Gift in memory of
Hiron Kumar Sanyal
from Mira Sanyal.
8 12 1978

ত্রৈমাসিক
পত্রিকা

বার্ষিক
৪।০
প্রতি সংখ্যা
১৲

পঞ্চম বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা
মাঘ, ১৩৪২

বিষয়-সূচী

সম্পাদক :
শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দত্ত

ভারতী ভবন
কলিকাতা

৫ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা
মাঘ ১৩৪২

পরিচয়

রাসলীলা

(১)

রাস কি ?

তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ বলেন—রসো বৈ সঃ—রসং হ্যেবায়ং লব্ধা আনন্দী ভবতি। ইহার ভাষ্যে শ্রীশঙ্করাচার্য্য লিখিয়াছেন—আনন্দ-কারণং রসবৎ ব্রহ্ম * * ব্রহ্মৈব রসঃ, রসত্ব-প্রসিদ্ধি র্ব্রহ্মণঃ অর্থাৎ আনন্দঘন ভগবান্ রসস্বরূপ।

রস কি ?

রসঃ সারোঽমৃতং ব্রহ্ম আনন্দো হ্লাদ উচ্যতে।
নিঃসারং তেন সারেণ সারবৎ লক্ষ্যতে জগৎ॥

—সুরেশ্বরাচার্য্যকৃত দীপিকা

অর্থাৎ 'রস' শব্দের নানার্থ—সার, অমৃত, ব্রহ্ম, আনন্দ, হ্লাদ—কিন্তু (সুরেশ্বরের মতে) 'রসো বৈ সঃ' এস্থলে রসশব্দে সার বা নির্য্যাসই বুঝিতে হয়। শঙ্করানন্দ ইহার অনুমোদন করেন না—তিনি বলেন 'রসঃ আনন্দদ্রবঃ স্বয়ং প্রকাশমানানন্দ ইত্যর্থঃ'। এই অর্থই সঙ্গততর মনে হয় এবং ইহাই সংস্কৃত আলঙ্কারিকদিগের অনুমোদিত। তাঁহারা বলেন, চিত্তের সত্ত্বোদ্রেকে রজঃ ও তমঃ তিরস্কৃত হইলে, এক যে অপূর্ব্ব,

লোকোত্তর, চমৎকার, অখণ্ড আনন্দচিন্ময় ভাব উদিত হয়—যাহা 'ব্রহ্মাস্বাদ-সহোদর', যাহা সহৃদয় বোদ্ধার অনুভববেদ্য—তাহাই 'রস'।

সত্ত্বোদ্রেকাদ্ অখণ্ডস্বপ্রকাশানন্দচিন্ময়ঃ।
বেদ্যান্তর স্পর্শশূন্যো ব্রহ্মাস্বাদ সহোদরঃ॥
লোকোত্তর চমৎকার প্রাণঃ কৈশ্চিৎ প্রমাতৃভিঃ।
স্বাকারবদ্‌অভিন্নত্বেনায়মাস্বাদ্যতে রসঃ॥
রজস্তমোভ্যাম্ অস্পৃষ্টং মনঃ সত্ত্বমিহোচ্যতে॥ —সাহিত্যদর্পণ ৩.৩৪

এই 'রস' হইতেই 'রাস'। রাস কি?

প্রেমরস-পরিপাক-বিলাস-বিশেষাত্মকঃ ক্রীড়াবিশেষঃ অথবা পরমরসকদম্বময়ো ব্যাপার-বিশেষঃ (সনাতন গোস্বামী)। ভাগবতের প্রাচীন টীকাকার বিজয়ধ্বজ রাস শব্দের এইরূপ ব্যুৎপত্তি করিয়াছেন :—

নৃত্যাদিষু ভরতরীতিসংজ্ঞেষু গাতুমুপক্রান্তেষু যোঽধিরসোল্লাসো জায়তে স রসঃ, তৎসম্বন্ধী রসো রাসঃ তদুদ্রেকেণ ক্রীড়া নৃত্যবিশেষঃ।

এ সম্পর্কে বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর উক্তি এই :—

নৃত্যগীতচুম্বনালিঙ্গনাদীনাং রসানাং সমূহো রাসস্তন্ময়ী যা ক্রীড়া সা রাসক্রীড়া।

অর্থাৎ রাস সেই ক্রীড়া— যাহাতে রস পরাকাষ্ঠা-প্রাপ্ত, যেখানে মাধুর্য্যের চরম (acme)। এক কথায়, অখিল রসামৃত-মূর্ত্তি, রসরাজ, রসিক-শেখর শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে রস-ব্রহ্ম আস্বাদের জন্য ব্রজগোপী—বিশেষতঃ রাসেশ্বরী শ্রীরাধার সহিত যে চিদানন্দময়ী ক্রীড়া করিয়াছিলেন, তাহাই রাস। ভক্তজনের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া তাহাদিগের চিত্ত আকর্ষণ জন্য শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে অনেকানেক মনোহর লীলা করিয়াছিলেন বটে—

অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষং দেহমাশ্রিতঃ।
ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যা শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ॥—ভাগবত, ১০।৩৩।৩৬

কিন্তু (বৈষ্ণবমতে) এই রাসলীলাই সর্ব্বলীলার চরম—

সন্তি যদ্যপি মে প্রাজ্যা লীলা স্তা স্তা মনোহরাঃ।
নহি জানে স্মৃতে রাসে মনো মে কীদৃশং ভবেৎ॥

সেই জন্য বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী বলিয়াছেন—এই রাসলীলা 'সর্ব্ব লীলা-সম্পৎ-শিরোমণি', 'সর্ব্বলীলোৎসব-মুকুটমণি'; সেইজন্য শ্রীকৃষ্ণের সার্থক নাম—'রাসরসতাণ্ডবী'।

বৃন্দাবনে এই রাসের ব্যাপার কিরূপ অভিনীত হইয়াছিল, লীলা-শুক বিল্বমঙ্গল একটিমাত্র শ্লোকে তাহা বিবৃত করিয়াছেন ঃ—

অঙ্গনাম্ অঙ্গনাম্ অন্তরা মাধবঃ,
মাধবং মাধবং চান্তরেণাঙ্গনা।
ইত্থম্ আকল্পিত মণ্ডলে মধ্যগঃ
সংজগৌ বেণুনা দেবকীনন্দনঃ।

ইহার মূল ভাগবতের রাসপঞ্চাধ্যায়ে।

রাসোৎসবঃ সংপ্রবৃত্তো গোপীমণ্ডলমণ্ডিতঃ।
যোগেশ্বরেণ কৃষ্ণেন তাসাং মধ্যে দ্বয়োর্দ্বয়োঃ।
প্রবিষ্টেন গৃহীতানাং কণ্ঠে সন্নিকটং স্ত্রিয়ঃ॥ —১০।৩৩।৩

ইহার অনুসরণ করিয়া কবিরাজ গোস্বামী চরিতামৃতে লিখিয়াছেন—

যত গোপসুন্দরী কৃষ্ণ তত রূপ ধরি
সবার বস্ত্র করিল হরণ।
যমুনা জল নির্ম্মল অঙ্গ করে ঝলমল
সুখে কৃষ্ণ করে দরশন॥

* *

যত হেমাব্জ জলে ভাসে তত নীলাব্জ তার পাশে
আসি আসি করয়ে মিলন॥

—অন্ত্যলীলা, ১৮ অধ্যায়

কৃত্বা তাবন্তমাত্মানং যাবতী র্গোপযোষিতঃ।
রেমে ভগবাংস্তাভিরাত্মারামোঽপি লীলয়া॥ ১০।৩৩।২০

'রাসমণ্ডলে যতজন গোপী নৃত্য করিতেছিলেন, শ্রীভগবান্ নিজকে তত সংখ্যক করিয়া, সেই ললনাদিগের প্রত্যেকের সহিত বিহার করিলেন।'

রাস পঞ্চাধ্যায়ে বর্ণিত রাসক্রীড়াই সবিশেষ বিখ্যাত—অতএব আমরা প্রথমে সেই বিবরণের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিব। কৌতূহলী পাঠক ভাগবত পুরাণের দশম স্কন্ধের ২৯ হইতে ৩৩ অধ্যায় পাঠ করিতে পারেন।

রাস পঞ্চাধ্যায়ের আরম্ভ এইরূপ :—

ভগবানপি তা রাত্রীঃশারদোৎফুল্লমল্লিকাঃ।
বীক্ষ্য রন্তুং মনশ্চক্রে যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ॥

শরৎকালের রাত্রি যখন উৎফুল্ল মল্লিকাগন্ধে আমোদিত হইয়া পূর্ণিমায় পরিপূর্ণ হইবার উপক্রম হইল, তখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ রিরংসু (রন্তুমিচ্ছুঃ) হইলেন এবং সেজন্য 'যোগমায়া' আশ্রয় করিলেন। আকাশে পূর্ণচন্দ্র উদিত হইলে বৃন্দাবন তাহার কৌমুদীতে স্নাত হইয়া "অতি রমিত" হইয়া উঠিল। তখন শ্রীকৃষ্ণ বেণু সহকারে মধুর গান করিলেন

—জগৌ কলং বামদৃশাংমনোহরম্।

সেই 'অনঙ্গবর্দ্ধন' সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া ব্রজবধূরা সমস্ত কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বনোদ্দেশে ধাবিত হইল—আজগ্মুঃ অন্যোন্যম্ অলক্ষিতোদ্যমাঃ। পতিপিতা প্রভৃতি গুরুজন তাহাদিগকে নিবারণ করিলেন—কিন্তু শ্রীকৃষ্ণাপহৃতচিত্তা গোপীগণ কোন মানাই মানিল না—

তা বার্য্যমাণাঃ পতিভিঃ পিতৃভির্ভ্রাতৃবন্ধুভিঃ।
গোবিন্দাপহৃতাত্মানো ন ন্যবর্ত্তন্ত মোহিতাঃ॥ ১০।২৯।৭

কারণ 'ডেকেছেন প্রাণনাথ—কে থাকিবে ঘরে?'

একলা ঘরে রইতে নারি, কেমন করে প্রাণ
দূর বিজনে ডাকছে আমায় শ্যামের বাঁশী গান।

গোপীদিগকে সমাগত দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ তাহাদের ঐকান্তিকতা পরীক্ষার জন্য লৌকিক হিতোপদেশ শুনাইয়া নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিলেন।

রজন্যেষা ঘোররূপা ঘোরসত্ত্বনিষেবিতা।
প্রতিযাত ব্রজং নেহ স্থেয়ং স্ত্রীভিঃ সুমধ্যমাঃ॥ ১০।২৯।১৯

'গোপীগণ! গোষ্ঠে ফিরিয়া যাও—পতিপুত্রের সেবা শুশ্রূষা করগে। দেখ, কুলাঙ্গনার পক্ষে ঔপপত্য অতি দোষাবহ।

তদ্ যাত মাচিরং ঘোষং, শুশ্রূষধ্বংপতীন্ সতীঃ।
ক্রন্দন্তি বৎসা বালাশ্চ তান্ পায়য়ত দুহ্যত॥
জুগুপ্সিতঞ্চ সর্ব্বত্র হ্যৌপপত্যং কুলস্ত্রিয়ঃ॥ ১০।২৯।২১,২৪

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ বুঝিতে চান, গোপীদিগের ভক্তি 'বিধ্যনুগা' না 'রাগানুগা'। গোপীরা বলিলেন—'হে শ্রীকৃষ্ণ! তোমার জন্য আমরা সর্ব্বস্বত্যাগ করিয়াছি—আমাদের এরূপ নৃশংস বলিও না—মৈবং বিভো! অর্হতি ভবান্ গদিতুং নৃশংসম্। হে পুরুষ-ভূষণ! তোমার সুন্দর মুখশ্রী দর্শনে আমরা তীব্র কামতপ্ত হইয়াছি— আমাদের তোমার দাসী কর—

> ত্বৎসুন্দরস্মিতনিরীক্ষণতীব্রকাম
> তপ্তাত্মনাং পুরুষভূষণ! দেহি দাস্যং॥ ১০।২৯।৩৫
> দত্তাভয়ঞ্চ ভুজদণ্ডযুগং বিলোক্য
> বক্ষঃ শ্রিয়ৈকরমণঞ্চ ভবাম দাস্যঃ॥ ১০।২৯।৪২

কারণ, ভয়হারী তোমার ভুজদণ্ড ও সমস্ত শোভার আধার তোমার বক্ষঃস্থল অবলোকন করিয়া আমরা আপনা হইতেই তোমার দাসী হইয়াছি।'

গোপীদিগের এই কাতরোক্তি শুনিয়া যোগেশ্বরেশ্বর শ্রীহরি সদয় হাস্য করতঃ গোপীদিগের সহিত রমণে প্রবৃত্ত হইলেন—

> প্রহস্য সদয়ং গোপীরাত্মারামোঽপ্যরীরমৎ। ১০।২৯।৪২

বৈজয়ন্তী-মালাধারী শ্রীকৃষ্ণ বনিতামণ্ডলীর মধ্যবর্ত্তী হইয়া গোপীগণের সহিত স্বয়ং গান করতঃ ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিলেন—

> উপগীয়মান উদ্গায়ন্ বনিতাশতযূথপঃ।
> মালাং বিভ্রদ্বৈজয়ন্তীং ব্যচরন্মণ্ডয়ন্ বনং॥

শুধু তাই নহে—শ্রীকৃষ্ণ বাহুপ্রসারণ, আলিঙ্গন, হস্তগ্রহণ, অলকা-উত্তোলন, নীবি ও বক্ষঃস্পর্শন, নখাঘাত, অপাঙ্গদৃষ্টি এবং হাস্য ও পরিহাস দ্বারা গোপীদিগের কামভাব উদ্দীপন করিয়া ক্রীড়া করিতে লাগিলেন।

> বাহুপ্রসারপরিরম্ভকরালকোরুনীবীস্তনালম্ভননর্ম্ম নখাগ্রপাতৈঃ
> ক্ষ্বেল্যাবলোকহসিতৈঃ ব্রজসুন্দরীণামুত্তম্ভয়ন্ রতিপতিং রময়াঞ্চকার॥ ১০।২৯।৪৬

শ্রীকৃষ্ণের আচরণে গোপাঙ্গনারা আপনাদিগকে পৃথিবীর মধ্যে

সবিশেষ সম্মানিতা মনে করিল—তখন শ্রীকৃষ্ণ তাহাদের গর্ব্ব নিবারণের জন্য অকস্মাৎ অন্তর্হিত হইলেন—

তাসাং তৎ সৌভগমদং বীক্ষ্য মানঞ্চ কেশবঃ।
প্রশমায় প্রসাদায় তত্রৈবান্তরধীয়ত॥ ১০।২৯।৪৮

কৃষ্ণের অদর্শনে গোপীরা একান্ত ব্যথিত হইয়া বিলাপ করিতে লাগিল এবং দলে দলে মিলিত হইয়া উচ্চকণ্ঠে শ্রীকৃষ্ণের গুণগাথা গান করিতে করিতে পাগলিনীর ন্যায় বনে বনে তাঁহার অন্বেষণ করিতে লাগিল—

গায়ন্ত্য উচ্চৈরমুমেব সংহতা, বিচিক্যুরুন্মত্তকবদ্বনাদ্বনম্।

তাহারা বৃন্দাবনের পশুপক্ষী তরুলতা সকলের নিকট শ্রীকৃষ্ণের সন্ধান করিতে লাগিল—

শংসন্তু কৃষ্ণপদবীং রহিতাত্মনাং নঃ

এবং নানা ভাবে শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন লীলাব অনুকরণ করিতে প্রবৃত্তা হইল—

ইত্যুন্মত্তবচো গোপ্যঃ কৃষ্ণান্বেষণ কাতরাঃ।
লীলা ভগবত স্তা স্তা হ্যনুচক্রুস্তদাত্মিকাঃ॥ ১০।৩০।১৪

এইরূপে সেই বনোদ্দেশে শ্রীকৃষ্ণের সন্ধান করিতে করিতে তাহারা তাঁহার পদচিহ্ন দেখিতে পাইল—ব্যচক্ষত বনোদ্দেশে পদানি পরমাত্মনঃ। কিয়দ্দূর যাইয়া দেখিল সেই চরণ-চিহ্নের সহিত এক রমণীর পদচিহ্ন মিলিয়াছে।

কস্যাঃ পদানি চৈতানি যাতায়া নন্দসূনুনা?

তাহারা বলিল, এই রমণী নিশ্চয়ই শ্রীহরির বিশিষ্ট আরাধনা করিয়াছিল, নহিলে সকলকে পরিত্যাগ করিয়া তিনি ইহার সহিত নির্জ্জনে গেলেন কেন?

অনয়া রাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।
যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয়দ্রহঃ॥ ১০।৩০।২৮

সেই রমণীর সৌভাগ্য স্মরণ করিয়া গোপীরা ঈর্ষান্বিতা হইল। তাহারা বলিতে লাগিল, ঐ কামিনী আমাদিগকে বঞ্চিত করিয়া একাকী কৃষ্ণের অধরামৃত পান করিতেছে।

তস্যা অমূনি নঃ ক্ষোভং কুর্ব্বন্ত্যুচ্চৈঃ পদানি যৎ।
যৈকাপহৃত্য গোপীনাং ধনং ভুঙ্‌ক্তেঽচ্যুতাধরং ॥ ২৬

এদিকে যে গোপীকে লইয়া শ্রীকৃষ্ণ নিবিড় বনে অন্তর্হিত হইয়াছিলেন, তিনি নিজের সৌভাগ্যে মদগর্ব্বিতা হইয়া আপনাকে সর্ব্বোত্তমা মনে করিলেন—

যাং গোপীমনয়ৎ কৃষ্ণো বিহায়ান্যাঃ স্ত্রিয়ো বনে।
সা চ মেনে তদাত্মানং বরিষ্ঠং সর্ব্বযোষিতাম্ ॥

এবং দর্পভরে শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন,—আর আমি চলিতে পারিনা আমাকে বহন করিয়া লইয়া চল। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, বেশ আমার স্কন্ধে আরোহণ কর। সেই রমণী যেমন কৃষ্ণস্কন্ধে আরূঢ়া হইতে গেলেন অমনি শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্হিত হইলেন।

ততো গত্বা বনোদ্দেশং দৃপ্তা কেশবমব্রবীৎ।
ন পারয়েঽহং চলিতুং নয় মাং যত্র তে মনঃ ॥
এবমুক্তঃ প্রিয়ামাহ স্কন্ধ আরুহ্যতামিতি।
ততশ্চান্তর্দধে কৃষ্ণঃ সা বধূরন্বতপ্যত ॥—৩৭।৩৮

গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা বলেন যে এই রমণীই রাধা—যাঁহাকে লইয়া শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্হিত হইয়াছিলেন এবং যিনি গর্ব্বভরে শ্রীকৃষ্ণের স্কন্ধে আরোহণ করিতে চাহিয়াছিলেন। ভাগবতে শ্রীরাধার নাম নাই—কিন্তু এই দৃপ্তা মদগর্ব্বিতা সৌভাগ্যমূঢ়া গোপী যে শ্রীরাধা এরূপ বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। এ ঘটনা দ্বারা মহাভাবময়ী শ্রীরাধার কোন ভাবই প্রকাশিত হয় না, বরং শুকদেব ভাগবতে যাহা বলিয়াছেন অর্থাৎ কামীর দৈন্য ও কামিনীর দৌরাত্ম্যই প্রকটিত হয়।

কামিনাং দর্শয়ন্ দৈন্যং স্ত্রীণাং চৈব দুরাত্মতাম্—১০।৩০।৩৪

সে যাহা হউক, শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্দ্ধানে ব্যথিতা ও অনুতপ্তা হইয়া সেই গোপবধূ বিলাপ করিতে লাগিল—

হা নাথ রমণপ্রেষ্ঠ ক্বাসি ক্বাসি মহাভুজ।
দাস্যাস্তে কৃপণায়া মে সখে দর্শয় সান্নিধিম্ ॥ ৩৯

কৃষ্ণান্বেষিণী অন্যান্য গোপিকারা ইতিমধ্যে সেই বিরহ-বিধুরা,

শোকার্ত্তা গোপীকে দেখিতে পাইল এবং তাঁহার মুখে তদীয় আচরণের কথা শুনিয়া অতীব বিস্মিত হইল—

অবমানঞ্চ, দৌরাত্ম্যাদ্বিস্ময়ং পরমং যযুঃ। ৪১

তখন সকলে শ্রীকৃষ্ণে মনঃপ্রাণ সমর্পণ পূর্ব্বক তাঁহার মধুর আলাপ ও লীলার ধ্যানে তদ্‌গত হইয়া দেহ গেহ সমস্তই বিস্মৃতা হইল এবং যমুনা-পুলিনে সমবেত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের স্তবগান করিতে লাগিল—

তন্মনস্কাস্তদালাপাস্তদ্বিচেষ্টাস্তদাত্মিকাঃ।
তদ্‌গুণানেব গায়ন্ত্যো নাত্মাগারাণি সস্মরুঃ॥
পুনঃ পুলিনমাগত্য কালিন্দ্যাঃ কৃষ্ণভাবনাঃ।
সমবেতা জগুঃ কৃষ্ণং তদাগমনকাঙ্ক্ষিতাঃ॥ ৪৩, ৪৪

এ স্তুতিগানই প্রসিদ্ধ গোপীগীত—ইহার অপূর্ব্ব কবিত্ব ও মাধুর্য্য আস্বাদনের বস্তু। গোপীগীতের আরম্ভ এই ;—জয়তিতেঽধিকং জন্মনা ব্রজঃ। ইহার আদ্যোপান্ত কামের কমনীয় উচ্ছ্বাসে মুখরিত—

সুরতনাথ তেঽশুল্কদাসিকাঃ—১০।৩১।২
অধরসীধুনাপ্যায়য়স্ব নঃ—ঐ, ৮
বিতর বীর নস্তেঽধরামৃতং—১০।৩১।১৪
কিতব যোষিতঃ কস্ত্যজেন্নিশি—ঐ, ১৬

এইরূপে কৃষ্ণদর্শন-লালসায় গোপীরা যখন বিবিধ বিচিত্র বিলাপ করিতেছিলেন, তখন পীতাম্বর বনমালী সাক্ষাৎ-মন্মথমন্মথ হাসিতে হাসিতে সেই গোপীমণ্ডলে অকস্মাৎ আবির্ভূত হইলেন—

ইতি গোপ্যঃ প্রগায়ন্ত্যঃ প্রলপন্ত্যশ্চ চিত্রধা।
রুরুদুঃ সুস্বরং রাজন্ কৃষ্ণদর্শনলালসাঃ॥
তাসামাবিরভূচ্ছৌরিঃ স্ময়মানমুখাম্বুজঃ।
পীতাম্বরধরঃ স্রগ্বী সাক্ষান্মন্মথমন্মথঃ॥ ১০।৩২।১,২

এই যে রাসমণ্ডলী হইতে শ্রীকৃষ্ণের তিরোভাব ও পুনরাবির্ভাব—ইহার একটি গভীর আধ্যাত্মিক অর্থ আছে। খৃষ্টীয় মিষ্টিকেরা ইহাকে 'Ludus Amoris'(Game of Love) বলেন—

The 'game of love' in which God plays, as it were, 'hide and seek' with the questing soul'—

তিনি তাহার নিকট Flying Perfect. (Emerson)

যতদিন ভক্ত ভগবানের সহিত সঙ্গত হইবার সম্পূর্ণ যোগ্যতা লাভ না করে, ততদিন তিনি এই লুকাচুরির খেলা খেলেন—

In our terms, it is the imperfectly developed spiritual perception, which becomes tired and fails.—Underhill

আমরা দেখিয়াছি, রাসের আরম্ভে গোপীদিগের দম্ভদর্প মানমক্ষ্থ বেশ প্রবল ছিল—সেইজন্য তিনি 'প্রশমায় প্রসাদায়' অন্তর্দ্ধান করিলেন। তারপর গোপীরা যখন বিলাপ অনুতাপে বিদগ্ধ হইয়া বিশুদ্ধ হইল, তখন শ্রীকৃষ্ণ—তাসাম্ আবিরভূৎ শৌরিঃ।

Thou wast but hidden from me and not lost.—Madam Guyon

With the souls who have arrived at perfection, I play no more the 'game of love' which consists in leaving and returning again to the Soul.—St. Catherine of Siena.

শ্রীকৃষ্ণকে পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া গোপীদিগের আর আনন্দের অবধি রহিল না। তাঁহারা নির্নিমেষে শ্রীকৃষ্ণের রূপসুধা পান করিলেন এবং বিবিধ কাম-প্রচেষ্টা দ্বারা স্ব স্ব মনোভাব ব্যক্ত করিলে লাগিলেন।

সর্ব্বাস্তাঃ কেশবালোকপরমোৎসবনির্বৃতাঃ।
জহুর্বিরহজং তাপং প্রাজ্ঞং প্রাপ্য যথা জনাঃ ॥১০।৩২।৯

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ সেই কামিনীদিগের সঙ্গে যমুনা-পুলিনে প্রবেশ করিলেন—যথায় বিকশিত কুসুম-গন্ধ বহন করিয়া মন্দ মন্দ গন্ধবহ প্রবাহিত হইতেছিল এবং ভ্রমর ভ্রমরী মধুগন্ধে মত্ত হইয়া ইতস্ততঃ ঝঙ্কার করিতেছিল।

তাঃ সমাদায় কালিন্দ্যাঃ নির্ব্বিশ্য পুলিনং বিভুঃ।
বিকসৎকুন্দমন্দারসুরভ্যনিলষট্পদম্ ॥ ১১

শ্রীকৃষ্ণ মদনমোহন মূর্ত্তিতে সেই গোপীমণ্ডলে উপবিষ্ট হইয়া অনুপম শোভা ধারণ করিলেন—

চকাস গোপীপরিষদ্গতোঽর্চ্চিতস্ত্রৈলোক্যলক্ষ্ম্যেকপদং বপুর্দধৎ ॥

অনন্তর গোপীগণ হাস্য, বিলাপ, প্রেমবীক্ষণ, ভ্রূকুঞ্চনাদির দ্বারা অনুরাগ প্রকাশ করতঃ শ্রীকৃষ্ণের সম্বর্দ্ধনা করিয়া তাঁহার হস্ত ও পদ স্ব স্ব উরুদেশে গ্রহণ করতঃ সংমর্দ্দন করিতে লাগিল এবং প্রণয়-কোপ প্রকাশে তাঁহার ব্যবহারের নিন্দা করিতে প্রবৃত্ত হইল।

সভাজয়িত্বা তমনঙ্গদীপনং সহাসলীলেক্ষণবিভ্রমভ্রুবা।
সংস্পর্শনেনাঙ্ককৃতাঙ্ঘ্রিহস্তয়োঃ সংস্তুত্য ঈষৎ কুপিতা বভাষিরে॥ ১৪

শ্রীকৃষ্ণ সলজ্জভাবে উত্তর দিলেন—সখিগণ! তোমাদিগের ঋণ আমি কোন কালে শোধ দিতে পারিব না—তোমরা আমার অনুরাগে লোকধর্ম্ম বেদধর্ম্ম আত্মীয় স্বজন সমস্ত উপেক্ষা করিয়া আমাতে আত্ম-সমর্পণ করিয়াছ—

ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজাং স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ।
যা মা ভজন্ দুর্জ্জরগেহশৃঙ্খলাঃ সংবৃশ্চ্য তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা॥ ২১

শ্রীকৃষ্ণের এই সকল সুমধুর বাক্যে গোপীরা উৎফুল্ল হইয়া বিরহ তাপ হইতে বিমুক্ত হইলেন। তখন রাসক্রীড়া আরম্ভ হইল—

তত্রারভত গোবিন্দো রাসক্রীড়ামনুব্রতৈঃ।
স্ত্রীরত্নৈরন্বিতঃ প্রীতৈরন্যোন্যাবদ্ধবাহুভিঃ॥ ১০।৩৩।২

ভাগবতের দশম স্কন্ধের ৩৩ অধ্যায়ে এই রাসের বর্ণনা। সে বর্ণনা কামায়ন-প্রচুর। রাসমণ্ডলে কৃষ্ণের সহিত নৃত্যপরা গোপীদের লাস্যলীলায় কেবল নূপুর কিঙ্কিণী ও বলয়ের কলধ্বনি মাত্র শ্রুত হয় নাই—আরও কত কি ঘটিয়াছিল।

বলয়ানাং নূপুরাণাং কিঙ্কিণীনাঞ্চ যোষিতাম্।
সপ্রিয়াণামভূচ্ছব্দস্তুমুলো রাসমণ্ডলে॥

শেক্স্পীয়র উন্মাদিনী ওফিলিয়ার মুখে যে গানটি বসাইয়াছেন তাহার ভাষায় বলিতে গেলে,—

To-morrow is Saint Valentine's day,
All in the morning betime,
And I a maid at your window,
To be your Valentine.

Then up he rose, and donn'd his clothes,
Ane dupp'd the chamber-door ;
Let in the maid, that out a maid
Never departed more.

কৃষ্ণপ্রেমে উন্মাদিনী গোপীগণ কৃষ্ণস্পর্শে প্রমোদিতা হইয়া মধুর রাগে রক্তকণ্ঠীর ন্যায় উচ্চকণ্ঠে গীত করিতে লাগিল। কেহ অনুরাগভরে চন্দনচর্চ্চিত উৎপলগন্ধী শ্রীকৃষ্ণের বাহু ধারণ করিয়া তাঁহার মুখচুম্বন করিল—কেহ বা শ্রম নিবারণের জন্য অচ্যুতের করকমল স্বীয় বক্ষে ধারণ করিল—

তত্রৈকাংসগতং বাহুং কৃষ্ণস্যোৎপল সৌরভং।
চন্দনালিপ্তমাঘ্রায় হৃষ্টরোমা চুচুম্ব হ॥ ১২১
নৃত্যন্তী গায়তী কাচিৎ কূজন্নূপুরমেখলা।
পার্শ্বস্থাচ্যুতহস্তাব্জং শ্রান্তাধাৎ স্তনয়োঃ শিবং॥ ১৩

আর শ্রীকৃষ্ণ? তিনি আলিঙ্গন, করস্পর্শ, সানুরাগ বিলোকন এবং চুম্বনাদি প্রেমোদ্দীপক ভাবে ব্রজগোপীদিগের সহিত রাসক্রীড়া করিতে লাগিলেন।

এবং পরিষ্বঙ্গকরাভিমর্শস্নিগ্ধেক্ষণোদ্দামবিলাসহাসৈঃ।
রেমে রমেশো ব্রজসুন্দরীভির্যথার্ভকঃ স্বপ্রতিবিম্ববিভ্রমঃ॥ ১৬

শ্রীকৃষ্ণের স্পর্শজনিত আনন্দে আকুল হওয়ায় ব্রজসুন্দরীদিগের কবরী বন্ধন, দুকূল ও কুচপট্টিকা শিথিল হইয়া ভূতলে পতিত হইতে লাগিল; কিন্তু তাঁহাদের এমন ক্ষমতা হইল না যে সেগুলিকে যথাস্থানে সন্নিবেশ করেন। প্রত্যুত তাঁহাদের মণিময় হার ও অঙ্গের আভরণ কোথায় কিভাবে স্খলিত হইল তাহা তাঁহারা লক্ষ্য করিতেই পারিলেন না।

তদঙ্গসঙ্গপ্রমুদাকুলেন্দ্রিয়াঃ কেশান্ দুকূলং কুচপট্টিকাং বা
নাঞ্জঃ প্রতিব্যোঢ়ুমলং ব্রজস্ত্রিয়ো বিস্রস্তমালাভরণাঃ কুরূদ্বহ॥১৭
তাস্তু ভগবদ্ বিলাসৈঃ আকুলা বভূবুঃ ইত্যাহ তদঙ্গেতি—শ্রীধরস্বামী

এইরূপে রাসক্রীড়া সমাপন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ ললনাগণের শ্রমাপনোদন জন্য অতঃপর যমুনাতে অবগাহনপূর্ব্বক জলক্রীড়া আরম্ভ

করিলেন—যেন গজরাজ করিণী-পরিবৃত হইয়া সলিলে অবগাহন করিতেছেন।

তাভির্যুতঃ শ্রমমপোহিতুম্ অঙ্গসঙ্গঘৃষ্টস্রজঃ স কুচকুঙ্কুমরঞ্জিতায়াঃ।
গন্ধর্ব্ব পালিভিরনুদ্রুত আবিশদ্বাঃ শ্রান্তো গজীভিরিভরাড়িব ভিন্নসেতুঃ॥২২

হাস্যমুখী গোপীগণ প্রেমবীক্ষণে নিরীক্ষণ করতঃ শ্রীকৃষ্ণের অভিমুখে জল সিঞ্চন করিতে লাগিল, অমরীগণ বিস্মিত নেত্রে চাহিয়া রহিল এবং সুরবৃন্দ বিমান হইতে পুষ্পবৃষ্টি করিল। আর শ্রীকৃষ্ণ? রেমে স্বয়ং স্বরতিরত্র গজেন্দ্রলীলঃ—২৩।—আত্মারাম শ্রীকৃষ্ণ গজরাজের লীলার অনুকরণ করিয়া সেই সকল গোপীদিগের সহিত রমণ করিতে লাগিলেন। শুকদেব পরীক্ষিতের নিকট রাসের বর্ণনা শেষ করিয়া বলিতেছেন—

এবং শশাঙ্কাংশুবিরাজিতা নিশাঃস সত্যকামোঽনুরতাবলাগণঃ।
সিষেব আত্মন্যবরুদ্ধ-সৌরতঃ সর্ব্বাঃ শরৎকাব্যকথারসাশ্রয়াঃ॥২৬

'শ্রীকৃষ্ণ সত্যকাম—গোপীগণ তাঁহার নিতান্ত অনুরক্তা—তথাপি তিনি অচ্যুত। শরৎকালীন সমস্ত রসালাপের আশ্রয়ীভূত এবং শশাঙ্কের বিমল জ্যোৎস্নায় ধবলিত সেই রাত্রি তিনি 'আত্মনি অবরুদ্ধ-সৌরত' (এবমপি আত্মন্যেব অবরুদ্ধঃ সৌরতঃ চরমধাতুঃ নতু স্খলিতঃ যস্য—শ্রীধর) হইয়া গোপীদিগের সহিত যাপন করিলেন।'

ইহাই ভাগবতের বর্ণিত রাস। পাঠক লক্ষ্য করিবেন, ইহার মধ্যে প্রচুর Eroticism আছে (Eroticismএর প্রতিশব্দ 'কামায়ন')। কয়েকটা পক্তির পুনরুল্লেখ করি।

নিশম্য গীতং তদ্ অনঙ্গবর্দ্ধনং—১০।২৯।৪
জারবুদ্ধ্যাপি সঙ্গতাঃ—ঐ ১১
হৃৎশয়াগ্নিঃ—ঐ ৩৫
তীব্রকামতপ্ত—ঐ ৩৮
উৎতম্ভয়ন্ রতিপতিং রময়ঞ্চকার—ঐ ৪৬
কামিন্যাঃ কামিনা কৃতং—১০।৩০।৩৩
স্মরতনাথ! তেঽশুল্কদাসিকা—১০।৩১।২
কৃণু কুচেষু নঃ কৃন্ধি হৃচ্ছয়ং—ঐ ৭

চরণপঙ্কজং শন্তমঞ্চ তে রমণ! নঃ স্তনেষর্পয়াধিহন্—ঐ ১৩

স্তনেষু ভীতাঃ শনৈঃ প্রিয় দধীমহি কর্কশেষু—ঐ ১৯

মনসি নঃ স্মরং বীর! যচ্ছসি—ঐ ১২

মুহুরতি স্পৃহা মুহ্যতে মনঃ—ঐ ১৭

পরবর্ত্তী ব্রহ্মবৈবর্ত্ত ও পদ্মপুরাণে রাসের বর্ণনায় ঐ কামায়ন (eroticism) অধিমাত্রায় উঠিয়াছে—যথাস্থানে আমরা তাহার আলোচনা করিব। এখন প্রশ্ন এই—রাসলীলা কি কামক্রীড়া না প্রেমোৎসব? আগামী বারে আমরা এ প্রশ্নের উত্তর দিবার চেষ্টা করিব।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত

সংস্কৃত সাহিত্যের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য

সংস্কৃত সাহিত্য পৃথিবীর একটি প্রাচীনতম সাহিত্য। বহু শতাব্দী ধরে এই বিশাল সাহিত্য গঠিত হয়েছে। প্রাচীন বৈদিক যুগ থেকে আরম্ভ করে মধ্যযুগ পর্য্যন্ত যে বিপুল জ্ঞানসম্ভার সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে তার সম্পূর্ণ ও বিশুদ্ধ ইতিহাস এখনও নির্ভুল ভাবে রচিত হয় নাই। ভারতীয় সভ্যতার এই যে কীর্ত্তি তা যেমনি উজ্জ্বল তেমনি গৌরবজনক। কিন্তু এত বড় বিরাট্ সাহিত্যের পর্য্যালোচনা কোনও প্রবন্ধেই সম্ভবপর নয়। এ সাহিত্যের এত ভাগ ও বিভাগ আছে, যে তাদের যে কোনো একটির অংশবিশেষ নিয়ে উৎকৃষ্ট মৌলিক-গ্রন্থ রচনা করা যেতে পারে। সংস্কৃত সাহিত্যের বৈদিক যুগ বাদ দিলে অবশিষ্ট থাকে লৌকিক। আবার সেই লৌকিক যুগের ভিতরই ধর্ম্মশাস্ত্র, নীতি-শাস্ত্র, পুরাণ, দর্শন প্রভৃতি নানাজাতীয় উপসাহিত্য এসে পড়ে। সুতরাং আমরা এখানে 'সাহিত্য' শব্দটির বাঙ্ময় অর্থ না ধরে কাব্য অর্থে ব্যবহার করছি।

এই সংস্কৃত কাব্য প্রাচীন সভ্যতার একটি অপূর্ব্ব রচনা। দেবভাষা আধুনিক যুগে অচল ও বিগতপ্রাণ হলেও, সেই ভাষায় লিখিত কাব্য-গুলি আজও দেশে বিদেশে বিশিষ্ট সম্মান ও সমাদর লাভের অধিকারী। খৃষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দী থেকে প্রায় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্য্যন্ত সংস্কৃত কাব্য-সাহিত্যের যুগ আয়ত। এরি মধ্যে তার উত্থান ও পতন, সম্ভব ও পরিণতি। সংস্কৃতানুরাগী পাঠক মাত্রই জানেন যে দীর্ঘ পনর-শত বৎসর ব্যাপী সাধনা ও অভ্যাসের ফলে সাহিত্যে কয়েকটি আদর্শ গঠিত হয়েছিল, আর বিভিন্ন মার্গে প্রসারিত হলেও সেই কাব্য-সাহিত্যে কয়েকটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য ছিল। এই বিশিষ্ট লক্ষণগুলির আলোচনা বোধ হয় অরুচিকর হবে না।

সংস্কৃত সাহিত্যের যেটি প্রধান বিশেষত্ব সেটি আমাদের মতে তার কল্পনা-শক্তির প্রখরতা। খুব কম প্রাচীন সাহিত্যেই এইরূপ রোম্যান্টিক

সুর পাওয়া যায়। সংস্কৃত সাহিত্যের কল্পনা-প্রিয়তা কয়েকজন কবির কাছে হয়ত ভাববিলাসিতায় পর্য্যবসিত হয়েছে। কিন্তু কালিদাস, ভবভূতি-প্রমুখ শ্রেষ্ঠ কবির লেখনী যে অপরূপ কল্পলোকের সৃষ্টি করেছে, তা সৌন্দর্য্যে ও সুষমায় সত্যই অনবদ্য। অবশ্য এ কথা সত্য যে সকল কাব্যের মূল উৎসই প্রেরণা ও কল্পনা; তবুও সংস্কৃত সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য এই যে সে কল্পনা অতি উচ্চাঙ্গের ও সুদূর বিস্তৃত। য়ুরোপীয় অথবা আধুনিক কাব্য-সাহিত্যের মত তাতে অভিনব চিন্তাধারার স্বকীয়তা অথবা উৎকর্ষ নেই; কিন্তু মানব-হৃদয়ের বিভিন্ন ভাব-ব্যঞ্জনায় অথবা প্রকৃতি বর্ণনায় সে কল্পনার সূক্ষ্মতা ও বিশেষত্ব ধরা পড়ে।

কল্পনা যেখানে সূক্ষ্ম, তাকে শারীর রূপ দেবার জন্য সেখানে উপমার প্রয়োজন হয়। এই জন্যই সংস্কৃত সাহিত্যে উপমার এত প্রাচুর্য্য। একটি প্রাচীন শ্লোক আছে,—

> কবিরিব বঞ্চিতনিদ্রস্তরুণি ভবার্থং ভৃশং স যুবা
> পদশব্দলীনহৃদয়ো রূপালঙ্কারভাবনা-নিপুণঃ।

অর্থাৎ হে তরুণি! তোমার জন্য সেই যুবক নিদ্রা বিষয়ে কবির মতই নিতান্ত বঞ্চিত হয়েছেন। কবিরা যেমন ব্যাকরণসিদ্ধ পদ ও শব্দ চিন্তায় গভীর মনোনিবেশ করেন এবং রূপ অর্থাৎ পদমাধুর্য্য ও উপমাদি অলঙ্কার উদ্ভাবনে তৎপর হন, তেমনি ইনিও তোমারি পদশব্দে সমগ্র চিত্তবৃত্তি অভিনিবিষ্ট করে রূপ অর্থাৎ অবয়ব-সৌন্দর্য্য ও অলঙ্কার শোভার চিন্তায় মগ্ন হয়ে রয়েছেন। এই আদিরসাত্মক শ্লোকটিতে পদমাধুর্য্য ও উপমালঙ্কারের সাহায্যে কি সুন্দর অর্থ করা হয়েছে! গুণী শিল্পীর হাতে এ উপমার শোভনতা প্রকৃতই সার্থক, তার আবেদনও সকলের হৃদয়স্পর্শী।

ভারতীয় মতানুসারে উপমার যাথার্থ্য ও সৌন্দর্য্যে কবিকুলগুরু কালিদাসের শ্রেষ্ঠত্ব সর্ব্বতোভাবে স্বীকার করা হয়েছে। বাণভট্ট, গোবর্দ্ধনাচার্য্য, 'প্রসন্নরাঘব'-রচয়িতা জয়দেব প্রভৃতি পরবর্ত্তী কবিগণ তাঁদের পূর্ব্বসূরিকৃত উপমা-মাধুর্য্যের যশোগান করেছেন। রঘুর ষষ্ঠ সর্গে ইন্দুমতীর স্বয়ংবর প্রসঙ্গে কালিদাস উপমালঙ্কারের উৎকৃষ্ট নিদর্শন দেখিয়েছেন। স্বয়ংবরা ইন্দুমতী যখন সমবেত রাজন্যবর্গকে বিনীত

নমস্কার করে একে একে অতিক্রম করে গেলেন, নৈরাশ্যজনিত তাঁদের মুখের পাণ্ডুরতা লক্ষ করে কবি বলেছেন,—

সঞ্চারিণী দীপশিখেব রাত্রৌ যং যং ব্যতীয়ায় পতিংবরা সা।
নরেন্দ্র মার্গাট্ট ইব প্রপেদে বিবর্ণভাবং স স ভূমিপালঃ।

এস্থলে অদৃশ্য মনোবিকারের তুলনা দিতে কবি কী মনোহর বাস্তব চিত্রের অবতারণা করেছেন! কালিদাস-সাহিত্যে উপমার অনটন বা অপ্রাচুর্য্য নেই। তাঁর শকুন্তলা, মেঘদূত, ঋতু-সংহার অথবা অন্য যে কোনো কাব্যের আলোচনা করলেই আমরা নানাবিধ উপমার পরিচয় পেয়ে থাকি। তবে আমাদের মনে হয় যে এক রঘু ত্রয়োদশেই তাঁর উপমা-শক্তির অজস্র উদাহরণ রয়েছে। কি 'ধারাস্বনোদ্‌গারিদরীমুখ' চিত্রকূটের গম্ভীর রূপব্যাখ্যানে, কি ধবলকৃষ্ণ 'ক্বচিৎ প্রভালেপিভিরিন্দ্রনীলৈ মুক্তা-ময়ী যষ্টিরিবানুবিদ্ধা' গঙ্গাযমুনার সঙ্গম বর্ণনায় তাঁর কল্পনাচাতুর্য্য, উপমা-মাধুর্য্য ও সূক্ষ্ম পর্য্যবেক্ষণ-প্রতিভা ধরা পড়ে।

কালিদাস ছাড়া ভবভূতির উত্তররামচরিতেও অনেক উৎকৃষ্ট উপমা আছে। নাটকের তৃতীয় অঙ্কে তমসা মুরলাকে বিরহক্ষীণা, ধৃতৈকবেণী, শীর্ণদেহা জানকীকে লক্ষ্য করে বলেছেন, "করুণস্য মূর্ত্তিরথবা শরীরিণী বিরহব্যথেব বনমেতি জানকী।" এখানে একটি হৃদয়াবেগ বা চিত্ত-বৃত্তির উপর যে ভাবে মানবত্ব আরোপিত হয়েছে তা প্রকৃতই অপূর্ব্ব।

কিন্তু একদিকে সংস্কৃত সাহিত্যে যেমন মনোহর উপমার অভাব নেই, অপর পক্ষে অনেক স্থলে তার মধ্যে একটা গতানুগতিকতার আভাস পাওয়া যায়। এমন কি স্থান বিশেষে সেগুলি নিষ্প্রভ ও অর্থ-হীন মনে হয়। একই অলঙ্কার অথবা একই উপমা যদি বারংবার প্রয়োগ করা যায়, তাহলে অতি ব্যবহারের ফলে তাতে বৈচিত্র্যহীনতা ও মালিন্যদোষ আসা স্বাভাবিক। এর জন্য কবিদের সম্পূর্ণ দোষী করা চলে না; আলঙ্কারিকদেরও কিছু পরিমাণে দায়ী করা যেতে পারে। সাহিত্যদর্পণ খুললেই দেখা যাবে কয়েকটি গুণ কয়েকটি বিশেষ বস্তুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত। সুতরাং মালিন্য বোঝালেই আকাশ ও পাপ, ধবলতা বললেই হাস্য ও যশ, রক্তিমার উল্লেখ করলেই ক্রোধ অথবা

রাগের প্রসঙ্গ তুলতে হবে। চকোরের জ্যোৎস্নাপান, বর্ষাগমে মরালগণের মানসযাত্রা, যোষিদ্‌গণের পদাঘাতে বিকসিক অশোকপুষ্প, মুখমদিরার স্পর্শে প্রস্ফুটিত বকুলমঞ্জরী, বিপ্রয়োগতাপে বিশীর্ণ বক্ষে দুঃসহ অলঙ্কারভার, ভ্রমর-জ্যারোপিত পুষ্পময় বিশিখক্ষত, যুবতী-কটাক্ষের অব্যর্থ শরসন্ধানে যুবজনের হৃদয়-লক্ষ্যভেদ, এই অলঙ্কারগুলি সংস্কৃত কাব্য-সাহিত্যে আবহমান কাল থেকে আমল পেয়ে এসেছে। অবশ্য গতানুগতিকতার মোহ কাটিয়ে কালিদাস, ভবভূতি প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ শিল্পিগণ অনেক স্থলে স্বতন্ত্র ধরণের সজীবতা ও নূতনত্ব প্রবর্ত্তন করেছেন; কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে এগুলি অতি প্রয়োগে দুষ্ট, সুতরাং সাধারণ পাঠকবর্গের কাছে যে কিছু পুরাতন ও বৈচিত্র্যহীন ঠেক্‌বে তা অস্বাভাবিক নয়।

সংস্কৃত কাব্য-সাহিত্যের কল্পনা-প্রবণতার কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। এ কল্পনাশক্তি নানাবিধ বর্ণনার মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। সংস্কৃত কবিগণের বর্ণনাভঙ্গী সত্যই চমৎকার। পুঞ্জীভূত দীর্ঘ সমাস ও রূপকাদি বহুবিধ অলঙ্কার সাহায্যে তাঁদের বর্ণনা বৈশিষ্ট্য অর্জ্জন করেছে। কিন্তু এ কথা বোধ হয় বলা চলে যে তাঁদের বাক্যবিন্যাস কোনও কোনও স্থানে তেমন সতর্কতা লাভ করেনি। ধরা যাক্‌ কাদম্বরীতে রাজা শূদ্রকের বর্ণনা। তাঁর চরিত্রে অসাধারণ ধীশক্তি, অতিবদান্যতা, পরাক্রম, প্রবল প্রতাপ প্রভৃতি যে গুণগুলি আরোপিত হয়েছে, সেগুলি অনায়াসে যে কোনও প্রাচীন রাজার পক্ষেই প্রযুজ্য। দণ্ডী-কৃত দশকুমারচরিতের পূর্ব্বপীঠিকায় প্রথম উচ্ছ্বাসেও আমরা এইরূপ আর একটি বর্ণনা দেখতে পাই। রাজা রাজহংসের সম্বন্ধে "সকলরিপুগণকটকজলনিধিমথনমন্দরায়মাণসমুদ্দণ্ডভুজদণ্ডঃ, বিরচিতারাতিসন্তাপেন প্রতাপেন সতত তুলিতবিয়ন্মধ্যহংসো" প্রভৃতি যে বিভীষণ বিশেষণগুলি ব্যবহার করা হয়েছে তার থেকে আমরা একজন পরাক্রান্ত নরপতির চিত্র পাই, তাঁর চরিত্রের অন্য কোনও উল্লেখযোগ্য বিশেষত্বের সন্ধান পাই না। আবার শূদ্রকের রাজধানী বিদিশার বর্ণনাচ্ছলে বাণভট্ট যে ভাষা প্রয়োগ করেছেন তাতে নগরীর সংস্থান কোন্‌দিকে অথবা কোন প্রদেশে তা ভিন্ন আর সব

কথাই জানা যায়। এই রকম বিন্ধ্যাটবী বর্ণনাতেও ঐ ত্রুটিটুকু আমাদের নজরে পড়ে। প্রাচীন কবিগণ ঐতিহাসিক পরিবেশ ও ভৌগোলিক সংস্থান সযত্নে পরিহরণ করেছেন।

এই বর্ণনাপ্রসঙ্গে আর একটি বৈশিষ্ট্যের কথা আমাদের স্বতঃই মনে আসে। সেটি হল প্রাচীন কবিগণের নারীরূপের সৌন্দর্য্যকীর্ত্তন। নানা কবি নানা ভঙ্গীতে নারীরূপের বর্ণনা করেও পরিতৃপ্ত হতে পারেন নি। তাঁদের এই রূপ-পরীপ্তি রমণীর সৌন্দর্য্যকে সংস্কৃত সাহিত্যে অমরত্বদান করেছে। কালিদাস, বাণভট্ট, ও শ্রীহর্ষ থেকে আরম্ভ করে অপেক্ষাকৃত নগণ্য রচয়িতা পর্য্যন্ত সকলেই বিধিমতে, সুকৌশলে ও মধুরভাষায় অঙ্গনাবয়বের যথাযথ সৌন্দর্য্যবিকাশ বর্ণনা করেছেন। ললিত দেহযষ্টিকার এই পুনরাবৃত্ত পরিশীলনের ফলে অনেক সময়ে আমরা ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠি। কোনও কবি হয়ত মস্তকের কেশ জাল থেকে সূত্রপাত করে পদনখাশ্রিত সৌন্দর্য্যের চিত্র এঁকেছেন, আবার কেহ বা সরোরুহ লাঞ্ছিত পদযুগল থেকে উর্দ্ধায়িত হয়ে শিরোভূষণ পর্য্যন্ত উঠেছেন। উদাহরণস্বরূপ বাসবদত্তায় কন্দর্পকেতুর স্বপ্নদর্শন উল্লেখ করা যেতে পারে। এই অষ্টাদশবর্ষ-দেশীয়া কন্যার অপরূপ রূপলাবণ্যের বর্ণনা অতি অদ্ভুত ও বিরতিবিহীন বললেও অতিরঞ্জন হয় না। প্রথমে অধমাঙ্গ শোভা, অনিচ্ছাকৃত পরিসমাপ্তিতে অতঃপর উত্তমাঙ্গের রূপবর্ণন। টীকাকার এরূপ বর্ণনার ব্যাখ্যাও দিয়েছেন। উৎস্বপ্নায়মান পুরুষ শয্যায় শয়ান, স্বপ্নদৃষ্টা রমণী ঈষৎ উর্দ্ধাবস্থায়, সুতরাং এক্ষেত্রে স্বাভাবিক বর্ণনার বিপর্য্যয়ই রুচিসঙ্গত।

কিন্তু এই শতধা রূপব্যাখ্যানেও প্রাচীন ও অভিজাত প্রথার আনুগত্য আছে। মেঘদূতে কালিদাস—

> তন্বী শ্যামা শিখরিদশনা পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী
> মধ্যে ক্ষামা চকিতহরিণীপ্রেক্ষণা নিম্ননাভিঃ"

প্রভৃতি শ্লোকে যে নারী সৌন্দর্য্যের একটি আদর্শাভাস দিয়েছেন তা সকলের সুপরিচিত। এই আদর্শকেই অন্যান্য প্রাচীন কবিরা অল্পবিস্তর স্বীকার করে নিয়েছেন। কিন্তু তারি সবিস্তার বর্ণনা যদি পঙক্তির পর

পঙক্তি-ব্যাপী দীর্ঘ ও পরিস্ফুপ্ত হয়ে থাকে, তা হলে একটু বৈচিত্র্যহানি হতে বাধ্য। শ্রীহর্ষের নৈষধীয় কাব্যে সমস্ত সপ্তমসর্গখানি দময়ন্তীর রূপবর্ণনে নিয়োজিত হয়েছে। দুটি শ্লোকে কেশজালের, তিনটি শ্লোকে ভ্রূদ্বয়ের, নয়টিতে নয়নযুগলের, সাতটিতে অধরোষ্ঠের, তিনটিতে কুন্দ-দন্তের, চারটিতে মধুর বাণীর, পুনরায় নয়টি শ্লোকের সাহায্যে ভৈমীর সাবয়ব মুখবর্ণনা সমাপ্ত হয়েছে। এই ত গেল শুদ্ধ বদন মণ্ডলের বর্ণনা; শ্রোণী, জানু, গুল্‌ফ ও চরণাঙ্গুলির শোভা বাদ দিলাম। তারপর উপমাগুলিতেও সেই একই প্রকারের উপমিত পদপ্রয়োগ। নেত্রের সহিত সফরীর, কেশজালের সহিত শৈবালদামের, উদরস্থিত ত্রিবলীর সহিত সোপানরাজির আর অপরিমেয় দেহলাবণ্যের সহিত অগাধ সরোবরের তুলনা বহু কবিই গ্রহণ করেছেন।

সংস্কৃত কাব্যসাহিত্যের আর একটি প্রধান বিশেষত্ব তার বিস্ময়কর বাক্‌চাতুর্য্য। নানারকমের শ্লেষ, যমক, অনুপ্রাস ও বাক্যবিন্যাস সাহিত্যে প্রচলিত আছে। যেখানে অর্থগৌরব সংরক্ষিত হয়েছে, সেখানে এগুলির সার্থকতা নিঃসংশয়। কিন্তু যেখানে রসসৃষ্টির অভাব ঘটে, সেখানে লিপিকুশলতা নিরর্থক বলে প্রতিপন্ন হয়। রঘুর নবম সর্গে বসন্তবর্ণন-প্রসঙ্গে কালিদাস লিখেছেন,

"সুবদনাবদনাসবসম্ভৃতস্তদনুবাদিগুণঃ কুসুমোদ্গমঃ
মধুকরৈকরোন্মধুলোলুপৈর্বকুলমাকুলমায়তপঙ্‌ক্তিভিঃ।"

অর্থাৎ মদগন্ধি বকুল পুষ্পরাশি সুমুখী কামিনীগণের মুখমদিরার সংস্পর্শে শীঘ্র উৎপন্ন হইলে মধুলোভী অলিকুল দলে দলে সমাগত হইয়া বকুলবৃক্ষকে আকুল করিয়া তুলিল।

পুনরায়—

"উপচিতাবয়বা শুচিভিঃ কণৈরলিকদম্বকযোগমুপেয়ুষী
সদৃশকান্তিরলক্ষ্যত মঞ্জরী তিলকজালকজালকমৌক্তিকৈঃ"

অর্থাৎ শ্বেত পরাগসংশ্লিষ্ট তিলকমঞ্জরী ভ্রমর পঙক্তির সংসর্গ লাভ করাতে অঙ্গনাদিগের অলকার্পিত মুক্তাগুম্ফিত অলকাভরণের ন্যায় শোভিত হইতে লাগিল। এই উল্লিখিত শ্লোক দুটিতে যে অর্থ-গৌরবের

ও পদবিন্যাসের মধুর সমন্বয় সাধিত হয়েছে তার সন্দেহ নেই। একটি উদ্ভট শ্লোক আছে,—

তয়া কবিতয়া কিংবা তয়া বনিতয়া কিমু
পদবিন্যাসমাত্রেণ যয়া ন হ্রিয়তে মনঃ।

অর্থাৎ পদবিন্যাস মাত্রেই যে কবিতা অথবা বনিতা মানুষের চিত্তহরণ করতে না পারে সে কবিতাতে বা বনিতাতে কিছুমাত্র ফল নেই। উপরকার শ্লোকটি থেকে কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যাবে যে সেকালে কাব্যরচনার আদর্শ কতটা শোভন ও সুললিত ছিল।

এ রকম উচ্চাঙ্গের পদবিন্যাস রচনায় কালিদাস কতদূর পারদর্শী ছিলেন সে সম্বন্ধে একটি চমৎকার জনশ্রুতি আছে। গল্পের সত্যাসত্য নির্ণয় পাঠক করবেন, তবে প্রবাদ আছে, একদা কালিদাস ও বররুচির মধ্যে ভীষণ মতানৈক্য হয়েছিল 'প্রকৃত কাব্য কি?' এই তর্ক নিয়ে। অবশেষে জরতীবেশিনী সরস্বতী উভয়কে পরীক্ষা করবার জন্য তাম্বুল ভক্ষণ উপলক্ষ্য করে এক একটি শ্লোক রচনা করতে আদেশ করেন। বররুচি বললেন,—

তূর্ণমানীয়তাং চূর্ণং পূর্ণচন্দ্রনিভাননে
পর্ণানি স্বর্ণবর্ণানি শীর্ণান্যাকর্ণলোচনে।

হে পূর্ণচন্দ্রমুখি! শীঘ্র চূণ নিয়ে এস। অয়ি আকর্ণলোচনে তাম্বুলপত্রগুলি স্বর্ণবর্ণ হয়ে উঠেছে, শীঘ্রই শীর্ণ হয়ে যাবে।
আর কালিদাস উত্তর দিলেন,—

বিনা খদিরসারেণ হারেণ হরিণীদৃশঃ
নাধরে জায়তে রাগো নানুরাগঃ পয়োধরে।

খদিরসার ব্যতীত মৃগনয়না অঙ্গনার অধরে রক্তিমাপ্রতিফলিত হয় না, আর হার ব্যতিরেকে পয়োধরেও অনুরাগ জন্মায় না।

শ্লোক দুটির মধ্যে কোনটির উৎকর্ষ হৃদয়কে মুগ্ধ করে পাঠান্তে তা সহজেই বোধগম্য হয়। প্রথমোক্ত শ্লোকের তাৎপর্য্য কিছুই নেই, কেবল শব্দচ্ছটা ও কৃতক অনুপ্রাসের দ্বারা ওটি অলঙ্কৃত হয়েছে। দ্বিতীয়টিতে ভাবের গভীরতা আছে আর যেটুকু অনুপ্রাস ব্যবহার করা

হয়েছে সেটুকু সরল ও অকৃত্রিম। কাহিনীটি সত্য হোক আর মিথ্যা হোক্, রচনা দুইটির তারতম্যের সাহায্যে উৎকৃষ্ট পদরচনার মাধুর্য্য দেখানোই আমাদের উদ্দেশ্য। আরো অন্যান্য কবির অনেক রচনা থেকে উদ্ধৃত করা যেতে পারে যেখানে পদলালিত্য ও অর্থগৌরব একত্র অতি সুন্দর ভাবে গ্রথিত হয়েছে। অপর পক্ষে এমন অনেক রচয়িতা আছেন যাঁদের কাব্য কেবল গাঢ়বন্ধ শ্লেষে ও অকল্প বাক্‌চাতুর্য্যে পরিণত হয়েছে। তাঁরা প্রকৃতপক্ষে কাব্যমার্গ অনুসরণ করেন নি, করেছেন কাব্যশিল্পমার্গকে।

উপমার জন্য কালিদাস যেমন বিখ্যাত, অর্থগৌরবের জন্য ভারবি তেমনি প্রসিদ্ধিলাভ করেছিলেন। তাঁর কাব্যেও যথেষ্ট মৌলিকতা আছে। কিরাতের চতুর্থসর্গে শরৎকাল বর্ণনে, নবমসর্গে সন্ধ্যা, চন্দ্রোদয় ও প্রভাত বর্ণনায় বীররসপ্রধান কাব্যের ভিতরও কবি উচ্চদরের কাব্যশক্তি স্ফুরিত করেছেন। আবার মধ্যে মধ্যে প্রকৃত কাব্যাংশ চাপা পড়ে গিয়েছে, সেই সব স্থানে বর্ণ ও শব্দবৈচিত্র্যের আধিক্য স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। একই শ্লোকের ভিতর তিনি কত ভিন্ন ভিন্ন অর্থ সন্নিবিষ্ট করেছেন। দণ্ডীর 'কাব্যাদর্শে' যে সকল শব্দ ও বর্ণ-বৈচিত্র্যের উদাহরণ আছে, ভারবির কাব্যে সেগুলির অনেক সন্ধান মেলে। পঞ্চদশ-সর্গে এমন অদ্ভুত শ্লোক আছে যার উভয় দিক থেকে একই পাঠ হয়। চতুর্দ্দশ শ্লোকটিতে মাত্র একটি 'ৎ', নতুবা 'ন' কার ভিন্ন অন্য কোনো শব্দের প্রয়োগই নেই।

ন নোননুন্নো নুন্নোনো ননা নানাননা ননু
নুন্নো নুন্নো ননুন্নেনো নানেনা নুন্ননুন্ননুৎ।"

সমগ্র শ্লোকটি আবৃত্তি করে গেলে মনে ভ্রম হয় বুঝিবা হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের তেলেনা শুনছি। বলা নিষ্প্রয়োজন এ ধরণের অর্থহীন কারু-কার্য্য অতীব হাস্যকর। আমাদের মনে হয় সংস্কৃত কাব্যসাহিত্যের অবনতির যুগ এইখান থেকেই সুরু হয়েছে।

নৈষধীয় কাব্য আর একখানি বিপুল ও সমধিক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। দ্বাবিংশসর্গে কাব্যখানি সমাপ্ত হয়েছে। অলঙ্কার শাস্ত্রের উদ্ভট উদাহরণে

আর কামশাস্ত্রের সুচতুর ব্যাখ্যায় কাব্যগ্রন্থ এতটা স্ফীত। অত্যুক্তি-দোষ, যমক, অপ্রযুক্ত অনুপ্রাস অধিকাংশ স্থলেই বিরাজমান। এ জন্য বিশুদ্ধ কাব্য তাঁর রচনায় স্বল্প, কৃত্রিম কাব্যশিল্পই বেশী পরিমাণে লক্ষিত হয়। জনশ্রুতি আছে কবি শ্রীহর্ষের মাতুল প্রসিদ্ধ আলঙ্কারিক মম্মট-ভট্ট ভাগিনেয়ের রচনা সম্বন্ধে অত্যন্ত সরল মন্তব্যপ্রকাশ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে তাঁর স্বকৃত 'কাব্যপ্রকাশ' গ্রন্থ প্রণয়নের পূর্ব্বে যদি নৈষধীয় কাব্য রচিত হত, তাহলে 'দোষপরিচ্ছেদের' নিদর্শন চয়ন করবার জন্য তাঁকে বহুকাব্য অনুসন্ধান করে ফিরতে হতনা। এক নৈষধীয় কাব্যেই যাবতীয় দোষের দৃষ্টান্ত মিলত।

যদি প্রাচীন সাহিত্যের এমন কোনো কবি থাকেন যিনি এ বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা দোষী, তা হলে আমরা একবাক্যে সুবন্ধুর নামোল্লেখ করতে পারি। মাঘের 'শিশুপালবধে' শব্দ ও অলঙ্কার-সম্পদ্ প্রচুর পরিমাণেই বর্ত্তমান। বক্রোক্তিমার্গের কবিকুলের মধ্যে কবিরাজও একজন খ্যাতনামা শিল্পী। তাঁর 'রাঘবপাণ্ডবীয়' নামক কাব্যগ্রন্থে রাঘব ও পাণ্ডব উভয় পক্ষের অর্থোপপত্তি সাধন করে তিনিও অশেষ শ্রম ও সহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়েছেন, কিন্তু তুচ্ছ শব্দার্থের নাগপাশ থেকে মুক্ত হতে পারেন নি বলে তাঁর বিশিষ্ট প্রতিভার অপব্যবহার করেছেন। কিন্তু এ সকল কবিকে একেবারে ছাড়িয়ে গেছেন 'বাসবদত্তার' প্রণেতা সুবন্ধু। তাঁর গ্রন্থখানি কথা-সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত, তবে আখ্যানবস্তু অপেক্ষা কাব্যনৈপুণ্যই তাতে অধিক। বর্ণনা ও কাব্যশিল্পই তাঁর কাব্যের প্রাণ স্বরূপ। অলঙ্কারশাস্ত্রের যতগুলি বিধান আছে সবগুলির প্রয়োগই বোধ হয় তাঁর গ্রন্থে মিলে যাবে।

> নগরার্ণবশৈলর্ত্তুচন্দ্রার্কোদয়বর্ণনৈঃ
> উদ্যানসলিলক্রীড়ামধুপানরতোৎসবৈঃ॥
> বিপ্রলম্ভবিবাহৈশ্চ কুমারোদয়বর্ণনৈঃ
> মন্ত্রদূতপ্রয়াণাজিনায়কাভ্যুদয়ৈরপি॥ কাব্যাদর্শ, ১।১৭

উল্লিখিত বর্ণনা শিল্পেই সুবন্ধুর সমগ্র কাব্যশক্তি নিয়োজিত হয়েছে। 'বাসবদত্তা'য় বোধ করি এমন কোনো পৃষ্ঠা নেই যেখানে

শ্লেষের সন্ধান পাওয়া যায় না। আর সেই সব শ্লেষ অতি কূট ও দুরূহ। ঐতিহ্য, পুরাণ, আখ্যায়িকা প্রভৃতি নানাবিধ স্থান থেকে সেগুলি সমাহৃত। তাঁর বাক্য বা পদসমূহের প্রকৃত অর্থ সাধারণ পাঠকের নিকটে দুর্ব্বোধ ত বটেই, ব্যুৎপন্ন টীকারেরাও সে অপ্রমেয় অর্থসন্ধানে গলদ্‌ঘর্ম্ম হয়েছেন। দ্ব্যর্থ ও অপ্রধান অর্থ সমন্বিত সমাসে ও অতিবিস্তর শব্দ-প্রাচুর্য্যে সুবন্ধু অপ্রতিপক্ষ। তাঁর কাব্য গৌড়ী রীতির অতি উৎকৃষ্ট উদাহরণ। সুবন্ধু যেন পরম আত্মতৃপ্তিভরেই বলেছেন, "কবীনামগলদ্দর্পো নূনং বাসবদত্তয়া"। প্রতি অক্ষরে তাঁর শ্লেষ, তা যেমনি বহুল তেমনি অপ্রকট। তাই 'বাসবদত্তা'র শেষভাগে তিনি নিজেই শ্লেষের প্রাধান্য সম্বন্ধে পরিষ্কার লিখেছেন,—

প্রত্যক্ষর শ্লেষময়প্রপঞ্চ-
বিন্যাসবৈদগ্ধ্যনিধিং প্রবন্ধং
সরস্বতীদত্তবরপ্রসাদ
শ্চক্রে সুবন্ধোঃ সুজনৈকবন্ধুঃ।

তবে একথা স্বীকার করতে হবে যে অনেক উৎকট ভঙ্গী সত্ত্বেও তাঁর রচনায় উপভোগ্য বস্তু আছে। পূর্ব্ববর্ত্তী পদের শেষাংশের সহিত শৃঙ্খলিত পদরচনায় তিনি কেমন সিদ্ধহস্ত ছিলেন, পাঠক নিম্নোক্ত উদাহরণ থেকেই বুঝতে পারবেন,—

"যস্য চ সমরভুবি ভুজদণ্ডেন কোদণ্ডম্, কোদণ্ডেন শরাঃ, শরৈররিশিরঃ, অরিশিরসা ভূমণ্ডলং, ভূমণ্ডলেন অনন্থভূতপূর্ব্বো নায়কঃ, নায়কেন কীর্ত্তিঃ, কীর্ত্ত্যা সপ্ত সাগরাঃ, সাগরৈঃ কৃতযুগাদিরাজচরিতস্মরণম্, স্মরণেন স্থৈর্য্যম্, স্থৈর্য্যেণ প্রতিক্ষণ-মাশ্চর্য্যমাসাদিতম।"

হয়ত সংক্ষেপে বলা চলত, তবুও এই অন্যোন্যবদ্ধ বাক্যবলয়গুলি সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করেছে এ কথা অস্বীকার করা যায় না। এ যেন অনেকটা শ্রুতিমধুর একাবলী রচনা, কেবল কার্য্যকারণ-সম্পর্কের অভাব। সুবন্ধুর এই ভিন্নমুখী আলঙ্কারিক প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে বক্রোক্তিমার্গের অপর একজন শিল্পী কবিরাজ তাঁর পূর্ব্ববর্ত্তী কবির যশঃকীর্ত্তন করেছেন,—

"সুবন্ধুর্বাণভট্টশ্চ কবিরাজ ইতি ত্রয়ঃ
বক্রোক্তিমার্গনিপুণশ্চতুর্থো বিদ্যতে ন বা।"

আত্মগৌরবের পরাকাষ্ঠা বটে, তবে সৌভাগ্যক্রমে কবিরাজ অপর দুই কবিকে একেবারে নিরাকৃত করেন নি। এ প্রশংসা সুবন্ধুর প্রকৃত প্রাপ্য, অযোগ্য নয়।

এতক্ষণ আমরা সংস্কৃত সাহিত্যের অনেক অপ্রতীত শ্লেষের উল্লেখ করে এসেছি। কিন্তু এ শ্লেষ সত্ত্বেও পদলালিত্য সে সাহিত্যের একটি বিশেষ গুণ। নৈষধে পদলালিত্য প্রবাদবাক্যের অন্তর্গত, অতএব তাই থেকে দৃষ্টান্ত সঞ্চয়ন করাই যুক্তিসঙ্গত।

"অহো অহোভির্মহিমা হিমাগমেঽপ্যভিপ্রপেদে প্রতি তাং স্মরার্দিতাম্
তপর্ত্তুপূর্ত্তাবপি মেদসাং ভরা বিভাবরীভির্বিভরাং বভূবিরে।" নৈষধ ১।৪১

আবার "পতত্রিণা তদ্রুচিরেণবঞ্চিতং শ্রিয়ঃ প্রয়াস্ত্যাঃ প্রবিহায় পল্বলং
চলৎপদাম্ভোরুহ নূপুরোপমা চুকূজ কূলে কলহংসমণ্ডলী।" নৈষধ ১।১২৭

শ্লোক দুটি, বিশেষতঃ শেষ চরণ গুলি, বার বার আবৃত্তি করলে তবে এদের সুকুমার পদলালিত্য ধরা পড়ে। এই লালিত্যগুণই নৈষধের চরম প্রকর্ষ, এই কারণেই তার অন্যান্য ত্রুটি মার্জ্জনীয়। কয়েকটি উদ্ভট শ্লোকেও আমরা এই ললিত পদরচনা লক্ষ্য করেছি, নিম্নে তারই একটি উদ্ধৃত করলাম।

যুষ্মৎকৃতে খঞ্জনমঞ্জুলাক্ষি
শিরো মদীয়ং যদি যাতি যাতু
যাতানি নাশং জনকাত্মজার্থে
দশাননেনাপি দশাননানি।

অর্থটিও মনোহারী। হে খঞ্জননয়নে! যদি তোমার জন্য আমার মস্তক যায়, যাক্—তাতে আমি কিছুমাত্র দুঃখিত নই। দশানন রাবণ যখন জানকীর জন্য দশটি মস্তকেরই বিনাশ সাধনে পশ্চাৎপদ হননি, তখন আমার একটি মাত্র শিরের কথা কি আর বলব! মিলনভিক্ষায় মুখর প্রণয়ীর মুখে চাটুবাক্য ও পুরাণের উল্লেখ অতি শোভন হয়েছে; কিন্তু তার চেয়ে মোহন, শ্লোকটির পদলালিত্য।

সংস্কৃত সাহিত্যে বাগ্‌বিস্তার ও শব্দচাতুর্য্যের কথা পূর্ব্বে আমরা উল্লেখ করেছি। সেই সঙ্গে তার আরো একটি বিশেষত্বের কথা বলা দরকার। সেটি হল এর বিপরীত গুণ, অর্থাৎ বাক্‌সংক্ষেপ। সংস্কৃত কবিরা যেমন অতিবিস্তর পদ ব্যবহারে নিপুণ ছিলেন, তেমনি আবার অল্প কথাতেও তাঁদের বৈদগ্ধ্যপ্রকাশ করেছেন। সূত্রগুলির কথা বাদ দিলাম, যদিও তারা অতিসংক্ষেপের উৎকৃষ্ট উদাহরণ, কারণ সূত্র কাব্য বিষয়ের বহির্ভূত। কাব্য সাহিত্যেও অবিস্তর বাক্যের ভূরিনিদর্শন আছে। যে বাণভট্ট প্রচুর শব্দালঙ্কার আর বর্ণনা-প্রাগল্‌ভ্যের জন্য সুপ্রসিদ্ধ, তাঁর কাদম্বরীর মত গ্রন্থেও অনেক মূল্যবান্ ও সামাসিক কথা লিপিবদ্ধ আছে। মদনশরে বিক্ষত বন্ধুকে যখন কপিঞ্জল সান্ত্বনা-বাণী শোনাচ্ছেন, প্রত্যুত্তরে কুমার বলছেন, "বয়স্য! সবই বুঝি, কিন্তু মন বোধ মানে না। ব্যথার ব্যথী না হলে পরকে উপদেশ দেওয়া সহজ কাজ—সুখমুপদিশ্যতে হি পরস্য।" আবার গ্রন্থের পূর্ব্বভাগে শুকনাস কুমার চন্দ্রপীড়কে যে নীতি শাস্ত্রের উপদেশ দিচ্ছেন, সেগুলিও সংক্ষেপগুণে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অন্যস্থলে, বিলাসবতীর সান্ত্বনাতেও লঘুপদা সরস্বতীর প্রাধান্য রক্ষিত হয়েছে।

সংস্কৃত প্রবাদ-বাক্যগুলিও এই শ্রেণীর ভিতরে পড়ে। সংক্ষিপ্ত ও সহজস্মরণ বাক্যের সাহায্যে অনেক সারগর্ভ বাণী তাতে লিপিবদ্ধ আছে।

"বরং রামশরঃ সহ্যো ন চ বৈভীষণং বচঃ
অসহ্যং জ্ঞাতিদুর্ব্বাক্যং মেঘান্তরিতরৌদ্রবৎ।"

শ্লোকটিতে রচয়িতার যেমনি উচিত উপমা-সঙ্কলন তেমনি পর্য্যবেক্ষণ শক্তি প্রকাশ পেয়েছে। যাঁদের উদ্ভট শ্লোকের প্রতি অনুরক্তি আছে তাঁরা এ উক্তির যাথার্থ্য উপলব্ধি করতে পারবেন। নিম্নে এই ধরণের আরো কয়েকটি শ্লোক উদ্ধৃত করা গেল।

"বিদ্বৎকবয়ঃ কবয়ঃ কেবলং কবয়স্তু কেবলং কপয়ঃ
কুলজা যা সা জায়া কেবল জায়া তু কেবলং মায়া।"

বিদ্বান্ হয়েও যাঁরা কবিত্বশক্তিসম্পন্ন, তাঁরাই প্রকৃত কবি। নতুবা যাঁদের বিদ্যা নাই অথচ কবিত্ব আছে, তাঁরা বানর অভিধেয়যোগ্য।

সৎকুলজাতা সহধর্ম্মিণীই প্রকৃত জায়া, তদ্ভিন্ন যিনি কেবলমাত্র জায়া তিনি মায়া ব্যতীত আর কিছুই নন।

অথবা বিদ্বানেব হি জানাতি বিদ্যার্জ্জনপরিশ্রমম্
ন হি বন্ধ্যা বিজানীয়াৎ গুর্ব্বীং প্রসববেদনাম্।

কিংবা উত্থায় হৃদি লীয়ন্তে দরিদ্রাণাং মনোরথাঃ
বালবৈধব্যদগ্ধানাং কুলস্ত্রীণাং কুচাবিব।

শেষোক্ত শ্লোকদুটিতে প্রথম চরণে একটি সংক্ষিপ্ত বাক্য, আর শেষ চরণে উক্তির প্রামাণ্য হিসাবে একটি উপমা নিহিত হয়েছে। উদ্ভট শ্লোক ছাড়া হিতোপদেশ ও পঞ্চতন্ত্রের উপদেশগুলিও এইরূপ সংহত বাক্যের শীর্ষস্থানীয়।

সংস্কৃত সাহিত্য আবেগ ও অনুভূতি প্রধান। মানুষের হৃদয়াবেগ বর্ণনা করা সেকালের কবিগণের প্রীতিকর ছিল। কখনও এ ভাবব্যঞ্জনা অতি গভীর ও ইঙ্গিতে অভিব্যক্ত, কখনও বা তা সুস্পষ্ট ভাষায় চিত্রিত। সংস্কৃত কাব্যে নানা প্রকার রস আছে। তার মধ্যে আদিরস ও করুণ রসই প্রধান আর প্রাচীন কবিগণও এই দুই রসের অধিক পক্ষপাতী ছিলেন। করুণ রসে ভবভূতির প্রাধান্য স্বীকৃত হয়েছে, তিনি মুখ্যতঃ বিষাদচিত্র অঙ্কনের জন্য প্রসিদ্ধ। উত্তররামচরিতে জানকীর সহিত মিলিত শ্রীরামচন্দ্র বিশ্রামসুখের ভিতরেও বলছেন, 'সুখমিতি বা দুঃখমিতি বা', 'তে হি নো দিবসাঃ গতাঃ'। আলেখ্যদর্শন চিত্রটি এই কারুণ্য-গুণে সাহিত্যে অতুলনীয় সৃষ্টি। সীতা বিসর্জ্জনেও ভবভূতি তাঁর কাব্য-প্রতিভা নিযুক্ত করেছেন। লবকুশের কথোপকথনে অথবা বাসন্তীর তিরস্কারে রামচন্দ্রের বিষাদসিন্ধু উদ্বেলিত হয়েছে। 'শরীরিণী বিরহব্যথা' জানকী দেবীর দুঃখে পাষাণও দ্রবীভূত হয়। গোবর্দ্ধনাচার্য্য সত্যই বলেছেন,

"ভবভূতেঃ সম্বন্ধাদ্ ভূধরভূরেব ভারতী ভাতি
এতৎকৃত কারুণ্যে কিমন্যথা রোদিতি গ্রাবা।"

কালিদাসের রঘুবংশেও এই কারুণ্যের ধারা উৎসারিত হয়েছে। বিচ্ছেদ ও বিরহবর্ণনায় তিনি সিদ্ধহস্ত। চতুর্থাঙ্কে শকুন্তলার পতিগৃহ-

গমন কালে কালিদাস যে করুণ ভাবের উৎসধারা খুলে দিয়েছেন, তা সকল হৃদয়কেই প্লাবিত করে। পিতাপুত্রীর এই মর্ম্মান্তিক বিচ্ছেদ-বেদনা মূক প্রকৃতিকেও যেন উদ্বুদ্ধ ও জাগরিত করেছে। আশ্রমবাসী কণ্বের পরম স্নেহ ও গভীর ব্যথা ভুলবার সামগ্রী নয়।

কিন্তু স্থানে এই করুণ রসও অতিমাত্রায় দীর্ঘ হয়ে যায়। কালিদাস কৃত রতিবিলাপ অথবা ভবভূতির উত্তররামচরিতের সমগ্র তৃতীয় অঙ্কটি এ কথার সত্যতা প্রমাণ করে। রঘুর অষ্টম সর্গে অজ-বিলাপ অযথা দীর্ঘ নয়, তবে অকৃত্রিম কারুণ্য সত্ত্বেও সে দৃশ্যটি অনেকখানি স্থান অধিকার করেছে। আমাদের সাহিত্যে প্রাচীন কাল ছিল অবকাশের যুগ। সেখানে মানুষের অন্যান্য কাজের মত হৃদয়াবেগ অথবা অনুভূতিও যেন দীর্ঘ মন্দাক্রান্তা ছন্দে প্রসর্পিত হয়েছে। কোনো কোনো পাঠকের কাছে সীতাবিসর্জ্জনের পর দণ্ডকারণ্যে শম্বূকবধ উপলক্ষ্যে জানকীর স্মৃতিমণ্ডিত দৃশ্যগুলির দর্শনমাত্রেই শ্রীরামচন্দ্রের মর্ম্মভেদী বিলাপ করুণ রসের পরাকাষ্ঠা বলে বোধ হতে পারে। কিন্তু সমস্ত অঙ্কব্যাপী এই কারুণ্যের চিত্রাঙ্কনে আমাদের চিত্ত ভারগ্রস্ত হয়ে ওঠে। আলঙ্কারিকদের মতেও এটি প্রাগ্‌ভাব নয়, অপকর্ষ সূচনা করে—'অঙ্গানামতিবিস্তৃতিঃ' কাব্যোৎকর্ষের হানি করে।

সে যাই হোক, কালিদাস ও ভবভূতি উভয় কবিই তাঁদের কাব্যে করুণ রসের অবতারণা করেছেন। সমালোচকগণও উভয়ের কাব্যশিল্প তুলনা করে রসসৃষ্টিতে ভবভূতিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। কিন্তু এ উক্তি যথার্থ হলেও আমাদের মনে হয় ভবভূতি যেখানে সুস্পষ্ট প্রকাশ করেছেন, কালিদাস সেখানে স্বল্পকথায় ও ইঙ্গিতে কার্য্য সমাধা করেছেন। একটি উদাহরণ দিলে অর্থ পরিষ্কার হবে। কালিদাসের শকুন্তলায় সপ্তম অঙ্কে

'বসনে পরিধূসরে বসানা
নিয়মক্ষামমুখী ধৃতৈকবেণিঃ
অতিনিষ্করুণস্য শুদ্ধশীলা
মম দীর্ঘং বিরহব্রতং বিভর্ত্তি।'

আর ভবভূতির উত্তররামচরিতের তৃতীয়াঙ্কে চতুর্থ ও পঞ্চম শ্লোক দুটি—

'পরিপাণ্ডুদুর্বল কপোল সুন্দরং
দধতী বিলোলকবরীকমাননং
করুণস্য মূর্ত্তিরথবা শরীরিণী
বিরহব্যথেব বনমেতি জানকী।'

এবং 'কিসলয়মিব মুগ্ধং বন্ধনাদ্বিপ্রলূনং
হৃদয়কুসুমশোষী দারুণো দীর্ঘশোকঃ
গ্লপয়তি পরিপাণ্ডু ক্ষামমস্যাঃ শরীরং
শরদিজ ইব ঘর্ম্মঃ কেতকী গর্ভপত্রং।'

পাশাপাশি রাখলে স্পষ্ট বোঝা যাবে যে কালিদাসের উক্তি অপেক্ষাকৃত সরল ও সহজ। তাঁর কাব্যে ব্যঞ্জনার প্রাধান্য; ভবভূতির কাব্যে দ্যোতনা অধিক। দুজনের কবিত্ব শক্তির পার্থক্য এই স্থলেই। কালিদাস রঘু ত্রয়োদশে 'শরৎপ্রসন্নমাকাশমাবিষ্কৃত চারুতারম্' সেতু-বিভক্ত উদ্বেল জলধি, 'সৈষা বনস্থলী' যেখানে শোকার্ত্ত, অনুসন্ধিৎসু রামচন্দ্র জানকীর পাদপদ্মভ্রষ্ট 'বদ্ধমৌনম্ নূপুরম্' দেখে কাতর হয়ে পড়েছিলেন, অথবা জনস্থানের প্রাচীন স্মৃতিসমন্বিত দৃশ্যাবলী ও পুণ্যসলিলা গোদাবরীর উপকূলে বানীরগৃহে মধুর মিলনের দিনগুলি, সমস্তই অতি করুণভাবে চিত্রিত করেছেন। আবার ভবভূতিও আলেখ্যদর্শনাঙ্কে সমজাতীয় অনেক দৃশ্য উদ্ঘাটিত করেছেন যা কারুণ্যে মর্ম্মস্পর্শী। কিন্তু কালিদাস সেই চিত্রগুলি ইঙ্গিতে উল্লেখ করেছেন মাত্র, আর ভবভূতি সেগুলি স্পষ্ট ও পরিব্যক্ত করেছেন। ভবভূতির সকরুণ বর্ণনায় পাষাণও দ্রবীভূত হয়; কিন্তু কালিদাসের কাব্যে বিরহ ও শোক বর্ণনায় মানব হৃদয়ের সহিত জড় প্রকৃতিও স্তব্ধ ও বিষাদগম্ভীর হয়ে যায়।

সংস্কৃত সাহিত্যে বিচ্ছেদ দৃশ্যের প্রাচুর্য্য থাকলেও অন্যান্য রসের অভাব নেই, বিশেষতঃ আদিরস। কালিদাসের প্রায় সমস্ত কাব্যেই এবং তাঁর পরবর্ত্তী জয়দেব প্রভৃতি অনেক কবির রচনায় আদিরসের প্রাধান্য দেখতে পাওয়া যায়। কি মেঘদূতে, কি ঋতুসংহারে অথবা অন্যান্য প্রক্ষিপ্ত রচনায়, সর্ব্বত্রই আদিরসের বাহুল্য আছে। কারণ

বোধ হয় আমাদের দেশে একটা কাব্যিক সংস্কার প্রচলিত আছে যে আদিরসই হল শ্রেষ্ঠ ও অকৃত্রিম রস। বাস্তবিক পক্ষে তাই বটে, কারণ আদিরসের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হচ্ছে সর্ব্বপ্রধান ও প্রথমতম রস। তা ভিন্ন, রসসৃষ্টির কার্য্যে রসস্বরূপ বিষ্ণুর অর্চ্চনা বাঞ্ছনীয়; যেহেতু 'মোক্ষমিচ্ছেদ্ জনার্দনাৎ' আর স্বয়ং কামের পিতা 'শৃঙ্গারো বিষ্ণুদৈবতঃ'। এক্ষেত্রে আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে আদিরসের সবিশেষ চর্চ্চা স্বাভাবিক। বৃহদারণ্যক উপনিষদে কথিত আছে যে নরনারীর সঙ্গমই চরম আধ্যাত্মিক মিলনের প্রতীক বিশেষ। চতুর্থ অধ্যায়ের তৃতীয় ব্রাহ্মণের একবিংশ খণ্ডে লিখিত আছে,

"তদ্যথা প্রিয়য়া স্ত্রিয়া সংপরিস্বক্তো ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদ
নান্তরমেবমেবায়ং পুরুষঃ প্রাজ্ঞেনাত্মনা সংপরিস্বক্তো ন বাহ্যং কিঞ্চন
বেদ নান্তরং।"

তবে এই সূত্রে স্মরণ রাখা উচিত যে যদি ঐ মিলন নিষিদ্ধ, পরকীয় অথবা তির্য্যগ্‌গত হয়, তা হলে রসাভাস হয়, অর্থাৎ বিশুদ্ধরসের ব্যত্যয় ঘটে। বোধ করি, এই সব শাস্ত্রোল্লিখিত কারণে এবং অংশতঃ দেশের স্বকীয় জলবায়ুর গুণে সংস্কৃত সাহিত্যে আদিরস শ্রেষ্ঠরস বলে প্রকীর্ত্তিত হয়েছে।

এখানে একটি কথা বলা আবশ্যক। উদ্ভট সাহিত্যে আদি-রসাত্মক যে শ্লোকগুলি পাওয়া যায়, সেগুলির মধ্যে একটু নূতন ধরণের বিশেষত্ব আছে। সে আদিরসের প্রকাশভঙ্গীতে কিছু পরিমাণে শব্দ-চাতুর্য্য আর অবশিষ্ট সবটুকুই অসরল ও আভিমানিক উক্তি। যেমন

"সঙ্গম বিরহবিকল্পে বরমিহ বিরহো ন সঙ্গমস্তস্যাঃ
সঙ্গে সৈব যদেকা ত্রিভুবনমপি তন্ময়ং বিরহে।"

অর্থাৎ যোগ ও বিয়োগ এই দুই অবস্থার মধ্যে কোনটি ভাল তার বিচার করতে গেলে বিরহই শ্রেষ্ঠ, সংসর্গ নয়। অবিয়োগ অবস্থায় কেবল একমাত্র তাঁকেই দেখা যায়, কিন্তু বিরহে নিখিল ব্রহ্মাণ্ড তন্ময় হয়ে যায়। অথবা

"নৈকতালিঙ্গনে যূনো নিমেষঃ প্রিয়সঙ্গমে
ইত্যেব বিরহঃ সাক্ষাৎ তদন্য পরলৌকিকঃ।"

অর্থাৎ, যুবক যুবতির আলিঙ্গন সময়ে উভয়ের দেহ যে এক হয়ে যায় না, এবং প্রিয়দ্বয়ের পরস্পর মিলনক্ষণে যে নয়নের পলক পড়ে, এ দুটিই সাক্ষাৎ বিরহপদবাচ্য। তা ছাড়া যে বিরহ সে পারলৌকিক, ইহলোকের নয়।

নিম্নোক্ত শ্লোকটিতে বাক্‌চাতুর্য্যের সহিত আদিরসের সংমিশ্রণ হয়েছে,

"কুচো লেভে হারং ঘনকঠিনপীনোন্নততয়া
নিতম্বো বিস্তারাৎ কনকময়কাঞ্চীমলভত।
তয়োর্মধ্যদেশো বসননিগড়ৈর্বন্ধনমগাৎ
ন কোঽপি ক্ষীণানাং জগতি কুরুতে সম্ভ্রমপদং।"

অর্থ হল—তরুণীগণের স্তনমণ্ডল অতি কঠিন, স্থূল এবং উন্নত হওয়াতে তাকে কেমন রমণীয় হার ভূষণে অলঙ্কৃত করা হয়; নিতম্বও অতি গুরু সেই কারণে তাকেও স্বর্ণকাঞ্চীতে ভূষিত রাখা হয়। ঐ উভয় দেশের মধ্য স্থলে থেকেও ক্ষীণতা বশতঃ কটিদেশ নীবিপাশে আবদ্ধ থাকে। এতে প্রতীতি হয় যে জগতে দুর্ব্বলের সম্ভ্রম নেই।

জগতের অধিকাংশ প্রাচীন সাহিত্যই বর্ণনাত্মক। কিন্তু সংস্কৃত সাহিত্যে প্রকৃতির বিচিত্র দৃশ্য ও বর্ণসম্পদের চিত্রণ কেবল একটি বৈশিষ্ট্য নয়, তা প্রকৃতই সৃষ্টি। কবিগণের লেখনী কখনও প্রকৃতির শান্ত ও সাহস মূর্ত্তির অঙ্কনে নিযুক্ত হয়েছে যেমন কিরাতে অথবা ভট্টিকাব্যে শরদ্বর্ণনে; আবার কখন বা গম্ভীর রসাত্মক বর্ণনায় প্রযুক্ত হয়েছে যেমন কালিদাসের হিমালয় চিত্রণে। এ ছাড়া বীভৎস রসের অবতারণাও প্রাচীন কবিরা করেছেন। সুবন্ধুর 'বাসবদত্তা'য় ও ভবভূতির 'মালতী মাধবে' অতি ভয়াবহ শ্মশানের বর্ণনা আছে। আবার উত্তররামচরিতের পঞ্চমাঙ্কে "পাতালোদর কুঞ্জপুঞ্জিততমশ্যামৈর্নভোজৃম্ভকৈঃ" এবং দ্বিতীয়াঙ্কে "কূজৎকুঞ্জকুটীরকৌশিকঘটাঘূৎকারবৎকীচকঃ" প্রভৃতি শ্লোক দুটিতে মনোহর বাক্যবিন্যাসের সহিত যথাক্রমে প্রকৃতির সংক্ষুব্ধ ও গম্ভীর, ভয়াবহ মূর্ত্তির বর্ণনা সাধিত হয়েছে। তবে এই প্রসঙ্গে একটি ন্যায্য মত প্রকাশিত হতে পারে, যে সংস্কৃত কবিগণ কেবল বহিরঙ্গবর্ণনা নিয়েই

ব্যাপৃত ছিলেন, তাঁদের কাব্যে অন্তরঙ্গ বর্ণনার অভাব লক্ষিত হয়। এ মন্তব্য আংশিক ভাবে সত্য। কালিদাসের কাব্যে, বিশেষতঃ ঋতুসংহারে, ভিন্নরূপিণী প্রকৃতির বাহ্যবর্ণনায় তাঁর প্রতিভা মঞ্জরিত হয়ে উঠেছে। কিন্তু কবির বৈশিষ্ট্য কেবল প্রকৃতি বর্ণনে নয়, মানবহৃদয়ের সহিত প্রকৃতির গূঢ় সংযোগ সাধনে। মূক ও জড় প্রকৃতির সঙ্গে মানবচিত্তের যে সুগভীর ও অশিথিল সংশ্লেষ আছে, এ কথা কবি কদাপি বিস্মৃত হন নি। এই কারণে, রসসৃষ্টির কার্য্যে প্রকৃতির কাছেই শুধু তাঁকে ঋণ গ্রহণ করতে হয়নি। মানব-মনের সূক্ষ্ম অনুভূতি ও অর্দ্ধস্ফুট আবেগগুলি তাঁর কাব্যের উপাদান সংগ্রহ করে দিয়েছে। বাহ্য ও স্থূল বস্তুর চেয়ে বিষয়ের অন্তর্লীন প্রতিকৃতি তাঁর কবিতায় বেশী ফুটে উঠেছে। উপমাই তাঁর কাব্যের একমাত্র সারবস্তু নয়, সুন্দর ও সুগভীর অর্থ-বিকাশেও তাঁর বৈদগ্ধ্য প্রমাণিত হয়।

সংস্কৃত কাব্যের আর একটি এমন বৈশিষ্ট্য আছে যা আমাদের মনকে যুগপৎ আকৃষ্ট ও বিদ্বিষ্ট করে। সংস্কৃতে গদ্য-সাহিত্যে বাহ্য-শোভার বাহুল্য আছে। তার সমাসবহুল বিপুলায়তন দেখে অনেক পাঠক পিছিয়ে গেছেন, কিন্তু যিনি প্রকৃত রসলিপ্সু তিনি এরি মধ্যে উপভোগের সামগ্রী সংগ্রহ করতে পারবেন। সেকালের গদ্য সর্ব্বদা ব্যবহারের জন্য ছিল না। আখ্যায়িকাগুলিও যথেষ্ট অবকাশের পরি-বেষে বিদগ্ধ নরপতির প্রাসাদকক্ষে কথিত হত। সেই জন্যই বোধ হয় সেকালের ভাষাও ধীর ও মন্থর চালে চলত। তাতে গতির চাঞ্চল্য ছিল না, ছিল প্রচুর অবসরের স্থিতিশীলতা। শ্লথ অবকাশের মুহূর্ত্তে মদা-লসাক্ষীর পরিম্লান অঙ্গচালনার মতই ছিল তার মৃদু ও দীর্ঘায়িত বিকাশ-ভঙ্গী। যিনি এরূপ কাব্যরস উপভোগ করতে চান, তাঁকে আধুনিক-তার বেগমোহ অতিক্রম করে প্রাচীন সাহিত্যের ভাষার ও ভাবের বিশাল প্রসারের ভিতর প্রবেশ করতে হবে। কাদম্বরীর আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ সত্যই বলেছেন যে যিনি এ বিশিষ্ট সাহিত্যের রসভোগে উৎসুক, তাঁকে "মনে করিতে হইবে যে তিনি বাক্যরস-বিলাসী রাজ্যেশ্বর বিশেষ, রাজসভামধ্যে সমাসীন এবং 'সমানবয়োবিদ্যালঙ্কারৈঃ অখিলকলাকলাপ-

লোচনকঠোরমতিভিঃ অতিপ্রগল্ভৈঃ অগ্রাম্যপরিহাসকুশলৈঃ কাব্যনাটকাখ্যানাখ্যায়িকালেখ্যব্যাখ্যানাদিক্রিয়ানিপুণৈঃ বিনয়ব্যবহারিভিঃ আত্মনঃ প্রতিবিম্বৈরিব রাজপুত্রৈঃ সহ রমমাণঃ'।" কিন্তু এ সমাস ও বিশেষণ বাহুল্যের মধ্যে থেকেও চিত্রগুলি অস্পষ্ট হয়ে যায়নি। বর্ণপ্রাচুর্য্য থাকলেও চিত্রগুলির সজীবতা ও স্পষ্টতা সংরক্ষিত হয়েছে। সেগুলি সকল জায়গায় হয়ত ধারাবাহিক নয়, তবুও তাদের কারুকার্য্য ও সৌন্দর্য্য মনকে মুগ্ধ করে।

এ সমাস-বাহুল্যের অন্য একটি কারণও আছে। প্রাচীন সাহিত্যের অপূর্ব্ব ছন্দোবদ্ধ কাব্য কাদম্বরীর কথাই ধরা যাক্। এ গ্রন্থে ভাষার আড়ম্বর, শব্দের ঘটা ও লিপিচাতুর্য্য আছে। কিন্তু কয়েক পঙক্তি ব্যাপী দীর্ঘ সমাসভারগ্রস্ত পদের প্রয়োগ কাব্যের অর্থকে সাধারণের নিকট অধিকাংশ স্থলে দুর্ব্বোধ্য করেছে। বোধ হয় কেবল বাণভট্টের ন্যায় বিচক্ষণ কবিই এই বিপুল পদ রচনার সাম্য রক্ষা করতে সমর্থ হয়েছেন। কিন্তু এক হিসাবে এ কাব্য ভীতিপ্রদ নয়, এর রস, মাধুর্য্য ও সুষমা উপভোগের বস্তু। 'সমস্ত' পদগুলি সুদীর্ঘ হলেও সেগুলির গ্রন্থি উন্মোচন করলেই অর্থবোধ হয়। এ ছাড়া এই শ্রেণীর কাব্যরচনার বিশেষ সুবিধা এই যে এতে ক্রিয়াপদের সংখ্যা প্রতিপাদকের তুলনায় অনেক কম। দীর্ঘ বিসর্পিত বাক্যের মধ্যে ক্রিয়াপদের সংখ্যাল্পতাও আরেকটি লক্ষ্য করবার বিষয়। সমাস প্রয়োগের অপর একটি কারণ যে অনভীপ্সিত বিভক্তি বর্জ্জন করেও ব্যাকরণের নিয়ম পালিত হতে পারে। নূতন নূতন 'সমস্ত' বাক্য ব্যবহার না করলে ভাষা সজীব থাকে না, ব্যাকরণের নাগপাশে জড়িত হয়ে তা স্বল্পকালের মধ্যেই আড়ষ্ট ও মৃতকল্প হয়। প্রকৃত কবির রচনায় এ নিগড় শৃঙ্খল নয়, নূপুরে পরিণত হয়।

কাদম্বরীর ভাষাপ্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে প্রাচীন সাহিত্যে রীতির প্রাধান্য বেশী ছিল। এ স্থলে রীতির বিশদ আলোচনা সম্ভবপর নয়। যাঁরা উৎসুকচিত্ত তাঁরা শ্রদ্ধেয় অতুলচন্দ্র গুপ্তের প্রবন্ধগুলি পাঠ করে পরিতৃপ্ত হবেন। রীতি সম্প্রদায়ের প্রধান আলঙ্কারিক

বামন রীতিকেই কাব্যের মূল অঙ্গ বলে নিরূপণ করেছেন—"বিশিষ্টপদ-রচনা রীতিঃ।" মোটামুটি রীতি দু প্রকারের, গৌড়ী ও বৈদর্ভী। কাব্যাদর্শের প্রথম অধ্যায়ে দণ্ডাচার্য্য বলেছেন,

> 'শ্লেষঃ প্রসাদঃ সমতা মাধুর্য্যং সুকুমারতা
> অর্থব্যক্তিরুদারত্বমোজঃকান্তিসমাধয়ঃ। ৪১
> ইতি বৈদর্ভমার্গস্য প্রাণা দশগুণাঃ স্মৃতাঃ
> এষাং বিপর্য্যয়ঃ প্রয়ো দৃশ্যতে গৌড়বর্ত্মনি॥ ৪২

সংস্কৃত কবিগণ সকলেই এ বিধান পালন করেছেন। তবে কালিদাস ভারবি প্রভৃতি কবিরা 'অলঙ্কৃতমসংক্ষিপ্তং রসভাবনিরন্তরং' এই নিয়ম স্বীকার করে কাব্যের অকৃত্রিমত্ব রক্ষা করেছিলেন। কিন্তু সংস্কৃত সাহিত্যের অবনতির যুগে রসাভাস ঘটেছিল। পাণ্ডিত্যাভিমানে কবিগণ কেবল চমকপ্রদ শব্দ ও বর্ণ-বৈচিত্র্যে, শ্লেষ প্রয়োগে, এক কথায় শুষ্ক জ্ঞানবিচর্চ্চিকায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। গৌড়ী রীতির প্রধৃষ্ট কবিগণ প্রাতিজনীন উক্তি দ্বারা বিপক্ষীয় কবিদের উদ্ব্যস্ত করেছিলেন, বলেছিলেন মূর্খতা নিবন্ধনই তাঁরা এ সব শ্লোকের অর্থ করতে পারেন না, নতুবা প্রসাদ প্রভৃতি গুণরাশিও তাঁদের নিজ কাব্যে যথেষ্ট পরিমাণে বর্ত্তমান আছে। সে যাই হোক গৌড়ী রীতিতে সুবন্ধু ও বাণভট্ট এবং বৈদর্ভীতে কালিদাস শীর্ষস্থান অধিকার করেছিলেন। এই দুটি শ্লিষ্ট ও শিথিলবন্ধের মধ্যপথ ছিল পাঞ্চালী রীতি।

বিভিন্ন আলঙ্কারিকদের বিভিন্ন মত। ভামহ রসকে কাব্যের মূল বলে অঙ্গীকার করেন না, আর রুদ্রট অলঙ্কারকে কাব্যের অঙ্গ বলে স্বীকার করেছেন। বামন বলেছেন, "রীতিরাত্মা কাব্যস্য', ধ্বনিকার বলেন 'কাব্যস্যাত্মা ধ্বনিঃ'। কুন্তক লিখেছেন, 'বক্রোক্তিরেব বৈদগ্ধ্য-ভঙ্গী' আর নব্যালঙ্কারিকদের অগ্রণী মম্মটভট্টের ধারণা ব্যঞ্জনাই কাব্যের মূল। এ সকল বিতর্ক সত্ত্বেও স্বীকার করতে হবে যে সংস্কৃত সাহিত্যে অলঙ্কারের স্থান অনেক উচ্চে। অবশ্য গ্রীক সাহিত্যেও অলঙ্কার বিভাগ ছিল; কিন্তু আমাদের দেশে পূর্ব্বাচার্য্যগণ অলঙ্কারের যেরূপ সূক্ষ্ম ও দার্শনিক বিচার করেছেন, তা অন্য কোনো সাহিত্যে হয়েছিল

কি না জানি না, তবে সংস্কৃত সাহিত্যকে একটি পরম বৈশিষ্ট্য দান করেছে সে কথা অবিসংবাদিত সত্য।

প্রাচীন সাহিত্যের সর্ব্বশেষ বিশেষত্বের উল্লেখ করে প্রবন্ধের উপসংহার করব। সেকালের কবিগণ অতিমাত্রায় আত্মগোপন করতেন। ব্যক্তিগত ইতিহাস সম্বন্ধে সংস্কৃত সাহিত্য চিরকালই উদাসীন, এই কারণেই তার সুসংবদ্ধ ইতিহাস আজও রচিত হয় নি। আত্মগুপ্তি এত অধিক ছিল যে কালিদাসের জন্মস্থান ও তারিখ নিয়ে আমরা এখনও নিঃসংশয় হতে পারিনি এবং ভাসের অমূল্য নাটকরত্নাবলি এযাবৎ লোকচক্ষুর অন্তরালেই ছিল; পণ্ডিতবর্গের চেষ্টা ও ধৈর্য্য ব্যতীত সেগুলি বিস্মৃতিগর্ভে সমাধি লাভ করত। অবশ্য সব কবিই যে আত্মলাঘবে প্রয়াসী ছিলেন, একথা বলা যায় না। কারণ অনেক কবির রচনায় যথেষ্ট পরিমাণে আত্মগৌরব আছে। সকলেই বিনয়ী কালিদাসের ন্যায় 'ক্বচাল্পবিষয়ামতিঃ', 'তনুবাগ্‌বিভবো' অথবা 'উদ্বাহুরিব বামনঃ' ছিলেন না। তবে ভবভূতির মত শ্রেষ্ঠ কবির গৌরববাণীর সার্থকতা আমাদের বোধগম্য হয় কিন্তু 'রাঘব পাণ্ডবীয়' প্রণেতা কবিরাজের মত রচয়িতার বাগাড়ম্বর মাত্র আত্মশ্লাঘাতেই পর্য্যবসিত হয়েছে। বোধ করি কাব্যশিল্পের যুগে কবিরা যে উচ্চাদর্শ থেকে ভ্রষ্ট হয়েছিলেন সেই তথ্যটি গোপন করবার জন্যই তাঁদের আত্মবিজ্ঞপ্তির এত সকরুণ প্রয়াস।

পরিশেষে এই কথা বলতে চাই, যে সংস্কৃত সাহিত্য ছিল আদর্শ-বাদী। নতুবা এত টীকা, টিপ্পনী ও ভাষ্যরচনা, এত অলঙ্কার শাস্ত্রের প্রণয়ন একেবারে ব্যর্থ মনে হয়। এগুলিকে কেবল নিয়মকানুনের নাগপাশ বলে ভাবলে ভুল করা হবে, এগুলি হল সেকালের কাব্য-ব্যাখ্যান ও তার লক্ষণ-বিজ্ঞান। প্রাচীন কবিরা স্বকীয় বৃত্তি ও চর্য্যাকে কত সাদরে বরণ করেছিলেন, নিম্নোক্ত শ্লোকটি তারই উদাহরণ স্বরূপ।

"কবিতা কোমলবনিতা, রসেনবসিতা রসয়তি রসিকং।
যদি সা পততি কঠিনহৃদয়ে, ভবত্যলগ্না প্রতিপদভগ্না॥"

অর্থাৎ, কবিতা ও কোমলবনিতা উভয়েই রসবতী অথবা মাধুর্য্য-

সম্পন্না ও অনুরাগশালিনী। এরা রসিক জনকে পরম প্রীতিদান করে; কিন্তু যদি অরসিকের হস্তে পতিত হয়, তাহলে প্রতিপদেই তারা দুরবস্থাপন্ন ও নিতান্ত অস্বচ্ছ হয়ে ওঠে।

সংস্কৃত ভাষা আজ জড়ত্ব ও অচলতা প্রাপ্ত হয়েছে। সে সাহিত্যের প্রতি অনুরাগও অন্যান্য জ্ঞানচর্চ্চার উচ্ছেষ মাত্র। কিন্তু তার অপরূপ লিপি-চাতুর্য্য, তার অভিনব বিশেষণ ও সুমিষ্ট সামাসিক বাক্যগুলির ব্যবহারিক সার্থকতা আধুনিক বিদগ্ধ কবিগণের প্রাণবান্ প্রয়াসের প্রতীক্ষা করে।

শ্রীবিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

আফ্রিকায় শ্বেত-কৃষ্ণ

জীওফ্রে গোরের রচিত আফ্রিকা ডানসেস্ বইখানি সমালোচনার জন্য পেয়েছিলাম। রচনাটি আফ্রিকার পশ্চিম দেশীয় কাফ্রীদের জীবন চিত্র এবং আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা পূর্ব্বাঞ্চলে আবদ্ধ; তবু সম্পাদকের অনুরোধ অঙ্গীকার করে নিই, কারণ গোরের বর্ণিত ফরাসী কলোনী বাসী কাফ্রীর সঙ্গে ইংরাজ আশ্রিত নিগ্রোর অবস্থাগত প্রভেদ ও সাদৃশ্যের একটি তুলনামূলক পর্য্যালোচনা বর্ত্তমান সময়ে প্রনিধানযোগ্য। তাছাড়া পাশ্চাত্য সভ্যতার সংঘাতে তাদের যে অবস্থা দাঁড়িয়েছে তার সংক্ষিপ্ত বর্ণনার সাংবাদিক মূল্যও আজ কিছু কম নয়। বিশেষ করে যখন মুসোলীনির কল্যাণে আফ্রিকার একমাত্র অবশিষ্ট স্বাধীন ভূখণ্ড অচিরেই আর একটি সুসভ্য ইউরোপীয় জাতির স্নেহাস্পদ হতে চলেছে এবং তদ্দেশবাসীর আশু-অবস্থা-বিপর্য্যয়ের যথার্থ রূপ অবধারণে সহায়তা করে এমন সাহিত্য বাংলা দেশে বিরল।

অবশ্য পূর্ব্ব, মধ্য এবং পশ্চিম আফ্রিকার উলঙ্গ ও অর্দ্ধ-উলঙ্গ কৃষ্ণকায় নিগ্রোদের সঙ্গে তাম্রবর্ণ আবিসিনিয়ানদের প্রকৃতিগত সাদৃশ্য যে কতখানি তা বলা কঠিন; কিন্তু শাসকের ঐতিহ্যজ্ঞান ও বর্ণাভি-জাত্য যেখানে প্রকট সেখানে ভিন্ন ভিন্ন শাসিতের অবস্থার মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য থাকেনা, এইটাই প্রতিপাদ্য।

বর্ণাভিজাত্যের সমস্যা যে কতখানি জটিল বোঝা যায় ইংরাজের ব্যবহারে। ভারতবাসী এবং নিগ্রোদের সম্বন্ধে সাধারণ ইংরাজের মনোভাব এক নয় যদিও উভয় জাতিই তার মানস চক্ষে সমান নিকৃষ্ট ও অপরিচ্ছন্ন। ভারতীয়ের ঐশ্বর্য্যময় ঐতিহ্যের কূল কিনারা সে পায় না, তাই এড়িয়ে চলে; নিগ্রো জীবনের ক্রমাভিব্যাক্তি সম্পদ মূর্ত্ত নয়, তাই কাঁচা ভেবে মনোমত করে গঠন করতে চায়। এই মনোভাবটি সুন্দর ভাবে প্রতিভাত হয়েছে বিখ্যাত প্রাণিতত্ত্ববিদ্ জুলিয়ান হাক্স্লীর কয়েকটি কথায়। তিনি 'আফ্রিকা ভীয়ু' বইতে লিখেছেন:

The negroes are willing to learn and have a natural barbaric cleanliness ; the Indians do not want to change any of their ways and combine an ancient civilization with squalor.

অনেক ইংরাজ নৃতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতের আলেখ্যেও এই বদ্ধমূল সংস্কারের ইঙ্গিত পাই। তাঁরা বলেন নিগ্রো চিত্ত পাশ্চাত্য জাতীয় শিশুর মতই পাশ্চাত্য প্রথায় প্রবর্দ্ধনক্ষম। এর মূলে নিগ্রো ঐতিহ্য সম্বন্ধে অজ্ঞতা বা অবজ্ঞা বই কিছু দেখি না।

আফ্রিকার অনাহূত অতিথিদের মধ্যে একমাত্র মিশনারী কর্ম্মীই শারীরিক ক্লেশ ও মানসিক নিঃসঙ্গতা সহ্য করে সুদীর্ঘকাল নিগ্রোদের মধ্যে বাস করে এসেছেন—কোন কোন বিশিষ্ট মহাত্মা তাদের ব্যাধি, তাদের ক্লেদ, মলিনতা অঙ্গে মেখে নিতেও দ্বিধা করেন নি, কিন্তু দেশ বর্ণ নির্ব্বিশেষে মনুষ্য-হিতৈষণার মত অভ্রস্পর্শী যাঁদের জীবনের ব্রত তাঁদের অনুসন্ধিৎসার বিষয়বস্তু এমনই অলৌকিক যে অকিঞ্চিতকর নিগ্রো ঐতিহ্যের অন্তর্গূঢ় প্রাণ-স্পন্দন তাঁদের শ্রবণ-সান্নিধ্যে আসেনা।

স্বার্থান্বেষী ঔপনিবেশিক ও ক্ষণস্থায়ী পশুশিকারীর কথা ছেড়ে দিলে রাজকর্ম্মচারীর কথা মনে আসে। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ প্রথম জীবনে নূতন জগতের অপর্য্যাপ্ত সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হয়ে গাছ পালা ও মানুষের পর্য্যবেক্ষণে মেতে যান। কিন্তু তাঁদের দৃষ্টি বস্তু-বিশেষের গভীরতর অন্তরে প্রবিষ্ট হবার পূর্ব্বেই ক্ষীণ হ'য়ে আসে কর্ম্মক্ষেত্রের আদর্শ-বিবর্জ্জিত কর্ত্তব্যের চাপে—পারিপার্শ্বিক পরিমণ্ডলের স্তব্ধতায়। সে দেশে দূরাগত বাদ্যভাণ্ডের সমাপ্তি-হীন তালহীন ঝঙ্কার আকাশে বাতাসে অবসাদের দীর্ঘ ছায়া টেনে আনে—স্নায়বিক ধৈর্য্য অবসন্ন হ'য়ে আসে উদ্দেশ্য-বিবর্জ্জিত অর্থহীন সময়ের জীর্ণ শ্লথ চারণে। ফলে অনেকে নিষ্ঠুর নির্ম্মম হ'য়ে পড়েন; কেউ কেউ যৌন-চর্চ্চার মত হীন পরিতৃপ্তিতে নিমজ্জিত হয়ে রসাতলে তলিয়ে যান।

আফ্রিকায় শ্বেতকায় নৃতত্ত্ববিদ পণ্ডিতদের গতিবিধি অবিরত এবং এও স্বীকার্য্য যে তাঁদেরই কল্যাণে নিগ্রো জাতির স্বতঃস্ফূর্ত্ত প্রাণ-প্রবাহের

দু-একটি বাহ্য-ধারা সংস্কারকদের চেষ্টা থেকে অব্যাহতি পেয়েছে—কিন্তু নিগ্রো চিত্তের মর্ম্মোদ্‌ঘাটন করা তাঁদের কাজ নয়। তাঁদের কাজ নিগ্রোর সামাজিক জীবনের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা আহরণ করা; অস্থি-মজ্জার গঠন ও প্রকৃতির তথ্য সংগ্রহ করা। তাঁদের মধ্যে অনেকে পেশাদার দোভাষীর সাহায্যে পুঁথির মশলা যোগাড় করেন—অনেকে দীর্ঘকাল ভাষাও শিক্ষা করেন, কিন্তু সে দৈনন্দিন সংসার যাত্রার প্রচলিত কথোপকথনের ভাষা। তার অন্তরালে যে সাঙ্কেতিক পরিভাষার প্রচলন আছে তার সম্যক পরিচয় পেতে হ'লে যে কৃচ্ছ্রসাধনের প্রয়োজন হয় সেরূপ অনন্ত অবকাশ তাঁদেরও থাকে না।

যে কোন বড় পাঠাগারে আফ্রিকা সম্বন্ধে বই প্রচুর মেলে; কিন্তু সে সকল সাহিত্যে মানুষ অপেক্ষা শিকারের উপযোগী পশুর প্রশস্তি অধিক থাকে। ভবিষ্যৎ শাসন প্রণালীর পরিকল্পনা অনেক বড় বড় গ্রন্থকার করেছেন বটে, কিন্তু তাতে শ্বেতাঙ্গ-জাতির আভিজাত্য ও দায়িত্বের কথাই স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়েছে, আর কিছু নয়। একমাত্র গোরেরের রচনা দেখছি ভিন্নতর। তাঁর তথ্য সংগ্রহের প্রণালী সম্পূর্ণ মৌলিক। তিনি প্রথমে আপন বর্ণমর্য্যাদা উপেক্ষা করে বিখ্যাত নিগ্রো নর্ত্তক বেঙ্গাকে স্বীয় গৃহে আমন্ত্রণ করে প্রতিবেশীর বিরাগভাজন হন এবং পরে একত্রে উত্তর-আফ্রিকা পর্য্যটনে গমন করেন। সৌভাগ্য-ক্রমে কোন স্থানীয় রাজকর্ম্মচারীর নামে পরিচয়-পত্র গ্রহণ না করে সহযাত্রীর নির্দ্দেশ অনুযায়ী নগরের বহির্ভাগে রাজবর্ত্ম হতে দূরে ছোট ছোট গ্রাম হতে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন। তাঁর আলেখ্যে কতকগুলি ঘটনার বর্ণনা আছে যার বাস্তবতা সম্বন্ধে আমি নিঃসন্দেহ নই, তবু আমার মনে হয় তিনিই একমাত্র ইউরোপীয় যিনি নিগ্রো জীবনের প্রচ্ছন্ন ধারাকে পুঁথি-গত করতে পেরেছেন।

কিন্তু গোরের উদার হলেও ইংরাজ। তিনি একই চক্ষে নিগ্রো জাতির স্বয়ং-সম্পূর্ণ পরিণতি দেখতে চান, মিশনারী প্রভাবের আমূল উচ্ছেদ দেখতে চান, ফরাসী আধিপত্যের শেষ দেখতে চান—অথচ চান কেনিয়া ও অন্যান্য ব্রিটিশ উপনিবেশে শাসন-পদ্ধতির দৃঢ়তর প্রতিষ্ঠা।

গোরেরের উদাহরণ থেকে মনে হয় নিরাসক্তভাবে কোন জাতিই অপর জাতির মঙ্গল কামনা করতে পারে না।

মানব সংস্কৃতির পুষ্টি সাধনে নিগ্রোর কি দেবার আছে বিচার করতে হলে তার স্বভাবের কয়েকটি বিশিষ্ট ধারার আলোচনা করতে হয়। নিগ্রো তার জীবনের নিবিড়তম অনুভূতিগুলিকে ব্যক্ত করে নৃত্যের ছন্দে, দেহের হিল্লোলে। অন্তরে পুঞ্জীভূত অপার আনন্দ বা নিবিড় নিরাশা, গভীর দুঃখ বা উদ্বেল প্রেম, তীব্র ঘৃণা বা অসহনীয় ক্রোধ বাঙ্ময় হয়ে ওঠে অঙ্গলীলার তালে তালে—সে ছন্দের মাত্রা হয়তো অদ্ভুত, সে আবেগের আতিশয্য হয়তো লাবণ্যহীন, উৎকট—কিন্তু আশে পাশের প্রকৃতির সঙ্গে কি বিরাট সামঞ্জস্য! সময়ের অনন্ত বিরতি, দিন রাত্রি অর্থহীন; পল, ঘণ্টা, যুগ অলীক—অধ্যাস। দূরাগত সিংহ গর্জ্জন, ঝিল্লীর আর্ত্তনাদ, অভ্রভেদী বৃক্ষরাজীর মধ্যে সূচীভেদ্য অন্ধকার, অশরীরী প্রেতাত্মার সমাগম—দীর্ঘ তৃণগুচ্ছ, জীরাফ, উটপক্ষী, এই সবের সমীপ স্পর্শে পাশ্চাত্য হৃদয় আতঙ্কে সঙ্কুচিত হ'য়ে পড়ে। অন্তর্লীন প্রতীক উপলব্ধি হবে কেমন করে?

তবু বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রথম ভাগে নিগ্রো ভাস্কর্য্য-শিল্পের আকস্মিক পরিচয়ে পাশ্চাত্য জগতের শিল্প-পবিকল্পনায় প্রচণ্ড আলোড়ন লেগেছিল; রেখার অদ্ভুত ভঙ্গিমা, সমমাত্রিকা, উপকরণের ব্যবহার শিল্প-প্রতিভার নবতর বিকাশ বলে সাদরে গৃহীত হয়েছিল। গোরের বলেন এক সমমাত্রিকা ব্যতীত সকল গুণই আকস্মিক প্রাপ্ত অর্থাৎ পরিশীলন-শূন্য, তথাপি ব্যঞ্জনার ওজস্বিতা এমনই অপ্রত্যাশিত যে চমক লাগিয়ে দেয়। এই ওজস্বিতার নিদান হচ্ছে আপন ধী-শক্তির উপর অখণ্ড ও পরিপূর্ণ বিশ্বাস। সেই জন্যেই নিগ্রোকে শিশুর সমতুল্য জ্ঞান করা বাতুলতা—বরং তাকে উন্মাদ বলা চলে, কারণ, তার মনের কাঠামো সময়ের শাসনে বদ্ধ না হওয়াতে ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান একীভূত হয়ে গণ্ডগোলের সৃষ্টি করেছে। নিগ্রোর কাছে স্বপ্ন বাস্তবের মত সত্য, ভবিষ্যতের পূর্ব্বাভাস; নিগ্রো জগতে আত্মার গতি সর্ব্বত্র, তার অবস্থিতি অন্তরীক্ষে, জীবে, মৃতে এবং বস্তুতে।

নিগ্রোর ধর্ম্মে কোনো রহস্যনিগূঢ় তর্কবাদ নেই—আছে দুর্ব্বার ভয় ও অসীম ভক্তি।

এ ত গেলো অন্তরের কথা। হৃদয়ের সঙ্গে ব্যবহার একতন্ত্র বলে সমাজ গঠন হয়েছে সুন্দর সরল হয়ে। সাধারণ ইউরোপীয় কৃষ্ণকায় জাতির মধ্যে কোন বিচিত্রতা দেখে না। তারা জানে না যে মুষ্টিমেয় মৃতকল্প পিগ্‌মী ও বুশম্যান ব্যতীত প্রায় সকল আফ্রিকান জাতিই প্রশস্ত ও প্রশংসনীয় সামাজিক বিধি ব্যবস্থা দ্বারা পরিচালিত হয়ে এসেছে। ভিন্ন ভিন্ন সমাজের নিজস্ব আইন এবং স্বতন্ত্র বিচার পদ্ধতি, মালিকীয়ানা স্বত্ব, ব্যবস্থা সভা, নীতি শাস্ত্র ইত্যাদি সভ্য জগতের যাবতীয় উপকরণ আছে। তারা জানে না যে নিগ্রো ইতিবৃত্ত সুদূর ঘটনার বৈচিত্র্য দ্বারা পরিশোভিত। নিগ্রো রাজ্যে বৃত্তিভোগী ঐতিহাসিকের কথা তারা শোনেনি।

আমার ব্যক্তিগত পরিচয় ঘনিষ্টতম ছিল কেনিয়ার কিকুয়ু জাতির সঙ্গে। তারা ঘোরতর অসভ্য জাতি। আবিসিনিয়ান, বাগাণ্ডা বা দাহোমিয়ানদের মত কোন প্রাচীন ঐতিহ্য নেই তাদের। তাদের কথা এখানে বললে যথা-ইচ্ছা-নির্ব্বাচনরূপ অতিরঞ্জনের কারণ থাকবে না।

কিকুয়ু কেনিয়ার উচ্চভূমিতে এসেছে মাত্র তিন শতাব্দীর মধ্যে ; কোথা থেকে, কেন—তার কোন হদিশ নেই। কিন্তু তাদের প্রথম অভিযান যখন এলো, সেই গভীর অরণ্যসমাকীর্ণ ভূমিতে বাস করতো গুম্বা নামক এক চতুর লোমশ-পগমী জাতি—কঙ্গো পিগমীর আত্মীয়। কোন কোন অঞ্চলে বাস করতো ওয়াণ্ডারোবো নামে আর একটি ব্যাধ জাতি। তখন কিকুয়ুও মৃগয়াজীবী ছিল—তারা প্রথমে ওয়াণ্ডারোবোদের নিকট হতে পশু শিকারের অধিকার ক্রয় করে নেয়, পরে, সংখ্যা-নিকৃষ্ট গুম্বাদের ঠেলে দেয় কেনিয়া পর্ব্বতের তুষারাবৃত উচ্চ ভূমিতে কিম্বা আর কোনও মৃত্যুমুখে।

কিকুয়ুরা যে অধিকার ক্রয় করে নিয়েছিল তাকে বলা হতো গিথীকা। গিথীকা প্রথা পুরুষানুক্রমে হস্তান্তরিত হ'তে হ'তে আজও

অক্ষুণ্ণ রয়ে গেছে—যদিও ইত্যবসরে তারা পশু শিকার ছেড়ে ফসল উৎপাদনে আপন অর্থনৈতিক ভিত্তি বদল করে নিয়েছে, ঝোপ কেটে জঙ্গল কেটে স্থানটিকে সুগম সমৃদ্ধ করে তুলেছে। আজও সেই পুরাতন প্রথামত এক একটি গোষ্ঠীর আয়ত্তে ছেড়ে দেওয়া হয় এক একটি গিথীকা অর্থাৎ খণ্ডভূমি, আয়তনে প্রায় পনর একার হ'তে দশ স্কোয়্যার মাইল পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ। সে ভূমির মালিকীয়ানা স্বত্ব গোষ্ঠীভুক্ত ব্যক্তি-বিশেষের এবং গোষ্ঠী-নির্ব্বাচিত কর্ত্তাদের ওপর সম্পূর্ণ ভাবে ন্যস্ত থাকে। কেবল মাত্র এক খণ্ড ভূমি নিয়ন্ত্রিত থাকে সমবায়ের ব্যবহারার্থে এবং নূতন অংশীদাবেব আবির্ভাব হ'লে এই অংশ হ'তেই বণ্টন কবা হয়।

কর্ত্তাদের মধ্যে থেকে নির্ব্বাচিত এক ব্যক্তির (মুরামাটি) হাতে ন্যস্ত থাকে পরিচালনার ভার। তথা-কথিত সভ্য দেশের অর্থনৈতিক আদর্শে প্রণোদিত মানদণ্ড দিয়ে নিগ্রোর বিষয়-বুদ্ধি নিরূপিত করা যে কতখানি অসম্ভব তা প্রতীয়মান হয় গিথীকার অন্তর্গত অংশ বিক্রয়ের আইন দিয়ে। ব্যক্তি-বিশেষের জমি বিক্রয় করবার অধিকার আছে এবং অনেকে বিবাহের যৌতুক—অর্থাৎ গরু, বাছুর, ছাগল সংগ্রহ করবার ইচ্ছায় স্বীয় অংশ হস্তান্তরিত করে; এবং যথাযথ মূল্য প্রদান করবামাত্র ক্রেতার জমির ওপর অধিকার-স্বত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু তাব দিক থেকে ক্রয়ের ইচ্ছা প্রকাশ হওয়া এমনই গর্হিত যে অভাবনীয়। বিবাহের ইচ্ছা বা আবশ্যকতা প্রকট হলে বিক্রেতা সচরাচর স্বীয় গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত কোন ধনী প্রতিবেশীর শরণাপন্ন হয়। কিন্তু মজা হচ্ছে যখন ইচ্ছা-মূল্য প্রত্যর্পণে বিক্রয় নাকচ হয়। বিচিত্র সে প্রত্যর্পণের মূল্য নির্দ্ধারণ। জমি পতিত থাকলে ক্রেতা ফিরিয়ে পায় তার দেওয়া গরু, ছাগল এবং ইত্যবসরে তাদের যত বংশ বৃদ্ধি হয়েছে, তার সবই। যদি সে ফসল উৎপন্ন করে ভোগ করে থাকে, তাহলে মূল্যের অতিরিক্ত একটি কানা বাছুরও ফিরে পায় না। নিগ্রোর চক্ষু দিয়ে দেখলে এ ব্যবস্থা অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গত।

কিকুয়ুদের বিখ্যাত বাঁজাব হাটের কথা বর্ণনার যোগ্য—কিন্তু

মানস চক্ষে ভেসে উঠছে বিচিত্রতর ছবি—সুন্দর সুঠাম স্কন্ধদেশের নিম্নে আলুলায়িত উজ্জ্বল বর্ণের বস্ত্র পরিহিত বাগাণ্ডা মহিলা, স্বাভাবিক লাবণ্য ও মর্য্যাদা সহকারে রাজপথ দিয়ে চলে যায় মনের আনন্দে—হয়তো মাথার উপরে একটি ছোট কিছু ভার,—দিয়াশালাই কিম্বা ঔষধের বোতল, কিন্তু শরীরের ভঙ্গিমা সম্রাজ্ঞীর মত উদার। পথপ্রান্তে দুই বন্ধুর উচ্চৈস্বরে আলাপন কত সহজ ও সরল। অপরিচিতের সঙ্গে দেখা—সে অভিবাদনও আত্মীয়তায় উন্মুখর—কে কেমন আছে? স্বাগত জিজ্ঞাসার ছন্দ রক্ষার জন্য মৃত ব্যক্তিরও শারীরিক কুশলাদি জ্ঞাপন প্রচলিত প্রথা।

সভ্য জগতের অভীষ্ট লক্ষ্য সাম্যবাদতন্ত্রের সে দেশে স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল প্রচলন আছে। অঙ্গীভূত বসন ব্যতীত কোন সামগ্রীর ওপরই ব্যক্তি-বিশেষের স্বত্ব নেই। মনে পড়ে ছেলেবেলাকার কথা, যখন বাড়ীর চাকর মালীর অগ্নিকুণ্ডের আড্ডায় গুরুজনের অলক্ষ্যে বসে পশু-পক্ষী জলঝড়ের কত রোমহর্ষক গল্প শুনতাম। সেই সঙ্গে দেখতাম তাদের আহার্য্য প্রস্তুতের ঘটা—অত্যন্ত সাদাসিধা খাদ্য, রাঙাআলু অথবা ভুট্টা-সিদ্ধ—পাক হতো প্রয়োজনের দ্বিগুণ অনাহূত অতিথিদের প্রতীক্ষায়। পথচারী স্বজাতিই হোক অথবা বিজাতিই হোক, সপ্রতিভ ভাবে আসতো, খেয়ে যেতো। প্রথম আলাপনে কদাচিৎ সঙ্কোচ প্রকাশ পেতো।

মনে পড়ে দক্ষিণ-পূর্ব্ব অঞ্চলের সেই জাতির কথা যাদের মধ্যে আজও প্রচলিত আছে 'এজ্‌গ্রুপ্‌' প্রথা। এখানে সামাজিক ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার কর্ত্তা হচ্ছে পঁচিশ হতে বত্রিশ বৎসর বয়স্ক যুবক-সঙ্ঘ—যারা এককালে দীক্ষিত হয়ে যৌবনে গৃহীত হয়েছে। বত্রিশ পার হওয়া মাত্র শাসকদলকে বানপ্রস্থ অবলম্বন করে নবাগত দলের হাতে কর্ত্তৃত্বের ভার অর্পণ করতে হয়। স্বেচ্ছায় স্বার্থত্যাগের প্রকৃষ্টতর উদাহরণ কোথায় মেলে? শুনেছি উগাণ্ডায় একটি বাৎসরিক উৎসবের অনুষ্ঠান হয় যখন পল্লীবাসীরা পরস্পরের গৃহকার্য্যে সাহায্য করে। সে কদিন ঘর গড়া বিধি-নিষেধের ও ঘর ভরা দ্রব্য সামগ্রীর উপর নিত্য দখলের অহঙ্কার চূর্ণ করা হয়।

উপরে নিগ্রোর যে জীবন-চিত্রটি সাধ্যমত উদ্ঘাটিত করেছি তার আয়ু বিগতপ্রায়। আজ ভাঙন ধরেছে তার চারিভিতে। অনেকে মনে করেন এ ভাঙন অবশ্যম্ভাবী ও মঙ্গলকর, কারণ বিমানযানের উদ্ভাবনায় আজ পৃথিবী এতই সঙ্কুচিত যে জগতের যাবতীয় জ্ঞান ও অনুশীলন সম্পদ একত্র হ'য়ে প্রগতির প্রবাহ-ভুক্ত হতে বাধ্য। কিন্তু তাঁরা ভুলে যান যে মিলন হবে যাকে নিয়ে সে মৃত-প্রায়। মিশনারীদের আমি এই কথাই বার বার বলে এসেছি। আমার মনে হয় আফ্রিকায় ক্রিশ্চিয়ানিটির প্রবেশ মানব ইতিবৃত্তে একটি চরম শোচনীয় ঘটনা।

মিশনারীর প্রবল প্রভাবের কথা কারো অবিদিত নেই। এই প্রবল ধনবল ও লোকবল প্রবলতর শাসকগণের আশ্রয়ে নিগ্রোর মসীলিপ্ত অন্তর-গহনে দাবানলের আলোক জ্বালাতে বদ্ধপরিকর ;—কিন্তু নিগ্রো প্রথম মাটির আশ্রয় ছেড়েছে আতঙ্কে বিহ্বল হ'য়ে নয়—পাদ্রীর ব্যক্তিগত নিষ্ঠা ও ঐকান্তিক সাধনের প্রতি বিস্ময়ে ও শ্রদ্ধায়। আজ সেদিন আর নেই। ক'য়েক বৎসর হতে ভিন্ন ভিন্ন গোত্রের গীর্জ্জা-সঙ্ঘের মধ্যে যে হীন ও লজ্জাকর প্রতিযোগিতা চলেছে নিগ্রোর শ্রদ্ধা ভক্তি তাইতে সঙ্কুচিত। মিশনারীর প্রতিষ্ঠিত সেবাশ্রম সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে প্রশংসার্হ এবং নিগ্রো সে জন্য কৃতজ্ঞ—কিন্তু এখানেও উপকার-বৃত্তিটি নিছক শারীরিক কল্যাণ সাধনের মত সাধু উদ্দেশ্য লঙ্ঘন করে উদ্‌ভ্রান্ত স্বার্থান্বেষণে নিরুদ্ধ হয়েছে। বিদ্যাদান হয়ে দাঁড়িয়েছে বাইবেল পাঠের নিমিত্তমাত্র—জ্ঞান বিতরণ হয়েছে সাম্প্রদায়িক ছুৎমার্গের প্রাচীর গড়ার কারণ। যখন পরস্পরের মধ্যে প্রতিযোগিতা এত প্রকট এর বেশী কিছু আশাও করা যায় না ; কিন্তু অসহ্য লাগে যখন শুনি যে টাবোরার সেমিনারীতে এক একটি নিগ্রোকে বিশ বৎসরের ন্যায় দীর্ঘকালের জন্য ভক্তি-রসের জারকে জরিয়ে পাদ্রী তৈরী করা হয়—তাও অধ্যয়নের মিডিয়াম সোহাইলি নয়—ইংরাজীও নয়—একেবারে লাটিন। শোনা যায় যে লাটিন ভাষার কূট তর্কে রোমের বিশিষ্ট পণ্ডিতেরাও এঁদের কাছে হার মেনে যান।

১৯২৯ সালে কলোনীয়াল অফিসের অনুরোধে জুলিয়ান হাক্স্লী পূর্ব্ব আফ্রিকায় যান নেটিভ শিক্ষা সম্বন্ধে কয়েকটি তথ্যের অনুসন্ধানে। সেখানে একটি কিকুয়ু বিদ্যালয়ের মিশনারী কর্ত্তা তাঁকে গর্ব্বভরে বলেছিলেন যে সে অঞ্চলে কিকুয়ু ভাষাই শিক্ষা প্রদানের প্রকৃষ্ট পন্থা অথচ সোহাইলিতে শিক্ষা প্রদান করা হয় তার একমাত্র কারণ পুরাতন টেষ্টামেন্টটি তখনও কিকুয়ু ভাষায় আদ্যন্ত অনুদিত হয় নি।

বাইবেল অনুবাদে ভাষার বিপর্য্যয় কিছু কম হাস্যোদ্দীপক নয়। একটা উদাহরণ দেবার লোভ সম্বরণ করতে পারলাম না।

আফ্রিকার বহু জাতির মত কিকুয়ুদের মধ্যেও প্রচলিত প্রথা আছে যে বালক ও বালিকা শৈশব অবস্থা অতিক্রম করবার সময় একটি অনুষ্ঠানের দ্বারা যৌবনাবস্থায় নীত হয়। অনুষ্ঠানের পর কয়েক বৎসরের জন্য তাদের বিবাহ করবার অনুমতি দেওয়া হয় না, কিন্তু পরস্পরের মধ্যে সীমাবদ্ধ ভাবে শারীরিক ও মানসিক ঘনিষ্ঠতা গড়ে তোলবার উৎসাহ দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানের সময় দীর্ঘ—সেই অবসরে বিশ্ব প্রকৃতির রহস্যবাদ, যৌন সম্পর্কীয় অভিজ্ঞান, সামাজিক শিষ্টাচরণ ও দেশভক্তি সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া হয়। অধ্যায়ন শেষে, বয়ঃপ্রাপ্তির বাহ্যিক নিদর্শন স্বরূপ, তাদের একটি অস্ত্রোপচারের ক্লেশ সহ্য করতে হয়।

বালিকার ওপর এই প্রকার অস্ত্রোপচার অনাবশ্যক অত্যাচার সন্দেহ নাই, কিন্তু বংশ পরম্পরায় প্রচলিত এই প্রথা বিদেশীর আকস্মিক হস্তক্ষেপে বিদূরিত হতে পারে কিনা সে বিষয় চিন্তা না করেই মিশনারীরা তাঁদের দীক্ষিত কিকুয়ুদের ওপর আদেশ জারি করে বসেন যে বর্ব্বরোচিত অভ্যাসটি অচিরাৎ পরিত্যাগ করতে হবে। ফলে যে দেশব্যাপী উত্তেজনার সৃষ্টি হয় তাতে মিশনারী নির্ব্বুদ্ধিতার পরাকাষ্ঠা প্রকাশ হয়ে পড়ে।

নূতন টেষ্টামেন্টের অনুবাদে 'সার্কামসিশান' অর্থাৎ 'ইরুয়া' কথাটির বার বার উল্লেখ আছে। কিকুয়ু ভাষায় ইরুয়ার অর্থ উভয় লিঙ্গের অস্ত্রোপচার—কিকুয়ুরা ভেবে পেলে না মিশনারীর ধর্ম্মগ্রন্থে যে আচার

সমাদৃত হয়েছে তা তাদের সমাজে গর্হিত বলে গণ্য হবে কোন অপরাধে। এতদ্ভিন্ন ইরুয়া শব্দটি বৃহত্তর অর্থে সর্ব্বাঙ্গীণ অনুষ্ঠানটিকে বোঝায়। মিশনারীদের দুর্ভাগ্যবশতঃ সামান্য আনুষঙ্গিক ক্রিয়ার সংস্কার-চেষ্টা সমুদায় অনুষ্ঠানটির উপর আক্রমণ স্বরূপ প্রতীয়মান হলো, উপরন্তু গণ্ডগোলের সৃষ্টি হলো ইংরাজি ভারজিন্ শব্দটির অর্থ নিয়ে। কিকুয়ু ভাষায় ভারজিন্ অর্থব্যঞ্জক কোন শব্দ নেই বলে 'মুইরিতু' শব্দটিকে ব্যবহার করা হয়েছে। এই শব্দটির কিকুয়ু অর্থ হচ্ছে অনুষ্ঠান-উত্তীর্ণা বালিকা—সুতরাং যীশুর পবিত্র মাতা স্বয়ং যখন অস্ত্রোপচার সহ্য করেছেন তখন মিশনারীর অনুজ্ঞা নিশ্চয় অগ্রাহ্য।

পূর্ব্বেই বলেছি মিশনারীর মধ্যে সহৃদয় কর্ম্মীর অভাব নেই—তাঁদের মধ্যে অনেকে আছেন যাঁরা গোষ্ঠী হতে বিচ্ছিন্ন দীক্ষিত নিগ্রোদের নীতি-শৈথিল্যের জন্য যারপর নাই ব্যথিত ও অনুতপ্ত—কিন্তু তাঁদের পেশার দোষ একবার কর্ম্মপ্রবাহে গা ভাসালে আর মোড় মেলে না। আবার অনেকে আছেন—দুঃখের বিষয় তাঁরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ—যাঁরা নিগ্রোর আচার অনুষ্ঠানগুলিকে ইচ্ছাপূর্ব্বক উন্মূলিত করতে সচেষ্ট। অসংখ্য উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। এক স্থানে কোন এক জাতির বিশ্বাস জন্মেছিল যে তাদের আরাধ্য দেবতার প্রতীক একটি বিশাল বৃক্ষ। তারা সেই বৃক্ষ হতে লতা পাতা এনে গৃহ-দ্বার শোভিত করতো সকল প্রকার অলৌকিক অত্যাচারকে ঠেকিয়ে রাখবার উদ্দেশ্যে। মিশনারীরা এসেই নিগ্রোর অন্ধ বিশ্বাস চূর্ণ করবার উপলক্ষে সেই বৃক্ষ কেটে গীর্জ্জা প্রস্তুত করালেন। পশ্চিম য়ুগাণ্ডায় অনেক স্থানে কুটীর-সম্মুখে ছোট ছোট মন্দিরে পূর্ব্বপুরুষদের উদ্দেশ্যে উপাসনা হয়—স্থানীয় মিশনারী সেই সকল মন্দিরকে শয়তানের আবাস বলে দীক্ষিত নিগ্রোদের দিয়ে ধ্বংস করাতে লাগলেন।

কেনিয়াতে দেখেছি মিশনারী ইচ্ছা করলেই অখৃষ্টীয় হিথেনদের কর্ম্ম, আতিথেয়তা বা স্ত্রীলাভের পথে কণ্টক রোপণ করতে পারেন এবং করেন। সুতরাং তাঁদের ক্ষমতা অসীম। তথাপি পৃষ্ঠপোষকদের মনরঞ্জনের জন্য দীক্ষিতের সংখ্যা বৃদ্ধি করবার এমনই প্রবল প্রতিযোগিতা যে

অজ্ঞান অবস্থায় ব্যাপটাইজ করবার জন্য পাদ্রী হাসপাতালে পর্য্যন্ত ধাওয়া করেন। গীর্জ্জা বনাম ক্রায়িষ্ট প্রসঙ্গ আজও তর্কাধীন—ছলে বলে দীক্ষা প্রদানের সার্থকতা সম্বন্ধে তর্ক তুলে লাভ নেই, কিন্তু গীর্জ্জা-ভুক্ত নিগ্রোর মানসিক অবনতির কথা পাদ্রীরাও স্বীকার করেন।

কথায় কথায় মিশনারী প্রচেষ্টার বর্ণনা একটু বিস্তৃত করে দিয়ে ফেললাম। তার কারণ শ্বেত শাসনযন্ত্রের সঙ্গে গীর্জ্জার প্রভাব নিবিড় ভাবে বিজড়িত।

এইবার ফরাসী রাজ্যের বর্ণনা করি। আফ্রিকায় ফরাসী অধিকার আয়তনে বিশাল কিন্তু উত্তর প্রান্ত মরুভূমি হওয়ার জন্য প্রায় লোকশূন্য। পশ্চিম আফ্রিকার ফরাসী উপনিবেশকে উদাহরণ স্বরূপ ব্যবহার করা যেতে পারে। প্রথমে স্মরণে রাখা উচিত যে ফরাসী চরিত্র স্বভাবতঃই কুণো অর্থাৎ বাঙ্গালীর মত ঘরমুখো। সেইজন্যই বোধ করি উপনিবেশ পরিচালনায় কোন ঐতিহ্য বা অভিজ্ঞতা গড়ে ওঠেনি তাদের প্রকৃতিতে, তবু অন্যজাতির সঙ্গদোষে ঘাড়ে ঝুঁকি যখন এসে পড়েছিল তখন নেপোলিয়ানের বাঁধা কতকগুলি মোটামুটি শাসন প্রণালীর সামান্য কিছু সংস্কার করে ফরাসী আফ্রিকার রাজ্য শাসনের গোড়া পত্তন হয়। আজ অবধি শাসন-যন্ত্র সুনিয়ন্ত্রিত হলোনা—অর্থনৈতিক দুর্দ্দশা ও আনুষঙ্গিক অসন্তোষ চিরস্থায়ী হয়ে রইল। রাজকর্ম্মচারীর দৈন্যও সেই অনুপাতে প্রকট হয়ে রইলো; অথচ কাজের চাপ আর কর্ত্তৃপক্ষের কর আদায়ের তাগিদের বিরতি নেই। তার ওপর প্রাকৃতিক আবহাওয়াও শ্বেতাঙ্গের প্রতিকূল।

এই সকল কারণে প্রকৃত ধী-সম্পন্ন ব্যক্তিকে পশ্চিম আফ্রিকা কখনও আকৃষ্ট করতে পারে না। উচ্চপদের চাকুরী সচরাচর পূরণ হয় সঙ্গতিপন্ন তপ্ত মস্তিষ্কের দ্বারা যাদের স্বদেশবাস প্যারিসের মন্ত্রীসভাকে প্রতিনিয়ত ব্যতিব্যস্ত করে তোলে। নিম্নস্তরের পদগুলি পরীক্ষোত্তীর্ণ দরিদ্র ছাত্রের দ্বারা পূরণ হয় যাদের দেশত্যাগ করা ব্যতীত অবস্থা পরিবর্ত্তনের কোন উপায়ই থাকেনা। ১৯২৭ সালে প্রথম শ্রেণীর অবিবাহিত কর্ম্মচারীর বাৎসরিক বেতনের হার ছিল মাত্র দুইশত পাউণ্ড

—পরে আরও নাকি হ্রাস হয়েছে। এর উপর ফরাসীর স্বাভাবিক মিতব্যয়িতা যোগ হলে অত্যাচার বর্ত্তায় শাসিতেব ওপর। নিগ্রো ব্যবসায়ীর প্রতি আজ্ঞা জারি হয় যে তারা য়ুরোপীয় খরিদ্দারকে আহার্য্য দ্রব্য বাজার দর অপেক্ষা তিন ভাগ অল্প মূল্যে বিক্রয় করতে বাধ্য—এই সুবিধার জন্য অধিকাংশ রাজকর্ম্মচারীর মধ্যে বাণিজ্য-স্পৃহা এমন প্রবল ভাবে জাগরূক হয়ে ওঠে যে মসিয়ে কার্দ্দে ১৯২৪ সালে, বাধ্য হয়ে বিধান করেছেন যে কোন কর্ম্মচারী দুই টার্ম্মের অধিককাল এক কলোনীতে থাকতে পারবে না। ফল দাঁড়িয়েছে হিতে বিপরীত। আজ প্রায় কোন কর্ম্মচারী নিগ্রোভাষা শিক্ষার ক্লেশ স্বীকার করেন না, অথবা নিগ্রো সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অর্জ্জনের চেষ্টা করেন না। তাঁরা মনে করেন যে ক্লেশলব্ধ জ্ঞান যখন কর্ম্মক্ষেত্রে প্রয়োগ করবার অবসর নেই তখন বৃথা কাল-ক্ষেপে লাভ কি। এই একই কারণে সেই দেশের উন্নতির চেষ্টায় কোন সঙ্কল্পের পরিকল্পনা হয় না। রাজ্য শাসিত হয় কতকটা দোভাষীর ব্যখ্যা ও অভিরুচির ওপর। এক একটি প্রদেশের শাসন-কর্ত্তার স্বৈরাচারে প্রজাবর্গ আতঙ্ক-বিহ্বল কিন্তু আপিলের কোন পথ নেই। গোরের বলেছেন : Most of the French administrators I met were not bourgeois turned gentille-homme : they were petit bourgeois turned Caesars.

স্থানীয় শাসন-কর্ত্তার স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে প্যারিস কোন প্রতিবাদ করতে পারে না ; তার কারণ প্যারিস জানে যে কর আদায়ের অঙ্ককে উচ্চস্তরে রাখতে হলে এবং কৃষ্ণকায় সৈন্যবাহিনীর উদর পূরণ করতে হ'লে কয়েকটি অমানুষিক অত্যাচারের প্রবর্ত্তনা অনিবার্য্য,সুতরাং শাসন-কর্ত্তা যদি তাঁর ব্যক্তিগত অভিরুচিকে একটু বিচিত্রতর করে বিন্যাস করেন তার জন্য অস্থির হবার কোন কারণ নেই। তাছাড়া অত্যধিক কাজ, অত্যল্প আয় ও অস্বাস্থ্যকর জলবায়ু—এই ত্রিশ্বের প্রভাবে স্নায়বিক অধৈর্য্য আসা স্বাভাবিক।

অনেকে নিশ্চয়ই জ্ঞাত আছেন যে আফ্রিকার প্রায় সর্ব্বত্র কয়েদী শ্রমিক হচ্ছে P. W. D.র বিনা বেতনের লোকবল এবং সে হতভাগ্য

দেশে শ্রমিকের অভাব হ'লে করের মাত্রাধিক্য করা হচ্ছে প্রচলিত রীতি। ফরাসী পশ্চিম আফ্রিকার কর্তারা কর আদায়ের বেলায় অনেক সময় অর্থের বিনিময়ে শ্রম গ্রহণ করেন—অর্থাৎ অর্থ প্রত্যাখ্যান করা তাঁদের ইচ্ছা-সাপেক্ষ এবং শ্রমের মূল্য নির্দ্ধারণও তাঁদের অভিরুচি।

সাধারণ করের হার মাথা পিছু ছয় হ'তে পঞ্চাশ ফ্রাঙ্ক, ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের অর্থনৈতিক সঙ্গতির সরকারি হিসাব অনুযায়ী ধার্য্য হয়েছে। নিছক কায়িক পরিশ্রম দিয়ে অর্থ সঞ্চয় করা সাধারণ নিগ্রোর পক্ষে দুঃসাধ্য, সুতরাং বছরের পর বছর কর আদায়ের সময় অমানুষিক অত্যাচারের আবর্ত্তন হয়।

কঙ্গো-ওসান-রেলপথের নির্ম্মাণ-কার্য্য স্মরণ করে আলবেৎ লোঁদ্রে বলেছিলেন যে এক একটি শ্লীপার এক একটি মৃত নিগ্রো শ্রমিকের প্রতীক; ফরাসী পশ্চিম আফ্রিকার উৎকৃষ্ট মোটর পথে কোন স্লীপার পাতা থাকলে হয়ত ঐ কথাই শুনতে হতো—কারণ ক্ষুদ্র হাতলের টাঙ্গী ব্যতীত কোন যন্ত্র সম্বল না করে যে শ্রমিকের দল কাজে নেমেছিল, তাদের বেতনের পরিবর্ত্তে দেওয়া হয়েছিল যে পরিমাণ ও যে প্রকৃতির খাদ্য কোন সারমেয় তাই খেয়ে জীবিত থাকতে পারতো কিনা, গোরের সন্দেহ প্রকাশ করেছেন।

সেখানকার নিগ্রোদের আর একটি নিরন্তর বিভীষিকা হ'চ্ছে সৈন্যবাহিনীর অসীম ক্ষুধা। মহাযুদ্ধের সময় আঠার হতে পঁইত্রিশ বছর বয়সের প্রত্যেক পুরুষ প্রেরিত হয়েছিল জার্ম্মান অনলের আহুতি স্বরূপ; আজও মনুষ্য-শিকার চ'লেছে।

এই আত্মদানের বিনিময়ে ফরাসী-সভ্যতা তাকে কি দিয়েছে? গোরের কথনচ্ছলে ব'লেছেন—but the brutal and abusive manner in which the French treat them in every occasion, and the systematic way in which they are cheated in every transaction which the cheaters quite erroneously believe their simplicity prevents them from realising that

actually it is their fear or their experience with the results of complaints which keep them apparently quiet.

ইংরাজের পূর্ব্ব-আফ্রিকায় অধিকার-বিস্তার আকস্মিক বা অপ্রত্যাশিত ভাবে হয়নি। অন্তঃসঙ্গতির বিপুল ঐশ্বর্য্য নিয়ে যখন সে সাম্রাজ্য বিস্তারে নেমেছিল তার বিজয়-উন্মাদনার অন্তরালে ছিল সাধন-সুকঠিন সংযম ও কর্ম্ম-প্রেরণার উৎসাহ। উচ্চ আদর্শে অনুপ্রাণিত কর্ম্মিবৃন্দ প্রবুদ্ধভাবে চেয়েছিল মাতৃভূমির সুমহান পরিণতি। বর্ণা-ভিজাত্যের উগ্রতা নিহিত ছিল উচ্চাঙ্গের আদর্শবাদে। ইংলণ্ডের সুধী-জন কল্পনাচক্ষে দেখেছিলেন এক গৌরব-রঞ্জিত সুদূর ভবিষ্যৎ যখন তাঁদের জাতীয় প্রতিভার প্রকৃষ্ট প্রকাশ প্রস্ফুট হয়েছে সভ্যতার আলোকে উদ্ভাসিত নিগ্রোর প্রতীকে।

কিন্তু সেদিন বিগত। আজ ইংলণ্ডের সুধীজন কল্পলোকে দেখেন কেনিয়া হ'তে তাঙ্গানিকার মধ্যে দিয়ে নায়াসাল্যাণ্ড্ এবং রোডেসিয়া হয়ে দক্ষিণ-আফ্রিকা পর্য্যন্ত এক বিরাট "শ্বেত মেরুদণ্ড"—যাকে পুষ্ট কববার জন্য সংরক্ষিত থাকবে নিগ্রো শোণিত, যার বাতাস পবিশুদ্ধির জন্য বিতাড়িত হবে ভারতীয়।

আজও ইংরাজ রাজকর্ম্মচারীর অন্তঃস্থ আদর্শবাদ ক্ষুণ্ণ হয়নি,—মাতৃভূমির গৌরব কামনায় সে আজও আত্মোৎসর্গ করতে প্রস্তুত ; কিন্তু তার বিশ্ব পরিকল্পনার ব্যাস সার্ব্বজনীনতা হ'তে স'রে গিয়ে সঙ্কীর্ণ জাতীয়তা-বাদে নিবদ্ধ হয়েছে বলে সে বিজাতীয় প্রজাবর্গের বিশ্বাস হারিয়েছে।

সেদেশে ইংরাজ শাসন পদ্ধতি 'ইণ্ডিয়ান পিনাল কোডের' ন্যায়নিষ্ঠ আস্তরণে মণ্ডিত এবং বাহ্যতঃ ফরসী-শাসন যন্ত্র হতে অনেক উন্নত কিন্তু শাসিতের সঙ্গে শাসকের আন্তরিক টান যদি সাফল্যের পরিচায়ক হয় স্বীকার ক'রতে হবে যে আফ্রিকার গগনে ইংরাজের অভ্যুদয় বিফলতর হয়েছে। খোলাখুলি নিষ্ঠুরতা হতে অর্থ নৈতিক আধিপত্য চিরস্থায়ী করবার প্রচ্ছন্ন প্রয়াস যে অধিক দূষণীয় সে অভিজ্ঞতা আজ ভারতীয়

মাত্রেরই হয়েছে। তাছাড়া ফরাসীর নিষ্ঠুরতা যতই নৃশংস হোক না কেন, পশ্চিম আফ্রিকার বিশাল জনসঙ্ঘ তার প্রতিঘাতে তাসমানিয়ার মুষ্টিমেয় দুর্ভাগাদের মত বিলুপ্ত হ'য়ে যাবে না। একদিন নিশ্চয় আসবে যখন নিষ্ঠুরতার বহ্নিশিখা আপনি আপনাকে দগ্ধ ক'রে অবসন্ন হয়ে পড়বে। তখন হবে নিগ্রোর উত্থানের সময়। ঈশ্বরদত্ত প্রতিফলের ইঙ্গিত করছি না। কারণ কে না জানে যে সে-স্পেন আজও বেঁচে আছে যে এককালে বিজিত ইণ্ডিয়ানদের পেরুর খনি-গহ্বরে অমানুষিক অত্যাচার ক'রে খাটিয়েছিল। যে বেলজিয়ান ও পর্ত্তুগীজ দাস ব্যবসায়ীরা কাফ্রীদের ওপর অসহনীয় নির্য্যাতন করে প্রভূত ধনসঞ্চয় করেছিল, তাদের বংশধরেরা আজও আভিজাত্যের বিলাসে জীবন যাপন করছে। যে মার্কিন সৈন্যবাহিনী পাঠিয়ে বুনোমহিষ নিঃশেষ ক'রে রচনা করেছিল রেড্ইণ্ডিয়ানদের রিসার্ভ অর্থাৎ অন্তিম শয্যা, সেই আবার হয়েছিল আন্তর্জাতিক মহামিলন যজ্ঞের প্রধান পুরোহিত।

আফ্রিকান্ নিগ্রোর প্রাণ-প্রবাহ নিছক পাশবিকতার সংঘাতে নিঃশেষ হবার নয়—ফরাসীর শোষণ বড় জোর শাসিতের হৃদয়ে বিদ্রোহ বা আতঙ্কের সৃষ্টি করে প্রগতির স্বাভাবিক গতিকে শ্লথতর করে আনে, কিন্তু ইংরাজ তার অভিসন্ধিকে হিতৈষণার বাহ্যাড়ম্বরে এমন সুচারুভাবে অবগুণ্ঠিত করে, মনে হয় যেন বেচারাদের জন্য মোক্ষের দ্বার উন্মুক্ত; তারপর কোন্ অবসরে দৃষ্টির অন্তরালে দেহের এক একটি তন্তু ছিন্ন হ'য়ে যায় কে তার সংবাদ রাখে?

কেনিয়ার অধিকাংশ শ্বেতকায় রাজকর্ম্মচারী শিক্ষিত, হৃদয়বান্ ও দায়িত্বজ্ঞান-সম্পন্ন। কিন্তু স্বজাতির স্বার্থ যখন নিয়ন্ত্রিত এবং কর্ত্তব্য কার্য্য নির্দ্ধারিত তখন তাদের ব্যক্তিগত মতামত মূল্যহীন। অনেকের অন্তরের বিদ্রোহ পরিস্ফুট হয়ে প্রকাশ পায় পর্য্যটকের দিন-পঞ্জিকায় বিধৃত কথোপকথনে, কিন্তু কর্ম্মজীবনে কার্য্যের শৃঙ্খলা অটুট রাখাই তাঁদের জাতীয় সৌকর্য্য। একাধিক ইংরাজ কর্ম্মচারী খোলাখুলি ভাবে স্বীকার করেছেন যে নিগ্রোকে শিক্ষার প্রথম স্তরে ইংরাজী কেতাবে পুষ্টি করলে ফল হয় শোচনীয়। কিন্তু তাঁরাই কার্য্যক্ষেত্রে আদর্শবাদ পরিহার

করেছেন যখনই প্রতীয়মান হয়েছে যে ভারতীয়দের বিতাড়িত ক'রতে হ'লে প্রথম প্রয়োজন বহুসংখ্যক নিম্নশ্রেণীর নিগ্রো কেরাণী।

অবশ্য বর্ণাভিজাত্যের আতিশয্যে কেনিয়ার বিচারালয়ে, পথে, ঘাটে, ন্যায়ের ব্যত্যয় প্রতিনিয়ত ঘটে থাকে। কিন্তু সে এতই নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার যে দোষাবহ বলে মনে হয় না। অন্ততঃ আমি এ-ক্ষেত্রে বর্ণবৈষম্য-জাত অন্যায় বিচারকে স্বাভাবিক ও অনিবার্য্য বলে ধরে নিয়ে ইংরাজ-কর্ম্মচারীকে হৃদয়বান বলেছি। যে দেশে শিক্ষা প্রদানে ব্যয়ের বৈষম্য মাথাপিছু চারিশত গুণ সেখানে সাধারণ প্রচলিত মাপকাঠির প্রয়োগ চলে না।

এখন বিচার্য্য যে "শ্বেত মেরুদণ্ড" প্রতিষ্ঠার সংকল্প যখন কার্য্যে পরিণত হবে এবং যখন শ্বেত ঔপনিবেশিক সংখ্যায় অপর্য্যাপ্ত হওয়ায় শ্বেত-কৃষ্ণে অর্থনৈতিক সংঘর্ষ বাধবে, তখন ইংরাজ সরকার কোন মূর্ত্তি পরিগ্রহণ করবে। কেনিয়ার মুষ্টিমেয় শ্বেতকায় ঔপনিবেশিকরা ইতিমধ্যেই স্বায়ত্তশাসনের জন্য পীড়াপীড়ি সুরু ক'রে দিয়েছে এবং তাদের ভবিষ্যৎ-পরিকল্পনায় কৃষ্ণকায়দের বস্তিবাসী মজুরের অতিরিক্ত সম্পদসম্পন্ন কোন স্থান নেই। অনেকে মনে করেন বিলাতের প্রভাব যতদিন অক্ষুন্ন থাকবে নিগ্রোর ফসল উৎপন্ন করবার অধিকার অন্ততঃ হস্তচ্যুত হবে না। এ ধারণা যে কতখানি ভ্রমাত্মক নিম্নোক্ত দুইটি দৃষ্টান্তে পরিষ্কার বোঝা যায়।

কিলিমানজারো পর্ব্বতের ঢালুর ওপর চাগাজাতির আবাসভূমি। সেখানে জমির উর্ব্বরতা কফি চাষের উপযোগী বলে তারা যুদ্ধারম্ভের কিছু পূর্ব্বে 'রবুস্তা' ও 'এরাবিকা' কাফির চাষ আরম্ভ করে। যুদ্ধ শেষে যখন জার্ম্মাণ পূর্ব্ব-আফ্রিকা ব্রিটিশ শাসনাধীনে আসে বহু ইংরাজ ঔপনিবেশিককে সরকার হ'তে অল্প মূল্যে জমি প্রদান করা হয়। তার পর তাদের উৎপন্ন কফি যখন বাজারে নিগ্রোর প্রতিযোগিতা পেলো সমগ্র পূর্ব্ব আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ মণ্ডলীর মধ্যে উত্তেজনার অবধি রইলো না। তাঙ্গানিকা Mandated Territory, সুতরাং সরকার সরাসরি নেটিভ্ চাষ বন্ধ না করে কতিপয় বিশেষজ্ঞকে একত্রিত ক'রে শ্বেতাঙ্গ

চাষীর অনুযোগের যথার্থতা—(অর্থাৎ নেটিভ্ চাষ জঞ্জাল ও পোকা মাকড়ে পরিপূর্ণ সুতরাং উচ্ছেদ-যোগ্য) অনুসন্ধান ক'রতে লাগিয়ে দিলেন। বিশেষজ্ঞরা রায় প্রকাশ করলেন যে চাগা জাতির কফি চাষ যে কোন শ্বেতকায় চাষীর বাগান অপেক্ষা পরিচ্ছন্ন ও উৎকৃষ্ট। কেনিয়ায় সরকারী কৃষি কমিটি তৎক্ষণাৎ ভীত সন্ত্রস্ত হ'য়ে সরকারকে পরামর্শ দিলো যে যদিও আইনতঃ নেটিভদের কোনও বিশেষ ফসলের চাষ বন্ধ করানো সম্ভবপর নয়, তবু বাৎসরিক দশ পাউণ্ড করে লাইসেন্স ফী ধার্য্য করে দিলে কলমের এক খোঁচাতেই পনের আনার অধিক নেটিভ চাষীকে মাটি হ'তে উৎক্ষিপ্ত করা যেতে পারে।

আর একটি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত হ'চ্ছে মাসাই প্রদেশের মানচিত্র। সর্পসম অদ্ভুত আঁকা বাঁকা রেখা দৃষ্ট হয় সীমান্ত প্রদেশে—কারণ জিজ্ঞাসা ক'রলে জানা যায় যে শ্বেতকায়দিগের জন্য সংরক্ষিত ভূমিতে সমুদায় জল নির্গমের উৎসগুলিকে স্থানান্তরিত ক'রতে গিয়ে সীমান্তের ঋজু রেখা বঙ্কিম হ'য়ে গেছে।

শ্রীশ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ

পুরানো কথা

(পুনরাবৃত্তি)

বিজাপুরের বাদশাহী আমলের ইমারৎ সম্বন্ধে গবেষণা একটু বেশী মাত্রায় হয়ে যাচ্ছে। পাঠক হয়ত বিরক্ত হচ্ছেন। তবু আর একটি সাবেক ইমারতের উল্লেখ না করে থাকতে পারছি না। এই ইমারতের নাম আসার মহল। এর আগে নাম ছিল দাদ মহল, কেন না তখন এইখানে রাজ্যের প্রধান আদালত বসত। পরে যখন মহম্মদ আদিল শাহ হজরৎ পয়গম্বরের শ্মশ্রুর দু চার গাছি কেশ সংগ্রহ করে এই মহলের এক কামরায় প্রতিষ্ঠিত করলেন, তখন থেকে এর নূতন নাম হল আসার (Relic) মহল, আর, এটা একটা পবিত্র পীঠস্থান বলে গণ্য হতে লাগল। বিজাপুরে এই মহাপুরুষের শ্মশ্রুর কেশ দেখার সৌভাগ্য আমার হয় নেই। কিন্তু কয়েকবছর পরে সিন্ধের রোহরী শহরে বার মুবারক (Sacred Hair) বলে আর এক মন্দিরে দেখেছিলাম। মন্দির লোকে লোকারণ্য। ধূপের গন্ধে চারিদিক ভরপূর। স্তোত্রগানের গুরুগম্ভীর স্বরে মন্দিরের চূড়া ধ্বনিত। এই আবেষ্টনের মাঝে যখন প্রধান মুল্লা ইসলাম-গুরুর পবিত্র কেশ বার করলেন, তখন আমাদের মতন বাজে লোকেরও যেন গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল, চোখ ভারী হয়ে এল।

আসার মহল বাড়ীখানা আমার সময়ে বেশ ভাল অবস্থাতেই ছিল, প্রায় ভাঙ্গে চোরে নেই। এর দোতালায় একটা কামরায় অনেক সেকেলে গালিচা ইত্যাদি আসবাবপত্র রাখা থাকত। তারই একটা গালিচার নক্শী নকল করে বিজাপুর জেলের বিখ্যাত লাল রঙ্গের Prayer Carpet, পূজার আসন, তৈরী হয়ে দেশ বিদেশে চালান যেত। কিন্তু এই মহলের বিশেষত্ব আর এক কারণে। দোতলায় অনেক কুঠুরীর দেওয়ালে অতি সুন্দর নানা রঙ্গের ছবি আঁকা ছিল। আলম-

গীর বাদশাহের হুকুমে সেই চিত্রগুলি, বিশেষ করে মহম্মদ আদিল শাহের প্রতিমূর্ত্তি, নষ্ট করা হয়। দিল্লীর বাদশাহ বিজাপুরে শুধু যে এই একটা নিরর্থক ধ্বংসের কাজ করেছিলেন, তা নয়। নগর অবরোধের সময় বিখ্যাত সমাধি মন্দির ইব্রাহিম রোজার এক অংশও তিনি তোপ মেরে ভেঙ্গে দিয়েছিলেন। আদিল-শাহীর পতনের পরে মোগল বাদশাহের বোধ হয় রাগ কতকটা পড়ে গেল, কেন না তিনি দয়া করে রোজার এই ভাঙ্গা অংশ মেরামত করে দিলেন। কিন্তু আসার মহলের ছবি যেমনকার তেমনি ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় রইল। কে জানে, হয়ত মুসলমান ধর্ম্মমন্দিরে মানুষের মূর্ত্তি আঁকা দেখে অতি-ভক্ত মোগল ক্রোধে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিলেন।

বিজাপুরে থাকতে কেবলই মনে হত যে মূর্খ মোগল দক্ষিণের মুসলমান রাজ্যগুলো ধ্বংস করবার জন্য কেন এত ব্যস্ত হয়েছিল, কেন এই পাগলামি করতে গিয়ে নিজের সর্ব্বনাশ ডেকে আনলে? আমার এক দরজী ছিল। সে উত্তর ভারতের গোঁড়া মুসলমান। নিতান্ত ভালমানুষ হলেও দিল্লীর অতীত গৌরবে তার মনপ্রাণ সদাই মশগুল থাকত। তার ভাবটা ছিল এই রকম—ভারী ত বিজাপুর রাজ্য, আমাদের বাদশাহ এসে কেমন সব লণ্ডভণ্ড করে দিয়ে গেছলেন! তার কথায়বার্ত্তায় এই ভাবটা কেবলই ব্যক্ত হয়ে পড়ত। তাই বিজাপুরের বাজারে নেটিব মুসলমানদের সঙ্গে বেচারাকে অনবরত ঝগড়াঝাঁটি মারামারি করতে হত। আমার কাছে এসে ক্রমাগত নালিশ করত যে এই সব বেতমিজ ছোটলোকদিকে হুজুরের এজলাসে মোকর্দ্দমা করে সে উত্তম-মধ্যম শিক্ষা দেবে। শেষ, একদিন বাজারে খুব মারধর খেয়ে লোকটা একেবারে হিন্দুস্থানমুখো হয়ে পলায়ন দিলে। আর ফিরল না। আলমগীরের বিজাপুর অভিযানের ফল কতদূর গড়াল, দেখুন।

দিল্লীর মোগলেরা কি ভাবতেন জানি না, কিন্তু এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে বিজাপুরের আদিল শাহেরা হিন্দুদের সঙ্গে মিলেমিশে কি করে রাজ্য চালাতে হয়, তা খুব ভাল করেই বুঝেছিলেন। আগেই বলেছি যে প্রথম বাদশাহের মহিষী ছিলেন হিন্দু মহারাষ্ট্রীয়া।

এ কথাও বলেছি যে আর্ক কেল্লার মাঝে একটি পুরানো হিন্দু মন্দির আজও দাঁড়িয়ে আছে। কেউ কেউ এমনও বলেন যে বাদশাহেরা সময়ে অসময়ে সেই মন্দিরে পূজা দিতেন। বিখ্যাত ইব্রাহিম আদিল শাহ জগৎগুরু এই হিন্দু-নাম নিয়েছিলেন। তাঁর আমলের অনেক কাগজ পত্রের উপর "শ্রীশ্রীসরস্বতী জয়তি" এই পাঠ দেখা যায়। এই জনপ্রিয় সুলতান ফারসী ও কানাড়ী মিলিয়ে এক নূতন ভাষা তৈরী করে তাতে স্বয়ং কবিতাদি লিখে গেছেন। কিন্তু শুধু এই সব কারণেই আমি আদিল শাহী সুলতানদিকে প্রজারঞ্জন বলছি না। বিজাপুর অঞ্চলে মুসলমানদের হাতে বিনষ্ট কোন মন্দিরেরই চিহ্ন আমি দেখি নেই। সে প্রদেশের বাসিন্দা ছোট জাতের হিন্দুরা যে কখনও অত্যাচার জুলুমের ভয়ে দলে দলে মুসলমান হয়ে গেছল, তারও কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। সেনাপতি আফজল খান শিবাজীকে সাজা দিতে বেরিয়ে যখন তুলজাপুরের ভবানী মন্দিরের অবমাননা করলেন তখনই না বিজাপুরের ব্রাহ্মণ পেশোয়া শিবাজীর কাছে দূত পাঠালেন! সে পর্য্যন্ত তিনি বা ক্ষত্রিয় সেনানীরা কোন রকম নিমক-হারামী করেন নেই। এই জেলায় দুবছর ঘুরতে ঘুরতে আদিল শাহীদের দেওয়া দেবোত্তর ব্রহ্মোত্তর ইত্যাদির কত দলিল যে দেখেছিলাম তার সংখ্যা নেই। কিন্তু এ সকলের চেয়ে এক আশ্চর্য্য জিনিস আমার নজরে পড়েছিল এক দূর পল্লীগ্রামে। গাঁয়ের বাইরে এক টিলার উপর পীরের সমাধি। আর টিলার ভিতরে ভূগর্ভে গুহার মধ্যে শিবলিঙ্গ-মূর্ত্তি। সমাধি ও লিঙ্গ দুই স্থানেই নিয়মিত পূজা চলছিল, যখন আমি সে গ্রামে গেছলাম। তার পর দেখুন, বিজাপুরের নগর প্রাচীরের উপর মলিক-ই-ময়দান বলে যে প্রকাণ্ড তোপ বসান রয়েছে, হিন্দুরা ফুল-সিন্দুর দিয়ে সেই তোপের আজও নিত্যপূজা করে থাকে। তোপটার কথা বলতে গিয়ে মনে পড়ছে যে কার্জ্জন লাটসাহেব এই তোপের উপর বসে ফটো তুলিয়েছিলেন। আলমগীরের মাথায় বিজাপুর গোলকুণ্ডা জয়ের এত জেদ চেপেছিল বোধ হয় এইজন্য যে এ রাজ্য-গুলো ছিল হিন্দুঘেঁসা।

পাঠকের হয়ত মনে আছে যে ষোড়শ শতকের মাঝামাঝি বিজাপুরাদি দক্ষিণের পাঁচ মুসলমান রাজ্য মিলে বিজয়নগরের মহা-পরাক্রান্ত হিন্দুরাজাকে তালিকোটায় যুদ্ধে হারিয়ে দেন। যুদ্ধের পব হিন্দু রাজার কাটা মুণ্ডটা দখল করলেন আহম্মদ নগরের নিজাম শাহ। তিনি সেটাকে বল্লমের মাথায় বিঁধে নিয়ে গিয়ে তাঁর রাজধানীর ফটকেব উপর লাগিয়ে দিলেন। বিজাপুরের আদিল শাহ করেন কি? তাঁরও ত একটা মুণ্ড চাই? তাই তিনি রামরাজার এক পাথরের মুণ্ড তৈবী করিয়ে সেটাকে এনে আর্ক কেল্লার ফটকের মাথায় লটকে দিলেন: একথা ইতিহাসেব পৃষ্ঠায় লেখা আছে। কিন্তু পরে সেই পাথরের মুণ্ড যে কোথায় গেল, তার কি হল, তা দেড়শো দুশো বছর অবধি কেউ কিছু জানত না। আমি বিজাপুর যাবার বছব খানেক আগে এক ব্যাপার ঘটল। তাজবাউড়ী বলে সহরের যে প্রধান ইঁদাবা আছে, সেটা অনাবৃষ্টিতে প্রায় শুকিয়ে গেছল। তার পঙ্কোদ্ধাব করতে করতে ইঞ্জিনিয়ার সাহেবেরা তলার কাদা পাঁকের মধ্যে পেলেন এক প্রকাণ্ড পাথরের মাথা। পুরানো ছবি ইত্যাদির সঙ্গে মিলিয়ে পুরাতত্ত্ববিদ পণ্ডিতেরা ঠিক করলেন যে ওইটাই সেই রামরাজার মুণ্ড যা তালি-কোটার যুদ্ধের পর আদিল শাহ তৈরী করে এনেছিলেন। স্থির হল যে সম্ভবতঃ মারাঠারা রাগের মাথায় ওটাকে তুলে জলে ফেলে দিয়ে থাকবে। এখন সে মাথা কোথায় আছে তা ঠিক জানি না। তবে তখনকার দিনে আমাদের আনন্দ মহলের নীচে এক কুটুরীতে অন্যান্য পুরানো পাথরের সঙ্গে রাখা থাকত। সাহেব সুবো অনেকে এসে দেখে যেতেন!

ইতিবৃত্ত, পুরাতত্ত্ব নিয়ে মিথ্যা অনেক জটলা করলাম। এইবার আবার নিজের কথা বলি। আহমদাবাদ ছিল বড় সহর। সেখানে থাকতাম ইংরেজ-পল্লী ও ক্লাব থেকে বহুদূরে। মনের মতন দেশী বন্ধুও সেখানে বিস্তর জুটেছিল। তাই ইংরেজী সমাজের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠ যোগ আহমদাবাদে হতে পারে নেই। কিন্তু বিজাপুর ছোট জায়গা। সাহেবী সমাজ মানে জনা ছয় সাত মাত্র কর্ম্মচারী। আনন্দ মহলেই

ক্লাব, আনন্দ মহলেই আমার বাস। কাজেই এখানে এসে রীতিমত সাহেব বনে যাওয়া অবশ্যম্ভাবী। ইংরেজী সমাজে মেলামেশার ভাল মন্দ দুই দিকই আছে। ইংরেজ বললেই ত আর জুজু বোঝায় না! হাকিমী মুখোসের আর সরকারী উর্দ্দীর পেছনে যে মানুষটা থাকে, তার দেহে দয়ামায়া যা আছে, তা আমাদের চেয়ে ত কম নয়ই, বরং এমন কতকগুলো গুণ আছে যা আমাদের মধ্যে নিতান্ত দুর্লভ। তবে সব সময়ে এ সব কথা ত মনে থাকে না! তাই মাঝে মাঝে একটু আধটু ঠোকাঠুকি লেগে যায়। এ ঠোকাঠুকির জন্য শুধু ইংরেজের দম্ভই যে দায়ী, তা নয়; আমাদের দৈন্য, আমাদের হীনতাও কম পাজী জিনিস নয়। এ সব ব্যাপারের আলোচনা অপ্রিয়, কিন্তু সত্য কথা আর সব সময় প্রিয় কি করে হবে!

বিজাপুরে এসে যাঁকে আমার বড় সাহেব বলে পেলাম, তিনি বয়সে প্রবীণ আর চরিত্রে একেবারে আসল জন্ বুল। মনে খল কপট এতটুকু ছিল না। বর্ণভেদ-জ্ঞানও অতি সামান্য। তাঁরই কথা আগে বলেছি যে কার্জ্জনলাটের শুভাগমন উপলক্ষে এক ছোটখাটো Guide Book লিখিয়ে মুখস্থ করে নিয়েছিলেন। ভদ্রলোক কিন্তু ছেলে ছোকরাকে একেবারে হেয় জ্ঞান করতেন। আমি ত তখন সবে দু বছরের সিবিলিয়ান। আমাকে পিঠ চাপড়ে বললেন, "ভাল করে কাজ কর্ম্ম শেখ, আপাততঃ তোমাকে একটা ছোট মহকুমার ভার দেব।" বলা বাহুল্য কথাটা আমার খুব মিষ্টি লাগল না। তবে বুড়ো মানুষকে বলিই বা কি? কিন্তু ঘটনাক্রমে আমার অল্পদিনের মধ্যেই কার্য্যতঃ পাল্টা জবাব দেওয়ার সুযোগ মিলল। আমি বিজাপুর আসার ঠিক আগে কালেক্টার D. ও তাঁর সিনিয়ার সহকারী দুজনে একমত হয়ে এক মামলতদারকে (Sub-Deputy) ঘুস খাওয়ার অপরাধে বরতরফ করে তাঁর বিরুদ্ধে ফৌজদারী মোকদ্দমা চালানোর অনুমতি চেয়ে পাঠিয়েছিলেন কমিশনারের কাছে। কমিশনার সাহেব আমাকে হুকুম দিলেন—তুমি নূতন লোক, তোমার কোন পক্ষপাত নেই, তুমি সব সাক্ষীসাবুত নিয়ে তোমার মতামত রিপোর্ট কর। আমি এক মাস ধরে

খুব খুঁটিনাটি রকম বিচার করে আমার রায় পেশ করলাম যে মামলতদার সাহেব কোন কোন ব্যাপারে নিজের বন্ধু-বান্ধবের অযথা সুবিধা করে দিয়েছেন বটে, তবে ঘুস খেয়েছেন এ কথা বলতে আমি প্রস্তুত নই। D. খুব চটে গেলেন। আমাকে ধমকালেন, "লোকটা ঘুস নেয় নেই, তুমি কি করে জানলে। যত সব ছেলেমানুষ—!" কমিশনার কিন্তু আমার মতই গ্রাহ্য করে ফৌজদারী মোকদ্দমা চালাতে দিলেন না। এতে আমার একটু খাতির বাড়ল বই কি!

D. র আর এক বড় দোষ ছিল। জেলা সংক্রান্ত কোন জরুরী বিষয়ে পরামর্শ করার দরকার হলে, দুজন প্রবীণ ডেপুটী কালেক্টার ছিলেন, তাঁদের ডাকতেন। আমি বা আমার সহকর্ম্মী T কে কস্মিন কালেও কিছু জিজ্ঞাসা করতেন না। প্রথমে আমার মনে হত যে আমি স্বদেশী রঙ্গীন সিবিলিয়ান বলে কর্ত্তা আমাকে এই হেনস্তা করছেন। কিন্তু পরে Tর মুখে শুনলাম যে তারও সেই দশা। সে আমার চেয়েও জুনিয়ার ছিল। কখন কখনও আবার D. করতেন কি, আমাদের অধীনস্থ মামলতদারদিকে, আমাদের কিছু না জানিয়ে, সরাসরি হুকুম পাঠাতেন। আমি Tকে বললাম, "এস, বুড়োর কাছে গিয়ে দু কথা শুনিয়ে দিয়ে আসা যাক, আমরা কি কেউ নই না কি!" সে কিছুতেই রাজী হল না। বললে, "কাজ কি গোলমালে, করুক না যা খুসী ওর!" অগত্যা আমি একলাই গিয়ে নালিশ করলাম। সাহেব কোন জবাবই দিলেন না। শুধু একটা কি রকম ঘোঁক্ গোছের আওয়াজ করে অন্য কথা পাড়লেন। Tকে জানাতে সে খুব ঠাট্টা করলে, "তোমারও যেমন কাজ নেই, ইচ্ছে করে অপমান হতে গেলে।" ভাবটা এই যে সে বীরপুরুষ, তাই দূরে দূরেই রইল।

মাস দুই পরে ব্যাপারটা আরও ঘনিয়ে এল। হল কি, মামলতদারদের কাছ থেকে কালেক্টারের নামে খানছয়েক রিপোর্ট আমার কাছে এসে জমা হল। আমি সেগুলোকে আটকে রেখে বেশ চেপে বসে রইলাম। দিন কয়েক বাদে কালেক্টারের তাকীদ এল,—তোমার আপিসে আমার নামে অনেকগুলো তালুকা রিপোর্ট আটকে

রয়েছে, অবিলম্বে সেগুলো পাঠিয়ে দিয়ো। আমি জবাব দিলাম,—জমাবন্দীর কাজে বড় ব্যস্ত আছি, একটু সময় পেলেই ওগুলো ভাল করে দেখে আমার মতামতসুদ্ধ আপনার কাছে পাঠাব। দুই দিন না যেতেই এক সওয়ার এল আমার ক্যাম্পে D.র জরুরী হুকুম নিয়ে,—এই লোক মারফৎ রিপোর্টগুলো পাঠাবে, অনর্থক আমার কাজের ক্ষতি কোরো না। আমি সওয়ারের হাতে রিপোর্টগুলো তৎক্ষণাৎ দিলাম, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একখানা formal চিঠিও লিখলাম—মহাশয়ের হুকুম মুজব রিপোর্টগুলো পাঠাচ্ছি, কিন্তু আমার একান্ত অনুরোধ যেন ভবিষ্যতে আমি আমার মহকুমা সংক্রান্ত কথায় আমার মতামত জানাতে পাই, নইলে আমার কাজেরও অনেক ক্ষতি হয়। যখন সদরে ফিরলাম কর্ত্তার কাছে মুখে খুব খানিকটা বকুনি খেলাম বটে, কিন্তু সেই দিন থেকে আমার পদোন্নতি হয়ে গেল, অর্থাৎ কর্ত্তার Inner Councilএ, পরামর্শদাতার দলে, দাখিল হলাম। ভবিষ্যতে জেলা সংক্রান্ত সকল বিষয়েই তিনি আমাব সলা পরামর্শ জিজ্ঞাসা করতে আরম্ভ করলেন। Tটা করলে না কিছুই, কিন্তু আমার সঙ্গে সঙ্গে তারও হিল্লে হয়ে গেল।

এর পরে D. যতদিন আমার জেলা হাকীম ছিলেন তাঁর সঙ্গে কাজ কর্ম্ম সম্বন্ধে আমার বা অন্য সহকারীর কোন রকম বোঝা-পড়ার অভাব হয় নেই। সামাজিক বিষয়ে ত ওরকম মাথাঠাণ্ডা মানুষের ভুলচুক হওয়ার সম্ভাবনা এক রকম ছিলই না!

কিছুদিন বাদে আমাদের জেলায় R. বলে এক জজ এলেন। বয়স অপেক্ষাকৃত কম। বেচারার স্বাস্থ্য খারাপ, আর বোধ হয় সেই কারণেই মেজাজ একটু রুক্ষ। একবার তাঁর খর্পরে পড়লে কোন আসামীর খালাস পাওয়া কঠিন ব্যাপার ছিল। আসামী তরফের উকীলদের সঙ্গে তাঁর নিয়ত খিটিরমিটির চলত, ও এই বাবতে দুই একবার হাইকোর্টে দরখাস্ত পর্য্যন্ত হয়ে গেছল। আমাদের একটু মুস্কিল হল। সাধারণতঃ খুনের ব্যাপারে মোটামুটি কিঞ্চিৎ প্রমাণ থাকলেই আমরা মোকদ্দমা দায়রা সোপর্দ্দ করতাম। করাও বোধ হয় উচিত। কিন্তু R সাহেবের গতিক দেখে আমি ত ভয় পেয়ে গেলাম। খুব ভাল করে সাক্ষীদের

নাড়াচাড়া না করে মোকদ্দমা তাঁর এজলাসে পাঠানর সাহস রইল না। শেষ কি হল, দু-দুটো খুনের মোকদ্দমা একেবারে ছেড়ে দিলাম। আমার বড়সাহেব আমাকে ডেকে খুব ধমক লাগালেন। জবাবে আমি তাঁকে স্পষ্ট বললাম, "রীতিমত প্রমাণ না পেলে R এর কাছে মোকদ্দমা পাঠাতে আমার সাহস হয় না। আপনি এ দুটো মোকদ্দমার নথীপত্র বেশ করে পড়ে দেখুন।" মজা হচ্ছে এই যে এ দুটোর একটাতে চারজন খুনের Direct (প্রত্যক্ষ) সাক্ষী ছিল, অন্যটাতে দুজন। প্রথমটা পড়ে D সাহেব আমার সঙ্গে একমত হলেন। দ্বিতীয়টা দায়রায় পাঠাতে হুকুম করলেন। আমি পাঠালাম। বিচার অন্য জেলার এক বিচক্ষণ জজের কাছে হল। তিনিও প্রত্যক্ষ সাক্ষী দুজনকে অবিশ্বাস করে আসামীকে ছেড়ে দিলেন। মোটের উপর আমারই জিত রইল!

Rএর সঙ্গে আমার বিন্দুমাত্রও বে-বনতি ছিল না, যদিচ মাঝে মাঝে দুজনে খুব তর্ক লেগে যেত। তর্ক করতে করতে যখন তিনি খুব গরম হয়ে উঠতেন, তখন সকলে হেসে ফেলত। জনা ছয় সাত মানুষ নিয়ে ছিল আমাদের সমাজ। ঝগড়া-ঝাঁটি করার উৎসাহ কারও ছিল না। একবার কিন্তু Rএর সঙ্গে ঝগড়া লেগে যেতে যেতে কোনক্রমে বেঁচে গেল। গল্পটা মন্দ নয়, অপেনাদের শোনাই। আগেই বলেছি, আমি থাকতাম আনন্দমহলের এক দিকটায়, আর আমার অপিস ছিল অপর দিকটায়। মাঝখানে নীচে তলায় ছিল ক্লাব, আর দোতলা তে-তলায় বাস করতেন জজ সাহেব। আমি কি কাজে কদিনের জন্য পুণায় গেছলাম। আমাদের খাড়া হুকুম ছিল যে রাত্রে চারিদিক বন্ধ করে সদর দরজার বাহিরে দালানে একজন চাপরাসী শোবে। দুতিন রাত বেশ কাটল। চতুর্থ রাত্রে ভোরের দিকে একটা চীৎকার শুনে আমার চাপ-রাসীর ঘুম ভেঙ্গে গেল। বেচারা ছিল বুড়ো মানুষ, ভয়ে হুড়মুড়িয়ে উঠে দাঁড়াল। দেখে যে জজ সাহেব দাঁড়িয়ে গর্জ্জন করছেন, "যাও, নিকল যাও, একদম নিকল যাও, ইধার ক্যা করতে হো!" সে থতমত খেয়ে জবাব দিলে, "সাহেব, আমি আমার মনিবের হুকুমে এখানে রোজ রাত্রে শুয়ে থাকি।" জজ সাহেব তার ছাতির উপর একটা ধাক্কা মেরে

বললেন, "আব্ ভি নিকল যাও ইধারসে, বাঙ্গলেকে অন্দর যাকে শোও।" লোকটা বৃদ্ধ চাপরাসী হলেও জাতে মারাঠা। উত্তর দিলে, "আমি অন্য সাহেবের নোকর,—তুমি আমার গায়ে হাত দাও কিসের জন্য সাহেব? মনিবের হুকুম এইখানে দালানে শোবার, আমাকে এখানে শুতেই হবে। আনন্দ মহলের দালানটা প্রকাণ্ড, মাপে অন্ততঃ সাত আট কাঠা হবে।" সেটা আমার একলাকার এলাকা না হলেও R সাহেবের তার উপর কোন বিশেষ হক্ ছিল না। সাহেব আর ধাক্কাধাক্কি করলেন না। একটু গালাগালি দিয়ে শাসিয়ে গেলেন,—"কাল সকাল বেলায় তোমাকে দেখে নেব।" পরদিন সকালে আমার চাপরাসীরা দল বেঁধে গিয়ে কালেক্টার সাহেবকে সব ঘটনা জানিয়ে বললে, "আমাদের সাহেব পুণা গেছেন, এখন হুজুরের যে রকম হুকুম হবে, সেই রকম আমরা করব।" D তাদিকে আমার আদেশ-মত দালানে শুতে বললেন। জজ সাহেবকে তিনি কিছু বলে থাকবেন, কেন না আমি ফিরে আসা পর্য্যন্ত তিনি আর কোন গোলযোগ করেন নেই। আমি ফিরে এসে সব শুনলাম। বুড়ো চাপরাসী নামদেও কাঁদতে কাঁদতে বললে, "এ বিষয়ের বিচার হুজুরকে করতেই হবে।" সন্ধ্যা বেলায় ক্লাবের সবাই চলে গেলে আমি আস্তে আস্তে R-এর কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "আমার চাপরাসীর সঙ্গে তোমার কি হয়েছিল, জজ সাহেব?" দেখি, D. তখনও চলে যান নেই, ঘরের কোণে কি একটা অছিলা করে দাড়িয়ে রয়েছেন। R. চটে গেল। মুখ বাঁকিয়ে উত্তর দিলে, "তোমার চাপরাসী আমার সঙ্গে বেয়াদবী করেছিল, তাকে সাজা দিয়েছি। আবার কি হবে?" আমি বললাম, "কিন্তু সে ত কবুল করছে না যে সে কিছু বেয়াদবী করেছিল। তা যাই হোক, আমার চাকরকে মারবার অধিকার তোমার আছে কি? এটা ত তোমার ভাবা উচিত ছিল! আমি লোকটাকে ডাকি, তাকে তুমি বল দেখিনি সে তোমার সঙ্গে কি রকমে বেয়াদবী করেছিল।" D একটু কাছে ঘেঁসে এসে বললেন, "দেখ, আমার সঙ্গে R-এর এ বিষয়ে কথা-বার্ত্তা হয়ে গেছে। ওর সেদিন শরীর খারাপ ছিল, ঘুম হয় নেই, তাই মেজাজটা ভাল ছিল না।" R ঘাড় নেড়ে সায় দিলে, "হ্যাঁ, সত্যিই

সেদিন আমার শরীরটা বড় বিশ্রী ছিল। সারারাত ঘুম হয় নেই, তার উপর তোমার ওই চাকরটার সেই ভীষণ নাসিকা-গর্জ্জন!" আমি দেখলাম R-এর রাগ পড়ে গেছে। তাই একটু হেসে D-এর দিকে তাকিয়ে বললাম, "আমি চাপরাসীকে ডাকি। জজ সাহেব তাকে দুটো মিষ্টি কথা বললেই সে খুশী হয়ে যাবে।" নামদেও আসতে R তাকে বললে, "দেখো নামদেও, হাম তুমকো ধাক্কা মারা, এ কাম আচ্ছা নেই কিয়া।" বুড়ো একগাল হেসে সেলাম করে উত্তর দিলে, "হুজুর মালিক হুজুর মা-বাপ।" গোলমালটা এত সহজে মিটে যাওয়াতে আমাদের তিন জনেরই খুব আহ্লাদ হল। বিজাপুর ছাড়ার পর R-এর সঙ্গে আর আমার দেখা হয় নেই। তবে অন্য ইংরেজ বন্ধুদের কাছে পরে শুনেছিলাম যে বিয়ে-থা করে তার মেজাজ বেশ শুধরে গেছল। যাওয়াই সম্ভব!

১৯০৩ সালে কার্জ্জন বাহাদুর দিল্লীতে যে ব্যাপার করেছিলেন, আমরাও তার একটা ছোটখাটো রকম অভিনয় করলাম বিজাপুরে। D, আমি ও T মর্নিং-কোট ইত্যাদি পরে বড়লাটের ছোটলাটের ভূমিকা নিলাম। পুলিস সাহেব সমব সাজে তলোয়ার ঝুলিয়ে D এর সঙ্গে সঙ্গে বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। আমাদের দরবার বসল চীনী মহলের সেকালের বাদশাহী দরবার হল্-এ। সুতরাং নট-মণ্ডলী সব চুনোপুঁটি জাতীয় হলেও আমাদের রঙ্গমঞ্চকে ত কেউ ফেলনা জিনিস বলতে পারবে না! D যখন গম্ভীর স্বরে সম্রাটের ঘোষণা পাঠ করলেন তখন তাঁর মুখখানা লাল হয়ে উঠেছিল। পরে আমাকে চুপি চুপি বললেন, "আমার কি এসব পোষায়, নাটুকে ঢঙ্গ ত কখন শিখি নেই!" তাঁর মহিষী কিন্তু তাঁর মতন ছিলেন না। তিনি বেদীর উপর চন্দ্রাতপের নীচে যে রকম জাঁকিয়ে বসেছিলেন, তাতে প্রাচীন চীনী মহলের অবমাননা হয় নেই। সন্ধ্যাবেলায় D. এক মস্ত পার্টি দিলেন আনন্দ মহলের দালানে। সারা জেলার গণ্যমান্য সবাই এসেছিলেন। আসর সাজানোর ভার ছিল আমার গৃহিণীর উপর। আনন্দ মহলের দালানের বহর ত আপনাদিকে আগেই জানিয়েছি। সে

দালান সাজান কি সহজ কথা! তায় আবার বিজাপুরে ফুল জিনিসটা দুর্লভ। কিন্তু অঘটন-ঘটন-পটীয়সী বুদ্ধি কি হার মানে কখন! খেজুরপাতা, কাগজের ফুল, রঙীন কাপড়ের থান, জাপানী ফানুস দিয়ে ভদ্রমহিলা যেন ভেল্কী লাগিয়ে দিলেন। কলেক্টার বক্তৃতার সময় গদগদ কণ্ঠে তাঁকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলেন।

এর দুচারদিন পরে D. ছুটীতে বিলেত চলে গেলেন। তাঁর জায়গায় এলেন B বলে একজন স্বদেশী কলেক্টার। এতে আমার খুব আনন্দ হওয়ারই কথা। কিন্তু ষ্টেশনে ভদ্রলোককে দেখেই হরিষে বিষাদ উপস্থিত হল। একে ভয়ানক সাহেব, তায় আবার পদগৌরবে আত্মহারা! আমার ইংরেজ সহযোগী T. ত নূতন কর্ত্তাকে দেখেই কেমন মুষড়ে গেল। আমাকে কানে কানে বললে, "By Jove, এ যে ভীষণ কলেক্টার!" সাহেব গাড়ীতে উঠেই আমাকে খুব মুরুব্বীয়ানা চালে জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমাদের বিজাপুর কি রকম জায়গা হে, দত্ত? আমি আসছি রত্নাগিরি থেকে, জান ত? সে এক অতি হতভাগা জায়গা। Fancy! আমার ছেলের জন্য একটা ফরাসী মাষ্টার পেলাম না সেখানে।" তিনি যে রত্নাগিরিতে ছিলেন সেটা আমাদের সকলেরই জানা ছিল, কেন না সেখানে তিনি এক ভয়ানক কেলেঙ্কারী করে এসেছিলেন। শহরের কাছে দালদী (মুসলমান জেলে) পাড়ায় কি মারপিট হয়, সেথায় গোলমাল থামাতে গিয়ে জনা দুই মারাঠা কনেষ্টবল দালদীদের হাতে মার খায়, তাতে সারা পুলিশ লাইন ভয়ানক খাপ্পা হয়ে ওঠে। এই ব্যাপার নিয়ে আরও একটু আধটু গণ্ডগোল হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না, তা নয়। তবে রত্নাগিরির লোক স্বভাবতঃ শান্তশিষ্ট। সেখানে এমন কি গণ্ডগোল হবে, যা জনাদশেক বন্দুকওয়ালা কনেষ্টবল আধ ঘণ্টায় ঠাণ্ডা করতে পারবে না? অথচ এই কলেক্টার সাহেব ঘেবড়ে গিয়ে বোম্বাই সরকারকে তার করে জঙ্গী ফৌজ চেয়ে পাঠিয়ে বসলেন। ফৌজ ত এলই না। উপরন্তু সাহেবকে বেশ একটু রগড়ানি খেতে হল। এ ব্যাপার খবরের কাগজেও জাহির হয়ে গেছল। সুতরাং কর্ত্তার রত্নাগিরির উপর আক্রোশ দেখে বেশ একটু হাসলাম মনে মনে।

সে কথা যাক। বিজাপুরে আমাদের ক্লাবটী ছিল মোটামুটি গেরস্থ ঘরের ব্যাপার। কলেকটার D সেটা বুঝেই চলতেন, যদিও তাঁর গৃহিণী মাঝে মাঝে একটু আধটু ভুলচুক করতেন। কিন্তু আমাদের নূতন হাকীম প্রথম থেকেই এমন বেজায় চাল দিতে আরম্ভ করলেন যে আমরা অস্থির হয়ে উঠলাম। T.কে ও আমাকে দিবারাত্র "my assistant, my assistant" করে লোকের কান ঝালাপালা করে তুললেন। আমার ত ছুঁচো গেলা গোছ হয়েছিল। স্বদেশী Boss (কর্ত্তা), ঝগড়া করতেও পারি না। দেখতাম ইংরেজেরা কানাকানি করছে, অথচ মুখটী বুজে থাকতে হত। কিছুদিনের মধ্যে, বোধ হয়, সাহেব আমাদের ভাবগতিক দেখে বুঝলেন যে আমরা তাঁকে নিয়ে একটু ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছি, একটা কিছু খোলাখুলি গোলমাল হওয়াও অসম্ভব নয়। তিনি চট করে মফস্বলে বেরিয়ে পড়লেন। পালালেনও বলা যায়। কেন না, তখনও সফরের মৌসুম আরম্ভ হয় নেই। কয়েকদিন বাদে যথাসময়ে আমরা সকলেও চারিদিকে ক্যাম্পে রওয়ানা হলাম। বাহিরে ঘুরতে আরম্ভ করে দেখি যে চাষা-ভুষোরা আদপে বুঝতে পারে নেই B. সাহেব নূতন জেলার হাকীম। তারা ধরে নিয়েছে যে আমিই কর্ত্তা, কেন না তাঁর বিরুদ্ধে নানা রকম নালিশ আমার কাছে করতে লাগল। তার মধ্যে একটা ছিল বেশ মজার। সেইটের কথা আপনাদিগকে বলি। দরখাস্তটা করেছে অমুকগ্রাম-বাসীরা মেহেরবান দত্ত সাহেব জেলা হাকীমের হুজুরে। আর্জীর মজকুর এই যে গত মাসে আপনার সহকারী B. সাহেব এই গ্রামে দশ দিন ডেরা করেছিলেন, তিনি নানা রকমে গ্রামের লোককে উত্যক্ত করে গেছেন, নিজের খাবার জন্য গ্রাম থেকে রোজ একটা ভেড়া আনিয়ে তার একটা leg (পা) রেখে বাকীটা মালিককে ফেরত দিতেন, আর legটার জন্য চার আনা দাম দিতেন। পাঠকের মনে আছে ত যে তখনকার দিনে একটা ছোট ভেড়ার কি পাঁঠার জন্য মোট এক টাকা দাম দেওয়াই হাকীমদের দস্তুর ছিল। আমার বড়সাহেব আবার এর উপরও কারদানি করলেন না কি! কিন্তু আমি কি করি? অনেক

ভেবে চিন্তে আর্জীখানা কর্ত্তাকেই পাঠালাম। সঙ্গে একখানা চিঠিও লিখলাম যে এ দরখাস্ত কলেকটর সাহেবকেই করা হয়েছে যদিচ ভুলক্রমে এতে আমার নামটা জুড়ে দিয়েছে,—আপনার কাছে পাঠাচ্ছি for favour of disposal। আমি দরখাস্তখানা সব পড়েছি কি না, তার কিছুই উল্লেখ করলাম না। কর্ত্তা পড়ে কি ভাবলেন বা কি করলেন, তা আমি আজও জানি না। কেন না ছ চার মাস বাদে আমি ছুটী নিলাম আর ছুটীর পরে অন্যত্র বদলী হয়ে গেলাম।

বিজাপুরে আমি থাকতে থাকতে সেখানে Irrigation Commissionএর পদার্পণ ঘটল। এই কমিশনের অধ্যক্ষ ছিলেন Scott Moncrief সাহেব। সভ্যমণ্ডলী সবই ইংরেজ, কেবল একটী ভারতীয়। আরম্ভে জয়পুরের মন্ত্রীপ্রবর কান্তিবাবু মেম্বর ছিলেন। তিনি মারা যাওয়ার পর তাঁর জায়গায় বাহাল হলেন মাদ্রাজের এক প্রবীণ সরকারী কর্ম্মচারী, রাও বাহাদুর রাজরত্নম্ মুদেলিয়ার। কলেকটর Dর মুখে শুনলাম যে সাহেব মেম্বর কজন তাঁর আতিথ্য স্বীকার করেছেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "তাহলে আমি মুদেলিয়ার মহাশয়কে নিমন্ত্রণ করি?" D. উত্তর দিলেন, "তুমি ছেলেমানুষ, তুমি আবার মিছেমিছি এত খরচ পত্র কেন করবে? আর কি জান, তোমার সঙ্গে কি একজন সেকেলে গোঁড়া মাদ্রাজীর বনবে?" কথাটা বললেন একটু বিদ্রূপের ছলে। আমার জাতীয় ভাব জেগে উঠল। একটু ঝাঁঝাল স্বরে জবাব দিলাম, "আমার স্বদেশী একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার বনবে না, তুমি বল কি!" D. হেসে উঠলেন, "বেশ ত! তুমি ওঁকে বাড়ীতে রাখতে চাও, ত রাখ না!"

আমি রাও বাহাদুরকে আগ্রহ করে নিমন্ত্রণ করলাম। তাঁর কমিশন তখন পুণায়। ফেরত ডাকে উত্তর পেলাম,—আমাকে নিয়ে তুমি বিব্রত হয়ে পড়বে। মাদ্রাজীরা কি রকম গোঁড়া হিন্দু, তা কি তুমি জান না! আমার সঙ্গে লোকজন আছে, আমি সেলুন-এই থাকব। আমি নাছোড়বান্দা,আবার লিখলাম—আপনার জন্য আলাদা ঘরদোরের ব্যবস্থা করে দেব। আপনার লোকই না হয় রান্না-বাড়া করবে।

যথাসময়ে আমার অতিথি এসে পৌঁছলেন। আমি তাঁকে আদর করে বাড়ী নিয়ে গেলাম। তাঁর বসবাসের জন্য একটা তলা ছেড়ে দিলাম। বাদশাহী আনন্দ মহলে ত আর চাকরদের ঘরের অভাব নেই। তিন চারটে কুঠরী ঠিক করে দেওয়া গেল তাঁর লোকজনের জন্য। কিন্তু সুরুতেই এক মুস্কিল হল। আমার চাকরেরা পেছনের যে সিঁড়ী দিয়ে যাতায়াত করত, সেটাতে ত ছোট জাতের ছোঁয়াচ লেগে গেছে! রাও বাহাদুরের সাত্বিক পাচক জানালে যে সে পথ দিয়ে তার মনিবের খাবার আনা চলবে না। মনিবকে কিছু বলতে আমার সাহস হল না। তবে তাঁর বছর কুড়ি বাইশের একটি ছেলে সঙ্গে এসেছিল, তার শরণাপন্ন হলাম। মনে করলাম সে ইংরেজী জানা একেলে তরুণ, আমার দুঃখ বুঝে একটা ব্যবস্থা করে দেবে। কিন্তু ব্যবস্থা যা করলে সে অতি অপরূপ। সে বললে যে আনন্দ মহলের সদর Staircase দিয়ে তাদের খাবার নিয়ে আসতে বলে দিয়েছে। আমার ত চক্ষু স্থির! অনেক করে বোঝাতে চেষ্টা করলাম যে ও সিঁড়ী দিয়ে নানা রকমের অহিন্দু যাতায়াত করে ওখান দিয়ে হিন্দুর খাবার আনা চলতে পারে না! ছোকরা খুব বিজ্ঞের মত বার দুই তিন মাথা নেড়ে বললে যে আজকালকার দিনে কতকটা progressive (উদার) না হলে চলে কি? আসতে লাগল রাও বাহাদুরের খানা সদর পথে। পাঠকের মনে আছে ত, যে ওইটেই আমাদের ক্লাব? প্রথম দিন সন্ধ্যাবেলায় জনাদশেক আমরা দালানে বসে জটলা করছি এমন সময়ে ধীরে ধীরে এক মিছিল সিঁড়ী বেয়ে এল। আগে আগে আমার চাপরাসী লণ্ঠন হাতে আলো দেখাতে দেখাতে আসছে। তার পর আসছে একজন চাকর ঘটী হাতে জল তড়তড়া দিতে দিতে। তার পেছনে আর একজন ভৃত্য সেই জলের উপর ঝাঁটা বুলোতে বুলোতে আসছে। আর সব পেছনে পাচক ঠাকুর দুই থালে মনিব ও মনিব পুত্রের অন্নব্যঞ্জন নিয়ে গুরুগম্ভীর চালে আসছেন। দৃশ্য দেখে সমবেত সাহেবরা মুখ চাওয়া চাওয়ি করতে লাগলেন। আমার কেমন লজ্জা বোধ হল। Slave Mentality কি না! "আমাকে মাপ করবেন

আমার অতিথিরা এইবার খাবেন” বলে তাড়াতাড়ি আমি পলায়ন দিলাম। অতিথিদের বসে খাওয়ালাম। অবশ্য পাশের ঘরে দোর গোড়ায় বসে। রাওবাহাদুরের ছেলে আমাকে আগেই সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে তাঁদের খাবার সময় আমরা কেউ যেন ঘরের ভিতর না ঢুকি। কিন্তু পরের দিন বিষম বিভ্রাট ঘটল। ওঁরা খাচ্ছেন, আমি চৌকাঠের বাইরে বসে গল্প করছি, আমার পাশে দাঁড়িয়ে আমার ছোট্ট দেড়বছরের মেয়ে। হঠাৎ এক সেকেণ্ড আমি যেই আনমনা হয়েছি কি আমার বেবী চট করে চৌকাঠ ডিঙ্গিয়ে খাবার ঘরে ঢুকে পড়েছে। অজাতের মেয়ে ঘরে ঢোকবামাত্র বৃদ্ধ ও তরুণ মুদেলিয়ার দাঁড়িয়ে উঠলেন, আর কিছুতেই খেতে বসলেন না। আমি ভয়ানক অপ্রস্তুত হলাম, কিন্তু রাগও হল বই কি। এ কি রকম বিকট শুদ্ধাচার! তবু যদি না শূদ্র মুদেলিয়ার হত! আমাদের বুড়ী ঝি ত চটেই অস্থির, চীৎকার করতে লাগল, ‘মুয়ে আগুন অমন হিঁদুয়ানির। দু বেলা কাঁড়ি কাঁড়ি মুরগী মটন পেঁয়াজ রসুন খাচ্ছে, ওরা তো মোছলমান!” আমার স্ত্রী মুখে কিছু না বললেও ভীষণ চটেছিলেন। পরদিন মুদেলিয়ার আমাকে বললেন “মিসেস দত্তের সঙ্গে আলাপের সৌভাগ্য আমার আজও হল না। আমাদের অধ্যক্ষ সাহেব তাঁর কত সুখ্যাতি করলেন। আমি লজ্জায় বলতে পারলাম না যে আমার সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয় নেই।” আমার স্ত্রীকে জানালাম। তিনি কিন্তু বলে পাঠালেন, “আমাদের বাঙ্গালীর ঘরের মেয়েদের বাহিরের লোকের কাছে বেরোতে নেই। রাও বাহাদুরের মতন একজন মাননীয় হিন্দু অতিথির সামনে আমি কেমন করে এত বড় অনাচার করব!” রাও বাহাদুর সত্যি কি ভাবলেন জানি না, তিনি যেন একটু অপ্রস্তুত ভাবে উত্তর দিলেন, “নিশ্চয়, নিশ্চয়, আমার এ রকম অন্যায় অনুরোধ করাই ভুল হয়েছে। আমি জানতাম না যে আপনাদের সমাজে পর্দ্দা প্রথা আছে।”

চতুর্থ দিনে আমার অতিথি বিদায় নিলেন। ভদ্রলোক বিদ্বান বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ মানুষ। বিদ্যাবুদ্ধির সঙ্গে এ রকম বিকট Dont-touchism কি করে খাপ খায়, কে জানে? পরে গল্পটা আমার

কলেক্টার D. কে বললুম। তিনি উত্তর দিলেন "তোমাকে ত বাপু আগেই সাবধান করে দিয়েছিলাম, তুমি শুনলে কই!"

শ্রীচারুচন্দ্র দত্ত

প্রাচীন ভারতবর্ষীয় মুদ্রায় শিব-মূর্ত্তি

যে সমস্ত উপকরণ দ্বারা প্রাচীন ভারতবর্ষীয় ইতিহাস গঠিত হইয়াছে এবং হইতেছে, তন্মধ্যে মুদ্রা অন্যতম। ঐতিহাসিকগণের মতানুসারে প্রাচীন ভারতবর্ষীয় ইতিহাস গঠনের উপকরণ চারি প্রকার, যথা প্রাগৈতিহাসিক প্রত্নতত্ত্ব, প্রাচীন ভারতবর্ষীয় সাহিত্য, প্রাচীন বৈদেশিক সাহিত্য, অনুশাসন ও মুদ্রা। প্রাচীন ভারতবর্ষীয় ইতিহাস-গঠনে মুদ্রা কতদূর সাহায্য করিয়াছে ও করিতে পারে তাহা মুদ্রাতত্ত্ববিদ্‌গণ দেখাইয়াছেন। একটী বক্তৃতাতে মুদ্রা প্রাচীন ভারতবর্ষীয় ইতিহাস গঠনে কি প্রকার সাহায্য করিয়াছে তাহা অধ্যাপক ডাক্তার কর অতি সুন্দরভাবে দেখাইয়াছেন। প্রাচীন মুদ্রা সম্বন্ধে একজন প্রসিদ্ধ মুদ্রা-তত্ত্ববিদ্ যাহা বলিয়াছেন তাহা বিশেষভাবে প্রণিধান যোগ্য। তিনি বলিয়াছেন, 'As datable objects they are above all valuable as the grammar of art. Not only do they throw light on local forgotten schools and preserve representations of long lost master-pieces, but it is from them that the chronology of ancient art has been fixed. A long series of coins of a Greek town, ranging from the archaic period to the decline of art, sets a standard of comparison which enables sculptures and other objects to be dated'। যিনি এই কথা বলিয়াছেন তিনি প্রাচীন গ্রীষীয় ও রোমক মুদ্রা উল্লেখ করিয়াই বলিয়াছেন কিন্তু তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহা ভারতবর্ষীয় মুদ্রা সম্বন্ধেও প্রয়োগ করা যাইতে পারে। ভারতবর্ষীয় ভাস্কর্য্য, স্থাপত্য, ও মূর্ত্তিতত্ত্বের ইতিহাস গঠন-কার্য্যে মুদ্রাতত্ত্বের সাহায্য গ্রহণ করা বিশেষ প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছে। এই প্রবন্ধে আমরা প্রাচীন ভারতবর্ষীয় মুদ্রায় কত প্রকার শিব-মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে এবং তাহারা কোন যুগের তাহা আলোচনা করিব। মূর্ত্তিতত্ত্ববিশারদ ৺গোপীনাথ রাও মহাশয় শিবমূর্ত্তি সম্বন্ধে

বিশদ্‌ভাবে আলোচনা করিয়াছেন কিন্তু প্রাচীন ভারতবর্ষীয় কোন কোন মুদ্রাতে শিবমূর্ত্তি পাওয়া যায় এবং তাহারা কোন যুগের সে সম্বন্ধে তিনি কোন প্রকার আলোচনা করেন নাই।

উজ্জায়িনীতে প্রাপ্ত একপ্রকার মুদ্রার সম্মুখে একটী মূর্ত্তি আছে। ইহা একটী দণ্ডায়মান ত্রিমুখ মূর্ত্তি। ইহার গলদেশ হইতে কটী পর্য্যন্ত নগ্ন, কটী হইতে জানু পর্য্যন্ত আচ্ছাদিত ও জানু হইতে পদযুগল পর্য্যন্ত নগ্ন। ইনি দক্ষিণ হস্তের দ্বারা একটী যষ্টি ধারণ করিয়া রহিয়াছেন ও বামহস্তে জলপাত্র রহিয়াছে। কানিংহাম ইহা শিবমূর্ত্তি বলিয়া ধরিয়াছেন ; এ সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন—'The figure on the coins seem to carry a club in one hand, and a water vessel in the other, both of which symbols are characteristic of Siva. This coin may, therefore, be accepted as a single evidence of Brahmanism at Ujain !' চক্রবর্ত্তীও কানিংহামকে অনুসরণ করিয়া ইহাকে শিব-মূর্ত্তি বলিয়াছেন। এই মুদ্রাতে কোন লিপি লিখিত নাই ; সুতরাং ইহা কোন যুগের মুদ্রা সে সম্বন্ধে নিশ্চয়রূপে কিছু বলা অসম্ভব। সেইজন্য ইহার যুগ সম্বন্ধে কানিংহাম, র‍্যাপ্‌সন্‌ ও চক্রবর্ত্তী কোন প্রকার নিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই। কিন্তু মুদ্রাটী দেখিলে ইহা যে অতি প্রাচীন যুগের মুদ্রা সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ থাকে না।

ইহার পর যাঁহার মুদ্রাতে আমরা শিব মূর্ত্তি দেখিতে পাই তিনি হইতেছেন মহারাজ গুহ্‌ফর। তাঁহার নিম্নলিখিত মুদ্রাগুলিতে শিবমূর্ত্তি অঙ্কিত আছে যথা :—

(১ বিপরীত দণ্ডায়মান শিবমূর্ত্তি ; কটীদেশ হইতে পদতল পর্য্যন্ত আচ্ছাদিত কিন্তু দেহের অন্য অংশ নগ্ন বলিয়া প্রতীয়মান হয়। মস্তকে জটামুকুট বর্ত্তমান ; তিনি দক্ষিণ হস্তের দ্বারা ত্রিশূল ধরিয়া রহিয়াছেন ও কট্যবলম্বিত বামহস্তের দ্বারা খর্জ্জুর পত্র ধারণ করিয়া রহিয়াছেন।

(২) বিপরীত সম্মুখ দিকে নিবদ্ধ-দৃষ্টি শিবমূর্ত্তি। পূর্ব্বোক্ত

শিবমূর্ত্তির ন্যায় ইঁহারও কটী-দেশ হইতে পদতল পর্য্যন্ত আচ্ছাদিত ও দেহের অন্য অংশ নগ্ন বলিয়া প্রতীয়মান হয় ও মস্তকে জটামুকুট বর্ত্তমান। কিন্তু ইঁহার হস্তদ্বয়ের সহিত পূর্ব্বোক্ত মূর্ত্তির হস্তদ্বয় তুলনা করিলে ইহা যে বিভিন্ন প্রকারের শিবমূর্ত্তি সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ থাকে না। ইঁনি বামহস্তে ত্রিশূল ধরিয়াছেন ও দক্ষিণহস্ত প্রসারিত করিয়া দিয়াছেন।

এই দুই প্রকার মুদ্রাতে অঙ্কিত দুই প্রকার বিভিন্ন শিবমূর্ত্তি ব্যতীত এই রাজার অন্য কোনও মুদ্রাতে শিবমূর্ত্তি পাওয়া যায় নাই। এই দুই প্রকার শিবমূর্ত্তি আলোচনা করিবার পূর্ব্বে, ইহাদের যুগ জানা প্রয়োজনীয় এবং ইহাদের যুগ জানিতে হইলে, রাজা গুদুফরের যুগ জানিতে হইবে। নিম্নলিখিত শিলালিপি, মুদ্রা ও ঐতিহাসিক বিবরণ হইতে মহারাজ গুদুফরের যুগ জানা যায় যথা (ক) তাখ্‌তিবাহী শিলালিপিতে প্রাপ্ত গুদুফরের নাম—'মহরয়স গুদুহ্বরস বষ [এ] ২০৪১১ স [ং] ব [ৎসরএ তি] শতিমএ ১ ১০০ ১১১ বেনখস মসস দিবসে [প্র] ঠম্ [এ] [দি ১]; (খ) মহারাজ গুদুফরের একপ্রকার মুদ্রা যাহার বিপরীতে খরোষ্ঠী অক্ষরে 'জয়তস এতরস ইন্দ্রবর্ম্মপুত্রস স্ত্রতেগস অশ্‌পবর্ম্মস' লিখিত আছে। এই মুদ্রার সহিত মহারাজ অয়ের যে মুদ্রার বিপরীতে খরোষ্ঠী অক্ষরে 'ইন্দ্রবর্ম্মপুত্রস' অশ্‌পবর্ম্মস স্ত্রতেগস জয়তস' লিখিত আছে তাহার সহিত তুলনামূলক আলোচনা করিতে হইবে কারণ অশ্‌পবর্ম্ম মহারাজ গুদুফর ও মহারাজ অয়—দুই জনেরই স্ত্রতেগ ছিলেন। (গ) প্রাচীন খৃষ্টধর্ম্মমতানুসারে সেণ্ট টমাস রাজা গুদুফরের সভাতে আসিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে খৃষ্টধর্ম্মগ্রন্থে যাহা লিখিত আছে তাহার সংক্ষিপ্তসার নিম্নে প্রদত্ত হইল। যখন পৃথিবীর সমস্ত সভ্যদেশে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্য দ্বাদশজন ধর্ম্মযাজক নিযুক্ত হইল, তখন সেণ্ট টমাসের ভাগ্যে ভারতবর্ষ ন্যস্ত হইল। কিন্তু তিনি ভারতবর্ষে যাইতে সম্মত হইলেন না; সেই সময়ে গুদুফর নামে এক-জন ভারতীয় রাজার নিকট হইতে, রাজপ্রাসাদ নির্ম্মাণ করিবার জন্য একজন দক্ষ কারিগর আনিবার জন্য, হাব্‌বান নামক একজন দূত উক্ত

দেশে প্রেরিত হইয়াছিল। যীশুখৃষ্ট হাব্বানের নিকট আবির্ভূত হইয়া কুড়িটী রৌপ্যমুদ্রাতে সেণ্ট টমাসকে তাহার নিকট বিক্রয় করিলেন এবং গুন্ডুফরের প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিবার জন্য আদেশ করিলেন। সেণ্ট টমাস হাব্বানের সহিত ভারতবর্ষে আসিলেন। তিনি রাজা গুন্ডুফরকে বলিলেন যে ছয় মাসের মধ্যে তিনি প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইয়া দিবেন কিন্তু ছয় মাস ধরিয়া রাজার নিকট হইতে প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিবার জন্য যত অর্থ লইয়াছিলেন, তাহা সমস্ত দান করিয়া ব্যয় করিয়া ফেলিলেন। যখন রাজা তাঁহার নিকট প্রাসাদ চাহিলেন, তখন তিনি বলিলেন যে তিনি রাজার জন্য প্রাসাদ পৃথিবীতে করেন নাই, স্বর্গে করিয়াছেন। এই কথাতে রাজা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন এবং তিনি, তাঁহার ভ্রাতা গ্যাড্ ও তাঁহার অনেক প্রজা খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হন। পরে সেণ্ট টমাসকে ভারতবর্ষের অন্য একজন নৃপতি মারিয়া ফেলেন। খৃষ্টধর্ম্মপুস্তকে উল্লেখিত রাজা গুন্ডুফর ও মুদ্রাতে প্রাপ্ত মহারাজ গুন্ডুফর যে অভিন্নব্যক্তি তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। সেণ্ট টমাস যে যীশুখৃষ্টের সমসাময়িক ছিলেন ও যীশুখৃষ্টের মৃত্যুর পর যে তাঁহার মৃত্যু হয়, তাহাও এই বিবরণ হইতে জানিতে পারা যায়। সুতরাং মহারাজ গুন্ডুফর যে যীশুখৃষ্টের মৃত্যুর কিছু পরেও জীবিত ছিলেন সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। সেইজন্য সেণ্ট টমাসের কাহিনীটি মহারাজ গুন্ডুফরের যুগ বাহির করিবার পক্ষে প্রয়োজনীয়। এই তিনটী তথ্যের উপর মহারাজ গুন্ডুফরের কালনির্ণয় নির্ভর করিতেছে। তাখ্‌তিবাহী শিলালিপিতে আমরা দুইটী তারিখ পাই—একটী হইতেছে মহারাজ গুন্ডুফরের ২৬ রাজ্যাঙ্ক (regnal year ও অন্যটী হইতেছে সম্বৎসর ১০৩। এই দুইটী তারিখ লইয়া অনেক বাদ বিসংবাদ হইয়া গিয়াছে ও দুইটী মতবাদ হইয়াছে। প্রথমটী হইতেছে যে ১০৩ সম্বৎসরকে বিক্রমাব্দ বলিয়া ধরিতে হইবে; বিক্রমাব্দ ৫৭ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দ হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। সুতরাং এই সম্বৎসর ও ৪৬ খৃষ্টাব্দ এক বলিয়া ধরিতে হইবে (১০৩-৪৬=৫৭) এবং যে-হেতু ৪৬ খৃষ্টাব্দ ও মহারাজ গুন্ডুফরের ২৬ রাজ্যাঙ্ক এক, সে হেতু মহারাজ গুন্ডুফর যে

২০ খৃষ্টাব্দে (৪৬-২৬=২০) সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে নাই। শিলালিপিতে প্রাপ্ত যুগের সহিত টমাস্-বিবরণের যুগের বেশ একটী সামঞ্জস্য পাওয়া যায়। দ্বিতীয়টী হইতেছে যে সম্বৎসর ১০৩কে ৮৪ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে প্রচলিত পুরাতন শকাব্দ বলিয়া ধরিতে হইবে ও বর্ষ ২৬কে অয় প্রচলিত একটী অব্দের বৎসর বলিয়া ধরিতে হইবে। সুতরাং ১০৩ সম্বৎসর হইতেছে ১৯ খৃষ্টাব্দ (১০৩-৮৪=১৯ খৃষ্টাব্দ)। এই মত হইতে মহারাজ গুতুফর কবে সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন তাহা জানা যায় না। এই মতটীর প্রচারক হইতেছেন অধ্যাপক ষ্টেন্‌কোনো। এই দুইটী মত আলোচনা করিলে প্রথমটী অধিকতর যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হয়। সুতরাং সমস্ত দিক আলোচনা করিয়া আমরা মহারাজ গুতুফরের প্রথম রাজ্যাঙ্ক ২০ খৃষ্টাব্দ বলিয়া ধরিতে পারি। সুতরাং এই যুগে ভারতবর্ষে যে পূর্ব্বে উল্লেখিত দুই প্রকার শিবমূর্ত্তি প্রচলিত ছিল তাহা নিঃসন্দেহ। এই দুইটী মূর্ত্তি যে শিবের তাহা আমরা মস্তকে জটা-মুকুট ও হস্তে ত্রিশূল হইতেই বুঝিতে পারি কিন্তু খর্জ্জুরপত্রের সহিত শিবমূর্ত্তির সম্বন্ধ কি প্রকারে হইল তাহা বলা দুষ্কর।

মহারাজ গুতুফরের পরে আমরা যে রাজার মুদ্রাতে শিবমূর্ত্তি পাই তিনি হইতেছেন বিম কঠ্‌ফিশ। ইনি কুষাণবংশীয় রাজা। ইঁহার তিন প্রকার শিবমূর্ত্তি পাওয়া যায়—(১) শিব মুদ্রার মধ্যস্থলে দক্ষিণদিকে নিবদ্ধ-দৃষ্টি বৃষের পৃষ্ঠে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। শিব দক্ষিণ হস্তের দ্বারা ত্রিশূল ধরিয়াছেন ও কট্যবলম্বিত বাম হস্তের দ্বারা ব্যাঘ্র চর্ম্ম ধরিয়া রহিয়াছেন। এই শিবমূর্ত্তি যে পূর্ব্বে বর্ণিত উজ্জয়িনীতে প্রাপ্ত মুদ্রাতে শিবমূর্ত্তি ও মহারাজ গুতুফরের দুই বিভিন্ন প্রকারের মুদ্রায় অঙ্কিত শিবমূর্ত্তি হইতে অন্যরূপ তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কারণ ইহাতে আমরা বৃষমূর্ত্তি দেখিতে পাই ও ব্যাঘ্র চর্ম্ম বামহস্তে দেখিতে পাই—এই দুইটী বিশেষত্ব পূর্ব্ববর্ত্তী তিন প্রকার মূর্ত্তিতে পাওয়া যায় না।

(২) মুদ্রার বিপরীত দিকে শিবমূর্ত্তি অঙ্কিত রহিয়াছে। এই মূর্ত্তির

সহিত মহারাজ গুডুফরের পূর্ব্বে আলোচ্য প্রথম প্রকার শিবমূর্ত্তির এত সাদৃশ্য রহিয়াছে যে বিম কঠ্‌ফিশ যে এই প্রকার শিবমূর্ত্তি-পরিকল্পনাতে মহারাজ গুডুফরের মুদ্রায় অঙ্কিত সেই মূর্ত্তির নিকট ঋণী তাহা বলা খুব সম্ভব অযৌক্তিক হইবে না। কেবলমাত্র মহারাজ গুডুফরের মুদ্রাতে অঙ্কিত শিবমূর্ত্তির বামহস্তে খর্জ্জুরপত্রের পরিবর্ত্তে আমরা মহারাজ বিম কঠ্‌ফিশের মুদ্রাতে অঙ্কিত শিবমূর্ত্তির বামহস্তে ব্যাঘ্র চর্ম্ম ও অলাবু দেখিতে পাই—এই প্রভেদ ব্যতীত আর কোনও বিভিন্নতা এই মুদ্রা দুইটীতে অঙ্কিত শিবমূর্ত্তিতে পাওয়া যায় না। এই দিকে খরোষ্ঠী অক্ষরে প্রাকৃত ভাষাতে যে লিপি রহিয়াছে তাহাতেও বিম কঠ্‌ফিশের বিশেষণরূপে মহিশ্বরস বলিয়া একটী শব্দ রহিয়াছে। মহেশ্বর অর্থাৎ শিব, তাঁহার পূজক অর্থাৎ মহিশ্বর। সুতরাং এই উপাধি হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে অ-ভারতীয় রাজা বিম কঠ্‌ফিশ নিজের মুদ্রাতে শিবমূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, নিজে মহিশ্বর-উপাধি গ্রহণ করিয়া গৌরবান্বিত মনে করিয়াছিলেন।

(৩) আরএক প্রকার মুদ্রার বিপরীত দিকে আমরা বিভিন্ন প্রকারের শিবমূর্ত্তি দেখিতে পাই। ইহার সহিত বিম কঠ্‌ফিশের মুদ্রাতে অঙ্কিত প্রথম প্রকার শিবমূর্ত্তির যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। প্রথম প্রকার মূর্ত্তিতে আমরা মস্তকে কোনও পরিবর্ত্তন দেখিতে পাই না কিন্তু ইহার মস্তকে মুকুট রহিয়াছে—ইহা ব্যতীত আর সর্ব্বপ্রকারে এই শিবমূর্ত্তি ও প্রথম প্রকারের শিবমূর্ত্তি দেখিতে একরূপ। কোন সময় ভারতবর্ষে এই প্রকার শিবমূর্ত্তিগুলির প্রচলন ছিল, তাহা জানিতে হইলে বিম কঠ্‌ফিশের যুগ লইয়া আলোচনা করিতে হইবে। প্রথমতঃ, কুজুল কঠ্‌ফিশ ও বিম কঠ্‌ফিশ যে একই বংশের রাজা, কুজুল কঠ্‌ফিশ যে বিম কঠ্‌ফিশের পূর্ব্বে সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন ও এই দুইজন রাজা যে কণিষ্ক ও তাঁহার পরবর্ত্তী কুষণবংশীয় রাজাদের পূর্ব্ববর্ত্তী তাহা প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে। সুতরাং বিম কঠ্‌ফিশ কুজুল কঠ্‌ফিশের পরে ও কণিষ্কের পূর্ব্বে রাজত্ব আরম্ভ করিয়াছিলেন। মহারাজ গুডুফর আনুমানিক ২০ খৃষ্টাব্দ হইতে ৪৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন।

সুতরাং বিম কঠ্ফিশ বোধ হয় ৪৬ খৃষ্টাব্দের পর রাজা হন। তাঁহার রাজত্ব কবে শেষ হইয়াছিল তাহা জানিতে হইলে কণিষ্কের যুগ নির্ণয় করিতে হইবে। অধিকাংশ পণ্ডিতগণের মতানুসারে কণিষ্ক শকাব্দের প্রচলিতা এবং সেই হইতে কণিষ্কের রাজত্ব ৭৮ খৃষ্টাব্দ হইতে আরম্ভ হইয়াছিল বলিয়া ধরা যাইতে পারে। সুতরাং বিম কঠ্ফিশ যে আনুমানিক ৪৬ খৃষ্টাব্দ ও ৭৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কোন সময়ে সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন তাহা অসম্ভব নয়। সুতরাং এই যুগে ভারতবর্ষে কিপ্রকার শিবমূর্ত্তি প্রচলিত হইয়াছিল তাহা আমরা জানিতে পারি।

বিম কঠ্ফিশের পর যে রাজার মুদ্রাতে আমরা শিবমূর্ত্তি দেখিতে পাই তিনি হইতেছেন কণিষ্ক। ইঁহার তিন প্রকার মুদ্রাতে আমরা শিবমূর্ত্তি দেখিতে পাই যথা—

(১) বিপরীতে দিকে গ্রীক্‌ভাষাতে ওম্‌শো আর্থাৎ উমেশ (শিব) লিখিত আছে ও শিবের মূর্ত্তিও আছে। মহারাজ গুডুফর ও মহারাজ বিম কঠ্ফিশের মুদ্রাতে আমরা যথাক্রমে দুই প্রকার ও তিন প্রকার শিবমূর্ত্তি দেখিতে পাই। এই পাঁচ প্রকার শিবমূর্ত্তি হইতে এই শিবমূর্ত্তি সম্পূর্ণ বিভিন্ন। পূর্ব্বোক্ত পাঁচ প্রকার শিবমূর্ত্তির আমরা দুই হাত দেখিতে পাই কিন্তু এই শিবমূর্ত্তির চারি হাত। এই বিশেষত্বই এই মূর্ত্তিকে অন্যান্য মূর্ত্তি হইতে বিভিন্ন করিয়াছে। এই মূর্ত্তির উপরের দক্ষিণ হস্তে ত্রিশূল, নিম্নের দক্ষিণহস্তে ডমরু, উপরের বামহস্তে ছাগশিশু ও নিম্নের বামহস্তে ব্যাঘ্রচর্ম্মও রহিয়াছে। ইহার মাথায় জ্যোতি রহিয়াছে ও গলদেশে হার আছে।

(২) অন্য একপ্রকার মুদ্রার বিপরীতে চতুর্ভুজ শিবমূর্ত্তি রহিয়াছে ও গ্রীক্‌ভাষাতে ওম্‌শো অর্থাৎ উমেশ (শিব) লিখিত আছে, কিন্তু হস্তে বিভিন্ন প্রকারের প্রহরণ থাকার দরুণ আমরা ইহাকে আরএক প্রকার শিবমূর্ত্তি বলিয়া ধরিতে পারি। এই মূর্ত্তির উপরের দক্ষিণ হস্তে ডমরু, নিম্নের দক্ষিণহস্তে পাশ, উপরের বামহস্তে ত্রিশূল, নিম্নের বামহস্তে অলাবু রহিয়াছে।

(৩) বিপরীত, প্রথম ও দ্বিতীয় শিবমূর্ত্তির ন্যায় চতুর্ভুজ শিবমূর্ত্তি রহিয়াছে ; কিন্তু হস্তে ত্রিশূল না থাকার দরুণ ইহাকে বিভিন্ন প্রকারের মুদ্রা বলিয়া ধরা যাইতে পারে।

(৪) বিপরীতে, শিবমূর্ত্তি আছে কিন্তু ইহা দ্বিভুজ। আমরা এই মুদ্রাতেই সর্ব্বপ্রথম কণিষ্কের মুদ্রাতে অঙ্কিত দ্বিভুজ শিবমূর্ত্তি পাই। এই শিবমূর্ত্তির সহিত বিম কঠ্ফিশের মুদ্রায় অঙ্কিত একপ্রকার শিবমূর্ত্তির বিশেষ সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।

কণিষ্কের পর আমরা হুবিষ্কের মুদ্রাতে শিবমূর্ত্তি অঙ্কিত দেখিতে পাই। কণিষ্কের মৃত্যুর পর যে হুবিষ্ক কুষণ-সিংহসনে আরোহণ করিয়াছিলেন তাহা তাঁহাদের শিলালিপির কাল আলোচনা করিলেই বুঝিতে পারা যায়। হুবিষ্কের মুদ্রাতে নিম্নলিখিত শিবমূর্ত্তি পাওয়া যায় যথা।—

(১) বিপরীত, গ্রীকভাষাতে নানা ও উম্শো লিখিত আছে ; নানা ও শিব পরস্পরের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া রহিয়াছেন। এই মুদ্রাটী খুব ছোট এবং দেবতাদ্বয়ের অবয়ব খুব পরিষ্কারভাবে অঙ্কিত না করায় ইহার সম্বন্ধে স্পষ্টভাবে কিছু বলা যায় না।

(২) বিপরীত, গ্রীক্ অক্ষরে উম্শো লিখিত আছে ; দ্বিভুজ শিব বামদিকে তাকাইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন ; দক্ষিণ হস্তে ত্রিশূল ও বাম হস্তে অলাবু রহিয়াছে। দুই হস্ত এই একই প্রকার জিনিষ ধরিয়া রহিয়াছে। এরূপ শিবমূর্ত্তি আমরা কণিষ্কের মুদ্রাতে দেখিতে পাই ও এই জন্য কণিষ্কের মুদ্রার নিকট ইহা যে ঋণী সে বিষয়ে সন্দেহ নাই ; কিন্তু ইহার বিশেষত্ব হইতেছে এই যে কণিষ্কের মুদ্রায় সৌন্দর্য্য ইহাতে দেখিতে পাওয়া যায় না, ইহাতে বর্ব্বরতার প্রকাশ পাইয়াছে। এই জন্য ইহাকে এক নূতন প্রকারের শিবমূর্ত্তি বলিয়া ধরা যাইতে পারে।

(৩) বিপরীত, গ্রীক্ অক্ষরে উমশো লিখিত আছে ও শিবমূর্ত্তি রহিয়াছে। এই মূর্ত্তির সহিত কণিষ্কর একপ্রকার চতুর্ভুজ শিবমূর্ত্তির আকারগত সাদৃশ্য রহিয়াছে। এই মূর্ত্তি অঙ্কনেও হুবিষ্ক কণিষ্কের অনুসরণ

করিয়াছেন। সুতরাং ইহাকে বিভিন্ন প্রকারের মুদ্রা বলা চলিবে না। এই তিন প্রকার শিবমূর্ত্তি ব্যতীত আর কোনও বিভিন্ন প্রকারের শিবমূর্ত্তি হুবিষ্কের মুদ্রাতে দেখিতে পাওয়া যায় না। হুবিষ্কের যুগ আলোচনা করিতে হইলে তাঁহার অনুশাসনগুলির তারিখ দেখিতে হইবে। এ পর্য্যন্ত হুবিষ্কের যে সকল শিলালিপি রহিয়াছে তাহাতে ৩১ হইতে ৬০ পর্য্যন্ত সম্বৎসর রহিয়াছে। কণিষ্কের অনুশাসনের সহিত হুবিষ্কের অনুশাসন তুলনা করিলে ৩১ সম্বৎসর যে কণিষ্ক প্রচলিত অব্দ হইতে গণনা করা হইয়াছে তাহা বুঝা যায়। সুতরাং হুবিষ্ক যে অন্ততঃ পক্ষে ১০৯ খৃষ্টাব্দ (৩১ + ৭৮)—১৩৮ খৃষ্টাব্দ (৬০ + ৭৮) পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

হুবিষ্কের পর যে রাজার মুদ্রাতে আমরা শিবমূর্ত্তি দেখিতে পাই তিনি হইতেছেন বাসুদেব। কণিষ্ক, হুবিষ্ক ও বাসুদেব এক বংশোদ্ভূত কিন্তু বাসুদেব এতদূর ভারতবর্ষীয় ভাব ও চিন্তার দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন যে তিনি নিজে ভারতবর্ষীয় নাম পর্য্যন্ত গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইঁহার মুদ্রাতে নিম্নলিখিত শিবমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায় যথা—

(১) বিপরীত, গ্রীক্‌ভাষাতে উম্‌শো লিখিত আছে। এই শিবমূর্ত্তি দ্বিভুজ ; দক্ষিণ হস্তে পাশ ও বাম হস্তে ত্রিশূল রহিয়াছে ; মস্তকে জটা বিদ্যমান ; শিব সম্মুখদিকে তাকাইয়া বৃষের পিঠে হেলান দিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। যদিও আমরা পূর্ব্ববর্ত্তী রাজা বিম কঠফিশের মুদ্রাতে বৃষের পৃষ্ঠে হেলাইয়া দাঁড়ান দ্বিভুজ শিবমূর্ত্তি দেখিয়াছি, তথাপি নিম্নলিখিত কারণবশতঃ ইহাকে নূতন প্রকারের শিবমূর্ত্তি বলা যাইতে পারে।

প্রথমতঃ, আমরা ইহার পূর্ব্বে দক্ষিণ হস্তে পাশ ও বাম হস্তে ত্রিশূল রহিয়াছে এইরূপ শিবমূর্ত্তি দেখিতে পাই না ; দ্বিতীয়তঃ, এই শিবের মস্তকে যে জটা দেখা যায়, তাহা পূর্ব্ববর্ত্তী শিবমূর্ত্তিতে পরিলক্ষিত হয় নাই। এই একপ্রকার শিবমূর্ত্তি ব্যতীত বাসুদেবের মুদ্রাতে ভিন্ন রকমের শিবমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায় না।

বাসুদেবের অনেক শিলালিপি ভারতবর্ষে পাওয়া গিয়াছে। এই সকল অনুশাসনে যে তারিখ পাওয়া গিয়াছে তাহা ৭৪ সম্বৎসর হইতে ৯৮ সম্বৎসর ; সুতরাং বাসুদেব যে অন্ততঃপক্ষে ১৫২ খৃষ্টাব্দে (৭৪+৭৮) হইতে ১৭৬ খৃষ্টাব্দ (৯৮+৭৮) পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

বাসুদেব কণিষ্ক-স্থাপিত কুষণবংশের শেষ বড় রাজা। বাসুদেবের মৃত্যুর পর তাঁহার বংশধরগণ রাজত্ব করেন—ইঁহাদের মুদ্রাতেও আমরা শিবমূর্ত্তি দেখিতে পাই। বাসুদেবের পরবর্ত্তী তাঁহার বংশজাত কণিষ্ক বলিয়া এক রাজার মুদ্রাতে আমরা শিবমূর্ত্তি দেখিতে পাই। এই কণিষ্ক পূর্ব্বোক্ত কণিষ্ক হইতে বিভিন্ন লোক। ইহার মুদ্রাতেও একপ্রকার শিবমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। এই শিবমূর্ত্তির সহিত বাসুদেবের মুদ্রাতে অঙ্কিত শিবমূর্ত্তির বিশেষ সাদৃশ্য আছে ; কেবলমাত্র বাসুদেবের মুদ্রাতে অঙ্কিত শিবমূর্ত্তিতে আমরা যে জটা দেখিতে পাই, তাহা এই মুদ্রাতে পাই না।

কুষণবংশের পতনের পর কুষণ-সাসানীয় বংশ উত্তর পশ্চিম ভারতের কিয়দংশ অধিকার করিয়াছিল। এই বংশীয় রাজগণের মধ্যে বাসুদেবের নাম উল্লেখ যোগ্য। ইঁহার একপ্রকার মুদ্রাতে আমরা শিবমূর্ত্তি দেখিতে পাই। এই শিবমূর্ত্তির সহিত কণিষ্কের বংশধর বাসুদেবের মুদ্রায় অঙ্কিত শিবমূর্ত্তির যথেষ্ট সাদৃশ্য রহিয়াছে। কিন্তু পূর্ব্ববর্ত্তী মুদ্রাতে অঙ্কিত শিবমূর্ত্তিতে কোন বর্ব্বরতার ছাপ নাই কিন্তু ইহাতে রহিয়াছে। এই বংশজাত দ্বিতীয় হোর্মজাদ ও প্রথম বারাহানের মুদ্রাতেও এই প্রকার শিবমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু ইহাতেও বর্ব্বরতার চিহ্ন রহিয়াছে।

কুনিন্দ জাতির একপ্রকার মুদ্রার উপর শিবমূর্ত্তি অঙ্কিত রহিয়াছে। ইহাতে দেখিতে পাওয়া যায় যে শিব দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন, দক্ষিণ হস্তের দ্বারা কুঠার সংযুক্ত ত্রিশূল ও বামহস্তের দ্বারা হরিণ চর্ম্ম ধরিয়াছেন। এই মুদ্রা সম্বন্ধে র‍্যাপ্‌সন্ বলিয়াছেন, 'The latter which seems to show the influence of the large copper

money of the Kushanas, and which bear inscription in a later form of Brahmi characters, may, perhaps, belong to the 3rd or 4th centuries, A. D.। কুষণ তাম্র মুদ্রার সহিত ইহার যে সাদৃশ্য আছে তাহা যে সত্য তাহা কুষণ তাম্র মুদ্রার সহিত ইহা মিলাইয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যাইবে।

ইহার পর গৌড়েশ্বর শশাঙ্কের সুবর্ণ মুদ্রাতে একপ্রকার শিবমূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। এই শিবমূর্ত্তি পূর্ব্ব বর্ণিত শিবমূর্ত্তি হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। দ্বিভুজ শিব দক্ষিণ দিকে তাকাইয়া বৃষের উপর দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। মাথায় জটা রহিয়াছে; শিব বাম হস্তের দ্বারা একটী জিনিষ ধরিয়াছেন, দক্ষিণ হস্তে কিছু আছে কিনা তাহা বুঝাইতেছে না। কেবলমাত্র গাঞ্জাম তাম্রলিপিতে শশাঙ্কের একটি তারিখ পাওয়া যায়, সেটি হইতেছে ৩০০ গৌপ্তাব্দ। তাহা হইলে শশাঙ্ক যে অন্ততঃপক্ষে (৩০০+৩১৯) ৬১৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। সুতরাং এই সময়ে ভারতবর্ষে যে কি প্রকার শিবমূর্ত্তি প্রচলিত ছিল তাহা এই মুদ্রাতে জানা যায়। এই যুগের পর হইতে ভারতের নানাস্থানে প্রস্তরে শিবমূর্ত্তি উন্নততর ভাবে গঠিত হইতে থাকে ও সেসম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ ৺গোপীনাথ রাও মহাশয়ের পুস্তকে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। সুতরাং সে বিষয়ে এস্থলে আলোচনা করিবার প্রয়োজন নাই। মুদ্রায় অঙ্কিত শিবমূর্ত্তির সহিত প্রস্তরে নির্ম্মিত শিবমূর্ত্তির যে একটি সংযোগ আছে তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন।

শ্রীচারুচন্দ্র দাসগুপ্ত

ডিক্‌টেটরশিপ

১

ডিক্‌টেটরশিপ সম্বন্ধে প্রথম কথা এই যে তা ব্যক্তি বিশেষের সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্ব নয়। ডিক্‌টেটর নন সীজর। মুসোলিনীকে নেপোলিয়ন বর্গীয় বলে মনে করলে ভুল করব। ডেমক্রেসীর সঙ্গে ডিক্‌টেটরশিপের পার্থক্য হচ্ছে দ্বৈতের সঙ্গে অদ্বৈতের। ডেমক্রেসীর দুই পক্ষ। এক পক্ষের নাম পার্টি ইন পাওয়ার। অপর পক্ষের নাম পার্টি ইন অপোজিশন। ডিক্‌টেটরশিপ অপোজিশন সইতে পারে না, তাই অপর পক্ষচ্ছেদ করে নিরঙ্কুশ হয়। ডিক্‌টেটরশিপ হচ্ছে ডানা-কাটা ডেমক্রেসী। তার যিনি কর্ণধার তিনি পার্টির তেজে তেজীয়ান, পার্টির থেকে বিচ্ছিন্ন নয় তাঁর সত্তা। তিনি রাষ্ট্রের ডিক্‌টেটর হলেও পার্টির ডিক্‌টেটর নন। ব্যক্তিত্ব যদি তাঁর থাকে তবে তা নিতান্ত আকস্মিক, না থাকলেও অচল হত না। যেমন কনষ্টিটিউশনাল রাজার।

আদত কথা দুই হাতে যে তালি বাজে তার নাম ডেমক্রেসী। আর এক হাতে যে কাঁসি বাজে তার নাম ডিক্‌টেটরশিপ। হাত এ স্থলে পার্টি। উভয়েরই প্রাণ পার্টিগত। পার্টিকে নির্ম্মূল করে দাও, দেখবে ডেমক্রেসীও নেই, ডিক্‌টেটরশিপও নেই। পক্ষান্তরে পার্টিকে ডালপালা মেলতে দাও, একদিন পাবে হয় ডেমক্রেসী নয় ডিক্‌-টেটরশিপ। একই বীজ থেকে কি করে দুই জাতের চারা হতে পারে তা আমাদের সকলের জেনে রাখা ভাল। নইলে বুনব ডেমক্রেসী আর ফলবে ডিক্‌টেটরশিপ্।

২

ইংলণ্ডে যখন রাজার হাত থেকে প্রজার হাতে ক্ষমতা আসে তখন প্রজাদের দুই দল দাঁড়িয়ে যায়। তাদের এক পক্ষ নেয় রাজার

অংশ, করে শাসন। অপর পক্ষ নেয় প্রজার অংশ, করে সমালোচনা। চক্রের আবর্ত্তনে সমালোচকরাও শাসক হয়, শাসকরাও হয় সমালোচক। তারা পালা করে ক্রিকেট খেলে, কখনো এর হাতে ব্যাট ওর হাতে বল, কখনো ওর হাতে ব্যাট এর হাতে বল। হুইগ ও টোরি এই দুই দল ওস্তাদ খেলোয়াড় ইংলণ্ড সরগরম করে তুল্লে, অন্যান্য দেশেও সাড়া পড়ে গেল। সবাই বল্ল, আমাদেরও অমন দুটি টিম চাই। উঠল ডেমক্রেসীর জয়ধ্বনি।

ইংরাজের মত সবাই ত ক্রিকেট বোঝে না। অন্যান্য দেশে টিম তৈরি হল বটে, কিন্তু দুটি নয়, তার বেশী। জোড়াতালি দেওয়া দলের খেলা ঠিক ইংরাজী খেলা নয়। তা হলেও তা খেলা। তা পার্লামেণ্টারী গবর্ণমেণ্ট।

গত শতাব্দীর মধ্যভাগে সমস্ত জগৎ যখন ডেমক্রেসীর নাম জপছে তখন এক বেসুরা গলায় উচ্চারিত হল, ডিক্‌টেটরশিপ। রসভঙ্গকারীর নাম কার্ল মার্ক্‌স্‌। কার ডিক্‌টেটরশিপ? কোনো ব্যক্তি বিশেষের? না। প্রোলিটারিয়াটের। শ্রমিকগোষ্ঠীর।

মার্ক্‌সের মতে রাজার ক্ষমতা প্রজার হাতে এসেছে বটে, কিন্তু প্রজা এ ক্ষেত্রে কেবল মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়। পার্লামেণ্ট হয়েছে তাদের পাঠা। সেটাকে তারা যেমন ইচ্ছা কাটছে। তাতে শ্রমিক শ্রেণীর প্রবেশ নেই, প্রবেশ থাকলেও স্বার্থসিদ্ধির ভরসা নেই। শ্রমিক কি চায়? কোন পক্ষ কত দৌড় করল? কয়টা ছোট ছোট উপকার করল? না। শ্রমিক চায় সে তার সম্পূর্ণ মূল্য পাক। যারা তাকে তার ষোলো আনা পাওনার জায়গায় পাঁচ আনা দিয়ে বলে, খুব পেয়েছে, যারা তার বকেয়া এগারো আনা পকেটে পুরে বড় লোক, তাদের সঙ্গে পার্লামেণ্টে দাঁড়িয়ে তর্ক করা বৃথা। তাদের সঙ্গে বাদানুবাদ না করে তাদের সোজা বিদায় কর। কেড়ে নাও তাদের হাত থেকে ক্ষমতা। নির্ব্বাচনে জয়লাভ করে নয়। সরাসরি গায়ের জোরে। রাষ্ট্র পরিচালনা ছেলেখেলা নয়, ক্রিকেট নয়। যারা শ্রম করবে না তারা বাঁচবে না। তাদের বাঁচা বারণ। আর যারা শ্রম করবে তাদের কি

নিয়ে দলাদলি হতে পারে ? তাদের নিয়ে যে সমাজ তাতে একাধিক দলের স্থান নেই।

মার্ক্সের সময় থেকে ডিক্টেটরশিপের আইডিয়া ডেমক্রেসীর আইডিয়ার সপত্নী হল। কিন্তু তার প্রতি বিশেষ কেউ ভ্রূপেক্ষ করেন নি। ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশের শ্রমিকরা পার্লামেণ্টে প্রবেশ করতে টোরি হুইগের মত পার্টি খাড়া করল, নির্ব্বাচনের আসরে নামল। ধীরে ধীরে তারা দলে ভারি হয়ে একদিন অপোজিশনের আসন নিল। তারপরে ব্যাট ধরল। হুইগ বনাম টোরির খেলায় হুইগ দলে ফাটল দেখা দেয়, য়াস্কুইথ ও লয়েড জর্জ পৃথক হয়ে যান। ফলে উভয় উপদল নগণ্য হন। লেবার লিবারলের বদলে খেলার আসর জমায়।

ইংলণ্ডের লেবার পার্টির অনুরূপ জার্ম্মানীর সোশ্যাল ডেমক্রাট পার্টি। অন্যান্য দেশে বিশুদ্ধ সোশ্যালিষ্ট পার্টি। এদের সকলেরই পলিসি পার্লামেণ্টে সংখ্যাভূয়িষ্ঠ হয়ে টোরি বা হুইগের মত রাষ্ট্র শাসন করা। অর্থাৎ বিপক্ষকে খেলায় আউট করে তার ব্যাট ধরা। এরা বিপক্ষকে খেলার মাঠ থেকে খেদিয়ে দিতে চায় না, এরা চায় ওরা বল ছুঁড়ুক। সমালোচনায় এদের আপত্তি নেই, এরা অপোজিশনের রসগ্রাহী।

মাঝখানে একটা মহাযুদ্ধ না ঘটে গেলে ডেমক্রেসীর উপর জনগণের আস্থা অচলা হয়ে রইত। কোনো দেশেই ডিক্টেটরশিপের প্রশ্ন কাফিখানা বা লেখকের দপ্তর ছাপিয়ে উঠত না। কিন্তু মহাযুদ্ধের দিন ইংলণ্ডের মত খেলোয়াড়ধর্ম্মী দেশেও ডেমক্রেসীর খেলার ভোল বদলায়। য়াস্কুইথকে গুরু-দক্ষিণা দিয়ে লয়েড জর্জ কোয়ালিশন গবর্ণমেণ্ট গড়লেন। সমালোচনা করবার জন্য কেউ রইল না। সকলের এক তনু এক মন এক ধ্যান। অপোজিশনের অভাব যদি হয় ডিক্টেটরশিপের সংজ্ঞা তবে ইংলণ্ডে এই সময় ডিক্টেটরশিপই স্থাপিত হয়েছিল। ডিক্টেটরশিপের লক্ষণ এই যে তার অধীনে ব্যক্তির অধিকার সঙ্কুচিত হয়, ব্যক্তিকে স্বাধীন বলে গ্রাহ্য করা হয় না। মহাযুদ্ধের আমলে ইংলণ্ডের মানুষ যা খুসী করতে পারত না, যা খুসী বলতে পারত না। খবরের উপর সেন্সরশিপ, খাবারের উপর

ভাগবাঁটোয়ারা, আলোর উপর নির্ব্বাণের আদেশ, সব জিনিষের উপর খাজনা। গবর্ণমেণ্ট নিজেই গোলাবারুদের কারখানা চালান, অন্য অনেক ব্যবসার উপর গবর্ণমেণ্টের হস্তক্ষেপ চলে। যার ইচ্ছা নেই তাকেও পাকড়িয়ে সেপাই করে যুদ্ধে পাঠানো হয়, তার বিবেকের বাধা থাকলে কয়েদ করা হয়।

ইংলণ্ডের মত বনেদী ডেমক্রেসীও যুদ্ধের দিনে ফেল মারল। শুধু যুদ্ধের দিনে নয়। ডিপ্রেশন যখন ঘনিয়ে এল তখন ম্যাকডোনাল্ডের নেতৃত্বে সমস্ত কনসারবেটিব, সমস্ত লিবারল ও বহু সংখ্যক সোশ্যালিষ্ট মিলে ন্যাশনাল গবর্ণমেণ্ট পত্তন করলেন। নামমাত্র একটি বিপক্ষ দল রইল, তাদের মৃদু স্বরের সমালোচনা দুর্ব্বলের প্রতি অনুগ্রহ করে শুনলেন কর্ত্তারা, কিন্তু কর্ম্মের ইতরবিশেষ লক্ষিত হল না। সুখের বিষয় ইংলণ্ডকে এই ডিপ্রেশন জখম করতে পারেনি, যেমন করেছে আমেরিকাকে। যদি করত তবে ব্যবসার উপর দস্তুরমত হস্তক্ষেপ করা আবশ্যক হত।

৩

মহাযুদ্ধে যখন ক্রিকেটের জন্মভূমির এই দশা তখন অন্যে পরে কা-কথা। মার্কসের মানসকন্যা রুষকে মাল্যদান করলেন। নির্জ্জলা ডিক্‌টেটরশিপ বৎসারের মসনদ দখল করল।

বোলশেবিক রুষ পৃথিবীর প্রথম নিরাবরণ ডিক্‌টেটরশিপ। ইংলণ্ডে যা অন্নের উপর দিয়ে গেল, রুষে তা ষোলো কলায় পূর্ণ হল। অন্নের ভাণ্ড রাষ্ট্রের হাতে। বস্ত্রের ভাণ্ডার রাষ্ট্রের জিম্মায়। গহনার বাক্‌স রাষ্ট্রের সিন্দুকে। একটি পয়সাও কারুর পকেটে নেই। বাঁচান বাঁচি মারেন মরি, বল ভাই ধন্য রাষ্ট্র। নিজেকে ব্যক্তি বলে ভাবাটাও রাষ্ট্রদ্রোহ, সমষ্টির অকল্যাণ।

সবচেয়ে বড় কথা, কোনো সমালোচক রইল না। দেশে কেবল একটি বাণী, একটি সুর, একটি সত্য। তার প্রতিবাদ নেই। তার সংশোধন নেই। বিপক্ষের সংবাদ পত্র বাহির হয় না, বই ছাপা হয় না, বক্তৃতা উচ্চারিত হয় না। বিপক্ষীয়রা হল নির্ব্বাসিত, কারারুদ্ধ,

নিহত। সব জমিই খাসমহল, সব ব্যবসাই খাস ব্যবসা, সব কারখানা খাস কারখানা। এর সামান্য ব্যতিক্রম স্থলে স্থলে অনুমোদিত হলেও আইনে স্বীকৃত হল না। ভোগোপকরণের উৎপাদনে ও বিতরণে রাষ্ট্রের কেউ প্রতিযোগী নয়, কোনো প্রতিযোগী নেই। ঘরেবাইরে নিরঙ্কুশ হয়ে রাষ্ট্র স্থির করিল প্ল্যান করে সেই বিরাট একান্নবর্ত্তী পরিবারের অশনবসনের অভাব পূরণ করবে। সমস্ত ব্যক্তির সংহত প্রচেষ্টা রাষ্ট্রের নির্দ্দেশে ধন সৃষ্টি করবে, রাষ্ট্র জোগাবে মূলধন, ব্যক্তি জোগাবে শ্রম, রাষ্ট্র জোগাবে দিশা, ব্যক্তি জোগাবে মনীষা। ব্যক্তির পারিশ্রমিক বিভিন্ন হবে, কিন্তু সেই পারিশ্রমিককে মূলধনে পরিণত করা নিষিদ্ধ। এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে খাটাতে পারবে না। অপরের জন্য খাটতে পারবে না। পক্ষান্তরে রাষ্ট্র প্রত্যেককে কাজ দেবে, খোরাক দেবে।

এখন এই ব্যবস্থা একদা ডেমক্রেসীর সাহায্যেও সাধিত হতে পারত। সেই সুদিনের অপেক্ষায় বসে থাকতে মার্কসপন্থীরা রাজি নয়, তাই তারা দিনটাকে সরাসরি উপায়ে এগিয়ে নিল। তাদের কৈফিয়ৎ এই যে মধ্যবিত্তরা ভোটে হেরে রাষ্ট্রের পায়ে সম্পত্তি সমর্পণ করবার পাত্রই নয়, ভোটে হারজিৎ তাদের ঘরোয়া তামাসা, তার সুযোগ নিয়ে অন্য শ্রেণীর লোক যে তাদের ঘর সংসার বেদখল করবে এর সম্ভাবনা দেখলে তারা তামাসার টিকিট বেচবে না, জুয়াখেলায় বাজি রাখতে দেবে না। তার মানে ডেমক্রেসীর আটঘাট বেঁধে তাকে নিজেদের পক্ষে নিরাপদ করে তুলবে। আধুনিক পরিভাষায় তাদের ডেমক্রেসী সেফগার্ডে সমাচ্ছন্ন পর্দ্দানশীন সাজবে।

৪

মার্ক্‌স্‌পন্থীদের আশঙ্কা অমূলক নয়। তার প্রমাণ ধীরে ধীরে পাওয়া যাচ্ছে। অথচ তাদের আশঙ্কার প্রতিষেধকরূপে তারা যে ঔষধ উদ্‌ভাবন করেছে তা এমন সদ্য ফলপ্রদ যে দেশে দেশে তার জাল হতে লেগেছে। রুষবিপ্লবের অনতিকাল পরে ইটালীতে ফাসিষ্ট ডিকটেটরশিপ প্রতিষ্ঠিত হয়। ফাসিষ্টরা পার্লমেণ্ট উঠিয়ে দেবার

দরকার দেখল না, রাজারাও মাথা কাটল না। চার্চের সঙ্গে তাদের একটু ঝগড়া বাধল বটে, কিন্তু চার্চ তাদের স্বার্থে বাদ সাধল না, সুতরাং চার্চের স্বার্থকেও তারা মেনে নিল।

ফাসিষ্ট পার্টির উদ্দেশ্য কি? উদ্দেশ্য ইটালীকে প্রথম শ্রেণীর শক্তির পর্য্যায়ে উন্নীত করা। ইংলণ্ড ফ্রান্স ও রাশিয়া যখন পৃথিবী ভাগ করে নিচ্ছে ইটালী ও জার্ম্মানী তখন বহুধা-বিভক্ত। উপরন্তু ইটালী তখন পরাধীন। অন্যেরা অনেক দূর যাবার পর এই দুই জাতি জাগে। জেগে দেখে তাদের ভাগে বেশী কিছু অবশিষ্ট নেই, আফ্রিকার মাংস নিঃশেষ, খানকয়েক হাড় পড়ে রয়েছে। এশিয়াও পরের গ্রাসে। অবশ্য ঘরের যা আছে তাই নিয়ে সন্তুষ্ট হলে খুব চলত। কিন্তু তা হলে প্রথম শ্রেণীতে নাম ওঠে না। প্রথম শ্রেণীই স্বর্গ, প্রথম শ্রেণীই ধর্ম্ম, প্রথম শ্রেণীই পরম তপ। নবজাগ্রত ইটালীর নবপ্রতিষ্ঠিত ডেমক্রেসী আফ্রিকার দিকে হাঁ করল। কিন্তু হাঁ ভরল না। আদোয়াতে আবিসিনিয়ার দ্বারা লাঞ্ছিত হয়ে ইটালী আর ও মুখো হল না। বলকান যুদ্ধের মরসুমে তুর্কীর কাছ থেকে ত্রিপোলী কেড়ে নিয়ে সে কোনোমতে দ্বিতীয় শ্রেণীতে প্রমোশন পেল বলা চলে। মহাযুদ্ধে তার মহদ্‌ভোজ্য সমুপস্থিত হয়, তার বিভীষিকার হেতু অষ্ট্রিয় সাম্রাজ্য চূর্ণ হয়ে যায়। আড্রিয়াটিক সাগরের বন্দরগুলি ত সে আহার করলই, অধিকন্তু দক্ষিণ টিরোল দক্ষিণা পেল। বলকান অঞ্চলে অষ্ট্রিয়া রাশিয়া ও তুর্কীর যে প্রতিপত্তি ছিল একা ইটালী তার সবটা করায়ত্ত করল। অষ্ট্রিয়ার জাহাজগুলি বগলদাবা করে ভূমধ্য সাগরে ইটালীর ভার বাড়ল। ওদিকে জার্ম্মানীর বাণিজ্যের একাংশ তার ভাগ্যে জুটেছে। এক কথায় ইটালীর সামনে সীমাহীন আশা, প্রাণে সদ্যলব্ধ সাহস। অন্ধ যেন দৃষ্টি ফিরে পেয়েছে, খঞ্জ ফিরে পেয়েছে চলৎ শক্তি।

বাছুরের নতুন শিং উঠেছে, সে যত্র তত্র ঢুঁ মারবার জন্য অধৈর্য্য। সংখ্যাভূয়িষ্ঠ হবার জন্য ইটালীর ফাসিষ্ট দলের তর সইল না রাশিয়ার বোলশেবিকদের' দৃষ্টান্ত ছিল চোখের সুমুখে। রোমান

ক্যাথলিক চার্চের আদর্শও নিত্য পরিচিত। এবং এমন আশঙ্কাও ছিল যে কমিউনিষ্ট দল বাহুবলে রাষ্ট্র অধিকার করবে। ডিক্‌টেটরশিপ যদি ইটালীর কপালে লেখা থাকে তবে কমিউনিষ্ট ডিক্‌টেটরশিপ কেন? ফাসিষ্ট ডিক্‌টেটরশিপ কেন নয়? ফাসিষ্টরা কণ্টকের দ্বারা কণ্টক উদ্ধার করল। অবিকল কমিউনিষ্ট পদ্ধতি দিয়ে কমিউনিষ্টকে পরাস্ত করল। যেন জিউজুৎসু দিয়ে জাপানীকে। মাঝখান থেকে মারা পড়ল বেচারা উলুখাগড়া লিবারলরা। সোশ্যালিষ্টরা বেকুব বনল। ডেমক্রেসীর সঙ্গে সঙ্গে তাদেরও ঘটল প্রাণান্ত। ফাসিষ্টরা বিরুদ্ধবাদীমাত্রকেই টিপে টিপে মারল, সরাল, তাড়াল, বাঁধল। অপোজিশনের নামগন্ধ রাখল না।

আবার জিজ্ঞাসা করতে হবে, ফাসিষ্টদের উদ্দেশ্য কি? উদ্দেশ্য স্বদেশের শক্তিবৃদ্ধি। এর জন্য রাষ্ট্রকে দিয়ে যাকিছু সম্ভব তাই করণীয়। রাষ্ট্র ইচ্ছা করলে বাঘকে হরিণকে এক ঘাটে জল খাওয়াতে পারে। রাষ্ট্রের চাপে ধনিক ও শ্রমিক আপোষ করল। রাষ্ট্র সাহায্য করল উভয়কেই। কারুর সম্পত্তি কেড়ে নিয়ে খাস করতে হল না, সকলের সম্পত্তির উপর ক্ষমতা জাহির করাই যথেষ্ট বোধ হল। একটা উদাহরণ দিই। ইটালীতে বেড়াবার সময় লক্ষ করেছি হোটেলের প্রত্যেক ঘরে ফাসিষ্ট পার্টি একখানি কাগজ এঁটে দিয়েছে, তাতে লেখা আছে ঘরভাড়া এত, বিদ্যুতের ভাড়া এত, মিউনিসিপাল ট্যাক্স এত ইত্যাদি। মনোযোগের বিষয় এই যে রাষ্ট্র নয় ফাসিষ্ট পার্টির স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষই এই সব হোটেলের মা-বাপ। পার্টি রাষ্ট্র দখল করেছে বলে নিজের দুর্গ ছাড়েনি। ওটুকু রাণীর স্ত্রীধন।

যুদ্ধকালীন ইংলণ্ডের সঙ্গে ফাসিষ্ট ইটালীর তুলনা সর্ব্বাধিক সঙ্গত। ফাসিষ্টরাও বলে যে তাদের ব্যবস্থা যুদ্ধকালীন ব্যবস্থা, যুদ্ধ জগতের সনাতন ধর্ম্ম, তা শান্তির দিনেও অন্য আকারে রয়েছে। প্রাণে মারার চেয়ে ভাতে মারা কম মারাত্মক নয়। বিদেশী মালের উপর শুল্ক চড়িয়ে শান্তির দিনেও এক দেশ অন্য দেশের অন্ন মারছে। আবার দেশী মালের ব্যবসাদারকে অর্থসাহায্য করে সেই সব মাল

সস্তায় বিদেশী হাটে চালান দিয়েও বিদেশীর অন্ন কাড়ছে। এই অন্ন যুদ্ধ কি কম হিংস্র ? এ কি কোনো অংশে যুদ্ধ ছাড়া অন্য কিছু ?

ইংলণ্ডে যা ছিল আপদ্ধর্ম্ম ইটালীতে তাই সনাতন ধর্ম্ম, যেহেতু আপদ হচ্ছে সনাতন। যুদ্ধের সময় যুদ্ধ, শান্তির সময় অন্নযুদ্ধ, সব সময় এক প্রকার না এক প্রকার যুদ্ধ। সুতরাং ফাসিজম্ ইটালীর চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। সেদেশে অন্য বাণী হতে পারে না, অন্য সুর হতে পারে না, অন্য সত্য হতে পারে না। ইংলণ্ডের লোক যা দু বছরের বেশী বরদাস্ত করতে পারে না ইটালীর লোক তা তের বছর পছন্দ করে এসেছে।

ইটালীতে পার্লামেণ্ট আছে, কিন্তু তাতে মেজরিটি মাইনরিটি নামক দুই দল নেই। তাতে আছে বিভিন্ন ও বিচিত্র স্বার্থের নির্দ্দিষ্ট-সংখ্যক প্রতিনিধি। তারা সমালোচনা করে না, তাদের কেউ মন্ত্রীপদ পাবার অধিকারী নয়। মন্ত্রীপদ ফাসিষ্ট পার্টির লোককে পার্টির দান। রাশিয়াতে পার্টির কর্ত্তারা রাষ্ট্রের কর্ত্তা নিযুক্ত করেন, লোকপ্রতিনিধি-দের ইচ্ছা খাটে না।

৫

ইটালীর অনুকরণে যেসব দেশে ডিক্‌টেটরশিপ প্রতিষ্ঠা হয় তাদের মধ্যে জার্ম্মানীই উল্লেখযোগ্য। পোলণ্ড, স্পেন প্রভৃতি দেশে পিল্‌সুডস্কি প্রিমো প্রভৃতি ব্যক্তি সৈন্যদলকে হাতে করে রাষ্ট্রের গাড়োয়ান হয়েছিলেন, তেমন ত অহরহ দক্ষিণ আমেরিকায় ঘটছে। তুর্কী ও ইরানের নায়কদের সম্বন্ধে আর একটু বেশী বলা যায়, তাঁরা নেপোলিয়নবর্গীয়।

বোলশেবিক ও ফাসিষ্ট পার্টির মত জার্ম্মানীর ন্যাশনাল সোশালিষ্ট পার্টি। ওরফে নাৎসী পার্টি। এই পার্টির পত্তন যুদ্ধের অল্প পরে। অথচ ক্ষমতা আয়ত্ত করতে এদের দীর্ঘকাল লাগল। ফাসিষ্টদের যেমন ভয়ের কারণ ছিল যে ওরা না হলে কমিউনিষ্টরা ডিক্‌টেটর হবে নাৎসী-দের তেমন অজুহাতও ছিল না। এদের পথ পরিষ্কার করে দিল সোশ্যাল ডেমক্রাট ও কমিউনিষ্টদের গজকচ্ছপ কলহ। এরা গরুড়ের

মত ভুটোকেই ভক্ষণ করে অসপত্ন হল। বোলশেবিক ও ফাসিষ্টকেও এরা বিপক্ষদলনে ছাড়িয়ে যায়। কিন্তু এরা সহজে নিষ্কণ্টক হতে পারছে না। প্রথমত কমিউনিষ্ট পার্টিকে নিঃসত্ত্ব করলেও কমিনিউষ্ট-ভাবাপন্ন ব্যক্তি নিশ্চিহ্ন হয় না জার্ম্মানীর মত কমিউনিষ্ট তীর্থে। নিকটে রাশিয়া। তার ছোঁয়াচকে অতিমাত্র ভয়। দ্বিতীয়ত ইহুদীর সংখ্যা কেবল যে ছয় লাখ তাই নয়, তারা সর্ব্বঘটে বিদ্যমান ও সর্ব্বত্র তারা জাতজার্ম্মানের চেয়ে অবস্থাপন্ন ও উন্নতিপরায়ণ। তাদের সঙ্গে মিশ্রণ সম্ভব নয় বলে তারা চিরকালই রাষ্ট্রের ভিতরে রাষ্ট্র হিসাবে দ্রোহিতা করবে। বিশেষত তাদের মিত্র ইউরোপের সব দেশে। জার্ম্মানীর শত্রু রাজ্যের যদি তারা চর হয়, যদি গোপনে তাদের আত্মীয়দের কাছে স্বর্ণ রপ্তানী কিম্বা তাদের কাছ থেকে নিষিদ্ধ পণ্য আমদানী করে, যদি যুদ্ধের দিনে পরের পক্ষে চক্রান্ত করে, তবে দেশ বিপন্ন হবে। ইহুদীদের অনেকে কমিউনিষ্ট, একে মনসা তায় ধুনোর গন্ধ। নাৎসীরা ইহুদীকে আমেরিকার নিগ্রোর মত দীনহীন দশায় উত্তীর্ণ না করে ছাড়বে না। ওদেরও দেশে দেশে আপনার লোক রয়েছে, আন্দোলন করে জার্ম্মান পণ্যের বাজার খারাপ করে দিচ্ছে। তৃতীয়ত জার্ম্মানীর ক্যাথলিকরা পার্লামেন্টেও প্রতিনিধি পাঠায়, তাদের একটা স্বতন্ত্র পার্টি আছে। ধর্ম্মের নামে পলিটিকল পার্টি কেবল ভারতবর্ষে নয় জার্ম্মানীতেও আছে, তা নইলে ওদেশের এমন দুর্দ্দশা হবে কেন? এখন ইহুদির মত ক্যাথলিকও অন্যান্য দেশে আছে, তাদের সঙ্গে জার্ম্মানীর ক্যাথলিকদের ভাব থাকা ভাল নয়। জার্ম্মানীর মহাশত্রু ফ্রান্স আবার ক্যাথলিক কিনা। তদ্ব্যতীত রোমের পোপ জার্ম্মানীর ক্যাথলিকদের ব্যাপারে কথা কন। এক্ষেত্রেও সেই রাষ্ট্রের ভিতরে রাষ্ট্র। এ জন্য নাৎসীরা ক্যাথলিকদের প্রতি বিরূপ। এরাই কতকটা অপোজিশনের কাজ করছে। এমনি কপাল যে প্রোটেষ্টাণ্টদের সঙ্গেও নাৎসীদের বনছে না। ক্যাথলিক ও প্রোটেষ্টাণ্ট উভয়কে এক সূত্রে গেঁথে একটা "দীন এলাহি" প্রবর্ত্তন করতে এ যুগের আকবর বাদশাহের সখ। গ্যয়রিং আবার প্রাক্‌ক্রিশ্চান পেগান যুগকে ফিরিয়ে আনতে চান।

নাৎসীদের মর্ম্মগত উদ্দেশ্য কি? ইতিহাসের মঞ্চে তারা কোন ভূমিকায় অভিনয় করতে অবতীর্ণ? এর উত্তর তারা জার্ম্মানীকে পুনরায় মহাশক্তির আসনে বসাতে কৃতসঙ্কল্প। যুদ্ধে জার্ম্মানী পরাভূত হয়েছে, এই তথ্যটাকে তারা ইতিহাসের পাতা থেকে রবার দিয়ে মুছে ফেলতে পণ করেছে। সেই সঙ্গে অন্যান্য গবর্ণমেণ্টের মত তারা বেকারসমস্যা সমাধানের দায়িত্ব নিয়েছে। ভাবী যুদ্ধের আয়োজনে জার্ম্মানী যা খরচ করেছে তাতে বেকার সংখ্যা হ্রাস হয়েছে। দেশরক্ষার্থে বাণিজ্যের নিয়ন্ত্রণ রাষ্ট্রের কর্ত্তব্য বলে সর্ব্বস্বীকৃত। তাদৃশ কারণে সংবাদের, অভিমতের ও আর্টের নিয়ন্ত্রণও মাথা পেতে নিতে হয়। নাৎসী জার্ম্মানীতে ব্যক্তির স্বাধীনতা ফাসিষ্ট ইটালী ও বোলশেবিক রাশিয়ার মত রাষ্ট্রের বৃহত্তর স্বার্থে বিলীন হয়েছে, জীবাত্মা যেমন পরমাত্মায়।

ব্যক্তির ত এই জীবন্মুক্ত দশা। নাৎসী পার্টি কিন্তু স্বতন্ত্র সত্তা রক্ষা করছে, রাষ্ট্রভার গ্রহণ করে আত্ম দেহ ত্যাগ করেনি।

রাশিয়া, ইটালী ও জার্ম্মানী এই তিন দেশেই রাষ্ট্র ব্যক্তিকে নিজের জারক রসে জীর্ণ করেছে, কিন্তু পার্টিকে উদরস্থ করতে পারেনি, বরং পার্টিই রাষ্ট্রের পিঠে সওয়ার হয়েছে। এইখানেই ডিক্‌টেটর-শিপের ভণ্ডামি। তিন দেশেই ডিক্‌টেটরশিপ রাষ্ট্রের মহিমা গান করছে, রাষ্ট্রের চেয়ে বড় নেই, না ভগবান না ধর্ম্ম। নমো রাষ্ট্র নমো রাষ্ট্র বলে ত্রি সন্ধ্যা উপাসনা করতে হবে, রাষ্ট্র নামক অব্যয় অক্ষয় পরব্রহ্মের চরণে আপনার ক্ষুদ্র ব্যক্তিত্ব নিবেদন করে চরণামৃত সেবন করতে হবে। তা হলে যে অপূর্ব্ব আনন্দে চিত্ত পরিপূর্ণ হবে তাই হচ্ছে ইহজীবনের সার্থকতা। এই যাদের মতবাদ, যাদের ফিলসফি, তারা কিন্তু পার্টিকে শিকায় তুলে রেখে দিয়েছে ঠাকুরের ঠিক মাথার উপরে। অন্যান্য দেশে এই ফলার চুরি নেই। এর থেকে অনুমান হয় যে পার্টি বাইরে থেকে রাষ্ট্রের লাগাম কেড়ে নিয়েছে, ভিতর থেকে তার মন কাড়তে পারেনি। নাৎসী ফাসিষ্ট ও বোলশেবিক নিজ নিজ দেশের সমস্ত মানুষকে পার্টির সদস্য করতে সাহসী নয়, কারণ সেক্ষেত্রে ভোটের মর্য্যাদা আছে, ব্যক্তির মতামতের মূল্য আছে, যদি অধিকাংশের

আনুকূল্য না পাওয়া যায় তবে পার্টির পলিসি পণ্ড হবে ও নেতৃত্ব পাত্রান্তরিত হবে।

শেষপর্য্যন্ত দাঁড়াল এই যে মঙ্গলের জন্য গৌরবের জন্য পরাভবের গ্লানি ধৌত করণের জন্য মুষ্টিমেয়ের নেতৃত্বে মহাজনতাকে চালিত হতে হবে, সঙ্কল্প অল্পের, সমর্পণ অধিকাংশের। রাষ্ট্র হচ্ছে জগন্নাথের রথ, জনসাধারণ তাকে টানবে, পার্টি হবে তার পাণ্ডা। এ যদি দুর্দ্দিনের ব্যবস্থা হত তবে ডেমক্রেসীর পক্ষে ভয়াবহ হত না, কিন্তু যেমন দেখা যচ্ছে তাতে মনে হয় উক্ত তিনটি দেশে এই ব্যবস্থা সুদিনেও অটুট থাকবে, যাতে অটুট থাকে তার জন্য পার্টি আপনাকে বাঁচিয়ে রেখেছে। অপিচ ঐ তিন দেশে এর সাফল্য একে অন্যত্র সংক্রামক করতেও পারে। অতএব ডিক্‌টেটরশিপ ডেমক্রেসির স্থায়ী প্রতিযোগী হতে উদ্যত হয়েছে। হয় ডিক্‌টেটরশিপ জিতবে, নয় ডেমক্রেসী। দুটোর প্রভেদ যাঁরা বোঝেন না তাঁদের ষত্ব ণত্ব জ্ঞান নেই। ডেমক্রসী হচ্ছে সংখ্যাভূয়িষ্ঠের শাসন, ডিক্‌টেটরশিপ সংখ্যালঘিষ্ঠের।

সম্প্রতি ইংলণ্ডেও ডিক্‌টেটরশিপের আইডিয়া বহু মনীষীর মনঃপূত হয়েছে। আমি অস্‌ওয়াল্‌ড্‌ মস্‌লের কথা ভাবছিনে, ভাবছি ক্রিপ্‌স্‌ কোল লাস্কির কথা। এঁরা ডেমক্রেসীর ঠাট বজায় রেখে ডিক্‌টেটর-শিপের প্রাণবস্তু চান। এঁদের প্রস্তাব এই যে লেবার পার্টি সাধারণ নির্ব্বাচনে সংখ্যাভূয়িষ্ঠ হয়ে পার্লামেণ্টে আসুক, এসে ভোটের জোরে বিনা সময়ক্ষেপে রাতারাতি ব্যাঙ্ক, খনি, রেল, বিদ্যুৎ ইত্যাদির ব্যবসায় রাষ্ট্রের খাসদখলে আনুক।

এই প্রস্তাব শুনে প্রতিপক্ষ হেসে বল্লেন, ক্রিকেটের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ ক্রিকেট নয়। সমালোচনার সময় দিতে হবে। পদে পদে জবাবদিহি করতে হবে। দেশের লোককে ফলাফল অনুধাবন করবার অবসর দিতে হবে। রাতারাতি একটা সুপ্রতিষ্ঠিত দেশের একরতফা উলটপালট ঘটানোর জন্য পার্লামেণ্টে 'প্রবেশ করা পার্লামেণ্ট ধ্বংস

করার সামিল। তোমরা যদি ভোটের জোরে অন্যায় করতে উদ্যত হও আমরাও গায়ের জোরে অন্যায়কে ঠেকাতে জানি।

এঁরা প্রত্যুত্তর করলেন, দেশের লোক যদি আমাদের সংখ্যা-ভূয়িষ্ঠ রূপে পাঠায় তবে ধরে নিতে হবে যে আমাদের উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি ভাল করে বুঝেসুঝেই আমাদের পাঠিয়েছে। আমরা ম্যাণ্ডেট পালন করছি মাত্র।

এই যুক্তির দ্বারা আদালতে মামলা জেতা যায়, কলেজে ছেলে ভোলানো যায়। কিন্তু এ ক্রিকেট নয়। কোনোমতে একবার সংখ্যা-ভূয়িষ্ঠ হলেই যে ডালে বসেছি সে ডাল কাটবার অধিকার জন্মায় না। গোড়া ঘেঁষে কোপ মারার প্রস্তাব সর্ব্বসাধারণের বুদ্ধিগ্রাহ্য হওয়া দরকার। সংখ্যাভূয়িষ্ঠ ত চিরদিন সংখ্যাভূয়িষ্ঠ নয়। পাঁচ বছর পরে তারাই হতে পারে সংখ্যালঘিষ্ঠ। সমাজ ব্যবস্থা কি প্রতি পাঁচ বছরে বিপরীত হবে? কাটা ডাল গজাবে কি?

মোট কথা ডেমক্রসী বিপ্লবের বাহন নয়। কামারের দোকানে দইয়ের ফরমাস বৃথা। মার্কস্ এ সত্য জানতেন বলে তাঁর শিষ্যদের সোজাসুজি বিপ্লবের পরামর্শ দিয়ে গেছেন। লেবার পার্টি কনফারেন্সে মনীষীদের এই প্রস্তাব সহজবুদ্ধির দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হল। এতে আছে ডিক্‌টেটরশিপের সারবস্তু। লেবার ডিক্‌টেটরশিপের থেকে শত হস্ত দূরে থাকতে ব্যগ্র। কারণ লেবার ডিক্‌টেটর হবার উপক্রম করছে টের পেলে তার আগে প্রতিপক্ষ ডিক্‌টেটর সেজে বসবে। গায়ের জোর প্রতিপক্ষের বেশী। প্রেস প্রতিপক্ষের হাতে। সাফাই সৃষ্টি করা একান্ত সোজা। ব্যাঙ্ক প্রতিপক্ষের হাতে। আতঙ্ক সৃষ্টি করা কয়েক মিনিটের কর্ম্ম। লেবার জানে যে তার প্রতিপক্ষের সঙ্গে ক্রিকেট খেলাই নিরাপদ, তাতে মাঝে মাঝে ব্যাট ধরবার সুযোগ মেলে।

৭

ডিক্‌টেটরশিপের লক্ষ্য সুস্পষ্ট, সুভেদ্য, নির্দ্দিষ্টকালে নিবদ্ধ। ডেমক্রেসীর কোনো লক্ষ্য নেই। যদি থাকে তবে তা মৃদু মন্থর প্রগতি। ডিক্‌টেটরশিপ বলে, সাত বছর সময় দাও। জার্ম্মানীকে

পরাক্রান্ত ও নিরভাব করে দিচ্ছি। পাঁচ বছর সময় দাও। রাশিয়া শিল্পপ্রধান দেশ হবে ; যন্ত্রের সাহায্যে জমিতেও বহুগুণ ফসল ফলবে। দশ বছর সময় দাও। ইটালী উপনিবেশ জয় করে নেবে। ডেমক্রেসী তেমন কোনো অঙ্গীকার করে না। প্রত্যেক নির্ব্বাচনে প্রত্যেক দল কার্য্যতালিকা দাখিল করে বটে, কিন্তু সে সব খুচরা ঘরমেরামতি, তাতেও তারা ঢিলে দেয়। তাদের দোষ নেই। গৃহস্থ যে ট্যাক্স দেয় সেই খরচে তার বেশী হয় না। ট্যাক্স বাড়াবার নাম করলে নির্ব্বাচনে মাৎ হতে হবে, বাড়ালেও পরবর্ত্তী নির্ব্বাচনে ইটপাটকেল ভাঙ্গা বোতল পচা ডিম দিয়ে সম্বর্দ্ধনা করবে দেশের লোক।

বলা যায় না ডিক্‌টেটরশিপ যদি লক্ষ্য ভেদে অক্ষম হয় তবে তার সম্বর্দ্ধনা কিরূপ হবে। যারা চড়া পণে জুয়া খেলতে যায় তারা জুয়াড়ির পরিণাম জেনেশুনেই যায়, বিনাশ তাদের অপ্রত্যাশিত নয়। যাঁরা রাশিয়ার ডিক্‌টেটরশিপের দীর্ঘজীবন অথচ জার্ম্মানী ও ইটালীতে তার অকালমৃত্যু কামনা করেন তাঁরা প্রকৃতপক্ষে তত্রত্য ক্যাপিটালিসমের পতনকামী। তাঁদের সে অভিলাষ ডেমক্রেসী কর্ত্তৃক পূরণ হবে না, তাঁদের মনোগত অভিপ্রায় সিদ্ধির জন্য ডিক্‌টেটরশিপের মরণ নয় তার লক্ষ্যের পরিবর্ত্তন আবশ্যক। ডেমক্রেসী ক্যাপিটালিস্‌মের মিত্র। তার কাছে সোশ্যালিসমের প্রত্যাশা আকাশ-কুসুম। তবু এই প্রত্যাশাই অধুনাতন বামমার্গীয় আদর্শবাদীকে বাঁচবার প্রেরণা দেয়। সামঞ্জস্যের ভরসায় সে ধৈর্য্যের সহিত দিন গুণছে। তার বিশ্বাস রাশিয়াতেও একদিন ডেমক্রেসীর সূচনা হবে। সোশ্যালিষ্ট ডেমক্রেসী।

ওদিকে দক্ষিণমার্গের আদর্শবাদীর মানসে ক্যাপিটালিসমের সঙ্গে ডেমক্রেসীর সমাহার নব নব বর্ণে উদ্‌ভাসিত হচ্ছে। ডিক্‌টেটরশিপ তার প্রার্থনীয় নয়, কিন্তু সোশ্যালিসমের চেয়ে ডিক্‌টেটরশিপ স্পৃহণীয়। সে প্রথমে ক্যাপিটালিষ্ট, পরে ডেমক্রাট। ইটালী জার্ম্মানী যেদিন ক্যাপিটালিসমের পক্ষে নিরাপদ হবে সেদিন ডিক্‌টেটর-শিপের পরিবর্ত্তে ডেমক্রেসী সংস্থাপিত হ'লেই সে প্রীত হবে। সে

খেলোয়ার মানুষ, জুয়াড়ি নয়। ডিক্‌টেটর সম্বন্ধে তার মোহ নেই, আছে বিপৎ কালে নির্ভর।

বিশ্লেষণ করলে দ্বন্দ্বটা মূলত ক্যাপিটালিসমের সঙ্গে সোশ্যালিসমের। ক্যাপিটালিসম্ তার মিত্রের সঙ্কট দেখলে আত্মরক্ষার জন্য ডিক্‌টেটরশিপের বায়না দেয়। তা থেকে যদি কেউ সিদ্ধান্ত করেন যে ডিক্‌টেটর তার পোষা বরকন্দাজ তবে ভুল করবেন। ডিক্‌টেটরকে যে নিয়োগ করে সে তার। রাশিয়ায় সে প্রোলিটারিয়াটের, ইটালী জার্ম্মানীতে সে ক্যাপিটালিষ্টের। সে প্রভুভক্ত গুর্খা ভৃত্য। মালিকের বিচার করে না, যদি খোরাকী পায়। ডেমক্রেসী ভদ্রলোক। ক্যাপিটালিসম তাকেই খাতির করে বেশী। কিন্তু সম্পত্তির গায়ে হাত পড়লে লোকে ভ'ল মানুষ বন্ধুর চেয়ে বিশ্বস্ত লাঠিয়ালের দিকে বেশী ঝোঁকে। সোশ্যালিসম্ যখন নূতন দখল নিচ্ছে তখন লাঠিয়ালই ত তার একমাত্র অবলম্বন। সম্পত্তি রাখতে গেলেও যেমন কাড়তে গেলেও তেমনি, সম্পত্তির বেলায় ভদ্রতা করতে গেলে সর্ব্বনাশ। যে মানুষ দু বেলা মালা গডায় তত্ত্বকথা আওড়ায় নিরামিষ খায় সেও সম্পত্তির জন্য জাল করে, মিথ্যা জবানবন্দী দেয়, ভাইয়ের গলায় ছুরি চালায়।

অতএব দ্বন্দ্বটা মুখ্যত সম্পত্তিঘটিত।

লীলাময় রায়

রূপকথা

আমার ব্রহ্ম-বিতর্কের খাতা যখন ভূমধ্যসাগরে তলিয়ে চল্‌লো, তখন তার যে শোভা দেখেছিলুম, তা খুবই বিরল। সেটা ডুব্‌লো প্রথমে একখানা কালো শ্লেটের মতো; কিন্তু অবিলম্বেই তার পাতাগুলো খুলে গেলো—হাল্‌কা সবুজ পাতা, কেঁপে কেঁপে নীলে বদ্‌লে যাচ্ছে। থেকে থেকে কেতাবখানা হারায়, থেকে থেকে তার প্রসারে অসীমের যাদু লাগে, আবার মাঝে মাঝে তাকে বই ব'লেই চিনি, কিন্তু বিরাট বই, সমস্ত জ্ঞাননির্ঘণ্টের চেয়েও বিপুলায়তন। নিচে পৌঁছতে তার কুহক যেন আরো বাড়লো, এবং একমুঠো বালি তার অভ্যর্থনায় উচ্ছ্বসিত হয়ে তাকে চোখের আড়াল করলে। কিন্তু কিছু পরেই পুঁথিটা আবার নজরে এলো,—সাধারণ খোলা পুঁথি চিৎ হয়ে শুয়ে আছে, কেবল তার পাতাগুলো কার অদৃশ্য অঙ্গুলিস্পর্শে মৃদুসঞ্চালিত।

পিসিমা বল্‌লেন, "আসল আক্ষেপের কথা এই যে তুমি কোনো-মতেই ঘরে ব'সে কাজ সারবে না। তাহলে ঝাড়া হাত-পায়ে আমোদ করাও হতো, এমন দুর্ঘটনাও কিছুতেই ঘটতে পারতো না।"

পাদ্রী সাহেব ইনিয়ে বিনিয়ে আবৃত্তি করলেন, "কিছুই তাহার অধিকার নাহি রবে, অরূপ রতনে সবি পরিণত হবে"; এবং চমক ভেঙে তাঁর ভগ্নী যোগ দিলেন, "ওকি! খাতাখানা যে জলে পড়লো!" আর মাঝিরা? তাদের একজন হেসে ফেল্‌লে, এবং অন্যজন নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে উঠে কাপড় ছাড়তে লাগ্‌লো।

কার্নেল্‌ সাহেব চেঁচিয়ে উঠলেন, "কী সর্ব্বনাশ! লোকটা পাগল নাকি?"

পিসিমা বল্‌লেন, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওকে কৃতজ্ঞতা জানাও, অর্থাৎ বলো যে অতটা দয়ায় আজ প্রয়োজন নেই; হয়তো ভবিষ্যতে—"

আমি অনুযোগের স্বরে জবাব দিলুম, "সে তো বুঝলুম, কিন্তু

আমার যে খাতাখানা ফেরৎ চাই। ওটা আমার ফেলোশিপ্‌ পরীক্ষার নোট। ভবিষ্যতে কি আর ওর কিছু বাকি থাকবে?"

কে এক ভদ্রমহিলা ছাতার আড়াল থেকে প্রস্তাব করলেন, "আমার মাথায় এক বুদ্ধি এসেছে। এই স্বভাবশিশুটি বরং জলে নেমে বই উদ্ধার করুক, আর আমরা ইতিমধ্যে অন্য গুহাটা দেখে আসি। এই পাহাড়টায় কিম্বা ভিতরে ওই পাথরের ফলকে ওকে নামিয়ে দেওয়া যাক, আমরা ফিরতে ফিরতে ও কাজ গুছিয়ে রাখবে।"

যুক্তিটা ভালোই লাগলো, এবং আমি তার সংস্কার করলুম এই ব'লে যে আমাকেও ছেড়ে গেলে নৌকার ভার কমবে। ফলে আমরা দুজনেই ছোটো গহ্বরটার বাইরে একখানা প্রকাণ্ড রৌদ্রজ্জ্বল পাথরে স্থান পেলুম। আশ্চর্য্য সে-পাথরখানা, যেন গুহাভ্যন্তরীণ বর্ণসঙ্গীতের প্রহরী; আরো অনির্ব্বচনীয় ভিতরকার বর্ণবিন্যাস যাকে শব্দাভাবে নীলই বল্‌তে হয়, যদিও সে-নীল নির্ম্মলতারই নির্য্যাস। সে-রকম নির্ম্মলতা হয়তো গৃহস্থের পরিমার্জ্জিত ভদ্রাসনেই জন্মায়, কিন্তু তার পরিণতি পারমার্থিক পরাকাষ্ঠায়, সাত সমুদ্রকে একত্র করলে, তবে তেমন ভাস্বর নিরঞ্জনের সাক্ষাৎ মেলে। কাপ্রির নীল গুহার নীল জল পরিমাণে অনেক বেশী বটে, কিন্তু রঙে আরো গাঢ় নয়। সে-সাধারণ রঙে, সে-সামান্য সত্তায় ভূমধ্যসাগরের সকল গুহাই উত্তরাধিকারী; যেখানেই সূর্য্যের আলো পৌঁছয় আর সমুদ্রের স্রোত বয়, সেখানেই সেই নির্ব্বিশেষ নীলের পর্য্যাপ্তি।

সে যাই হোক, নৌকো চলে যেতেই বুঝলুম যে একখানা ঢালু পাথরের ধারে একজন অপরিচিত সিসিলিয়ানের হাতে নিজেকে অসহায় অবস্থায় সঁপে দিয়ে অত্যন্ত বোকামি করেছি। কারণ আমার সঙ্গী যেন মুহূর্ত্তমধ্যে অতিজীবন্ত হয়ে উঠলো, এবং আমার হাত ধরে টানতে টানতে দ্রুত স্বরে বল্‌লে, "গুহার শেষে যান দিকি, একটি চমৎকার দৃশ্য দেখবেন।"

তার পীড়াপীড়িতে বাধ্য হয়ে, একপ্রস্থ জ্বলন্ত জল ডিঙিয়ে, পাহাড় ছেড়ে পাড়ের উপরে লাফ দিলুম। তার পর আলো থেকে

সরিয়ে এনে সে আমাকে ছায়ার মধ্যে যেখানে দাঁড় করালে তার প্রত্যন্তে এক-ফালি বালির চড়া গুঁড়ো পান্নার মতো উঁকি পাড়ছিলো। সেখানে আমায় তার কাপড়-চোপড়ের জিম্মেয় রেখে সে ত্রস্তপদে আবার গুহামুখের পাথরটায় ফিরে গেলো, এবং সূর্য্যালোকে নিমেষকাল নগ্নদেহে দাড়িয়ে, নিচে চেয়ে একবার দেখে নিলে পুঁথিখানা কোথায় পড়ে আছে; তার পর কপালে ক্রুসচিহ্ন এঁকে, উর্দ্ধবাহু হয়ে সমুদ্রবক্ষে ঝাঁপ দিলে।

বইখানা বিস্ময়কর ঠেকেছিলো, মানুষটিকে লাগলো বর্ণনার অতীত। মনে হলো সমুদ্রগর্ভে সে বুঝি এক সচেতন রজতপ্রতিমা নীল আর সবুজের পুলক যার সর্ব্বাঙ্গে জীবনসঞ্চার করেছে। কিন্তু সেই অসীম আনন্দের ও অনন্ত জ্ঞানের অধিকারী, প্রাণময় পুরুষটিই যে মুহূর্ত্তমধ্যে আমার ব্রহ্মবিতর্কের খাতাখানা দাঁতে ধ'রে রৌদ্রদগ্ধ সজল শরীরে অতল থেকে উঠে আসবে এমন সম্ভাবনাও সে-সময়ে আমার মনে জাগেনি।

এই রকম ডুবুরীরা সাধারণত দক্ষিণার প্রত্যাশী। আমি যাই দিই না কেন, সে নিশ্চয়ই তার বেশি চাইবে; অথচ সেই সুন্দর, যদিও জনশূন্য, স্থানে তর্ক করার ইচ্ছা আমার মোটেই ছিলো না। কাজেই সে যখন আলাপ জমাবার স্বরে বললে, "এমনতর জায়গায় অপ্সরী সন্দর্শনও সম্ভব," তখন আমি অত্যন্ত স্বস্তি বোধ করলুম।

সে যে পরিবেষ্টনের সঙ্গে এমন ভাবে নিজের সুর মিলিয়ে নিয়েছে, তাতে তার উপরে খুশি না হয়ে পারলুম না। সঙ্গীরা যে-মায়ালোকে আমাদের ছেড়ে গিয়েছিলো, সেখানে বস্তু-নামক আষ্ট-প্রহরিক উৎপাতের প্রবেশ নিষিদ্ধ, সমুদ্র সে-নিভৃত জগতের ভিত্তি, তার প্রাকার ও পটল সমুদ্র-প্রতিবিম্বিত বেপমান শিলারাশি। সেখানে এক কবিকল্পনা ভিন্ন অন্য সমস্তই দুর্ব্বিষহ। সুতরাং আমিও তার খেয়ালের প্রতিধ্বনি ক'রে বললুম, "এখানে অপ্সরী সন্দর্শন শুধু সম্ভব নয়, সহজও বটে।"

কাপড় পরতে পরতে বেশ কৌতূহলী দৃষ্টিতে সে আমার দিকে

চাইতে লাগলো। বালির উপরে ব'সে আমি ব্যাপৃত হলুম আমার চট্‌চটে খাতাখানার পাতা ছাড়াতে।

অবশেষে সে আবার বললে, "তাহলে গত বছর যে বইটা বেরিয়েছিলো, তা আপনিও হয়তো পড়েছেন। কে জান্‌তো, এ-দেশের অপ্সরী বিদেশীদেরও টানে!"

(পরে কেতাবখানা আমি পড়েছি। তরুণীটির ছবি ও গানের কথাগুলি থাকা সত্বেও, সে বিবরণ স্বভাবতই অসম্পূর্ণ।)

"তিনি এই নীল জল থেকেই ওঠেন, নয় কি? তার পর গুহা-মুখের পাথরে বসে চুল আঁচড়ান", এই ব'লে আমি গল্পের প্রস্তাবনা করলুম।

তার হঠাৎ গাম্ভীর্য্যে আমার ঔৎসুক্য জেগেছিলো; ইচ্ছা হলো ফুসলিয়ে তার মনের খবর বের করি, কারণ তার শেষ কথাগুলোর মধ্যে একটা বিদ্রূপের ইঙ্গিত ছিলো, যার রহস্য আমি ঠিক বুঝলুম না।

সে জিজ্ঞাসা করলে, "আপনি তাঁকে কখনো দেখেছেন?"

"লাখো বার।"

"আমি, একবারও নয়।"

"কিন্তু তুমি তো তাঁর গান শুনেছো?"

সে কোট প'রে অধীর স্বরে বললে, "জলের নিচেই গাইবেন? কে পারে? কখনো কখনো গাইতে চেষ্টা করেন বটে, কিন্তু তার ফলে মস্ত মস্ত বুদ্বুদ ছাড়া আর কিছুই জন্মায় না।"

"পাহাড়ের উপরে চ'ড়ে বস্‌লেই হয়।"

সে একেবারে চ'টে জবাব দিলে, "কী ক'রে? পাদ্রীরা হাওয়াকে যাদু করেছে, তাঁর নিঃশ্বাস নেওয়া বারণ; পাথরগুলোর শুদ্ধি হয়েছে, ওতে বসা নিষেধ। মানুষ কেবল সমুদ্রকে মন্ত্রপূত করতে পারেনা, কারণ তার কোথাও শেষ নেই। তাই সমুদ্রেই তাঁর বাস।"

আমার উত্তর জোগালো না।

ফলে তার মুখের ভাব একটু নরম হলো। সে আমার দিকে এমন ক'রে চাইলে যেন তার মনে কি একটা লুকিয়ে আছে। তার পর

গুহামুখের পাথরটার উপরে গিয়ে সে কিছুক্ষণ বাইরের অসীম নীলের পানে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলো, এবং খানিক বাদে ভিতরের প্রদোষান্ধ-কারে ফিরে এসে হঠাৎ ব'লে উঠ্‌লো, "সাধারণত সৎলোকেই তাঁকে দেখতে পায়।"

আমি কোনো মন্তব্য করলুম না। তখন নীরবতা ভেদ ক'রে সে আবার বলতে লাগলো, "এই নিয়মটা কিন্তু সত্যিই অদ্ভুত, পাত্রীরাও এর মানে বোঝেনা ; কেননা অপ্সরী নিজে নেহাৎই মন্দ। যারা রীতি-মতো ব্রত-উপবাস করে, শুভদিনে গির্জেয় যায়, বিপদ শুধু তাদেরই নয়, এমন-কি যারা আটপৌরে ভালোমানুষ, নিতান্ত গোবেচারা, আশঙ্কা বেশি তাদেরই। গত দু-পুরুষের মধ্যে গ্রামের কেউই তাঁকে দেখেনি, না দেখাই স্বাভাবিক, কারণ জলে নামার আগে আমরা সকলেই কপালে ক্রুসচিহ্ন আঁকি। কিন্তু অত সাবধান হওয়ার দরকার নেই। জুসেপের বেলায় তো আমরা কেউ কখনো স্বপ্নেও ভয় পাইনি। অবশ্য আমরা প্রত্যেকেই তাকে পছন্দ করতুম, আর আমাদের অনেককেই তারও লাগতো ভালো। কিন্তু ভালোবাসা কখনোই ভালো হওয়ার সমান নয়।"

জুসেপে কে, জিজ্ঞাসা করলুম।

"সে অনেক দিনের কথা—আমার বয়স তখন সতেরো আর দাদা কুড়ি পেরিয়ে আমার চেয়ে আরো বলিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। সেইবারেই বিদেশীরা এ-অঞ্চলে প্রথম আসতে সুরু ক'রে আমাদের গ্রামের ভোল ফিরিয়ে দেয়। এই উন্নতি আর অবস্থা পরিবর্ত্তনের জন্যে আমরা প্রধানত এক ঘরোয়ানা ইংরেজ মহিলার কাছেই ঋণী। তিনি আমাদের বিষয়ে বই লিখেই থামেননি, আমাদের সংস্কার-সমিতির গোড়াপত্তনও তাঁরই চেষ্টার ফল।"

আমি তাকে বাধা দিয়ে বললুম, "এ গুহার মধ্যে সে-ভদ্রমহিলার কথা পেড়ে কাজ নেই।"

"সেদিন তাঁকে আর তাঁর বন্ধুদের নিয়ে আমরা গুহা দেখাতে যাচ্ছিলুম। নৌকো যখন পাহাড়ের কোল ঘেঁষে চলেছে, তখন সকলকে

চমকে দেবার ইচ্ছেয়, আর পাঁচজনের মতো, আমিও খালি হাতে একটা ছোটো কাঁকড়া ধ'রে, তার দাড়া উপ্‌ড়ে, তাঁদের সামনে ধরলুম। ফলে মেয়েরা সবাই কাৎরাতে লাগলো, কিন্তু ভদ্রলোকটি খুশি হয়ে আমায় বক্‌শিস্‌ দিতে চাইলেন। আমি তখনো পাকিনি, তাই তাঁর টাকা ফিরিয়ে দিলুম এই ব'লে যে তাঁকে সন্তুষ্ট করতে পেরেছি, সেই আমার যথেষ্ট পুরস্কার! আমার পিছনে ব'সে দাঁড় টানছিলো জুসেপে; এই ব্যবহারে চ'টে গিয়ে, সে এত জোরে আমাকে এক চড় কষিয়ে দিলে যে দাঁতে ঠোঁট কেটে আমার মুখ দিয়ে রক্ত বেরিয়ে গেলো। আমিও তাকে ঘুরিয়ে মারবার চেষ্টা করলুম; কিন্তু সে ছিলো অত্যন্ত চট্‌পটে, আমি ফিরতে না-ফিরতেই আমার বগলে সে এমন এক লাথি চালালে যে কিছুক্ষণের জন্যে নৌকো টানাও আমার সাধ্যে কুললো না। এই ব্যাপারে মেয়ে-মহলে মহা চেঁচামেচি সুরু হলো। পরে শুনেছি, দাদার অত্যাচার থেকে বাঁচিয়ে আমাকে ওয়েটারের কাজ শেখানোর জল্পনা-কল্পনাতেও তাঁরা তখুনি মেতেছিলেন। ভাগ্যিস্‌, সেটা আর কোনোদিন ঘ'টে ওঠেনি।

"আমরা যখন গুহায় পৌঁছলুম—এটা নয়, একটা আরো বড়ো গুহায়—তখন ভদ্রলোকটির হঠাৎ সখ হলো যে আমাদের মধ্যে একজন কেউ জলে ডুবে টাকা কুড়োই। মেয়েমাত্রেই মাঝে মাঝে লজ্জার মাথা খায়, তাই এ-ক্ষেত্রেও তাঁরা আপত্তি তুললেন না। কিন্তু জুসেপে আবিষ্কার করেছিলো যে আমাদের জলে নাম্‌তে দেখ্‌লে বিদেশীরা বিশেষ আমোদ পায়; কাজেই রূপো ছাড়া অন্য কিছুর জন্যে সে ডুব দিতে রাজি হলো না। ফলে ভদ্রলোকটি একটা ডবল লিরা ছুঁড়ে ফেল্‌লেন।"

"ঝাঁপাবার ঠিক আগে আমায় কালশিরা-পড়া গালে হাত দিয়ে অসহায়ভাবে কাঁদতে দেখে, দাদা হেসে বল্‌লে, "যাক, এবারে অন্তত আর অপ্সরীর নজরে আসবোনা।" তার পর কপালে ক্রুসচিহ্ন না এঁকেই, সে জলে পড়লো। কিন্তু ঠিক সেইবারেই সে তাঁর সাক্ষাৎ পেলে।"

গল্প অসমাপ্ত রেখে, সে আমার দেওয়া সিগারেট নিলে। আমি গুহামুখের পাথরটার পানে তাকিয়ে দেখলুম, সেই মায়ামুগ্ধ জল থেকে ক্রমান্বয়ে বড়ো বড়ো বুদ্বুদ ফুটে উঠে প্রবেশপথের দু-পাশকে আলোর ঝলকে কাঁপিয়ে তুলেছে।

অবশেষে পদপ্রান্তের ছোটো ঢেউগুলোর উপরে সিগারেটের গরম ছাই ঝেড়ে, সে অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে বল্লে, "দাদা টাকা না নিয়েই ফিরে এলো। আমরা তাকে কোনোক্রমে টেনে নৌকোয় তুল্‌লুম। সে ফুলে এমনি প্রকাণ্ড হয়ে উঠেছিলো যে মনে হতে লাগলো, সে যেন একলাই নৌকোখানা জুড়ে রয়েছে, এত ভিজে গিয়েছিলো যে আমরা তাকে কাপড় পরাতে পারলুম না। এত ভিজে মানুষ আমি জীবনে দেখিনি। আমি আর সেই ভদ্রলোকটিই নৌকো নিয়ে এলুম, জুসেপেকে চটে মুড়ে কোণে হেলান দিয়ে বসালুম।"

আমি ভাবলুম, জুসেপের প্রাণহানিই হয়তো গল্পের মর্ম্ম; তাই আস্তে আস্তে বললুম, "আহা, বেচারা তাহলে ডুবে মারা গেলো।"

সে ক্রুদ্ধ স্বরে জবাব দিলে, "নিশ্চয়ই না। এই না বললুম, সে অপ্সরী দেখেছিলো।"

আমায় আবার চুপ করতে হলো।

"দাদা বিছানা নিলে, যদিও তার শরীরে রোগের নামগন্ধ ছিলো না। ডাক্তার এলো, টাকা নিয়ে চ'লে গেলো; পুরুৎ এলো, শান্তিজল ছিটিয়ে পালালো। কিন্তু কিছুতেই কিছু হলোনা; সে যেমন প্রকাণ্ড, ঠিক তেমনটিই রয়ে গেলো। কী প্রকাণ্ড—যেন খানিকটা সমুদ্দুর! সান্ বিয়াজ্জোর বুড়ো আঙুলের হাড় দাদাকে ছোঁয়ানো হলো, ফলে হাড় শুকলোনা সন্ধ্যা পর্য্যন্ত।"

আমি সাহস ক'রে শুধালুম, "ফুলে তার চেহারা কি রকম হয়েছিলো?"

"অপ্সরী দেখলে যেমন হয়। আপনি না তাঁকে 'লাখোবার' দেখেছেন? তবে আবার জিগ্‌গেস করছেন কেন? ওঃ, কি দারুণ তার বিষণ্ণতা, যেন পৃথিবীর সমস্ত রহস্য সে ভেদ করেছে! জীবন্ত সকল কিছুর

সংসর্গেই তার শোক উথ্‌লে উঠতো, কারণ সে জানতো যে শেষে সবাই মরবে। ঘুম ছাড়া আর কিছুতেই তার আগ্রহ ছিলোনা।”

আমি ভিজে খাতাখানায় মুখ গুঁজে রইলুম।

“দাদা কাজকর্ম্মে ইস্তফা দিলে, সে খেতে ভুলে যেতো, গায়ে কাপড় আছে কিনা তার মনে থাকতো না। সব ভার এসে চাপলো আমার ঘাড়ে, বোনকে চাকরি নিতে হলো। আমরা দাদাকে ভিখিরী সাজাবার চেষ্টা করলুম, কিন্তু তার সবল শরীর দেখে কারো দয়া জাগলো না। তাকে হাবা ব'লে চালানোও অসাধ্য হলো, কারণ তার চোখে উপযুক্ত চাউনির অভাব ছিলো। কাজেই দাদা শুধু রাস্তায় দাঁড়িয়ে লোকের মুখে তাকিয়ে থাকতো, আর সে যতই চাইতো, ততই তার কষ্ট বাড়তো। কারো ছেলে জন্মালে, সে হাত দিয়ে মুখ ঢাকতো, কেউ বিয়ে করলে, তার অবস্থা এমনি ভয়ঙ্কর হতো যে তাকে গির্জ্জের বাইরে দেখে নবদম্পতীরা উঠতো শিউরে। কে ভেবেছিলো, সে আবার নিজেই বিয়ে করবে! আমি, আমিই সে-কাণ্ড বাধাই, আমিই একদিন তাকে খবরের কাগজ থেকে প'ড়ে শোনাই যে রাগুসার একটি মেয়ে সমুদ্রে নাইবার ফলে পাগল হয়ে গেছে। খবর পেয়েই জুসেপে বিছানা ছেড়ে উঠলো, এক হপ্তা বাদে আবার যখন বাড়ী ফিরলো, তখন তার সঙ্গে সেই মেয়েটি।

“সে নিজে আমায় কিছু বলেনি; কিন্তু শুনেছি, দাদা সিধে গিয়ে মেয়েটির বাড়ি চড়োয়া হয়; তারপর তার ঘরের দরজা ভেঙে তাকে লুটে আনে। মেয়েটির বাপ ছিলো ধনী খনিওয়ালা, কাজেই আমাদের সঙ্কট আপনি কল্পনা ক'রে নিতে পারবেন। এক ধূর্ত্ত উকিলকে সঙ্গে নিয়ে, মেয়ের বাপ এসে হাজির হলো; কিন্তু আমার মতো তাদের জারিজুরিও খাটলোনা। তারা বচসা করলে, ভয় দেখালে, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তাদেরও ফিরতে হলো খালি হাতে; আমাদের কিছুই লোকসান,—অর্থাৎ অর্থদণ্ড, গেলোনা। আমরা জুসেপে আর মারিয়াকে গির্জ্জেয় নিয়ে গিয়ে, তাদের বিয়ে দিয়ে আনলুম। হ্যাঁ! বিয়ে বটে! এমন বিয়ে, যে তার পরে পাদ্রীসাহেব সুদ্ধ একটা

রসিকতা করলেন না, আর রাস্তায় বেরুতেই ছেলেরা ঢিল ছুঁড়তে লাগলো।…আমার মনে হয়, বৌদিকে সুখী করতে পারলে আমার মরতেও আক্ষেপ থাকতো না; কিন্তু সচরাচর যেমন দেখা যায়, এখানেও কারো কর্ত্তাব্বি খাটলো না।”

“তাহলে বেচারাদের ঘরকরণা সুখের হয় নি?”

“তারা দুজনেই দুজনকে খুব ভালবাসতো, কিন্তু ভালোবাসাই সুখ নয়। ভালবাসা সব মানুষের কপালেই জোটে, তার কোনো দামই নেই। বরং এক বেকারের জায়গায় দু জন আসাতে আমার খাটুনি বাড়লো। কারণ বৌদিও ছিলো হুবহু দাদার মতো—তাদের মধ্যে কে কখন কথা কইছে, তা সুদ্ধ বোঝা যেতোনা। আমি বাধ্য হয়ে নিজেদের নৌকো বেচে, আজকের ওই রাঘববোয়ালের তাঁবে চাকরি নিলুম। ক্রমশ আমরা সারা গ্রামের চক্ষুশূল হয়ে উঠলুম। প্রথমটা ছেলেদের বিদ্বেষ জাগলো—যত হাঙ্গামের গোড়া ওইখানে—তার পর মেয়েদের, সব শেষে যোগ দিলে পুরুষেরা। কারণ যত অনর্থের মূল ছিলো—দেখবেন, শেষকালে যেন বিশ্বাসঘাতক হবেন না!”

আমি পণবদ্ধ হতেই, সে স্কুলপালানো বেসবদ ছেলের মতো মুখ ছুটিয়ে দিলে, যাজকদের গাল পেড়ে বলতে লাগলো, তাদের জন্যেই তার সারা জীবন অধঃপাতে গেছে। শেষে সে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে উঠলো, “এমনি ক’রে আজন্মকাল আমরা শুধু ঠ’কেই আসছি”, এবং তার উত্তেজিত পদাঘাতে বালি উড়ে, গুহামধ্যের নীল তরঙ্গভঙ্গকে চোখের আড়াল করলে।

আমিও কেমন বিচলিত হয়ে পড়লুম, অনুভব করলুম যে শত অসম্ভাব্যতা ও কুসংস্কার সত্বেও জুসেপের গল্প যথার্থ, এত দিন সংসার-সম্বন্ধে যত কথা শুনেছিলুম, সে সমস্তের চেয়ে নিগূঢ়তর ভাবে যথার্থ। জানিনা কেন, হঠাৎ আমার মনে জাগলো পরোপকারের আকাঙ্ক্ষা, যেমন দুর্দ্দম, তেমনি নিষ্ফল। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে সে ঘোর কাটলো অচিরেই।

‘‘বৌদির সন্তানসম্ভাবনাই হলো সোনায় সোহাগা। লোকে

বলতে সুরু করলে, 'তোমার সোনার চাঁদ ভাইপোটি কবে জন্মাচ্ছে? এ-রকম বাপ-মায়ের সন্তান নিশ্চয়ই খুব হাসিখুশি, নিশ্চয়ই খুব টুক-টুকে হবে।' আমি কোনো মুখভঙ্গি না ক'রেই জবাব দিতুম, 'সেটা হওয়াই খুব সম্ভব। দুঃখের চূড়াই সুখের গোড়া'—ওটা আমাদের একটা প্রবাদ। কিন্তু আমার উত্তরে তাদের ভয় বাড়তো বই কমতোনা; তারা গিয়ে নালিশ জুড়তো পাদ্রীদের কাছে, তখন পাদ্রীরাও আবার প্রমাদ গণতেন। এমনি ক'রে ক্রমশ একটা গুজব কানাঘুষোয় রটতে লাগলো যে সেই ছেলেটাই স্বয়ং কল্কী, একেবারে এন্টিক্রাইষ্ট্। ভয় নেই, বেচারা ভূমিষ্ঠই হয়নি।

"হঠাৎ একদিন এক বুড়ি ডাইনি ভবিষ্যৎ বাণী সুরু করলে, কেউ তাকে বাধা দিলে না। সে বলতে লাগলো যে দাদা বৌদিকে পেয়েছে বোবা ভূতে, তাদের দ্বারা খুব বেশি অনিষ্টের আশঙ্কা নেই। কিন্তু ছেলেটা মুখে ওলোপ দিয়ে থাকবে না; সে হেসে হেসেই দেবে সকলকে বিগ্‌ড়ে। তার পর একদিন যখন সমুদ্র সেঁচে সে অপ্সরীকে ডাঙ্গায় তুলে আনবে, তখন মানুষের চক্ষু-কর্ণের বিবাদ ঘুচবে একসঙ্গে। অপ্সরী একবার গান ধরলে, কে আটকাবে দ্বাদশ সূর্য্যের উদয়? তখন পোপ যাবেন মারা, মস্‌জিদেগোতে জ্বলবে আগুন, পুড়ে ছাই হবে সান্তা আগাতার ওড়না। তখন অপ্সরীকে বিয়ে ক'রে সে পৃথিবীতে পাতবে তাদের অবিনশ্বর যৌথ রাজ্য।

"সারা গ্রামে হৈ চৈ প'ড়ে গেলো; তখন যাত্রীর মুরসুম, কাজেই হোটেলওয়ালারা ভয় পেলে। তারা একজোটে সাব্যস্ত করলে যে ছেলে না-হওয়া পর্য্যন্ত দাদা বৌদিকে বাইরে বাইরে কাটাতে হবে, খরচের টাকা উঠলো তাদেরই চাঁদায়। যাত্রার আগের রাত্রে পূর্ণিমার আকাশ পূবে হাওয়ায় নির্ম্মল হয়ে গেলো, আর রূপালী মেঘের মতো সমুদ্রের ঢেউ উথ্‌লে উঠতে লাগলো পাহাড়ের ধারে ধারে। সে-দৃশ্য চিরদিনই অপরূপ সুন্দর; তাই মারিয়া বল্‌লে, সেটা আরেক বার না দেখে সে কিছুতেই যাবে না।

"আমি বললুম, 'কাজ নেই, একটু আগে একজন কার সঙ্গে

পাদ্রীসাহেবকে এদিক দিয়ে যেতে দেখেছি। তাছাড়া হোটেলওয়ালারা চায় না যে লোকে তোমায় দেখে, তাদেরও চটালে আমাদের অনাহারেই মরতে হবে।'

"বৌদি বল্‌লে, 'আমি যাবোই। সমুদ্রে ঝড় এসেছে, এমন রাত আর হয়তো কপালে জুটবে না।'

"জুসেপে বল্‌লে, 'না, যেওনা. ও ঠিকই বলেছে। তবে যদি একান্তই যাও, তা হলে আমাদের একজনকে সঙ্গে নিয়ে চলো।'

"কিন্তু বৌদি জবাব দিলে, 'আমি একলা যেতে চাই।' গেলোও একলাই।

"তাদের যৎসামান্য মালপত্র আমি একখানা ছেঁড়া কাপড়ে বাঁধতে বসলুম। কিন্তু অল্পক্ষণেই তাদের হারাবার আশঙ্কায় আমার মেজাজ এমনি খারাপ হয়ে উঠলো যে আমি কাজ ফেলে, দাদার পাশ ঘেঁষে না-ব'সে পারলুম না। ক্রমশ আমার হাত দাদার কাঁধে তুলে দিলুম, আর সেও আমায় ধরলে তার হাতে ঘিরে। এক বৎসর যাবৎ এতখানি ভালোবাসা সে আমাকে একবারও দেখায়নি; কাজেই আস্তে আস্তে আমাদের মন থেকে সময়ের হিসেব মুছে গেলো।

"হঠাৎ আপনা থেকে দরজাটা খুলে গিয়ে ঘরের মধ্যে একত্রে ঢুকলো জ্যোৎস্না আর হাওয়া, আর সেইসঙ্গে ছোটো ছেলের গলায় বাইরে থেকে কে একজন হেসে বল্‌লে, 'পাহাড় থেকে ধাক্কা মেরে দিয়েছে তাকে সমুদ্রে ফেলে'।

"যে-দেরাজে আমার ছোরা-ছুরি থাকতো, চট ক'রে উঠে আমি তার সাম্‌নে দাঁড়ালুম।

"জুসেপে, এত লোক থাকতে স্বয়ং জুসেপে, বল্‌লে, 'বোস্ শীগ্‌গির। ও তো মারা গেছেই, তাই ব'লে কি অন্যদেরও প্রাণদণ্ড হবে?'

"আমি চেঁচিয়ে উঠলুম, 'লোকটা কে, আমি আন্দাজ করতে পারছি, তাকে খুন করবোই।'

"আমি প্রায় ঘর থেকে বেরিয়েছি, এমন সময় দাদা ল্যাং মেরে আমায় ফেল্লে, আমার বুকে হাঁটু চেপে বসলো; তারপর আমার হাত

ধ'রে কব্জি দুটোকে দিলে মুচ্‌ড়ে—একে একে, প্রথমে ডান, তার পরে বাঁ। জুসেপে ছাড়া আর কারো মাথায় এই মৎলব আসতো না। আমার কী ভয়ানক লেগেছিলো, তা আপনি ভাবতে পারবেন না, আমি জ্ঞান হারালুম। যখন চৈতন্য ফিরলো, তখন দাদা উধাও হয়েছে; তাকে আর দেখতে পাইনি।"

কিন্তু জেসেপেকে আমার আর সইছিলো না।

সে আবার বললে, "বললুম তো দাদা মোটেই ভালোমানুষ ছিলোনা। সেইজন্যেই কেউ কখনো কল্পনাও করেনি যে অপ্সরী সন্দর্শন ঘটবে তারই বরাতে।"

"কি ক'রে জানলে যে জুসেপে তাঁর দেখা পেয়েছিলো?"

"কারণ দাদা তাঁকে 'লাখো বার' দেখেনি, মাত্র একটি বার প্রত্যক্ষ করেছিলো।"

"কিন্তু সে যদি এতই মন্দ, তবে তাকে ভালবাসো কেন?"

লোকটি এইবার প্রথম হাসলে, সেই হাসি ছাড়া তার কাছে আর অন্য জবাব পেলুম না।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, "তবে কি এইখানেই গল্পের শেষ?"

"বৌদিকে যে খুন করেছিলো তাকে আমি মারতে পারিনি; আমার কব্জি সারবার আগেই সে এমেরিকা পালালো; তাছাড়া যাজকহত্যা নিষিদ্ধ। আর জুসেপে? সেও সারা জগৎ ঘুরে বেড়ালো, যার ভাগ্যে অপ্সরী সন্দর্শন ঘটেছে, এমন একজন পুরুষ বা মেয়ের খোঁজে। অবশ্য সেই রকম কোনো মেয়েকেই সে বেশি চেয়েছিলো; কারণ তাহলে হয়তো তখনো সেই ছেলের জন্ম সম্ভবপর হতো। কিন্তু দাদার আশা মেটেনি। শেষকালে সে লিভারপুলে—পাড়াটা কি নেহাৎ আজগুবী শোনাচ্ছে?—এসে কাশির সঙ্গে রক্ত তুলতে তুলতে মারা গেলো।

"আমি মনে করিনা, আজ এমন মানুষ জীবিত আছে যে সত্যিই অপ্সরীকে দেখেছে। এক পুরুষে একাধিক লোকের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ বড় একটা ঘটেনি। অন্ততপক্ষে আমার জীবদ্দশায় এমন একজোড়া

স্ত্রী-পুরুষ নিশ্চয়ই জুটবে না, যারা সেই কুমারসম্ভবের উপলক্ষ হবে। সমুদ্র থেকে অপ্সরীকে ডেকে এনে পৃথিবীর মৌন বিনাশ করবে যে-জগত্রাতা, তাকে দেখা আমার অদৃষ্টে নেই।"

আমি চমকে উঠলুম। "জগত্রাতা? ভবিষ্যৎ বাণীর শেষে কি ও-কথাও ছিলো?"

সে পাহাড়ের গায়ে ঠেস দিয়ে সজোরে নিঃশ্বাস নিতে লাগলো, এবং অজস্র প্রতিবিম্বের নীলাভ সবুজ রং ভেদ ক'রে আমি দেখলুম তার মুখে উত্তেজনার লালিমা লেগেছে। শুনলুম, সে বলছে, "মৌন জনশূন্যতারও নিশ্চয়ই শেষ আছে। এ-অত্যাচার একশ বছর টিঁকতে পারে, হাজার বছর চলতে পারে, কিন্তু সমুদ্রের আয়ু আরো দীর্ঘ; সেই চিরস্থায়ী জলে যাঁর বাস, তাঁর গানকে চিরুরুদ্ধ করে, এমন শক্তি মানুষের নেই।" আমি তাকে আরো অনেক কথা শুধাতে যাচ্ছিলুম, কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে সারা গুহাটা অন্ধকার ক'রে আমাদের প্রত্যাগত নৌকা সঙ্কীর্ণ প্রবেশপথে ঢুকে পড়লো।

[E. M. Forster প্রণীত The Story of the Siren নামক ইংরেজী গল্পের অনুবাদ]

কবিতাগুচ্ছ

ওহারু

(নোগুচির "From the Eastern Sea" হইতে ।)

কুমারী ওহারু জাপানী তরুণা নয়ন-ভুলানি শোভা,
(বুক ভরি' তার চেরিমঞ্জরী সুকুমার মনলোভা ।)
নতজানু হয়ে পূজায় নিরতা প্রজাপতি মন্দিরে,
দেবতার কাছে মাঙে পতি-বর ভূমিলুণ্ঠিত শিরে ।
পুষ্প পরাগে চারুগ্রীবা তার সুরভিত রঞ্জিত,
('ক্রিসান্থিমাম্' গুচ্ছে গুচ্ছে বুকে তার সঞ্চিত ।)

কহে বালা, "প্রভু, দাও মোরে হেন পতি যার নিঃশ্বাসে
দীপ্ত সুরভি করিবে অন্ধ আমারে মদির বাসে ।
(ওহারু যে চিতে যতনে নিভৃতে চেরিমঞ্জরী ধরে,
আর সেথা আছে ক্রিসান্থিমাম্ পুঞ্জিত থরে থরে ।)

"ওগো প্রজাপতি, তোমার প্রসাদে পাই যেন হেন বর
কণ্ঠে যাহার গিরি-সানুভূমি-নিরালার মর্ম্মর,
যেথায় লুকায়ে আসে চন্দ্রমা মধুপূর্ণিমা রাতে ।
(ক্রিসান্থিমাম্ চেরির গুচ্ছ ওহারুর সে হিয়াতে ।)

"দাও হেন পতি দৃষ্টি যাহার মন্ত্র প্রস্ফুটানী,
আফিমের রাঙা কুঁড়িরে পবন ফুটায় যে যাদু হানি,'
ভালবাসা যার একটি পাখীর গানে ভরা ঘন বন ।
(ওহারুর বুকে ক্রিসান্থিমাম্ চেরির মুঞ্জরণ ।)

"দাও সেই স্বামী গম্ভীর বাণী শুনিব কণ্ঠে যার,
সেই সাগরের কল্লোলসম,—যেথা সৌরভ-ভার

বহি' আনে বায়ু অজানা দ্বীপের পুষ্প-পরাগ হরি'।
(ওহারুর বুক ক্রিসান্থিমাম্ চেরিতে রয়েছে ভরি'।)

"দাও হেন পতি অঙ্গুলি যার যাদুহানা পরশনে
স্বপন বুলায়ে ফুটাবে আমারে পুষ্পিত জাগরণে,
ওই কাশে ঘাসে যথা সমীরণ বুলায় পরশখানি।
(ওহারুর বুকে ক্রিসান্থিমাম্ চেরিফুল আছে জানি!)

"দাও প্রাণপতি পরাণ যাহার আপনারে পরকাশি'
সরল তরল দিঠিতে আমার নয়নে উঠিবে ভাসি',
—লজ্জা অরুণা অহনার পানে প্রান্তর যথা চায়।
(ক্রিসান্থিমাম্ চেরিমঞ্জরী ওহারু ধরে হিয়ায়।)

"দাও সে প্রাণেশ চুম্বনে যার আমার কুমারী হিয়া
একটি নিশীথে নারী হয়ে সুখে উঠিবে প্রস্ফুটিয়া।
(চেরিমঞ্জরী ওহারুর বুকে ফুটেছে যে থরে থরে,
আর তারি সনে ক্রিসান্থিমাম্ হিয়া তার আলো করে।)

"দাও সে দোসর জীবনের পথে রহিবে যে সাথে সাথে,
কবিতার সনে চাঁদের জোছনা মিশে যথা মধুরাতে
শান্তি-নিথর বীথিপথ পরে ছায়ালোকে অভিরাম।
(ওহারুর বুকে ফুটেছে পুলকে চেরি ক্রিসান্থিমাম্।)

"সেই স্বামী চাই হৃদয় যাহার ভরপুর সৌরভে,
যে সুরভি আমি পেয়েছি নিদাঘে কাননে ঘুরেছি যবে,
কলনিস্বনা ঝরণার বুকে পেয়েছি যে পরিমল।
(ওহারুর বুকে ক্রিসান্থিমাম্ আর চেরিফুলদল।)

"দাও হেন পতি মধুর মূরতি আঁকা যার এ নয়ানে,
পেয়েছিনু যারে জনমের আগে আমার পরাণ জানে।

হারায়েছি যারে এ ধরায় আসি', আমি যে তাহারে চাই।
(ওহারুর বুকে ক্রিসান্থিমাম্ চেরির তুলনা নাই।)

"দাও দাও সেই বাঞ্ছিতধনে যার বুকে 'প্রিয়তম'
এই কথাটি যে আছে অঙ্কিত এই হাতে লিখা মম,
পাইবে দেখিতে বসন আড়ালে মুছিবেনা কোনোদিন।"
(ওহারুর বুকে ক্রিসান্থিমাম্ চেরিরা অন্তরীণ।)

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মৈত্র

সুরু ও শেষ

প্রীতির মদিররাতে চেয়েছিনু তারাভরা আকাশের তলে,
চারিচোখে ফুটেছিল ভাষাহীন প্রকাশের তীব্র আকুলতা,
দৃষ্টির আদিমরূপ স্পর্শের উত্তাপে তাই লভিল পূর্ণতা
ওষ্ঠাধর পথ বাহি মুষ্টিভরা স্বরগের নীবিমোক্ষফলে।

উচ্ছল প্রাণের ছন্দ দেহতটবন্ধ মাঝে নাচিল উল্লাসে,
আন্দোলিত মুক্তবক্ষে উর্ম্মিভঙ্গ-ব্যাকুলতা উঠিল চঞ্চলি,
যৌবন-মানস-ঝঞ্চা মেঘে মেঘে সঞ্চারিল প্রেমের বিজলি,
নিষ্করুণ বজ্র তারে বরে নিল পূর্ণতার আবর্ত্ত-উচ্ছ্বাসে।

চম্পকের তীব্রগন্ধে অন্ধকার বনচ্ছায়া উঠিল চমকি,
কদম্বের শিহরণ নৈশবায়ুলীলাভরে চলিল ভাসিয়া,
আকাশের সর্ব্বঅঙ্গে তারকারোমাঞ্চ-হর্ষ লাগিল আসিয়া,
অকস্মাৎ স্তব্ধরাত্রি কৃষ্ণাবগুণ্ঠন টানি দাঁড়াল থমকি।

বলেছিলে এ আকাশ তৃপ্তিহীন অন্ধকারে হইবে বিলীন,
স্বাদহীন মেঘলোক নির্ব্বিচ্ছেদে ছাইবে অন্তর,
বিরক্ত উদাস ছায়া কায়াশূন্য নিরন্তর অন্ধ ও মন্থর
তোমার বিরহরূপে এ জীবন আবরিয়া রবে চিরদিন।

গুঞ্জরিয়া কয়েছিনু প্রেয়সীরে বক্ষে টানি অন্ধকার রাতে,
জীবনে কামনা সত্য, মৃত মিলনের স্মৃতি বৈধব্যছলনা,
দেহের সৈকতপ্রান্তে জোয়ারের ক্ষতচিহ্ন ক্ষণ আলিম্পনা
লুপ্ত হয় কক্ষচ্যুত তারকার মৃত্যুদীপ্ত শর্ব্বরীবেলাতে।

আজি অমানিশারাতে আবার ফুটেছে তারা আকাশের তলে,
স্নিগ্ধগন্ধ অন্ধকারে মনে পড়ে বিন্ধ্যগিরি-পরপারে তুমি,
হয়তো উন্মার্গ দেখে তোমারে করেছে গ্রাস লুব্ধ মরুভূমি,
হয়তো লভেছে প্রীতি মৃত্যুর নীলিম মুক্তি দিনান্তের জলে।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী

কবিতার মৃত্যু

কাল্‌কের আব্‌ছায়া রাত্রের আঁধারে, জান্‌লার ঠিক নীচে দেখ্‌লাম্—
ঝোপে ঝাড়ে যেখানটা বেল ফুল ফুটেছে মেটে মেটে জ্যোৎস্নার
আলোতে—
ঢল্‌ঢলে লতা পাতা লুটোপুটি খাচ্ছে, এলোমেলো হাওয়া এসে লাগ্‌তে,
আলো আর কালোতে কি কানাকানি চ'ল্‌ছে—সেইখানে মেয়ে এক
অপরূপ!
—চোখে তার চম্‌কায় তারাদের ইসারা, মেঘ-ডুরে শাড়ী তার পরণে,
দুই হাতে পরা তার রবারের লাল রুলি, চুলে তার বুনো ফুল জড়ানো;
চৈতালী ফসলের পাকা শীষ এক গোছা—তার মাঝে মুখ ঢেকে কাঁদছে,
আব্‌ছায়া নিশীথের তারা-ভরা বিজনে, দেখ্‌লাম্ মেয়ে সেই অপরূপ!

* * * *

কাল্‌কের আব্‌ছায়া রাত্রের আঁধারে, শুনলাম্ মেয়ে সেই অচেনা—
আমাকেই ডেকে যেন কেঁদে কেঁদে ব'ল্‌ছে, "চ'ল্‌লাম, চ'ল্‌লাম্ ঢের দূর—
ঐ নীল পাহাড়ের কোল ঘেঁষে ঝর্ণার ঠিক্‌রিয়ে পড়া জলে ছোট নদী
ছুটেছে,

যার তীরে পরীরা জাফ্‌রাণী চুল খুলে আন্‌মনে বাজাচ্ছে এস্রাজ ;
হাল্কা পায়ের তলে খেলে চলে নীল জল—কালো চোখে তারাফুল ফুট্‌ছে ;
দিন নেই, রাত নেই, চির-হাসি চির-আলো—সেই দেশে এতদিন
থাকৃতাম,
কেন তুমি ভুলিয়ে যে নিয়ে এলে এখানে, শেষকালে অবহেলা হান্‌তে ?
আব্‌ছায়া নিশীথের তারা-ভরা বিজনে, শুন্‌লাম কথা সেই অদ্ভুত !

* * * *

ভরা এই দিবালোকে ব'সে ব'সে ভাব্‌ছি, কাল্‌কের ব্যাপার কি স্বপ্ন ?
কার মেয়ে কোত্থেকে এলো এই বাগানে, ব'ল্‌লো যা কিছু তার
মানে হয় ?
ঘুমে ভারা চোখে যাকে দেখ্‌লাম কাঁদ্‌তে, সত্যিই সে কি এসে
কাঁদে নি ?
জ্বল্‌জ্বলে মুখ তার এখনো যে মনে পড়ে······সে আমারি কবিতা
কি অতীতের ?

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত

কবিকিশোর

(১)

God's in his Heaven
All's right with the world.

সহরের বুকে পাঁচতলায়
নেবো সখী এক ছোট্ট ফ্ল্যাট্‌ ।
ট্রাম বাস্‌ ভিড় নিত্য যায়—
উচ্চবৃক্ষচূড়ে দোঁহায়
ভিড়েতে থেকেও কী নিরালায় ।

গোলমাল যেন পায়েতে ম্যাট্।
সহরের বুকে পাঁচতলায়
মধুচক্র সে ছোট্ট ফ্ল্যাট্।

ঘুঘুনি ও ঘুঘু রইবো তায়—
আর্কেডিয়া কি, বুঝবে তাই।
সে ছোট্ট ফ্ল্যাট্, চৌমাথায়—
এলসি ও বব্ রইবো তায়—
ক্ষীণ কোলাহল ভাসে হাওয়ায়
ঘেঁসাঘেঁষি করে' দিন কাটাই।
এল্‌সি ও বব্ রইবো তায়—
কবিজীবন কি বুঝবে তাই।

(২)

প্রিরাফায়েলাইট্

প্রতিটি মুহূর্ত্তে মোর মূর্ত্তি পায় তিক্ত রসহীন
দুর্ব্বাসা বিশ্বের ক্রূর সর্পফণা শাপান্ত কৌতুক।
সূর্য্য দেয় অর্থহীন স্বচ্ছ তার বিদ্রূপ যৌতুক।
রাত্রিশেষে নিদ্রাহীন চুম্বনের জ্বালা হানে দিন।
ভুলে' গেছি কিবা ভুল—দিন মোর ক্লান্ত হতাশ্বাস
হেমন্তের কুষ্ঠরোগে গতপত্র বনানীর মতো।
প্রত্যহপ্রভাতে জানি দিন মোর ব্যর্থতা আহত
মিলাবে রাত্রিতে বৃথা—এ জীবন এক দীর্ঘশ্বাস।

দীর্ঘিকায় ভাসিলাম—তোমাদের তরঙ্গের মাঝে
খাণ্ডবদাহের ক্ষত জুড়ালো না হায় নারী হায়!
কাজলগভীর মৃগনয়নের ঘনপক্ষ্মছায়ে
প্রাণবহ বসন্ত তো নাহি এলো শ্যামপত্রসাজে
শীতমরুচিত্তে মোর নিঃশ্বাসের দক্ষিণহাওয়ায়।

(৩)

হেলেনিষ্ট

চাঁদ চলে' গেছে,
কৃত্তিকা গেলো,
মধ্য রাতি।
প্রহর যায়,
প্রহর যায়,
একেলা কাটাই সঙ্গীহীন।

(৪)

মোনালিসা

মনে মনে বলি,
হে মোনালিসা!
সাইনারা!
এসো মলিন আলোয়।
সহরের মুখে ধূসর সন্ধ্যা নামে।
হৃদয়ে আমার ঘরছাড়া যে গো ডাকে।
আমি চঞ্চল তাই, তাই সুদূরের পিয়াসী।
আমি তাই তো আকাশে কান
পেতে শুনেছি তোমার গান, হে মোনালিসা, হে সাইনারা!
মলিন আলোয় বইয়ের পাতায়
স্বপ্ন আতুর বিদেশী ভাষার মায়ায়
তোমাদের পদপাত
করেছে আমাকে একাগ্র ব্রতচারী।
সাগরের ঢেউয়ে বহুদিন হলো তুলে' তো দিয়েছি পাল,
অশেষ যাত্রা, অসীম সাগর, শুধু পদপাত গুণি।

হে মোনালিসা, শুধু হাসো তুমি মধুরহাসিনী
যখনি শুধাই, ওগো বিদেশিনী, হে মোনালিসা,
ক্লান্ত ঘরের নীরবতা দেখো তোমাকে ডাকে
পেটারের মেয়ে,
কুমারের মন ঘরছাড়া হলো তোমার খোঁজে
কবিতার বাঁকা ইন্দ্রধনুর দুরূহ পথে,
হে সাইনারা, কালো রাত্রির ক্লান্ত ঘুমে,
পরিশ্রান্ত স্বপ্নে তোমার
কুমারের মন কামনাছটায় তোমার আসা
ধমনীর তালে শুধু পদপাত, অকারণ পদপাত।
সাইসিফাস্ যে মরণক্লান্ত, শুধায় তোমায় আসবে? তো এসো
হে মোনালিসা, হে সাইনারা, স্বপ্নসঞ্জীবনীর বীজনে এসো
এসো এই মলিন আলোয় সাগরের শ্বেত কেশর পাণ্ডু দুপায়ে মেখে।
বহুদূরদেশে জড়তার গ্লানি বুকে, সহরের মুখে ক্লিষ্ট সন্ধ্যা নামে।

(৫)

প্রলাপকম্পন

কবিকিশোর ফিরেছি পথে পথে
সাতসমুদ্র তেরো নদীর পার।
যেখানে যতো পাণ্ডু মুখ আছে
বাকি তো কিছু রাখিনি দেখিবার।
কেহ বা ডেকে কয়েছে দুটো কথা,
কেহ বা চেয়ে করেছে আঁখি নত;
কাহারো হাসি ছুরির মতো কাটে,
কাহারো হাসি আঁখিজলেরি মতো।
গরবে কেহ গিয়েছে নিজ ঘর,
কাঁদিয়া কেহ চেয়েছে ফিরে ফিরে।

কেহ বা কারে কহে নি কোন কথা,

কেহ বা জিন্ খায় নি ধীরে ধীরে।

এমনি করে' ফিরেছি পথে পথে

অনেক দূরে ফীটনে পদরথে ;

রূপার দেশে রূপালী রাজবালা

তাহারি গলে এসেছি দিয়ে মালা।

ঘুরেছিলাম মোনালিসার খোঁজে,

লিসির মাঝে তাহার হাসি বুঝি !

দাভিঞ্চির দৈবী নিপুণতা !

সুদূরদেশে রচনা তার খুঁজি।

বাদলমেঘ খুলেছে বেণী তার।

বৃষ্টি ভেজা পার্ক্ষ্ট্রীটের মুখে

প্রহরী আলো জাগালো চিকিমিকি

কদম্বের পুলক মোর বুকে।

সন্ধ্যা আর মেঘের আশ্লেষে

পূরবী বায়ু ফেলিছে দ্রুতশ্বাস,

ওয়াল্ট্‌স্‌ধ্বনি পায়েতে গতি আনে,

হঠাৎ লিসা দাঁড়ালো মোর পাশ।

সাইনারার পূর্ব্বস্মৃতি চোখে !

লিসার হাসি দেহী যে মরলোকে !

রূপার দেশে রূপালী রাজবালা

তাহারি গলে পরায়ে' দিনু মালা !

(৬)

ব্রাহ্মমুহূর্ত্তের স্বপ্ন

চলে' গেছে চাঁদ,

শান্ত ধূসর অন্ধকার,

সূর্য্য এখনো আসে নি,

শীতল স্থির আকাশ,
গ্যাস্ নিবে' গেছে,
জাগে নি কো কাক,
বাতাস চুপ—
শুধু কাঁপে তার, শুধু বাজে শ্বেত বক্ষ তার।

বিষ্ণু দে

বৃষ্টি

অন্ধকার মধ্যদিনে বৃষ্টি ঝরে মনের মাটিতে॥
বৃষ্টি-ঝরে রুক্ষ মাঠে, দিগন্তপিয়াসী মাঠে,
মরুময় দীর্ঘতিয়াসার মাঠে, ঝরে বনতলে,
ঘনশ্যামরোমাঞ্চিত মাটির গভীর গূঢ় প্রাণে
শিরায় শিরায় স্নানে, বৃষ্টি ঝরে মনের মাটিতে।
ধানের ক্ষেতের কাঁচা মাটি, গ্রামের বুকের কাঁচা বাটে।
বৃষ্টি পড়ে মধ্যদিনে অবিরল বর্ষাধারাজলে॥

যাই ভিজে ঘাসে ঘাসে বাগানের নিবিড় পল্লবে
স্তম্ভিত দিঘির জলে, স্তরে স্তরে, আকাশে, মাটিতে।

ধ্বনিত টিনের ছাদে, গলিতে, গ্রামের আর্দ্র মাঠে
জলের ডাহুকী ডাকে, প্রাচীন জলের রলরবে ;
পাখী-নীড় ; বৃষ্টি ঝরে মনের মাটিতে॥

অন্ধকার বর্ষাদিনে বৃষ্টি ঝরে জলের নির্ঝরে
গতির অসংখ্য বেগে, অবিশ্রাম জাগ্রত সঞ্চারে, স্বপ্নবেগে
সঞ্চলিত মেঘে, মাঠে, কম্পিত মাটির অনুপ্রাণে
গেরুয়া পাথরে জল পড়ে, অরণ্য তরঙ্গ শীর্ষে, মাঠে
ফিরে নামে মর্ম্মজল সমুদ্রে মাটিতে।
বৃষ্টি ঝরে॥

মেঘে মাঠে শুভক্ষণে ঐক্যধারে
বিদ্যুতে
আগুনে
ঘূর্ণাঝড়ে
সৃজনের অন্ধকারে বৃষ্টি নামে বর্ষাজলধারে ॥

রচিত বৃষ্টির পারে, রৌদ্র মাটি, রুদ্র দিন, দূর,
উদাসীন মাঠে মাঠে আকাশেতে লগ্নহীন সুর ॥

অমিয়চন্দ্র চক্রবর্ত্তী

সম্পাদকী

সম্প্রতি কলিকাতা দর্শন পরিষদের রজত জয়ন্তী উপলক্ষে এক নিমন্ত্রণ আমার ভাগ্যেও জুটেছিলো। দার্শনিক না-হয়েও সে-অনুষ্ঠানে যোগ দেবার লোভ আমি সাম্‌লাতে পারিনি, কারণ শুনেছিলুম যে তাতে সনাতন সমস্যাগুলোর চর্ব্বিত চর্ব্বণ বন্ধ রেখে, আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয়ের সহকর্ম্মী ও সহধর্ম্মীরা তাঁর সত্তর বৎসরব্যাপী জ্ঞান সাধনার রহস্যোদ্‌ঘাটন করবেন। দুঃখের সঙ্গে মান্‌ছি যে এ-ক্ষেত্রেও আশাকে কুহকিনী ব'লে চিনেছি; ওজস্বিনী বক্তৃতার অনন্ত বন্যায় বারম্বার তলিয়ে গিয়ে এ-কথা যদিও নিঃসন্দেহে জেনেছি যে আচার্য্যদেবের সকল শিষ্যই বিদ্যা-বুদ্ধিতে অদ্বিতীয়, তবু সেই ধুরন্ধরদের আলোচ্য বস্তু, ব্রজেন্দ্রনাথের স্বকীয়তা, সভা পূর্ব্বে যে-তিমিরে ছিলো, এখনো সেই তিমিরেই সমাচ্ছন্ন। অবশ্য আমার মূঢ়তার দায় সেই কৃতকর্ম্মাদের উপরে চাপানো অনুচিত; ক্ষুদ্রবুদ্ধিবশত আমি প্রায়ই বাগবিস্তারের মর্ম্ম হারিয়ে ফেলি, পরে যখন ভাববার অবসর মেলে, তখন দেখি যে প্রথমে যে-কথাকে নিরর্থক লাগে, ক্রমশ প্রকাশ পায় তারই অর্থগৌরব। এবারেও সে-নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটেনি; স্মৃতিতে সে-সভার কার্য্যাবলী অশোভন ঠেকলেও তার আত্মজৈবনিক বাক্যচ্ছটায় এখন আর আমি অভিভূত নেই, অনেক অনুচিন্তার পরে আজ স্পষ্টই বুঝেছি যে দার্শনিকদের গুরুভক্তি স্বপ্রাধান্যের ছদ্মবেশেই লোকসমক্ষে আসে। খুব সম্ভব প্রাচ্য দর্শনের একীভাব ফুটিয়ে তোলার উদ্দেশ্যেই সেদিনকার পণ্ডিতবর্গ নিজেদের বিজ্ঞাপনে গুরুকে বিজ্ঞাপিত করতে চেয়েছিলেন। কারণ শতমুখ আত্মপ্রসাদের মধ্যেও তাঁরা আচার্য্যদেবের নাম নিতে ভোলেননি, প্রত্যেকেই নিষ্কুণ্ঠ চিত্তে বলেছিলেন যে ভারতীভাণ্ডারের বিভিন্ন বিভাগে তাঁদের ব্যক্তিগত উৎকর্ষ ব্রজেন্দ্রনাথের অধ্যাপনা বা সংসর্গের অবশ্যম্ভাবী ফল।

দুর্ভাগ্যক্রমে এ-প্রশস্তি সুশ্রাব্য হলেও মূল্যহীন; কারণ নাটকের সূত্রধার যদিও অপরিহার্য্য, তবু দর্শক স্বভাবতই শুধু কুশীলবদের মনে

রাখে। অবশ্য স্মৃতি-বিস্মৃতির অনেকখানিই দৈবাধীন, এবং লোক-যাত্রার সুপিচ্ছল পথে অধিকাংশ মহাপুরুষের পদরেখাই দুর্নিরীক্ষ্য। বিশেষত যাঁরা দিশারী, কোনো লক্ষ্যে পৌঁছননি, শুধু সম্ভাবনার নির্দ্দেশ দিয়ে গেছেন, তাঁরা হয়তো ঐতিহাসিক মানুষই নন, ঋণকুণ্ঠ সংসার তাঁদের ধার শুধেছে পুরাণের যাদুঘর নির্ম্মাণে। কিন্তু সেই সকল প্রাতঃস্মরণীয় নিয়ামকেরা শত-সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ইহলোক ছেড়েছেন, এবং ব্রজেন্দ্রনাথ আজও জীবিত, ভারতবাসী এখনো তাঁর পরম বাণীর প্রত্যাশায় সমুৎসুক। সুতরাং নিরুদ্দেশের যাত্রী ব'লে তাঁকে এরই মধ্যে রূপকথার রাজ্যে পাঠানো অবিচার তো বটেই, অত্যাচারও কম নয়। কারণ বিদ্যানুরাগ যতই প্রগাঢ় হোকনা কেন, কেবল পাণ্ডিত্য সর্ব্বত্রই উপহাস্য; এবং নানাশাস্ত্র-বিশারদ আখ্যা ব্যতীত যদি অন্য কোনো বিশেষণ শীলমহাশয়কে না-মানায় তবে তাঁর গুণমুগ্ধ গত তিন পুরুষের বাঙালীরা যেমন নির্ব্বোধ, তাঁর প্রেরণায় প্রবর্ত্তিত অগণ্য ভাবুকের দলও তেমনি কপোলকল্পনা। আসলে আচার্য্যদেব বিদ্যা-দিগ্‌গজদের চেয়ে অনেক ঊর্দ্ধ স্তরের লোক, তাঁর সর্ব্বজ্ঞতা নিশ্চয়ই অবিসংবাদিত, কিন্তু আরো অবিসংবাদিত তার ব্যক্তিত্ব। এই ব্যক্তিত্বই তাঁকে এত দিন ধ'রে বাঙালী মনীষার প্রতিভূকল্প ক'রে রেখেছে, এরই কল্যাণে তিনি এত লব্ধপ্রতিষ্ঠ গবেষণার পাথেয় জুগিয়েছেন; এবং এরই দৌরাত্ম্যে তাঁর কোনো স্থায়ী অবদান হয়তো মানুষী চিৎপ্রকর্ষে থাকবে না। কারণ অনেকের মতে অহমিকাই ব্যক্তিত্বের পাদপীঠ, তার সংঘাতে অনুযাত্রের মনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা জাগিয়ে তাকে জ্ঞানান্বেষণে নামানো গেলেও, স্বতন্ত্র সত্যের সন্দেশ আনে মমত্বমুক্ত নিরাসক্তি। অর্থাৎ ব্যক্তিবাদী ভূমাবাদীর বিধর্ম্মী; এবং তত্ত্বরচনার জন্যে একটা কোনো নৈর্ব্যক্তিক তন্মাত্রের অখণ্ড উপলব্ধি যেহেতু অত্যাবশ্যক, তাই নীট্‌শে-প্রমুখ সোহং স্বামীরা দর্শনের অছিলায় কাব্যচর্চ্চাতেই মাতেন, হিউম্‌-পন্থী যুক্তিসর্ব্বস্বদের আয়ত্তে আসে অলক্ষ্যভেদের ব্রহ্মাস্ত্র।

আমি জানি, পূর্ব্ব প্যারাগ্রাফের সিদ্ধান্ত অনেকের কাছেই অসঙ্গত ঠেকবে; এবং আর কেউ তার প্রতিবাদ না-করলেও, অন্ততপক্ষে

আচার্য্যদেবের শিষ্যমণ্ডলী সমন্বয়ে বলবেন যে নিরহঙ্কার ব্রজেন্দ্রনাথ শুধু বিনয়ব্যবহারের জন্যেই বিশ্ববিশ্রুত নন, ভূমানন্দও তাঁর জীবনের আদিম ও অবিকার অনুভূতি। আমার নিজের অভিজ্ঞতাই তাঁদের প্রথম প্রস্তাবের সাক্ষ্য ; এবং তাঁদের দ্বিতীয় দাবি যে অনতিরঞ্জিত, তার প্রমাণ শীলমহাশয়ের তরুণ বয়সের অপ্রকাশিত মহাকাব্য 'দি কোয়েষ্ট্ ইটার্ন্যাল'। অধিকন্তু শুনেছি যে ব্রজেন্দ্রনাথ সত্যের যূপে একাধিক বার স্বার্থবলি তো দিয়েইছেন, এমন-কি বৈষ্ণবদের খৃষ্টের পদান্তে বসিয়েও তিনি ঐতিহাসিক সততাকে দেশাত্মবোধরূপ শনির দশা থেকে বাঁচিয়েছেন। তাহলেও আমার বিবেচনায় আচার্য্যদেব আত্মরত মানুষ ; তাঁর চিন্তাজগতের ভিত্তি যদিও একটা বিরাট উপলব্ধির উপরে, তবু সে-উপলব্ধি আপাতত আত্মোপলব্ধি, তাতে বোধহয় নৈরাত্ম্যের বীজ নিহিত নেই। অবশ্য এ-আত্মোপলব্ধিকে দৈনন্দিন আত্মম্ভরিতার সমপংক্তিতে ফেলা হঠকারিতা ; কিন্তু সাংসারিক অহংজ্ঞানের মতো, দৈন্যবোধের গ্রন্থি থেকেই এরও উৎপত্তি। তবে সে-দৈন্যবোধে ব্যক্তিগত দারিদ্র্যের স্থূল হস্তাবলেপ নেই, ঐকপদিক অসম্পূর্ণতা সেখানে জাতীয় আত্মগ্লানিতে উন্নীত হয়েছে। অর্থাৎ পশ্চিমী ঐতিহ্যের তুলনায় ভারতীয় সংস্কৃতির অকিঞ্চিৎকরতাই তার উপলক্ষ, রামমোহনী গৌরতন্ত্রের প্রতিক্রিয়া হিসেবেই তার সাফল্য, তার ব্যসন প্রাদেশিক কূপমণ্ডূকত্ব। কারণ রামমোহনের পরবর্ত্তীরা অনেক ঠেকে শিখেছিলেন যে সে-অগ্রদূতের নবাবিষ্কৃত ভাবরাজ্যে বাঙালীর উপনিবেশ স্থাপনের উদ্যোগ আদৌ মঙ্গলময় নয় ; সে-অঞ্চলের বাসিন্দারা অতীতের অবরোধ এড়িয়েছে বটে, কিন্তু বর্ত্তমানের স্বায়ত্তশাসন তাদের হাতে আসেনি ; তারা এক দাসখৎ ছিঁড়ে ফেলে আর এক দাসখতে সই দিয়েছে মাত্র, ভিক্ষাজীবিকার বদলে স্বোপার্জ্জনের সামর্থ্য পায়নি। তাই ব্রজেন্দ্রনাথের যুগ স্বাবলম্বনসাধনায় আত্মনিয়োগ করলে ; তাঁর সমসাময়িকেরা তাঁকে নেতৃত্বে ব'রে ত্রিভুবনে খবর পাঠালেন যে পশ্চিমের অমূল্য ধনরত্ন প্রাচ্য কোষাগারেরই লুণ্ঠনাবশেষ। অচিরেই সাংখ্যে হিন্দু 'পজিটিভ্ সায়ান্স'-এর এজাহার বেরুলো ; কণাদ অণুবাদী বৈজ্ঞানিকদের গোষ্ঠীপতি হয়ে

উঠলেন; যে-নব্যন্যায় নবজাত শিশুর ক্রন্দনকে কর্ম্মবাদের অখণ্ডনীয় প্রমাণ হিসেবে গুণে এসেছে, বলা হলো, পাশ্চাত্য লজিক তার সাম্‌নে নিরবধি অধোবদনে থাকবে। উপরন্তু আমরা ভারতের লুপ্ত গৌরবের পুনরুদ্ধারেই থামলুম না; যে-সর্ব্বনাশা ব্যবকলন ও অমানুষিক সত্যানুরক্তি য়ুরোপীয় বুদ্ধিব্যবসায়ীর শ্রেষ্ঠ লক্ষণ, তাতেও তাকে হারানোর আয়োজন চলতে লাগলো। বলাই বাহুল্য সেই উত্তেজিত বিদ্রোহের মধ্যে দার্শনিকশোভন প্রশান্তির সুযোগ স্বয়ং ব্রজেন্দ্রনাথেরও জোটেনি। হয়তো সেইজন্যেই তিনি ভেবে দেখেননি যে প্রাচীন আর্য্যাবর্ত্তে যদি অর্ব্বাচীন অস্তদেশের অশরীরী প্রতিধ্বনি ভিন্ন আর কিছুই না-মেলে, তবে তার নামসঙ্কীর্ত্তন যতটা লজ্জাকর, তার পুনরুজ্জীবন ততোধিক পণ্ডশ্রম।

দৈবকৃপায় সে অনাসৃষ্টির প্রকোপ সম্প্রতি কমেছে; এবং মানসিক পরিশ্রমের আধিক্যে স্বাস্থ্যভঙ্গ না-ঘটলে শীলমহাশয় নিশ্চয়ই 'নিউ এসেজ্‌ ইন্‌ ক্রিটিসিজম্‌' অথবা 'পজিটিভ্‌ সায়ান্সেজ্‌ অফ্‌ দি এন্‌শ্যেণ্ট্‌ হিন্দুজ্‌'-এর অপেক্ষা মহার্ঘ বই এত দিনে অনেক লিখে ফেলতেন। কিন্তু তাহলেও তত্ত্বদর্শনের একটা নূতন সমন্বয় আমরা তাঁর কাছ থেকে ইতিমধ্যে পেতুম কিনা সন্দেহ। বর্ত্তমান জীবনের অশেষ বৈচিত্র্যই যদিও এই সংশয়ের প্রথম কারণ, তবু ব্রজেন্দ্রসাহিত্যের সর্ব্ববাদিসম্মত দুর্ব্বোধ্যতা, এবং পক্ষান্তরে তাঁর অনুষঙ্গপ্রধান চিন্তাপ্রকরণের বিশৃঙ্খলাও, এজন্যে কিয়দংশে দায়ী। অবশ্য এই দুরূহতা, এই অবচ্ছেদ যে একটা স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রাক্তন অভিজ্ঞার সংস্পর্শে সঞ্জীবিত, তাতে হয়তো মতান্তর নেই; এবং সেইজন্যেই তাঁর মনকে আবাল্য পরিণত বলাও সমীচীন। তার মানে এ নয় যে আচার্য্যদেবের মতামত জন্মাবধি বদলায়নি; বরং উল্‌টোটাই সত্য, এবং তাঁর কৈশোরিক হোগেল্‌-ভক্তি বার্দ্ধক্যে স্বভাবতই বৈদান্তিক ব্রহ্মবাদে মিশে গেছে। কিন্তু এই পরিবর্ত্তন স্বাভাবিক হলেও অনিবার্য্য নয়; এর মধ্যে কোনো অকাট্য যুক্তিসূত্রের চিহ্ন মেলেনা; ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের উপরে তাঁর অগাধ আস্থাই তাঁকে সমস্ত তুলামূল্য উৎরিয়ে অবাধ নিঃশ্রেয়সের সাম্‌নে এনেছে। সুতরাং এই

ব্রহ্মজ্ঞানের সঙ্গে হেগেল্-এর ডায়ালেক্‌টিক্-প্রসূত নির্ব্বিকল্প কৈবল্যের কোনো সম্পর্ক নেই। এ-নিরুপাধিক অনুভূতি অচিন্ত্য; অপবাদ-ন্যায়ের নেতি-নেতিই এর একমাত্র সংজ্ঞা; এবং তত্ত্বদর্শনের উদ্দেশ্য যেহেতু মানুষের অতিবিশিষ্ট অভিজ্ঞতাকেও সামান্যের অনুবন্ধে বাঁধা, তাই ব্রজেন্দ্রনাথের স্বয়ংসিদ্ধি এ-পর্য্যন্ত কোন চিন্তাপরম্পরা গড়তে পারেনি, মরমী প্রভাবে অন্তরঙ্গদের অন্তঃপ্রেরণাই জুগিয়েছে। সে-ইষ্টাপত্তিও নিশ্চয় অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য; কিন্তু যাঁরা তত্ত্বসমন্বয়ের প্রণেতা, তাঁদের ধরণ-ধারণ অন্য রকমের; বুদ্ধি ও ধারাবাহিকতাই সে-প্রতিভার গুণ; সে-প্রকৃতি মুখ্যত হেতুপ্রভব। তবে হেতুবাদে নির্ভর ঘুচলেই অন্বীক্ষা অধঃপাতে যায় না; এবং ব্যাড্‌লি-বর্ণিত সত্যের স্বরূপে সদসদের নির্দ্বন্দ্বও তর্কশাস্ত্রের অনুমোদিত। অতএব উপরোক্ত মন্তব্যের সাহায্যে ব্রজেন্দ্রনাথকে অ-ন্যায় আচরণের জন্যে সনাক্ত করা আমার অনভিপ্রেত। কিন্তু তত্ত্বজিজ্ঞাসু আর গণিতবিলাসী বিপরীত পথের পথিক; এবং শেষোক্তের শুচিগ্রস্ত নিত্যপদ্ধতি প্রায়ই প্রথমোক্তের ব্যবহারে আসে না। কারণ তথ্যই যদিও সব অনর্থের মূল, তবু তা ছাড়া তত্ত্বের অন্য উপকরণ নেই; এবং তত্ত্বের পক্ষে অন্তর্দর্শন আবশ্যক বটে, কিন্তু ভূয়োদর্শনও দুরাক্রম্য। এইখানেই সমন্বয়ের প্রয়োজন; এবং তাত্ত্বিক যখন নিজেকে কোনো নির্ব্বিভাষিক নিয়মের নিমিত্তমাত্র ভেবে, পুরুষার্থ আর পরমার্থের দুস্তর ব্যবধানে লজিকের সেতুবন্ধ গড়েন, তখনই তিনি তথাগত, তার আগে পর্য্যন্ত ব্যাসকূটের পদকর্ত্তা দ্বৈপায়ন।

আমার অনুসারে ব্রজেন্দ্রসাধনার অন্তর্গূঢ় নিঃসম্পর্কতাই আর্য্য আদর্শের অমোঘ অভিব্যক্তি। প্রতিকূল জনশ্রুতি সত্ত্বেও আমি মনে করি যে আমাদের চিত্তবৃত্তি প্রকৃত ফিলজফির অনুকম্পায়ী নয়; আমাদের কাছে প্রামাণ্য এখনো প্রজ্ঞার অগ্রগণ্য; এবং সে-প্রামাণ্য যদিও আধুনিক কালে আপ্তবাক্যের আঁচল ছেড়ে আত্মবেদের ভেক নিয়েছে, তবু যুক্তিকে আমরা জাল ব'লেই জানি, তার বিশ্লেষণেই যে আবদ্ধ বুদ্ধির লোকোত্তরযাত্রা সম্ভব, এমন বিশ্বাসে আমরা অনভ্যস্ত। কাজেই

বৈনাশিকেরা এ-দেশে তিরস্কার কুড়িয়েছে, প্রাচী পূজা করেছে ধর্ম্মধ্বজদের। সেইজন্যেই হিন্দু দর্শন সার্থক গদ্যে লিপিবদ্ধ হয়নি, সূত্রাকারে অথবা সংক্ষিপ্ত শ্লোকে তা স্বাধিকারপ্রমত্ত ভাষ্যকারদের আশ্রয় দিয়েছে। সেই কারণেই একই ন্যায়নিষ্ঠার তাগিদে জ্যামিতির গড়া-ভাঙা ভারতীয় কীর্ত্তিকলাপের অন্তর্গত নয়, পাশ্চাত্য ধীশক্তির সর্ব্বোৎকৃষ্ট নিদর্শন। কিন্তু বিদেশের আত্মঘাতী বিচারবুদ্ধি বিজ্ঞানের পক্ষেই অপরিত্যাজ্য, জ্ঞানের নিকষে স্বদেশের আধ্যাত্মিক সহৃদয়হৃদয়সংবেদ্যতাও অতিশয় উপকারী; এবং জ্ঞান আর বিজ্ঞানের অভিধা যেকালে আজ অবধি আলাদাই আছে, তখন এ-ক্ষেত্রে একাগ্রতা নিশ্চয়ই মারাত্মক। বস্তুত ব্যক্তির মতো জাতির মধ্যেও অধিকারভেদ বিদ্যমান; এবং পশ্চিমের ভাবধারা যেমন অভিব্যাপ্ত স্বতোবিরোধের আবিষ্কারে যুগযুগান্তর কাটিয়েছে, পূর্ব্বের ধ্যান-ধারণা তেমনি সেই বিরোধের পরপারে আবহমান কাল খুঁজেছে অনির্ব্বচনীয় প্রজ্ঞাপারমিতাকে। বিশ্বমানবের ঐশ্বর্য্য বাড়াতে দুই পরিশীলনই সমান মর্য্যাদাবান, এবং এই সত্যকে সর্ব্বাগ্রে অঙ্গীকার করেছিলেন ব'লেই রামমোহন রায় অবিস্মরণীয়। শুনেছি, শীলমহাশয়ও রামমোহনের পরম ভক্ত; এবং তাঁর অবচৈতন্যে সে-মৈত্রীর ঝঙ্কার বাজুক কি না-বাজুক, তাঁর বিশ্বম্ভর পাণ্ডিত্য যে সে-সঙ্কলনধর্ম্মেরই রূপান্তর, তাতে প্রতর্কের অবকাশ নেই। সুতরাং আজকের বহুধাবিভক্ত সমাজে তাঁর সক্রিয় উপস্থিতি নিতান্ত বাঞ্ছনীয়, তাঁর দীর্ঘায়ু সকল মানবপ্রেমিকের অবশ্যকাম্য। কারণ কোষ্ঠীবিচারে আচার্য্যদেব সক্রেটিস্-বংশের শেষ কুলপ্রদীপ; সুসম্বদ্ধ 'সিস্‌টেম্' রচনা তাঁর কর্ত্তব্য নয়, প্রতিবেশকে মন্ত্রদীক্ষা দিয়েই তিনি ভারমুক্ত। তাঁর ঐকান্তিক অন্তর্দৃষ্টি জাগতিক বীক্ষায় পর্য্যবসিত হবে পশ্চাদ্‌গামী প্লেটোর প্রয়োগে; এবং সে-প্লেটোর কণ্ঠস্বর যদি আজও বাঙালী না-শুনে থাকে, তবে ব্রজেন্দ্রনাথের কোনো দোষ নেই, অপরাধ বাংলার দুরদৃষ্টের।

* * * *

স্থানের কার্পণ্যে গত সংখ্যায় টমাস্ মান্-এর ষষ্টিতম জন্মোৎসবের

খবর পরিচয়ের পাঠকবর্গকে দিতে পারিনি। সৌভাগ্যক্রমে বাংলা বৎসর গণনায় তিনি এখনো ষাটে। কিন্তু তা না-হলেও এ-প্রসঙ্গে সাহিত্যামোদীরা সানন্দেই কান পাততেন। কারণ কেবল বয়সের গুণেই মান্ আমাদের নমস্য নন; এমন-কি বর্ত্তমান উপন্যাসিকদের পুরোবর্ত্তী ব'লেও তিনি আজ আমাদের মন জুড়ে নেই; তাঁর উপরে হিট্‌লার-রাজ্যের অত্যাচারই তাঁকে সম্প্রতি স্মরণীয় করেছে। যুদ্ধ শেষে বিজেতাদের নির্য্যাতনে তিনি যেমন তাঁর উদারনীতি ভোলেন নি, আজ তেমনি স্বদেশের হাওয়া বদ্‌লেছে জেনেও তিনি তাঁর স্বাধীনতা-বিলাসী বন্ধুদের ছাড়তে অনিচ্ছুক; এবং এই অপরাধে, শুধু তিনি নন, তাঁর সমগ্র পরিবার এখন নাৎসিদের চক্ষুশূল। আজ তাঁর বিষয়সম্পত্তি সরকারে বাজেয়াপ্ত, তাঁর পুস্তকাবলীর প্রচার নাকি জার্ম্মানিতে অবিহিত, স্বভাষী পত্রিকাগুলি তাঁর নিন্দারটনার ব্রত নির্ব্বিবাদে মেনে নিয়েছে, এবং তিনিও তাঁর আত্মীয়-স্বজন কিছু দিন থেকে স্বদেশবিতাড়িত হয়ে অগতির গতি সুইট্‌জার্ল্যাণ্ডে বাসা বেঁধেছেন। অবশ্য তাঁর উপস্থিত অবস্থায় বিস্ময়ের কারণ নেই; কেননা জার্ম্মান্ চরিত্র চিরদিনই বৈশিষ্ট্যবিনাশী, এবং কান্ট্ থেকে আরম্ভ ক'রে অনেক জার্ম্মান ভাবুকই রাজপুরুষের নিগ্রহ সয়ে গিয়েছেন। তৎসত্ত্বেও মানুষের অক্ষয় উত্তরাধিকারে জার্ম্মানির দান যে নগণ্য নয়, তার জন্যে দায়ী মান্-এর মতো আত্মমর্য্যাদাবান ব্যক্তির ধৈর্য্য ও ক্ষমা, তাঁদের অদম্য সত্যানুরক্তি ও অসামান্য স্বার্থত্যাগ। জার্ম্মান মেধা মন্থরগামী, ল্যাটিন জাতির কাছে যে-সত্য নিমেষে ধরা দেয়, তাকে জার্ম্মান পণ্ডিত খুঁজে পান আমরণ অনুসন্ধানে। কিন্তু হয়তো এইজন্যেই তাঁদের জেদ কুক্কুর্দুর্ল্ভ, মানস সংগঠনে স্থিতিস্থাপকতার অভাববশত তাঁরা যখন সকল পথ মাড়িয়ে চরম পথে দাঁড়ান, তখন তাঁদের সেখান থেকে টলানো প্রায় অসাধ্য। মান্-এর মুক্তিমার্গও সেই সনাতন উপায়ে আবিষ্কৃত, এবং যুদ্ধের সময়ে তিনি কাইজারী ধনতন্ত্রের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। কিন্তু শৃঙ্খলা ও চিরাচারের প্রতি তাঁর স্বাভাবিক পক্ষপাত কোনোমতেই টিঁক্‌লোনা, এবং কর্ত্তাদের বিশ্বাসঘাতকতার অসংখ্য নমুনা দেখে তিনি

অবশেষে বুঝলেন যে রাষ্ট্রচালনার ভার জনগণের হাতে আসা উচিত। তাহলেও উচ্ছৃঙ্খলতায় তিনি চিরকালই বীতশ্রদ্ধ, এবং তাঁর অভ্যস্ত মিতভাষণের ফাঁকে ফাঁকে যে-দু-একটা রাজনৈতিক মতামত আমরা শুনেছি, তার ধুয়া সংযম ও শালীনতা। এই পরিপ্রেক্ষণিকা তিনি এখনো হারাননি ; এবং দেশবাসীর যে-ধ্বংসতাণ্ডব স্বয়ং আইন্‌ষ্টাইন্‌-কেও তিতো ক'রে তুলেছে, সে বিভীষিকায় মান্‌-এর মুখ ফোটেনি। 'য়োসেফ্‌ উণ্ড্‌ জাইনে ব্রুডার'-নামক তাঁর সদ্য প্রকাশিত ত্রিপিটক প্রতি পৃষ্ঠাতেই শান্ত, শিব, সুন্দরের অবিকল আরাধনায় পূর্ব্ববৎ তন্ময় ; বাইবেল-বর্ণিত জোসেফের নির্ব্বাসনকাহিনীর আনুকূল্য পেয়েও তিনি তাঁর উৎপীড়িত সহধুরীদের মতো উপন্যাসকে অভিযোগ জ্ঞাপনে লাগাননি ; এবং এই বইগুলির গল্পাংশের সঙ্গে লেখকজীবনের ঘটনাগত সাদৃশ্য যদি বা কোনো গভীরদর্শী পাঠক খুঁজে পান, তবু এ-কথা না-মেনে গত্যন্তর নেই যে নায়কচরিত্রের নিষ্ঠুর বিশ্লেষণ সর্ব্ববিধ আত্মশ্লাঘার পরিপন্থী। এই রকমের নির্লিপ্তিই রসস্রষ্টাকে মন্ত্রদ্রষ্টার পর্য্যায়ে আনে, ভোগাসক্ত শিল্পিসমাজে এর দৃষ্টান্ত নিতান্ত বিরল ; তাই মান্‌-কে আজ আর আমি শুধু রূপদক্ষ হিসেবেই দেখছি না, তাঁকে প্রণাম জানাচ্ছি তিনি মুমূর্ষু মানবসভ্যতার অবশিষ্ট কেতনবাহীদের অন্যতম ব'লে। আমার বিশ্বাস, একদিন য়ুরোপে এই রকম মানুষ একাধিক জন্মাতো ; এবং সেইজন্যেই পশ্চিম আজও জগজ্জয়ী। কিন্তু তাঁদের যুগ আর নেই, তাঁদের জীবনকাহিনী এখন কিংবদন্তীর সামগ্রী, তাঁদের পুনরুত্থানও হয়তো প্রাকৃতিক নিয়মেই নিষিদ্ধ।

* * * *

চিত্রগুপ্তের অফুরন্ত খাতার প্রতিযোগিতা পরিচয়কে সাজে না। গত কয়েক বছর ধরে কৃতী মানুষের তিরোধান যে-দ্রুতবেগে বেড়ে চলেছে, তাতে মনে হয় পৃথিবীর মহাপ্রাণ সন্তানগণ স্বৈরিণী মায়ের সঙ্গে ধর্ম্মঘট করতেই বদ্ধপরিকর। তাছাড়া এই কর্ম্মবীরেরা শুধু সংখ্যাতে অগণ্য নন ; তাঁদের প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে এত স্তরভেদ আছে যে হাতে স্থান ও সময়ের পর্য্যাপ্তি থাকলেও, সর্ব্বমুখীনতার অভাবে আমি

সে-সকল জীবনবৃত্তান্তের সংক্ষেপসার দিতে পারতুম না। কিন্তু শত অযোগ্যতা সত্ত্বেও আমার পক্ষে অধ্যাপক সিল্‌ভ্যাঁ লেভি-র মৃত্যুকে নীরবে মেনে নেওয়া শক্ত। তার কারণ এ নয় যে অসংখ্য ভারতবাসীর মতো আমিও অধ্যাপক লেভি-র সঙ্গে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ। তাঁর সম্বন্ধে এ-কথাও বলা চলে না যে তিনি ভারতবেত্তা সুধীমণ্ডলের শিরোমণি। কিন্তু এ-প্রশংসা বিদ্বজ্জনের মধ্যে বোধহয় তাঁর একলারই প্রাপ্য যে বিশেষজ্ঞ হয়েও তিনি মনুষ্যধর্ম্মের বাদ সাধেননি, এবং বৈদগ্ধ্যকে পাণ্ডিত্যের উপরে তুলে, নিজের ও শিষ্যদের জীবন থেকে টিউটনিক একদেশদর্শিতার ভূত তাড়িয়েছিলেন। হয়তো তাঁর সহজ সভ্যতা আর মৌল সংস্কৃতিই তাঁকে প্রাচ্য পুরাবৃত্তে টেনেছিলো; এবং শুনেছি, আধুনিক ভারতে ওই দুই সম্পদের শোকাবহ স্বল্পতা দেখেই তিনি এ-দেশে বৃটিশ শাসনের চিরপ্রতিষ্ঠা চেয়েছিলেন। খুব সম্ভব শেষ অভিমতটি দুর্মুখদেরই কপোলকল্পিত; অন্ততপক্ষে তাঁর রচনাবলী ঘেঁটে এমন কোনো প্রক্ষিপ্ত হঠোক্তির আবিষ্কার দুঃসাধ্য, যার অনুমোদনে লেভি-কে ভারত সরকারের অন্ধ স্তাবক বলা চলে। কারণ তাঁর প্রকৃতি শান্তিপ্রিয় ও রক্ষণশীল ছিলো বটে, কিন্তু লেভি-র আচারে ব্যবহারে অন্যায় বর্ণাভিমানের নাম-গন্ধও কোনোদিন ধরা পড়েনি; এবং আকস্মিক জাতিছত্রকে উত্তরসামরিক য়ুরোপ কী পরিমাণে বিষিয়ে উঠেছিলো, তা তিনি মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করেছিলেন ব'লেই প্যালেষ্টাইনে য়িহুদি রাজ্যের পরিকল্পনা তাঁর সমর্থন পায় নি। লেভি-র জার্ম্মানি-বিদ্বেষও সেই নির্ব্বিরোধনীতির বিপরীত দিক; এবং তাঁর মৃত্যুর অনতিপূর্ব্ব থেকে সে-দেশের নৃশংস বর্ব্বরতা যে-সংহারমূর্ত্তি ধরেছে, তার পরে তাঁর আতঙ্কের হেতুনির্ণয়ে স্বার্থসিদ্ধির নাম নেওয়া শক্ত। কিন্তু লেভি-র মাতৃভূমির অবস্থাও নিরাপদ নয়, এবং তাঁর অন্তর্দ্ধানে ফরাসীর ধ্বংসোমুখ মাত্রাজ্ঞান আর একটি মানদণ্ড হারালো।

পুস্তক পরিচয়

বীথিকা—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত (বিশ্বভারতী)

উনবিংশ শতাব্দীর কবি একদা উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে ব'লেছিলেন—

The moving accident is not my trade,
To freeze the blood I have no ready art,
'Tis my pleasure alone in a summer shade
To pipe a simple song for a thinking heart.

উনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাসে পৃথিবীর একমাত্র স্মরণীয় ঘটনা হচ্ছে ফরাসী বিপ্লব। সমাজ বা রাষ্ট্রতন্ত্রের যে নিশ্চিত ভিত্তিকে আশ্রয় ক'রে মানুষ দিন কাটাচ্ছিল, সেটা এই আকস্মিক বিক্ষোভে কতকটা টাল্ খেয়েই আবার সাম্‌লে গিয়েছিল। তাই তখনো মানুষের জীবনে ছিল প্রচুর প্রশান্তি—সেই যুগের কবি নিদাঘের পল্লবচ্ছায়ায় বাঁশী বাজাবার অবকাশ পেয়েছিলেন। জীবনের এই সরল অবাধ গতি প্রতিহত হ'ল বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে—সমরোত্তর পৃথিবীর জীবন যখন অন্তর ও বাহিরের অজস্র দুর্য্যোগের আবর্ত্তে ঘুরপাক্ খেতে আরম্ভ ক'রলো, তখন দেখা গেল ভাবপ্রবণ হৃদয় হয়ত এখনও আছে, কিন্তু কালধর্ম্মে পল্লবচ্ছায়া অপসারিত হ'য়ে গেছে—রৌদ্রতপ্ত নিদাঘের কঠিন বাস্তবই চোখের সামনে জ্বল্‌জ্বল্ কর্‌ছে! বিংশ শতাব্দীর কবি তখন ব'ল্‌লেন—

To sing of rolling wheels of multifarious parts,
Of dust-marked cities resonant with their noise,
And blindfolded vapid clouds in curling dirts,
I stand a poet here of undreaming stifled voice.

উভয় শতাব্দীর কাব্য-দৃষ্টির মধ্যে এই যে মূলগত বিভিন্নতা একে যুগধর্ম্ম ব'লে এক কথায় বাতিল করা যায় না। প্রচলিত রসশাস্ত্রের আইন কানুনকে উপেক্ষা ক'রেই আজকের কবিতা তার স্বীকৃতির দাবী উপস্থিত ক'রেছে। যে প্রত্যক্ষ সংসারের গণ্ডীবদ্ধ বিচরণ-ক্ষেত্রকে আমরা অভ্যাস-মলিন ও মাধুর্য্য-বর্জ্জিত ব'লে মনে করি, যাকে আশ্রয় ক'রে আমাদের সত্তা অথচ যার সম্বন্ধে আমাদের অসন্তোষের অন্ত নেই, তাকে আমাদের চিন্তা, কল্পনা, আশা, আকাঙ্ক্ষার আলোকে অনুরঞ্জিত ক'রেই আজকের কবিতা অভিনবত্ব অর্জ্জন ক'রেছে। বল্গাহীন কল্পনা-বিলাসের তাই আজ অবসর কম, আজ তাই মাত্র সুন্দরকেই কাব্যরাজ্যের সার্ব্বভৌম প্রভু ব'লে স্বীকার করা চলেনা! বিংশ শতাব্দীর কবির ভাষায় তাই বিদ্রোহের সুর শোনা গেল!

কিন্তু একটা যুগ থেকে আর একটা যুগের ক্রমাভিব্যক্তি ত পদার্থ-বিজ্ঞানের শাসনাধীন নয়—কাজেই উভয় শতাব্দীর মধ্যে অদৃশ্য যোগসূত্র থাক্‌বেই। যাঁরা

পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের গোড়া ঘেঁষে জন্মেছেন তাঁদের বেশীর ভাগটা থাকে পূর্ব্বে নিবদ্ধ, কমটা আসে পরের দিকে—আবার যাঁরা বর্ত্তমান শতাব্দীর ভাব-ভূমিতেই ভূমিষ্ঠ তাঁরাও প্রাক্তন ধারাকে সম্যকরূপে পরিহার ক'রে যেতে পারেন না। অবশ্য অনেকটা নির্ভর করে চিত্ত-ধর্ম্মের ওপর, নইলে ব্রিজেস্, ইয়েট্স্, হাউস্‌ম্যান, এ-ই উনবিংশ শতাব্দীর ধারাকে অবলম্বন ক'র্‌লেন, অথচ তাঁদের চেয়ে তরুণ নন্ এমন যে লরেন্স, এলিয়ট্, ফ্লেকার, নয়েজ তাঁরা হ'লেন বিংশশতাব্দীর অগ্রদূত! অতি আধুনিক স্পেণ্ডার প্রভৃতির সঙ্গেই তাঁদের মনোবৃত্তির অধিকতর সম্বন্ধ। তবে একথা অবশ্য কেউ ব'ল্‌বে না যে কাব্য-রাজ্য থেকে সুন্দর নির্ব্বাসিত হ'য়েছে, কল্পনার পক্ষচ্ছেদ হ'য়েছে, স্বপ্নের অবগুণ্ঠনমুক্ত ক'রে তাকে সম্পূর্ণ নিরাবরণ ক'রে ফেলা হ'য়েছে—সবই আছে এখনো, তবে আকার বদ্‌লে গেছে। শুধু উনবিংশ শতাব্দীর Transcendentalismএ মানুষ আজ বিশ্বাস করে না—অর্থাৎ যে স্বপ্ন শূন্যাশ্রয়ী তাতে আজ আমাদের মোহ নেই, আজ মানুষ চায় স্বপ্নই হয়ত, কিন্তু তার পায়ের তলায় মাটিটা শক্ত হওয়া দরকার। তার জান্তব অস্তিত্বটা তার কাছে আজ অনাবশ্যক নয়, সেটাই বোধ হয় ষোল আনা। উভয় শতাব্দীর রসবোধের মধ্যে তফাৎটা যা তা বোধ হয় এই।

প্রশ্ন উঠতে পারে রবীন্দ্রনাথের কাব্যালোচনার প্রারম্ভে এ গৌরচন্দ্রিকার সার্থকতা কি? সার্থকতা কি জানিনে, তবে মনে হয় রবীন্দ্র-কাব্য সম্বন্ধে আমরা যে পাকা-পাকি সিদ্ধান্ত ক'রে বসেছিলাম তা পরিবর্ত্তনের সময় এসেছে। পূরবী থেকে বীথিকা পর্য্যন্ত, মোটামুটি এই দশবৎসরের রবীন্দ্র-কাব্য একটি বিশেষ ধারার সূত্রপাত ক'রেছে ব'লে আমাদের বিশ্বাস—এর মাঝখানে আছে বনবাণী, মহুয়া, পরিশেষ ইত্যাদি। শেষ সপ্তক ও পুনশ্চকে না হয় এই পর্য্যায় থেকে বাদই দিলাম কারণ কবি নিজেই ওদের স্বাতন্ত্র্যের দাবী করছেন!

এই দশ বৎসরকে রবীন্দ্র কাব্যের আধুনিক যুগ বা প্রতিক্রিয়ার যুগ নামে অভিহিত ক'র্‌লে কবি কুপিত হবেন কিনা ব'ল্‌তে পারি না! কিন্তু তিনি পুনঃপুনঃ স্ফুট কণ্ঠে যদিও প্রচার ক'রেছেন যে তিনি আধুনিকতার সমর্থক নন তবু তাঁর অজ্ঞাতসারেই এই কয় বৎসরে তাঁর কাব্যের দৃষ্টি-ভঙ্গিমায় আধুনিকতা প্রবেশ ক'রেছে প্রচুর! নইলে আমাদের কৈশোরকালের পরিচিত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাব্যে আমরা কি এই একেবারে আধুনিক রেশটুকু পেতাম?

গৌরবরণ তোমার চরণ-মূলে
ফল্‌সা বরণ সাড়ীটি ঘেরিবে ভালো,
বসন-প্রান্ত সীমন্তে রেখো তুলে,
কপোল-প্রান্তে সরু পাড় ঘন কালো।
এক গুছি চুল বায়ু উচ্ছ্বাসে কাঁপা
ললাটের ধারে থাকে যেন অশাসনে।

* * * *

মনে আসে তুমি পূব্ জানালার ধারে
পশমের গুটি কোলে নিয়ে আছ ব'সে,

উৎসুক চোখে বুঝি আশা করো কারে,
আল্‌গা আঁচল মাটিতে প'ড়েছে খ'সে।
অর্দ্ধেক ছাদে রৌদ্র নেমেছে বেঁকে,
বাকি অর্দ্ধেক ছায়াখানি দিয়ে ছাওয়া,
পাঁচিলের গায়ে চিনের টবের থেকে
চামেলি ফুলের গন্ধ আনিছে হাওয়া। ইত্যাদি

অবশ্য একথা ব'ল্‌তে পারি না যে পূরবী থেকে বীথিকা পর্য্যন্ত আস্‌তে আস্‌তে রবীন্দ্রনাথের সমগ্র outlookই বদ্‌লে গেছে—সেটা গায়ের জোরে বলা হবে। তবে আমাদের অতি-সন্নিহিত লোকায়ত আবেষ্টনীর মধ্যে একান্ত সহজভাবেই তাঁকে বার বার আস্‌তে দেখেছি—যেটা মানসী, সোনার তরী, খেয়া বা চিত্রার আমলে আশাতীত ছিল! বলাকার যুগে ত বটেই। পূরবী থেকেই এই মানুষী ভাবের সূত্রপাত—এই সঙ্গে কবি সময় সময় অসুন্দরকেও তাঁর কাব্যে আশ্রয় দেবার চেষ্টা ক'রেছেন, 'পশুর কঙ্কাল' থেকেই তার আরম্ভ—বীথিকাতেও সে রকম কবিতা দুষ্প্রাপ্য নয়। যেমন—

স্বাস্থ্যহীন বীর্য্যহীন যে হীনতা ধ্বংসের বাহন,
গর্ত্তখোদা কৃমিগণ
তারি অনুচর,
অতি ক্ষুদ্র, তাই তারা অতি ভয়ঙ্কর;
অগোচরে আনে মহামারি,
শনির কলির দন্ত সর্ব্বনাশ তারি।

এর তুলনায়—

আরণ্যক তীব্র হিংসা সেও
শত গুণে শ্রেয়।

বলা বাহুল্য উর্ব্বশী, নিরুদ্দেশ যাত্রা, বা বসুন্ধরার রবীন্দ্রনাথ আর এ রবীন্দ্রনাথ এক ধারার কবি নন্‌। এ রবীন্দ্রনাথ হুইটম্যান্‌, স্যাণ্ডবার্গ, লরেন্স, প্রভৃতির সগোত্রীয়!

আর একটি নূতন সুর দেখা যায় এই পর্য্যায়ের কাব্যগুলিতে—সেটারও দাবী আধুনিক। একান্ত সাধাসিধে ঘরোয়া জিনিষকে কাব্য ক'রে তোলা—দেখ্‌তে শুন্‌তে, নাড়্‌তে চাড়্‌তে যাতে রং ঝক্‌মক্‌ ক'রে ওঠে, কিন্তু বিশ্লেষণ ক'রতে গেলে যাতে কিছুই মেলে না একটু সুর একটু ছবি ছাড়া—এও রবীন্দ্র-রীতির বহির্ভূত জিনিষ!

সুদূর আকাশে ওড়ে চিল, উড়ে ফেরে কাক,
বারে বারে ভোরের কোকিল, ঘন দেয় ডাক।
জলাশয় কোন গ্রাম পারে,
বক উড়ে যায় তারি ধারে,
ডাকাডাকি করে শালিখেরা—
প্রয়োজন থাক্‌ নাই থাক্‌, যে যাহারে খুসী দেয় ডাক,
যেথা সেথা করে চলা ফেরা।

বিংশশতাব্দীর কাব্যের প্রত্যক্ষতা, স্পষ্টতা, সর্ব্বত্র-গমন-প্রবণতা এইভাবে টুক্‌রো টুক্‌রো আকারে রবীন্দ্র-কাব্যের অতীন্দ্রিয় কল্পময় অঙ্গনে প্রবেশ ক'রেছে। রবীন্দ্রনাথ ওদের সস্নেহে আশ্রয় দিয়েছেন। ওরা তাঁর কাব্য-ধারার সঙ্গে ত অতি অনায়াসেই গায়ে গা মিলিয়ে আছে—মধ্য যুগের সাহিত্যের ড্রাগনের মতো বিকট কাঁটা-গাঁথা লেজ তুলে ত ওরা আধুনিকতার ফতোয়া জারী ক'রছে না—অথচ পুরানো অপার্থিব রসাত্মকতা ও সপ্নালুতা থেকে রক্তমাংসের দুনিয়ার দিকে ফিরে তাকিয়েছে! এই জিনিষটিকেই আমরা ব'ল্‌ছিলাম রবীন্দ্র কাব্যের প্রতিক্রিয়া এবং বলছিলাম এর সুরু পূরবীতে এবং পুষ্টি বীথিকায়।

অবশ্য পূর্ব্বেই আমরা ব'লেছি যে রবীন্দ্রনাথ প্রধানতঃ পূর্ব্বতন যুগের কবি এবং উনবিংশ শতাব্দীর চিন্তাধারা তাঁতে চরমস্ফূর্ত্তি পেয়েছে—লিরিক্‌কাব্যের সে আমল পর্য্যন্ত যতটা উৎকর্ষ সাধিত হ'য়েছে, (হাইনে, শেলী, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, ব্রাউনিং, সুইন্‌বার্ণ, হুগো, মিস্ত্রাল, টেনিসন্ ইত্যাদির কথাই যে প্রসঙ্গে মনে হয়) রবীন্দ্রনাথ তার পূর্ণতম বিকাশ সাধন ক'রেছেন। রোমান্টিক্ আইডিয়ালিজমের কবি তাঁর চেয়ে বড় আর কল্পনা করাও কঠিন। তাঁর সেই স্বভাবসিদ্ধ ধারাকে তিনি পরিহার ক'রতে পারেন না, আর ক'রবেনই বা কেন? তাঁর স্বকীয় আদর্শের কবিতা সেই জন্যে বীথিকায় অজস্র আছে—প্রকৃতি, প্রেম ও পরমার্থ সম্পর্কীয় বিচিত্র লীলা-বিলাসের অপূর্ব্ব অনুভূতি-সঞ্জাত সেই কবিতাগুলির কথা বর্ত্তমান আলোচনায় কেন উল্লেখ করিনি সে কৈফিয়ৎ এখানেই দেওয়া দরকার। সেই সুর, সেই ব্যঞ্জনা, সেই গাঢ়বদ্ধ সুষমা-মণ্ডিত শব্দালঙ্কার আমাদের সুপরিচিত—তবে আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে তাতে এখনো যৌবনের সতেজ প্রাণবত্তা বিদ্যমান, বার্দ্ধক্যের কোন আভাসই নেই তাতে—কতকগুলো কবিতার নাম করে যাই; পাঠিকা, নাট্যশেষ, পোড়োবাড়ী, ভুল, অপরাধিনী, বনস্পতি, সাঁওতাল মেয়ে ইত্যাদি। তবে যে সুর, যে দৃষ্টি, যে চিন্তা রবীন্দ্রনাথে আমরা আগে পাইনি, এবং না পেয়ে অনুযোগ ক'রেছি, তাই স্বল্প পরিমাণে হ'লেও পেয়েছি যে কবিতাগুলোতে সেইগুলোই আমাদের সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য মনে হয়েছে, সেইগুলো নিয়ে আলোচনা করাই সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজনীয় মনে ক'রেছি। এ থেকে এই সিদ্ধান্তে আমরা উপস্থিত হয়েছি যে রবীন্দ্রনাথ প্রাক্‌মহাসমর পৃথিবীর অদ্বিতীয় লিরিক কবি হ'লেও সমরোত্তর পৃথিবীরও তাঁর ওপর দাবী কম নয়—এই বীথিকাই সেই দাবীর সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নজীর—যা উভয় যুগকে অববাহিকার মতো সংযুক্ত ক'রেছে এবং আমাদেরকে এই ভরসা করার সাহস দিয়েছে যে কবির আগামী কাব্যে আমরা শুনতে পাবো যান্ত্রিকতার প্রতি-ধ্বনি, শুন্‌তে পাবো আজ্‌কের এই বিক্ষোভ ও হানাহানির অনুরণন।

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত

Seven Pillars of Wisdom—By T. E. Lawrence,
(Jonathan Cape)

বেশী দিনের কথা নয়, টি, ই, লরেন্স—অথবা এয়ারক্রাফ্‌ট্‌স্‌ম্যান শ-এর অকাল মৃত্যুতে, মোটর-সংঘর্ষের আকস্মিক অপঘাতে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যময় ও তাহার বাহিরেও শোকের শিহরণ তরঙ্গায়িত হইয়া যায়। লরেন্সের জন্মবৎসর ১৮৮৮;

মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স পঞ্চাশ অতিক্রান্ত হয় নাই। ইহার মধ্যে যে যশোরাশি তাঁহার ভাগ্যে মিলিয়াছিল তাহা অপর কোন সৌভাগ্যবানের ঈর্ষ্যাস্থল। বর্ত্তমান যুগে অধিকাংশ ক্ষেত্রে খ্যাতির ভিত্তি প্রচারশক্তি। কোটিকণ্ঠ সংবাদপত্র, নিযুতকর্ণ-প্রসারী রেডিয়ো প্রভৃতির করুণা ব্যক্তিবিশেষের কীর্ত্তিকাহিনীকে একটি দিনের মধ্যে বিশ্ববিশ্রুত করিয়া তোলে। এ-শক্তিকে উপেক্ষা করিলে প্রভূত গুণরাশিও নষ্টোন্মুখ হয়। এপথে লরেন্সের সাধনাকে বৈরীভাবের সাধনা বলা চলে। আধুনিক প্রচারশক্তির বিশ্বদৃষ্টিকে তিনি যতই এড়াইতে চাহিতেন, ততই তাহার তীব্র-জ্যোতিঃ তাঁহার উপর নিবদ্ধ হইতে চাহিত। প্রতিষ্ঠাপথের সম্বন্ধে এখনকার কালে সাধারণের কৌতূহলের অন্ত আছে বলিয়া মনে হয় না। বিগত মহাসমরে তুর্কীর বিরুদ্ধে আরব স্বাধীনতা-অভিযানে সহায়তা করিয়া লরেন্স্ লোকগোচরে আসেন। আর তাঁহার নিষ্কৃতি নাই। তাঁহার আত্মগোপনের সচেষ্ট ব্যবস্থা, বেশ কর্ম্ম বাসস্থান ও নামোপাধির বহুবিধ ও পুনঃপুনঃ পরিবর্ত্তন, সে স্পৃহাকে নিবারণ করা দূরে থাকুক, অতিমাত্রায় উদগ্র করিয়া তুলিয়াছিল।

মৃত্যুর অব্যবহিত পরে প্রকাশিত লরেন্সের মহাগ্রন্থ, সেভ্ন্ পিলার্স্ অব উইজডম্ পড়িয়া মনে হইল বিধাতা ভুল করেন নাই, তাঁহার সৌষ্ঠববোধ অম্লান আছে। দীর্ঘকাল রোগভোগের পর বৃদ্ধবয়সে পরনির্ভর হইয়া যদি ধীরে ধীরে লরেন্সের মৃত্যু ঘটিত, তবে হইত তাহা অ্যান্টী-ক্লাইম্যাক্স্; আর শিল্পীমাত্রেই জানেন রসোপপত্তির পথে ইহাপেক্ষা গুরুতর বাধা অভাবনীয়। দুর্দ্দমতেজ আরব যোদ্ধারা যাহাকে সসম্ভ্রম আদরে আখ্যা দিয়াছিল "আমির ডিনামাইট" তাহার সহিত চিরাচরিত ব্যবহার কি মরণের পক্ষে অশোভন হইত না?

এই প্রসঙ্গে বলিয়া রাখা দরকার, বইটির শিরোনাম বিভ্রমোৎপাদক। ইহার বিষয় তত্ত্বজ্ঞান বা ঈশানুসন্ধিৎসা নহে; এমন কি আত্মচিন্তাও নহে,—সম্রাট্ মার্কাস অরেলিয়াসের বিখ্যাত গ্রন্থের সহিত ইহার বিন্দুমাত্র সাদৃশ্য নাই। ইহা আরব বিদ্রোহের ইতিবৃত্ত ও প্রসঙ্গতঃ লরেন্সের আত্মকাহিনী। দুই দিক দিয়াই ইহা খণ্ডিত, অসম্পূর্ণ। লরেন্সের জীবনের আদি ও উপান্ত পর্ব্ব ইহাতে নাই। ইতিবৃত্ত হিসাবেও ইহা পূর্ণাবয়ব নহে। লরেন্স্ নিজেই বলিতেছেন,

Please take it as a personal narrative pieced out of memory. I could not make proper notes; indeed it should have been a breach of my duty to the Arabs if I had picked such flowers while they fought.

ঐতিহাসিক অপূর্ণতার আর একটি উল্লেখযোগ্য কারণ আছে। সেভ্ন্ পিলার্স্ প্রথম প্রকাশিত হয় মুখ্যতঃ তাহাদের জন্য যাহারা আরব সমস্যায় সংশ্লিষ্ট ও প্রাচ্য ভূখণ্ডের ইতিহাস, ভূগোল ও রাজনীতি যাহাদের নখদর্পণে। ইহাদের সংখ্যা দুই শতের অধিক হইবে না। কাজেই লরেন্স্ অনেক বিষয় উহ্য রাখিতে দ্বিধা করেন নাই। সাধারণ পাঠকের কাছে, সেভ্ন্ পিলারস্ অনেকস্থলে ক্রমভঙ্গ-দোষে দুষ্ট লাগিবার সম্ভাবনা। সেভন্ পিলার্স্ উপভোগ করিতে হইলে তাই একটু প্রস্তুতির প্রয়োজন। লরেন্সের অন্তরঙ্গ বন্ধু সুবিখ্যাত লেখক রবার্ট গ্রেভস্ প্রণীত "লরেন্স্ এণ্ড দি.অ্যারাবস্", এপথে প্রধান ও আমার মতে অপরিহার্য্য সহায়।

সেভন্ পিলারস্ অব উইজডম্—এই নামটি বিভ্রমোৎপাদক হইলেও ইহার

একটি সকৌতুক ইতিহাস আছে। অক্‌স্‌ফোর্ডে লরেন্‌স্‌ ছিলেন প্রত্নতত্ত্বের ছাত্র। ক্রুসেড সম্বন্ধে তাঁহার আগ্রহ ছিল অপরিসীম। তাহার ফলে তিনি আসেন প্রাচ্য দেশের খৃষ্টীয় অংশে, পর্য্যটনে ও অন্বেষণে; ও পরে তথাকার সাতটি বিখ্যাত শহরের ইতিবৃত্ত গাঁথিয়া বাইবেল হইতে গৃহীত বাক্যাংশটিকে নাম হিসাবে লাগাইয়া রচনা করেন। রচনা করেন কিন্তু প্রকাশ করেন নাই; কারণ লেখকের মতে সে লেখা ছিল কাঁচা। স্বীয় রচনার এ-হেন নির্দ্দয় সমালোচক লেখক জগতে দুর্লভ। লরেন্‌স্‌ ছিলেন নিজের লেখার কোর্ট-মারশাল। এরূপ বেপরোয়া খেয়ালী লোকও বোধ হয় দুনিয়ায় খুবই কম জন্মিয়াছে। বইটি নষ্ট করিলেও তাহার নামটি লইয়া লরেন্‌স্‌ অন্য একটি পুস্তকে নির্ব্বিবাদে জুড়িয়া দিলেন, স্মৃতিহিসাবে।

সেভন্‌ পিলারস্‌-এর রচনা ও প্রকাশ-পরিক্রমাও কম কৌতূহলোদ্দীপক নয়। ইহা একটি ভূমিকা ও দশটি খণ্ডে বিভক্ত। বর্ণিত বিষয়, ১৯১৬ সালে লরেন্‌সের আরব দেশে প্রথম পদার্পণ হইতে ১৯১৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে লরেন্‌স্‌ ও ফৈজালের দামস্কস-বিজয় পর্য্যন্ত। বিগত মহাসমরে ইংলণ্ড যখন জার্ম্মেনীর সহিত যুঝিতেছিল, তখন কিচনার-প্রমুখ কয়েকজন ইংরাজের বিশ্বাস হয় আরবগণকে তুর্কীর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিলে ইংলণ্ড জার্ম্মেনীর মিত্রশক্তি তুরস্ককে সহজে পরাজিত করিতে পারিবে। এই উদ্দেশ্যেই ও-দেশে প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখনন ও মানচিত্র-অঙ্কনের ব্যবস্থা হয়, যাহাতে লরেন্‌স্‌ ঐতিহাসিক হিসাবে সংযুক্ত ছিলেন। তাহার পর তাঁহাকে সমরবিভাগে প্রেরণ করা হয়। ১৯১৯ সালের ফেব্রুয়ারী হইতে জুনের মধ্যে, তথা-কথিত শান্তি-বৈঠকে ফৈজালের সহিত যোগদান করিতে আসিয়া প্যারিসে বসিয়া লরেন্‌স্‌ সেভন্‌ পিলারস্‌ লিখিতে আরম্ভ করেন ও সাতটি খণ্ড লিখিয়া ফেলেন। ভূমিকাটি লেখা হয় কায়রো-যাত্রী এরোপ্লেনে বসিয়া। অষ্টম খণ্ড লণ্ডনে রচিত হইবার পর রিডিং ষ্টেশনে ট্রেণ বদলাইবার সময় ভূমিকাটি ও দুইটি খণ্ডের খসড়া ব্যতীত সমস্ত বইটি হারাইয়া যায়, কাহারো কাহারো মতে চুরি যায়। এই দারুণ ক্ষতি কারলাইলের "ফ্রেঞ্চ রিভলিউশন" পুড়িয়া যাওয়ার সহিত তুলনীয়। লরেন্‌স্‌ও কারলাইলের মতো পুনঃ রচনায় মনোনিবেশ করিলেন। দুটি খসড়াই পড়িয়াছেন এমন লোকে বলেন, লরেন্‌স্‌ নাকি অনেক স্থানে কমা সেমিকোলন পর্য্যন্ত পুনরুদ্ধারে সমর্থ হইয়াছিলেন। শোনা যায় তিনি নাকি সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত চব্বিশ ঘণ্টায় ৩৪০০০ কথার একটি খণ্ড লিখিয়াছিলেন। ইহাকে কি তাহা হইলে ওয়ার্ল্ড রেকর্ড বলা চলে না? ইহাই ১৯২২ সালে পরিমিত সংখ্যায় মুদ্রিত ও বিনামূল্যে বিতরিত হয়। ইহারই একটি সচিত্র সংস্করণ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের জন্য তিরিশ গিনি মূল্যে বিক্রীত হয়। সাধারণের জন্য প্রকাশিত হয় একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ, লরেন্‌স্‌ যাহার নাম দেন, "রিভোল্ট ইন দি ডেসার্ট।" তাহার পর কয়েক বৎসর ধরিয়া লরেন্‌স্‌ সেভন পিলার-এর ভাষা পালিশ করিতে থাকেন। এ সম্বন্ধে তাহার উক্তিটি উল্লেখযোগ্য।

Beginners in literature are inclined to fumble with a handful of adjectives round the outline of what they want to describe, but by 1924 I had learnt my first lessons in writing and was often able to combine two or three of my 1921 phrases into one.

তাঁহার জীবদ্দশায় সেভন্ পিলারস্ সম্পূর্ণ প্রকাশ করায় লরেন্সের নিষেধ ছিল। অকালমৃত্যু সে-অর্গল অপ্রত্যাশিত ত্বরায় উত্তোলিত করিয়াছে। প্রথম সংস্করণের বহুমূল্য চিত্রগুলিও বর্ত্তমান সংস্করণে সন্নিবেশিত হইয়াছে; সুধু সংখ্যায় তিনখানি কম ও বহুবর্ণরঞ্জিত নহে। চিত্রগুলি সম্বন্ধে লরেনস বলেন—

It seems to me that every portrait drawing of a stranger partook some what of the judgment of God. If I could get the named people of this book drawn, it would be their appeal to a higher court against my summary descriptions. So I took pains to bring objects and artists together.

শিল্পিগুলির নাম শুনিলে লরেনসের আগ্রহাতিশয্যে বিস্মিত হইতে হয়। তাহাদের মধ্যে আছেন এরিক কেনিংটন, সার্জ্জেণ্ট, অগষ্টাস জন, মেষ্ট্রোভিক প্রভৃতি মহারথিবর্গ।

সেভন্ পিলারস্ স্মৃতি-উন্মথিত পুস্তক। গ্রেভস্ লিখিয়াছেন, লরেন্সের memory for details was extra-ordinary, even morbid। এই প্রখর স্মৃতিশক্তির ফলে রচিত হইয়াছে এমন একটি গ্রন্থ যাহা যে কোন ভাষার সমর ও ভ্রমণ-সাহিত্যের তুঙ্গ শীর্ষে স্থান পাইতে পারে। আরব মরুভূর নির্জ্জন মহিমা, শত শত মাইল ব্যাপী উষ্ট্রযাত্রায় অনুচরগণের সহিত সহচরভাব, শিবিরাগ্নির পাশে বসিয়া সহাস্য আলাপ আলোচনা, তুর্কীদিগের নৃশংসত্ব; ক্ষিপ্রগতি ও ক্ষিপ্রবুদ্ধি জার্ম্মান ও তুরস্ক বাহিনীকে নির্ব্বোধ প্রতিপন্ন করা; শারীরিক যন্ত্রণায় লরেনসের ভীষণ ভীতি; অথচ তাহাকে দমিত রাখিয়া কতবার শত্রু শিবিরে প্রবেশ ও পলায়ন; একবার ধরা পড়িয়া অসহ্য যন্ত্রণা; বিজেতা সেনাপতির বন্দীর প্রতি কামাচরণে বাধা তাহার কারণ; বন্দীর পরিচয় না জানায় মুক্তিলাভ—এই সব দৃশ্য লরেনসের লিপি-চাতুর্য্যে পাঠকের মনে চিরতরে মুদ্রিত হইয়া যায়। প্রাচ্যসীমার সমরব্যাপারে আধুনিকতা অপেক্ষা মধ্য যুগের বাবস্থার প্রাধান্য ছিল প্রবলতর। তাই লরেনসের মধ্যযুগ-প্রবণ মন তাহাতে পাইত পরমা তৃপ্তি। আরবের স্বাধীনতা তাঁহার বাল্য-স্বপ্নের অন্যতম। সে স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার সুযোগ পাইয়া লরেন্স্ জীবন সার্থক জ্ঞান করিতেন। কিন্তু যুদ্ধাবসানের সঙ্গে সঙ্গেই সে স্বপ্নও অন্যান্য স্বপ্নের মতো শূন্যে মিলাইয়া গেল। কূটবুদ্ধি বৃটিশ রাজনীতিনায়কের অভিসন্ধিতে আরবের প্রাপ্য ব্রিটিশ-স্বার্থের নিকট নিবেদিত হইল। রাগে, অভিমানে, নৈরাশ্যে লরেন্সের চিত্ত শাসনকর্ত্তাদিগের বিরুদ্ধে বিষাক্ত হইয়া উঠিল। ব্রিটিশশাসকগণের সহিত লরেন্সের সম্বন্ধ লইয়া আমাদের দেশে অনেক উদ্ভট মত প্রচলিত আছে। তাহারা যে কি পরিমাণে ভিত্তিহীন, তাহা ১৯২০ সালের ২২শে জুলাই তারিখে টাইমস্ পত্রিকায় প্রকাশিত লরেন্সের একখানি চিঠি হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। পত্রখানি গ্রেভস-এর পুস্তকের পরিশিষ্টে মুদ্রিত হইয়াছে।

লরেন্সের রচনাশিল্পের পরাকাষ্ঠা সেভন্ পিলারস্-এর ভূমিকার প্রথম পরিচ্ছেদে। এই পরিচ্ছেদের বিষয়বস্তু আত্মজিজ্ঞাসা। ইংরাজীভাষায় সুলিখিত আত্মচরিতের অভাব নাই, গল্পরচনার মণিমাণিক্যে তাহার ইতিহাস ঝলোমলো,

তাহাদেরই মধ্যে এই পরিচ্ছদটি অকুণ্ঠ গৌরবে আসন দাবী করিতে পারে। তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করার লোভ সংবরণ করা গেল না।

Some of the evil of my tale may have been inherent in our circumstances. For years we lived anyhow with one another in the naked desert, under the indifferent heaven. By day the hot sun fermented us ; and we were dizzied by the beating wind. At night we were stained by dew, and shamed into pettiness by the innumerable silence of stars. We were a selfcentred army without parade or gesture, devoted to freedom, the second of man's creeds, a purpose so ravenous that it devoured all our strength, a hope so transcendent that our earlier ambitions faded in its glare.

As time went by our need to fight for the ideal increased to an unquestioning possession, riding with spur and rein over our doubts. Willy-nilly it became a faith. We had sold ourselves into its slavery, manacled ourselves together in its chain-gang, bowed ourselves to serve its holiness with all our good and ill content. The mentality of the ordinary human slaves is terrible—they have lost the world-and we had surrendered, not body alone, but soul to the overmastering greed of Victory. By our own act we were drained of morality, of volition, of responsibility, like dead leaves in the wind.

* * * * * * * * * * *

In my case, the effort for these years to live in the dress of the Arabs, and to imitate their mental foundation, quitted me of my English self, and let me look at the West and its conventions with new eyes ; they destroyed it all for me. At the same time I could not sincerely take on the Arab skin ; it was an affectation only. Easily was a man made on infidel, but hardly might he be converted to another faith. I had dropped one form and not taken on the other, and was become like Mohammed's coffin in our legend, with a resultant feeling of intense loneliness in life, and a contempt, not for other men, but for all they do. Such detachment came at times to a man exhausted by prolonged physical effort and isolation. His body plodded on mechanically, while his reasonable mind left him and from without looked down critically, on him, wondering what that futile lumber did and why. Sometimes these selves would converse in the void ; and then madness was very near, as I believe it would be near the man who could see things through the veils at once of two customs, two educations, two environments.

এই দ্বিত্বের ফলে লরেন্সকে কিরূপ সঙ্কটে পড়িতে হইত একটি উদাহরণে তাহা স্পষ্ট হয়। আমির ফৈজাল একবার বেসরকারীভাবে বাকিংহাম রাজপ্রাসাদে ইংলণ্ডের রাজার সহিত সাক্ষাতে আসেন। সঙ্গে ছিলেন লরেন্স্, আরব সেনাপতির বেশে। তাহা দেখিয়া একজন উচ্চপদস্থ ইংরাজনায়ক ভ্রূকুটিভঙ্গে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, রাজার সম্মুখে বিদেশী বেশ ধারণ কি কর্ণেল লরেন্সের পক্ষে উচিত হইয়াছে ? সসম্ভ্রমে অথচ শান্তভাবে লরেন্স্ উত্তর দেন—

When a man serves two masters and has to offend one of these, it is better for him to offend the more powerful.

নরেন্দ্রের ব্যক্তিত্বের সমস্ত জটিলতা, শক্তিমত্তা, সুক্ষ্ম বিচার-বোধ ও আদর্শ-নিষ্ঠা, এই একটি উক্তিতে অমরত্ব পাইয়াছে বলিয়া আমার বিশ্বাস।

শ্রীনীরেন্দ্রনাথ রায়

The State in Theory and Practice—by Harold J. Laski (Allen & Unwin).

The Nature of Capitalist Crisis—by John Strachey (Gollancz).

"Grammar of Politics" প্রকাশ হ'বার পর হ'তে অধ্যাপক ল্যাস্‌কি যে ক'খানি বই লিখেছেন, তার মধ্যে আলোচ্য বইটী সব চেয়ে দামী। "Democracy in Crisis" প্রভৃতি লেখায় তিনি যে সমস্ত মালমশলা সংগ্রহ করেছিলেন, সেগুলি এই বইয়ে ব্যবহার করেছেন। অবশ্য তাঁর স্বভাবসিদ্ধ লেখনী-কৌশলের প্রশংসা নিষ্প্রয়োজন।

রাষ্ট্রতত্ত্ব এবং রাষ্ট্রের ইতিহাস ও দৈনন্দিন কর্ম্মপদ্ধতির মধ্যে সঙ্গতির অন্বেষণে বেরিয়ে ল্যাস্‌কি এর পূর্ব্বে রাষ্ট্রের অনন্যাধীন সার্ব্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রান্তর্গত নানা জনসমষ্টির স্বতন্ত্র প্রভাবের বিষয় বিশেষ করে বলেছিলেন। গিয়ের্কা, মেট্‌ল্যাণ্ড ফিগিস্, ছ্যুগুই প্রভৃতির চিন্তাধারা তিনি তখন অনুসরণ করছিলেন; রাষ্ট্রশক্তির বহুত্ববাদ (Pluralism) প্রচারকদের মধ্যে তিনি ছিলেন। কিন্তু কিছুকাল থেকেই মনে হচ্ছিল—আর এ বই পড়ে সে ধারণা প্রায় স্থির হয়ে এল—যে রাষ্ট্রতত্ত্ব আলোচনার অপর একটা পথ তিনি ধরেছেন, আর তাঁর পথপ্রদর্শক হচ্ছেন মার্কস্। সম্প্রতি নিউ ইয়র্কের "Modern Monthly" পত্রিকায় তিনি নিজেকে মার্কস্‌বাদী বলে পরিচয় দিয়েছেন আর বলেছেন যে বর্ত্তমান জগতের যে অবস্থা, তাতে মার্কস্-বাদের জ্ঞানাঞ্জনশলাকা দ্বারা চক্ষু উন্মীলিত না করলে অজ্ঞানতিমিরান্ধ হ'য়ে থাকতেই হ'বে। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে তাঁর এই অতি সুপাঠ্য ও চিন্তোদ্দীপক গ্রন্থ পড়ে মনে হয় তাঁর চক্ষু এ পর্য্যন্ত শুধু অর্দ্ধোন্মীলিত হ'য়েছে। আমাদের সমাজব্যাধির তিনি রূপনির্ণয় করেছেন অনবদ্যভাবে, কিন্তু ব্যাধি নিরাকরণের সম্বন্ধে তিনি অস্থিতপ্রজ্ঞ।

অধ্যাপক ল্যাস্‌কি অতি স্বচ্ছ ভাষায় এই বল্‌তে চেয়েছেন যে জগতের বর্ত্তমান অবস্থায় রাষ্ট্রতত্ত্বান্বেষীদের বিশেষ করে উচিত, রাষ্ট্রের কাল্পনিক রূপ চিন্তার পরিবর্ত্তে তার বাস্তব ইতিহাস আলোচনা করা। রাষ্ট্রের প্রকৃতি কি সে সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত থাকতে পারে, কিন্তু সমাজজীবনকে রাষ্ট্র কি ভাবে নিয়ন্ত্রিত করছে সে বিষয়ে জ্ঞানই হ'চ্ছে রাষ্ট্রপ্রকৃতিনির্ণয়ের একমাত্র উপায়। রাষ্ট্রতত্ত্ব এ পর্য্যন্ত প্রায় সর্ব্বদাই প্রাচীন পদ্ধতি সমর্থন করার চেষ্টা করে' এসেছে, ভবিষ্যতের মুক্তিপথ নির্ম্মাণে সহায়তা করে নি। রাষ্ট্রের সার্ব্বভৌমত্বে বিশ্বাস করতে হ'লে পৃথিবীর যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা আমাদের বিশেষ প্রয়োজন, তা সুদূর পরাহত হ'য়ে

যায়। আমাদের আজ বোঝা উচিত যে শ্রেণীবিভক্ত সমাজকে ভিত্তি করে রাষ্ট্রসৌধ গড়া হ'য়েছে বলে' আমরা যথার্থ সভ্যতা থেকে বঞ্চিত রয়েছি। রাষ্ট্রের এই নিরাভরণ মূর্ত্তি দেখলে মনের বহু প্রবঞ্চ অপসৃত হ'বে। সংশয়চ্ছেদী বিবৃতিগুণে অধ্যাপক মশায় এই কথাটা এমন ভাবে বল্‌তে পেরেছেন, যা' অতিশ্লাঘ্য।

রাষ্ট্রের প্রকৃতি, যুদ্ধ, বিপ্লব, গণতন্ত্র, একাধিপত্যের সঙ্গে রাষ্ট্রের সম্বন্ধ লেখক আলোচনা করেছেন। ধনিক সমাজ ও গণতান্ত্রিক শাসনের সম্পর্ক, নিয়মানুগ শাসনব্যবস্থার অসিদ্ধি, বর্ত্তমান রাষ্ট্রে যোদ্ধৃসঙ্ঘের স্থান, ইত্যাদি সম্বন্ধে বহু জ্ঞাতব্য তথ্য তিনি দিয়েছেন। কয়েকটা বিশেষ মূল্যবান্ অধ্যায়ে তিনি রাষ্ট্রক্ষেত্রে বিজ্ঞানবাদের বিচার করেছেন। আমরা জানি যে হেগেল্ রাষ্ট্রকে প্রায় এক অলৌকিক স্তরে স্থাপন করেছিলেন; তাঁর মতে একমাত্র রাষ্ট্রজীবনেই ব্যক্তিগত ও সর্ব্বগত স্বাধীনতার সমবায় হ'তে পারে, রাষ্ট্রেই ব্যক্তিত্বস্ফুরণের সুযোগ মিল্‌তে পারে, অন্যত্র নয়। সদসদ্বিবেকের অন্তর্বর্ত্তিতা ও সমাজ-শাসনবিধির বহির্বর্ত্তিতার মধ্যে সামঞ্জস্য একমাত্র রাষ্ট্রের দ্বারাই সম্ভব ("reconciling the inwardness of morality with the externality of law")। কিন্তু হেগেল্ রাষ্ট্রতত্ত্বের এই অত্যুচ্চ ব্যাখ্যা প্রচার করেও তাঁর সমসাময়িক Prussiaকে রাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ বলেছিলেন! তাই, অন্যান্য যুক্তির মধ্যে ল্যাস্‌কি এই বলে' বিজ্ঞানবাদের খণ্ডন করেছেন যে বিজ্ঞানবাদ অনুরাগের উপর রাষ্ট্রের দাবী স্পষ্ট করেছে বটে, কিন্তু বাস্তব জীবনে রাষ্ট্রের সে দাবী ভিত্তিহীন কি না, সে প্রশ্নের কোন উত্তর দেয় না। ভবিষ্যতে কি ঘট্‌বে, সে বিষয়ে বিজ্ঞানবাদ আলোকপাত করছে না, ভবিষ্যতের দাস হ'য়ে কল্পনা-রাজ্যে বিচরণ করার সহজ আনন্দ দিচ্ছে।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে ধনিকবাদ যুদ্ধের জনক; বর্ত্তমান সমাজে ধনিকদের স্বার্থ রক্ষার্থে রাষ্ট্রের সার্ব্বভৌমত্ব ঘোষণা করা প্রয়োজন হয়েছে। হেগেল্ একবার বলেছিলেন যে যুদ্ধের সময়েই রাষ্ট্রের পূর্ণ স্বরূপ প্রকট হয়। রাষ্ট্রের মধ্যেও দেখা যাচ্ছে যে "ব্রহ্মবল" বা "ক্ষাত্রবলের" চেয়ে অর্থবলই মহীয়ান্; তাই রাষ্ট্রব্যবস্থা সংখ্যাল্প অর্থবান্‌দের কল্যাণ-কল্পেই রয়েছে। আসলে রাষ্ট্র হ'চ্ছে, লেনিনের ভাষায়, ধনিক শ্রেণীর কার্য্যনির্ব্বাহক সভা ("the executive committee of the capitalist class")। এই কথাটা যুক্তিতর্ক দিয়ে, দৈনন্দিন সংশয়াতীত ঘটনা দেখিয়ে ল্যাস্‌কি সাহেব প্রমাণ করেছেন।

লেখকের উপসংহার আমাদের হতাশ করেছে। তিনি বল্‌ছেন যে রাষ্ট্রক্ষমতা বর্ত্তমান শাসকদের কাছ থেকে যা'রা অর্থবলবঞ্চিত তাদের হাতে যাওয়া উচিত। কিন্তু কেমন করে এই হাত বদল হ'বে, তা তিনি বল্‌ছেন না। কবে হ'বে, এ প্রশ্নের উত্তরও তিনি দিতে রাজী ন'ন্। নিয়মানুগ উপায়ে, বিনা বিপ্লবে উদ্দেশ্য সিদ্ধি যে হ'বে, তা তিনি ইতিহাস আলোচনা করে স্বীকার করতে পারছেন না। সুতরাং স্থির সিদ্ধান্ত কিছু হ'ল না। নিয়মানুগতায় বিশ্বাস আর নেই, বিপ্লবরূপ দ্যূতক্রীড়াও ভীতিপ্রদ।

অধ্যাপক ল্যাস্‌কির মনের গড়ন অষ্টাদশ শতাব্দীর যুক্তিবাদীদের মতো; বিংশশতাব্দীর বিলোড়নে তিনি তাই বিক্ষুব্ধ, কিন্তু সেই ক্ষোভকে খড়্গরূপে ব্যবহার

তাঁর কাছ থেকে আশা করা যায় না। তা সত্ত্বেও আলোচ্য বইখানি এখানকার রাষ্ট্রচিন্তাক্ষেত্রে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করবে।

প্রায় তিন বছরের আগে "The Coming Struggle for Power" লিখে ষ্ট্রেচি বিখ্যাত হ'য়েছিলেন। বয়স অল্প হ'লেও তাঁর বিদ্যার ব্যাপ্তির যে পরিচয় আমরা পেয়েছি, তা একরকম বিস্ময়কর বলা যেতে পারে। তা ছাড়া ব্রিটিশ রাজনীতিক্ষেত্রে তাঁর অভিজ্ঞতাও খুব বেশী; প্রথমে তিনি ছিলেন লেবর পার্টিতে; তার পর সে দলের স্থবিরতা দেখে Oswald Mosley'র New Partyতে যোগ দিয়েছিলেন। Mosley'র ফাশিষ্ট্ভাব দেখে সে দল ছেড়ে কিছুকাল রাজনৈতিক বিজনবাস করে এখন কম্যুনিষ্ট্ পার্টিতে রয়েছেন। তিনি নিজেই বলেছেন যে এই মত পরিবর্ত্তনের ইতিহাসকে তিনি ব্যর্থ মনে করেন না, কারণ বর্ত্তমান যুগের জটিলতার দরুণ কেউই কুণ্ঠা ও ভ্রম এড়িয়ে যেতে পারেন না।

সম্প্রতি যে বিরাট অর্থনৈতিক সঙ্কট চলেছে, তা'র তাৎপর্য্য বোঝার চেষ্টাই আলোচ্য পুস্তকের উদ্দেশ্য। ধনিকবাদ কি বিনা সঙ্কটে অগ্রসর হ'য়ে যেতে পারবে? যদি এইরূপ ও এর চেয়ে কঠিন সঙ্কট মাঝে মাঝেই ধনিকবাদের সঙ্গী হয়, তবে আমাদের সকলের কর্ত্তব্য হ'বে এই অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উচ্ছেদ করা; কারণ আমরা জানি যে ১৯২৯-৩৩ সালে যে বিষম সঙ্কট গেছে, তা'র পুনরাবির্ভাব হ'বে সভ্যতার সমাধি।

বইয়ের প্রথম ভাগে অর্থনৈতিক সঙ্কটের কারণ নির্ণয়ের যে নানা চেষ্টা হ'য়েছে, তা'র আলোচনা আছে। মেজর ডগ্লাস্, জে, এ হব্সন্, আরভিং ফিশার, হায়েক্ ও রবিন্সের মত বিচার ক'রে লেখক দেখিয়েছেন যে বহু মতভেদ সত্ত্বেও এঁদের সকলেরই উদ্দেশ্য ধনিকদের লাভের হার পুনঃস্থাপন। একদল জিনিষপত্রের দাম বাড়িয়ে, আর একদল শ্রমিকদের মজুরি কমিয়ে, ব্যবসার খুঁটি শক্ত করতে চান্; ধনবিজ্ঞানবিদ্দের এই নিয়েই বচসা। কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে লাভের হার বাড়াতে হ'লে জিনিষপত্রের সরবরাহ কমে যায়, আর সরবরাহ পর্য্যাপ্ত করতে হ'লে লাভের হার কমে যায়। মোটের ওপর এই প্রতীতি হয় যে ধনিকবাদ পৃথিবীতে যান্ত্রিক সভ্যতা স্থাপনের শ্রেষ্ঠ উপায় বটে; কিন্তু সে কাজ সাঙ্গ হ'লে ধনিকবাদের আর কিছু করার থাকে না।

একটী সুলিখিত পরিচ্ছেদে গ্রন্থকার দেখিয়েছেন যে এখন অর্থনীতি ধনবিজ্ঞানে পরিণত হ'য়ে সমাজের সঙ্গে প্রায় সম্পর্কশূন্য হ'য়ে পড়েছে। ধার্ম্মিকেরা যেমন বলেন যে যথার্থ ধর্ম্ম কোথাও ঠিক্ পরীক্ষিত হয় নি, তেম্নি রবিন্সের মত পণ্ডিতেরা (এখানে বলা উচিত যে রবিন্সের বা হায়েকের পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র সন্দেহের স্থান নেই) বোধ হয় বল্বেন যে laissez-faire economicsএর এখনও পরীক্ষা হয় নি। রবিন্স্ একবার বলেছেন যে বছরে একশো পাউণ্ড আয় যা'র, তা'র চেয়ে যা'র হাজার পাউণ্ড আয়, সে বেশী ধনি ("richer") কি না, তা জানা সম্ভব নয়; বিজ্ঞান বিচারকের আসনে বস্বে না, ঐ দুই আয়ভোগীর পরিতুষ্টির পরিমাপ অসম্ভব!

ব্রিটিশ চিকিৎসাপরিষদের নির্দ্ধারণ অনুযায়ী প্রতি পরিবারের (লোকসংখ্যা

অনুসারে) খাইখরচা কত হওয়া উচিত, তা'র সঙ্গে তুলনা ক'রে স্ট্রেচি দেখিয়েছেন যে দেশের বহু পরিবারই স্বাস্থ্যের জন্য যা একেবারেই প্রয়োজন, তা'র চেয়ে কম খেয়ে' থাকতে বাধ্য হয়। অবশ্য ধনবিজ্ঞানবিদেরা এ বিষয়ে মাথাঘামানো বিশেষ দরকার মনে করেন না। ধনিকবাদের মূলসূত্র অনুসারে লর্ড রদারমিয়ারের চার কোটী পাউণ্ডের সম্পত্তি আছে বলে তাঁকে বছরে বিশ লক্ষ পাউণ্ড না দিলে তিনি সে টাকা ধনোৎপাদনে খাটাবেন না; সুদটা হ'চ্ছে রদারামিয়ারের কষ্টের পরিমাপ, যে কষ্ট তিনি ভোগ করছেন তাঁর সমস্ত টাকা তখনই খরচ না করতে পেরে, যে কষ্ট তিনি দয়া করে' "অপেক্ষা" করছেন বলে' পাচ্ছেন! অথচ, অনেক ইংরেজ কয়লা-খনিতে কাজ করছে বছরে একশো পাউণ্ডের জন্যে; এ টাকাটা হ'চ্ছে তা'র কষ্টের ও চেষ্টার পরিমাপ! ধনবিজ্ঞান দীর্ঘজীবী হো'ক্!

যাঁরা অর্থনীতিবিদ্, তাঁরা মার্ক্সের "Labour Theory of Value"এর ওপর প্রখ্যাত অষ্ট্রিয়ান্ পণ্ডিত বোম-বাভের্ক (Bohm Bawerk) যে আক্রমণ করেছিলেন তা জানেন। স্ট্রেচি সে আক্রমণের পাল্টা জবাব দিয়েছেন; এ বিষয়ে ইংরেজী ভাষায় আলোচনা মার্ক্সের পক্ষে নেই বল্লেই চলে। সে হিসেবে স্ট্রেচি খুব দামী কাজ করছেন।

চতুর্থ ভাগে স্ট্রেচি অতি বিশদভাবে ধনিক্বাদের সঙ্কট সম্বন্ধে মার্ক্সের মত বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। মার্ক্স্ দেখিয়েছেন যে ধনিকবাদের স্বাস্থ্যরক্ষা করতে হ'লে বিশেষ প্রয়োজন হ'চ্ছে মূলধন সঞ্চয়, কিন্তু আবার বর্ত্তমান অবস্থায় লাভের হার কমে যাওয়াও অপরিহার্য্য। এই লাভের হারকে ঠিক্ রাখার জন্যেই ধনিক-সভ্যতার অভিযান দেশদেশান্তরে গেছে; এই প্রচেষ্টাই পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্র যন্ত্রপ্রতিষ্ঠা করেছে, সমুদ্রবক্ষে জাহাজের পর জাহাজ ভাসিয়েছে, হাজার হাজার কারখানা আর খনি স্থাপন করেছে, জলা পরিষ্কার করেছে, শহর নির্ম্মাণ করেছে। আজ ঐ একই কারণে ধনিকরা পৃথিবীর যে সব দেশে ব্যবসা চল্লে লাভের হার এখনও কিছুকাল বেশীই থাকবে, তা অধিকার করার চেষ্টায় ব্যস্ত, সে চেষ্টার ফলে আন্তর্জাতিক যুদ্ধ হো'ক্ বা নাই হো'ক।

যাঁরা বিলেতে ফ্যাশিজ্মের সম্বন্ধে খবর জান্তে চান্, তাঁরা Labour Party'র মধ্যে কতকগুলি বিপজ্জনক মতবাদের আবির্ভাব সম্বন্ধে স্ট্রেচির কথা দামী মনে করেন। এমন কি কোলের মত আজীবন সাম্যবাদীও মাঝে মাঝে যেন বেফাঁস কথা বলে ফেলেন। সেগুলো একটু চোখে আঙুল দিয়ে দেখানো দরকার ছিল।

স্ট্রেচির লেখা সম্বন্ধে বলা যেতে পারে যে সহজ ভাষায় শক্ত কথা স্পষ্ট করে বোঝানোর ক্ষমতা তাঁর মত খুব অল্প লোকেরই আছে। একটা ব্যাপারে তিনি যেন একটা ভুল করে ফেলেছেন। তাঁর বই পড়ে' মনে হয় যে বর্ত্তমান অবস্থায় লাভের হার কমে আস্তে বাধ্য, এবং ঐ এক কারণেই ধনিকবাদ ধ্বংস হ'বে। কিন্তু মার্ক্স্, এঙ্গেল্স্ বা লেনিন্ কখনই বলেন নি যে জরাগ্রস্ত হ'লেও ধনিকবাদ বা অন্য কোন সমাজব্যবস্থা স্বতই ধ্বংস হ'বে। "ধ্বংস হওয়ার" চেয়ে "ধ্বংস করার" কথা তাঁরা জোর করে বলেছেন। স্ট্রেচি অবশ্য একথা জানেন্, কিন্তু তাঁর এ বইয়ে দুনিয়ার মজুরদের চেষ্টায় গড়ে' তোলা বিপ্লবী দলের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে কিছু নেই।

ধনিকবাদের কল্যাণে সঙ্কটের পর সঙ্কট এসে আমাদের বিধ্বস্ত করছে ও করবে। মাঝে মাঝে অবশ্য অবস্থার উন্নতি হ'বে, একটু স্বস্তিতে নিঃশ্বাস নেবার সময় মিল্‌বে, কিন্তু তার স্থায়িত্ব পূর্ব্বের তুলনায় ক্রমশঃই কমে যেতে বাধ্য। জোড়াতাড়া দিয়ে কতকাল এই সমাজ পদ্ধতিকে ঠেকিয়ে' রাখা যায়, তা জান্‌তে খুব বেশী দেরী হ'বে না।

হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

দৃষ্টি-প্রদীপ—শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত।
(পি সি সরকার এণ্ড কোং লিমিটেড)

সম্প্রতি বিভূতি বাবুর দৃষ্টি প্রদীপ পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছে। এটি তাঁর আরণ্যক পর্ব্বের আধুনিক অবদান। মেঘ মল্লারের যুগ থেকে তাঁর কাছে একটা বিশেষ রসের আস্বাদ পেয়ে আসছি। সে রস একটা মধুর স্বচ্ছ গ্রাম্য রস যেটা প্রাত্যহিকতার তুচ্ছতায় সহজে চোখে পড়ে না বা রসালু হয়ে ওঠে না। বিভূতি বাবু তাঁর অনুভূতি-মহাত্ম্যে অনাড়ম্বর মর্ম্মস্পর্শী ভঙ্গীতে তাকে সজীব করে তোলেন। স্বকীয়তাও যথেষ্ট পাওয়া যায়। পথের পাঁচালীতে পেলাম বাংলার পল্লীর অন্তর্লীন রূপ অপুর দৃষ্টি দিয়ে। তার আরণ্যকতা, গ্রাম্য জীবনযাত্রা অদ্ভুত সুসঙ্গতি পেলো পারিপার্শ্বিক সহানুভূতিতে। প্রথম বোঝা গেল, মেঠো সুর ধরবার এক বিশেষ ভঙ্গীতে তাকে সুধীসমাজের কাছে উপাদেয় করে তোলা যায়। এ জন্যে লেখককে সাম্প্রতিকদের আসরে প্রাথম্য না দিই প্রাধান্য দিতে বাধলো না। তারপর অপরাজিততে অপুর জীবন সহরে এসে রসসঙ্গতি পেল না। লেখকের স্নায়বিকতা পড়ল ধরা সহরের চলিষ্ণু রূপ ফোটাতে গিয়ে। তাঁর হাতের তুলি গেল কেঁপে। এ ব্যাপারটা একটা লজ্জার মত সমস্ত বইটাকে সঙ্কুচিত করে রাখে। মনে হল পথের পাঁচালীর এ অনুবৃত্তিটুকু না এলেই ভাল হত। মোটের ওপর বিভূতি বাবুর সৃজনী-প্রতিভার সীমানা পাওয়া গেল।

দৃষ্টি প্রদীপে আমরা আশা করেছিলাম লেখক সত্যিই নতুন কিছু পরিবেশন করছেন। আসলে দেখলাম, ভাব-বস্তু, রস-বস্তু বা প্রকাশ-ভঙ্গী কোনটাই বদলালো না আশানুরূপ। আত্মজীবনচরিতের ভঙ্গীতে বই লেখা বাংলা সাহিত্যে বা পাশ্চাত্য সাহিত্যে নতুন না হলেও স্বকীয়তা ফোটাবার ক্ষেত্র বা উপাদান যথেষ্টই আছে এতে। লেখকের পক্ষ থেকে হয়ত চেষ্টার ত্রুটি নাও থাকতে পারে, কিন্তু এ কথা জানাতে কোনো কুণ্ঠা নেই যে তিনি অকৃতকার্য্য হয়েছেন। যে মন্তব্যের সন্ধান আমরা প্রচ্ছদপত্রে পাই বস্তুত সে গন্তব্যে পৌঁছতে পারেন নি বলেই মনে হয়। "বিভূতিভূষণ এই উপন্যাসে পাঠকের দৃষ্টির সম্মুখে একটি নতুন জগৎ খুলে দিয়েছেন" যেটা বিশেষ ভাবে অতীন্দ্রিয় জগৎ। তারপর, খবর পাওয়া গেল—"আমাদের দৃষ্টির অন্তরালে যে গহন রহস্য লুকানো, যে বিশ্ব প্রসারিত সেই অদৃশ্য বিশ্বের আবছায়া রূপ মাঝে মাঝে দেখতে পায় বালক জিতু" তার অস্বাভাবিক অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে—যে অন্তর্দৃষ্টির বুদ্ধি বা যুক্তির কাছে কৈফিয়ৎ দিতে হয় না বড়

বেশী। আপত্তি নেই। কিন্তু তার জন্যে জিতুর Clairvoyance-এর ওপর বাণিজ্য করার দরকার ছিল না। St. Francis of Assisiর জীবন চরিত জিতুই পড়ুক বা বিভূতি বাবুই পড়ুন, রসসৃষ্টির দিক থেকে এই অতীন্দ্রিয়তার সংযম বিশেষ দরকার ছিল। ফলত জিতুর জীবনের নাক্ষত্রিক বিলাস তার সমস্ত অস্তিত্বকে হাওয়ায় উড়িয়ে দেয়। পাতায় পাতায় তার নাক্ষত্রিকতা আর Clairvoyance আমাদের পীড়িত করে তোলে। অতীন্দ্রিয়-বিলাস একটা বিশেষ কোনো কবিতায় ঐক্য পেতে পারে কিন্তু তাকে তিন-শো পাতা ব্যাপী বইয়ে ছড়িয়ে দিলে পাঠকমণ্ডলী লেখকের ওপর প্রসন্ন হতে বাধ্য নয়। অবশ্য Clairvoyance-কে কেন্দ্র করে খুব ভাল বই লেখা সম্ভব। কিন্তু লেখক এ বইটাতে তাকে কাজে লাগাতে সক্ষম হন নি। Clairvoyanceটা অবান্তরই থেকে গেল। লেখক ভুলেছেন যে মাধ্যাকর্ষণের টান অগ্রাহ্য করা মারাত্মক। প্রসঙ্গত লেখক অবশ্য জিতুর এই আবেশিক অবস্থাটা 'নিউরোসিস' বলে আত্মরক্ষার প্রয়াস পেয়েছেন। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত এ দুর্ব্বলতাটুকু অরক্ষিতই রয়ে গেল।

কড়া সাহিত্যাচার্য্যদের সূক্ষ্ম রসবিশ্লেষণের সামনে বইটার উপরোক্ত ত্রুটি ছাড়া আরও অনেক ত্রুটি প্রকট হওয়াই সম্ভব। পুনরাবৃত্তি তার মধ্যে একটি। এ ব্যাপারটি অবশ্য প্রথম কয়েক পরিচ্ছেদেই বেশী পরিলক্ষিত হয়। লেখককে এজন্যে একটু অসাবধান বলেই মনে হয়। কারণ সতর্ক পুনর্লিখনে এই ধরণের ত্রুটির হাত থেকে তিনি হয়ত অব্যাহতি পেতে পারতেন। এই সূত্রে লক্ষ্য করা যায় যে তিনি পথের পাঁচালীর বা অপরাজিতর যুগের উচ্ছ্বাসগুলি এখনও ভুলতে পারেন নি। থেকে থেকে একই জাতীয় নভশ্চারী ব্যসন ক্লান্তিদায়ক। এ কথার প্রমাণ স্বরূপ বইটার প্রত্যেক পরিচ্ছেদ থেকে প্রচুর দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। মাঝে মাঝে ভাষার পাতিত্য-দোষও ঘটেছে। সময়ে অসময়ে বঙ্কিমী ধরণের মর্ম্মোচ্ছ্বাস দেখে নিরাশ হতে হয়। এই সব কারণে লেখকের মনন-শক্তির ওপর আস্থা থাকে না। নায়কের মনের গ্রন্থিউন্মোচনের চেষ্টায় যদি এই সব ত্রুটি ঘটে থাকে তা' হলে লেখকই দায়ী। প্রসঙ্গত এটাও বলতে হবে যে বইটাকে যদি আগাগোড়া ডায়েরীগুচ্ছ ধরণে লেখা হত তা' হলে আমাদের তর্ক বা মন্তব্যের ধারা ভিন্ন দিকে বইত। সে ক্ষেত্রে নায়ক হতেন একক। পারিপার্শ্বিক সেখানে গৌণ। মনের কোনো বিশেষ অবস্থায় অসম্বদ্ধ প্রলাপও পেত সুসঙ্গতি ও ঐক্য। কিন্তু এটা খুব স্পষ্ট যে দৃষ্টি প্রদীপে লেখক সেরকম ধরণের কিছু করতে যান নি। এটাকে যে 'Journal Intime' বলে ধরে নেব এমনতর ইঙ্গিত লেখকের তরফ থেকে পাওয়া যায় নি। ফলে, এ মন্তব্য অবশ্যম্ভাবী যে বইটার অঙ্গসংস্থানের হানি হয়েছে।

পক্ষান্তরে, লেখক যে সব সামাজিক ও শাস্ত্রীয় তথ্যের আভাস দিয়েছেন বইটার ভেতর তার সম্বন্ধে বক্তব্য কিছু নেই। জিতুর সার্ব্বিক দৃষ্টির সামনে বাংলার সামাজিক সঙ্কীর্ণতা ফুটে উঠেছে। বাংলার একান্নবর্ত্তী পরিবারের দুর্দ্দশা ফোটাতে গিয়ে লেখক অনেকটা স্বপ্রতিষ্ঠ হয়েছেন দেখা গেল। জিতুর জ্যাঠাইমার ওপর আমাদের বিতৃষ্ণাও আন্তরিক। সীতার সৃষ্টি 'দুর্গা' জাতীয়। শেষের দিকটা অবশ্য সীতার চলাফেরা অস্পষ্ট হয়ে উঠেছে জিতুর ধোঁয়াটে দৃষ্টি প্রদীপের

আলোয়। সমস্ত বইটাই অল্প বিস্তর স্বল্পালোকিত জিতুর কৃপায়। ছোট বৌঠাকরুণকেও ভাল চেনা গেল না। কিন্তু তাঁর কম্বলচাপার ব্যাপারটা ভীষণ হাস্যকর ও অসম্ভব।

লোচন দাসের আখড়ায় এসে জিতু পেলো জীবনানুগ বেগ। সেটা রূপ পেলো মালতীর প্রেমে, যে প্রেম—জিতুর বালপ্রৌঢ়ি সত্ত্বেও—প্রচ্ছন্ন ছিল আন্তর্জ্জানিক স্তরে মিস্ নর্টনের যুগে। আখড়ার আবহাওয়ার বৈষ্ণবিক দিকটা কিছু বাধা পেয়েছে জিতুর আতিথ্যে। শরৎচন্দ্রের কমললতাকে মনে হয় এই সূত্রে। পাশাপাশি রাখলে কমললতা উন্নততর সৃষ্টি বলেই মনে হয়। এর তুলনায় মালতী কিছু আড়ষ্ট হয়েছে। তবু মালতীকে মন্দ লাগে না। তার মাংসল বিকাশ জিতুর স্বপ্নালু দৃষ্টির আবরণ ভেদ করেও ফটে উঠেছে। হিরণ্ময়ীর সঙ্গে জিতুর প্রথম পরিচয় গ্রাম্য পাঠশালায়। কিন্তু আমাদের সঙ্গে প্রথম পরিচয় রবীন্দ্রনাথের গল্প-গুচ্ছে। এই কিশোরী বালিকার চাপল্যের মধ্যে জিতুর প্রেম পেলো স্থিতি। এরকম আবহাওয়ায় জিতুকে ব্রাউনিঙের A Soul's Tragedy পড়ানো লেখকের পক্ষে ত্রুটি। হয়ত তাঁর ধারণা যখন তখন ব্রাউনিঙের কবিতা পড়াটা মানসিক আভিজাত্যের লক্ষণ। এ রকম দুর্ব্বলতা প্রকাশ না পেলেই ভাল ছিল। অনেক ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও এটা অস্বীকার করা যায় না যে এ বইটা লেখকের অন্যান্য বইয়ের চেয়ে কিছু বেগবান হয়েছে। কিন্তু মননশীলতার চর্চ্চা না করলে এর চেয়েও উন্নত ধরণের কিছু লেখা সম্ভব হয়ে উঠ্‌বে না। এ যাবৎ যে নৈহারিকতার চূড়ায় লেখক আশ্রয় নিয়েছেন সেটা ত্যাগ না করলে, ভাবোচ্ছ্বাসের বাষ্পে পাঠকদের উৎপীড়িত করেই তুলবেন। এবার তাঁর Cerebral Cortexএর দিকে নজর দেবার সময় হয়েছে।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ মৈত্র

Voltaire—By H. N. Brailsford (Home University Library)
Religion and Science—By Bertrand Russell
(Home University Library)
We Europeans—By Julian Huxley, A.C. Haddon and A. M. Carr-Saunders (Jonathan Cape)

প্রথম বইখানির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা ইতিমধ্যে প্রায় প্রত্যেক প্রথম শ্রেণীর পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। ২৫০ পৃষ্ঠার মধ্যে ঐ মহাকায় বিষয়টির সম্বন্ধে প্রধান জ্ঞাতব্য তথ্য এবং যথাযথ বিচার যে-রকম সুচারুভাবে লিখিত হয়েছে সেটি রসজ্ঞ পাঠকের বিস্ময় উদ্রেক করে। আমি বইখানিকে একটি আদর্শ জীবন-চরিত মনে করি। পলিটিক্যাল ঘটনার বিবরণ ও তাৎপর্য্য উদ্‌ঘাটনে ব্রেলস্‌ফোর্ড সিদ্ধহস্ত। তা ছাড়া তিনি সত্যকারের সাহিত্য-রসিক—শেলী গডউইনের গোষ্ঠীর ইতিহাসে তাঁর রসজ্ঞানের যথেষ্ট পরিচয় ছিল—ভলটেয়ারের সাহিত্য-সৃষ্টির বিচারে তিনি সে-পরিচয় সুপ্রতিষ্ঠিত করলেন। বইখানির সাহিত্যিক মূল্য খুবই বেশী।

কি জানি কেন—ইদানীংকার রাসেলের লেখা আমার তত ভাল লাগে না। হয়ত আমারই দোষ। কিন্তু অন্য কারণও থাকতে পারে। তার মধ্যে একটির উল্লেখ করছি—তিনি সমস্যাগুলিকে সরল প্রতিজ্ঞায় পরিণত করেন। মনোভাবটা এইরূপ—"ব্যাপারটা মোটেই জটিল নয়, একটু সুস্থির হয়ে আমার তর্ক শোন—এখনি বুঝিয়ে দিচ্ছি—যদি না বোঝ তবে তুমি একটি আস্ত বোকা।" পাঠক বোকা-নাম কিনতে চায় না, তাই লেখকের পরিগৃহীত বাক্যগুলি প্রমাণিত হয়েছে বলে সহজেই স্বীকার করে নেয়। রাসেল সাহেবের ইদানীংকার বইগুলিতে জাদু আছে—তাই পড়তে পড়তে মন ও বুদ্ধি আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। আজকাল তাই তাঁর লেখা পড়ি না—গলাধঃকরণ করি, গলায় বাধে না তবে ফলে শক্তিলাভও হয় বলা যায় না।

তাই সন্দেহ হয় তাঁর লেখার চমকে। সোজা করে বোঝান অত্যন্ত শক্ত কাজ জানি—যদি সমস্যার জটিলতা স্বীকার করা যায়। কিন্তু সমস্যাগুলির মধ্যে যদি ভাষায়, বাক্যে, প্রতিজ্ঞায়, উদাহরণে কিংবা উপনয়ে পরিণত হবার ক্ষমতা ভিন্ন অন্য সত্তা কিংবা গুণ থাকা অসম্ভব মনে করি তবে ভাষাটাও সহজে চিকণ হয়। অবশ্য অতটা ঝকমকে করা যার তার পক্ষে সম্ভব নয়। তবু এইখানেই আমার খটকা বাধে। আমার মনে হয়, প্রত্যেক ঘটনার মধ্যেই ভাষাতিরিক্ত কোন কোন বস্তু কি ভাবে আছে যাকে বাদ দেওয়া বুদ্ধির গোঁড়ামি। রাসেল সাহেবের মন অতিশয় মুক্ত হতে পারে—তাঁর বুদ্ধি ক্ষুরধার, তাঁর বিদ্যার শেষ নেই—তবু তিনি গোঁড়া—প্রায় মধ্য-যুগের পুরোহিত সম্প্রদায়ের মতনই, পার্থক্য কেবল একধারে বাইবেল এরিস্টটলে এবং অন্যধারে বৈজ্ঞানিক-পদ্ধতির প্রামাণিকতার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস। রাসেল সর্ব্ব প্রকার স্বৈর-শাসনের বিপক্ষে কেবল বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির জবরদস্তির বিপক্ষে নন। তাঁর বইএর ষষ্ঠ অধ্যায় আমার বৈজ্ঞানিক বন্ধুদের এবং সপ্তম অধ্যায় ধর্ম্মপ্রাণ বন্ধুদের পড়তে অনুরোধ করি। যোগ-ধর্ম্মের আলোচনায় রাসেলের যুক্তির বিপক্ষে বোধ হয় একাধিক আপত্তি তোলা যায়। প্রকৃত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিকে ফলিত বিজ্ঞান থেকে পৃথক করা এবং সেই পার্থক্যকে বর্ত্তমান যুগের নানাপ্রকার অন্যায় অত্যাচারের জন্যে দায়ী করাও বোধ হয় অসঙ্গত। বিশেষতঃ রাসেলের মতো বুদ্ধিমান লোকের যুক্তির এই প্রকার ফাঁকি যে বুদ্ধিবাদের গলদটুকুকেই ধরিয়ে দেয়, তা নয়, philsophy of history ভিন্ন মানবপ্রেম অর্থাৎ humanismও অন্ততঃ এ-যুগে অত্যন্ত হাল্‌কা ও ঠুন্‌কো লাগে। অবশ্য বুদ্ধির দিক থেকে—ব্যবহারের দিক থেকে নয়। সত্যের প্রতি, সৌন্দর্য্যের প্রতি, স্বাধীনচিন্তার প্রতি তাঁর মনোভাব নিতান্তই সাহিত্যিক। সত্যই তাঁর ভগবান, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিই তাঁর সাধনা, বিজ্ঞান সম্বন্ধে তাঁর সতর্কতা সে-কালের জেনিভা এবং একালের ঢাকা সহরের চরিত্র-রক্ষিণী সভারই উপযুক্ত। রাসেল প্রকৃতপক্ষে একজন বিশ্বাসী জীব—নচেৎ তিনি যাকে অন্যায় বিবেচনা করেন তার বিপক্ষে লড়াই করবার নামে হাতের কলম শাণিত খড়্গ হয়ে উঠত না।

এত কথা লেখবার উদ্দেশ্য এই যে তাঁর নতুন বইটায় গোঁড়ামি অত্যন্ত কম—অর্থাৎ যতটা সংযত হলে গোঁড়ামি আমার ভাল লাগে ঠিক ততটাই সংযত। এই বইখানিতে রাসেলের পুরানো হাত ফিরে এসেছে। Religion and Science

পড়ে আমার Voltaireএর Treatise on Toleranceএরই কথা মনে পড়ল। অবশ্য রাসেলের বইএ শুদ্ধ চিন্তার খোরাক অনেক বেশী—সেটা অত্যন্ত স্বাভাবিক।

রাসেল যেন ভলটেয়ারেরই বংশধর। পার্থক্যের জন্য দায়ী সমাজ-গঠন; অষ্টাদশ শতাব্দীর অত্যাচার ছিল ধর্ম্মের নামে—এখন আর সেটা নেই—তার বদলে আছে নব-গঠিত রাষ্ট্রধর্ম্ম, যেমন রাসিয়া, জার্ম্মানী ও ইটালীতে, বোধ হয় জাপানেও। তখনকার অত্যাচারের উপলক্ষ ছিল ভিন্ন ধর্ম্ম ও বিজ্ঞান—এখনকার, গরীব শ্রেণী এবং অর্থনীতি। জ্ঞানের মাত্রা ও প্রসার এখন বেড়েছে। তাই ভল্‌টেয়ারের দান মধ্যবিত্তশ্রেণীর মধ্যে উদারনীতির পরিবর্ত্তনে এবং রাসেল একজন নামজাদা সোশ্যালিষ্ট। ভল্‌টেয়ার বণিক সম্প্রদায় এবং বাণিজ্যেরই গুণগান করে গিয়েছেন; দেড়শ' বছর পরে সেই শ্রেণীর প্রভুত্বের কুফল সম্বন্ধে রাসেল নিতান্তই সচেতন। ভল-টেয়ার লিখছেন: "the labourer and the artisan must be cut down to necessaries, if they are to work: such is human nature. It is inevitable that the majority should be poor, but it is not necessary that it should be wretched"—ব্রেলস্‌ফোর্ড টিপ্পনী করেছেন, "What he states is the authentic middle class doctrine; but it revolts his humanity।" ভলটেয়ারের যুগে মনোবিজ্ঞান ও অর্থনীতি জন্মগ্রহণ করেনি—তখনকার ফরাসী অর্থনীতি ছিল physiocracy এবং ইংরেজী অর্থনীতি ছিল mercantilism—যাদের বোধ হয় পুরোপুরি অর্থনৈতিক মতবাদই বলা চলে না—রাষ্ট্রনৈতিক ব্যবহারই বলা যায়। রাসেল এই বিষয়ে নিতান্তই ভাগ্যবান—মনোবিজ্ঞান ও অর্থনীতিতে তিনি অভিজ্ঞ। তাই ভলটেয়ারের মতন তিনি Deistও নন, mercantilistও নন। ধর্ম্মের ব্যাখ্যায় রাসেল economic interpretationকে অগ্রাহ্য করেন না, যেমন ভলটেয়ার অজ্ঞানতা-বশতঃ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। ভলটেয়ার বিশ্বাস করতেন natural law (inevitable কথাতেই তার প্রমাণ) এবং natural religionএ—রাসেল তা করেন না, প্রমাণ তাঁর পঞ্চম অধ্যায়ে। তবু দুজনের মানব প্রেম—humanity লক্ষ্য করবার জিনিষ। মানুষের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা, অত্যাচারের বিপক্ষে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াবার সাহস ও ক্ষমতাই দুজনের যোগসূত্র।

আমার মনে হয়, কোনো না কোনো প্রকার গোঁড়ামি না থাকলে জনপ্রিয় লেখক হওয়া যায় না। সকলের প্রিয় হবার জন্য সকলেরই গোঁড়ামি লেখকের থাকা চাই। কিন্তু ভলটেয়ার ও রাসেল সকলের জন্য নয়—বলাই বাহুল্য তাঁরা যে শ্রেণীর প্রিয় সে শ্রেণীর মধ্যে শিক্ষা, ভদ্রতা এবং চিন্তার অবসর থাকা চাই, তবেই তাঁদের সরসতা উপভোগ করা সম্ভব। যাঁরা রাজ্য চালান, কিংবা যাঁদের হাতে অত্যাচার করবার প্রভূত শক্তি ও সুযোগ আছে এঁদের লেখা পড়ে তাঁদের হবে গাত্র-দাহ। গাত্রদাহের ফলে লাঠি নিয়ে মারতে যাওয়া যে শ্রেণীর রচিত আইনে বরদাস্ত করে এঁরা সে-সমাজেরই শত্রু। দৈহিক শক্তির বদলে যখন যুক্তির প্রভাব বেশী হয় তখনই ভল্‌টেয়ার-রাসেল সম্ভব। কেবল তাই নয়, লোকেদের হাসবার ক্ষমতাও থাকা চাই। গাম্ভীর্য্যের মধ্যে, কাপুরুষতার মধ্যে ঠাট্টার উত্তর লাঠি কিংবা

জেলখানা—দুজনের ভাগ্যেই তা ঘটেছিল। রাসেল ভারতবর্ষে এলে কি হয় জানতে ইচ্ছা করে।

ভলটেয়ার-রাসেলের লিখনভঙ্গীতে অনেক মিল পাই। অতি অল্প কথায় অমন ভীষণ ঠাট্টা আর কেউ করতে পারে আমার জানা নেই। তাঁদের প্রত্যেক বাক্য যেন ঝক্ ঝক্ করছে—ইস্পাতের ধারাল ফলার মতন—ইস্পাতের মতনই কঠিন ও concrete এবং ফলার মতনই শত্রুকে নিধন করতে লোলুপ, এর সাহায্যে হাতের সামান্য একটি দক্ষ সঞ্চালনে আততায়ীর প্রাণ বিনাশ অতি সহজে সম্পন্ন হয়। দুজনেরই লেখা যে ঝক্‌মক করে সেটা কেবল প্রখরতায় নয়, সংযত ভাবাবেগে, অন্যায়ের প্রতি রাগে। সে রাগ যতই দমিত ততই ভয়ঙ্কর। ভলটেয়ার বিংশ শতাব্দী কিংবা রাসেল অষ্টাদশ শতাব্দীর লোক হলে যে হাঁপিয়ে উঠতেন বলা যায় না—এইটাই বোধহয় তাঁদের সব চেয়ে বড় সুখ্যাতি—এবং বর্ত্তমান-সভ্যতার সব চেয়ে মারাত্মক সমালোচনা। দু'জনেই চিরন্তন—কিন্তু সমাজ যা ছিল অনেকটা এখনও তাই আছে বলেই। এ-যুগে অত্যাচারের নামান্তর ঘটেছে মাত্র।

য়ুরোপে আবার বুঝি গোঁড়ামির যুগ এল। এবার আর অত্যাচার ধর্ম্মের নামে নয়, জাতের দোহাইএ। সর্ব্বত্রই দেশাত্মবোধ জাগ্রত হয়েছে, বিশেষত জার্ম্মানীতে এবং ইটালীতে। একতাবোধের জন্য নাৎসীদলের কর্ত্তারা সুপ্রজনন বিজ্ঞানের আশ্রয় নিয়েছেন; তাঁরা নিতান্ত সক্রিয়ভাবে জাতিগত শুদ্ধতার পক্ষপাতী। অন্যধারে ইটালীর হাব্‌সীদের ওপর অত্যাচারের মূলে রয়েছে বর্ণবিদ্বেষ, বিশেষত কালা আদমীর ওপর। ইংরেজ ফরাসীদের মধ্যে জাত্যাভিমান খুব প্রকট নয় বটে, অন্তত লিখিত পড়িত ভাবে নয়, কিন্তু তাঁদের অধীনস্থ ভিন্ন বর্ণের প্রজাবৃন্দের প্রতি মনোভাবে যে ঐ প্রকার অভিমান খুঁজে পাওয়া যায় না এমন কথা শপথ করে বলা চলে না। দক্ষিণ আফ্রিকায় এবং অন্যান্য ব্রিটিশ শাসিত উপনিবেশে অধীনের সঙ্গে অধিপতিদের ব্যবহারে, আইন কানুনে, যুক্তদেশে নিগ্রোদের এবং পীতজাতির বিপক্ষে বিপরীত আচরণে একাধিক ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত অভিমান লক্ষ্য করেছেন। আমাদের দেশে স্বদেশী যুগে আর্য্যামির প্রকোপ ছিল, তখন মোক্ষ-মূলারের অস্বীকারোক্তি অগ্রাহ্য করে নিজেদের প্রত্যেককে আর্য্য জাতির বিশুদ্ধ বংশধর ভাবতাম। এখনও হয়ত হিন্দু সভার পণ্ডিতবর্গ ও মৌলানা সম্প্রদায়ের একাধিক নেতার মধ্যে ধারণা আছে যে প্রত্যেক হিন্দু সন্তান এক কল্পিত ভারতোত্থিত আর্য্য জাতির সর্ব্বগুণের উত্তরাধিকারী এবং প্রত্যেক মুসলমানের ধমনীতে আরবী কি ফার্সী কি তুর্কী জাতির রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে। জাতিবোধ (ন্যাশানলিজম) যখন তীব্র হয় তখন জাতিগত শুদ্ধতা (racial purity) নামক মিথ্যার নিতান্ত প্রয়োজন। এবং সেই সঙ্গে প্রতিবেশী 'অ-শুদ্ধ' জাতিকে দোষী সাব্যস্ত করার তাগিদ আসে। বিজ্ঞানকে জবরদস্তী করে নিজের কাজে লাগান এবং নিজের দোষ কি অপূর্ণতা ঢাকবার প্রয়াসে পরের স্কন্ধে দোষ অর্থাৎ অশুদ্ধতা চাপান—গণ-মনের নিতান্ত পরিচিত প্রবৃত্তি।

এই প্রবৃত্তির হাত থেকে উদ্ধার পাবার দুটি উপায় কল্পনা করা যায়। প্রথমত রাসেলের বুদ্ধিবাদ, মাত্রাজ্ঞান ও শ্রেয়োবোধের একাগ্র সাধনায় জাতীয়তা

ও দেশভক্তিকে অতিক্রম করা। হাক্‌স্লী-প্রমুখ লেখকত্রয়ের পক্ষে সেটা বিষয়-বহির্ভূত এবং We Europeans-এর ২৮৬ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় প্যারা পড়লে মনে হয় যেন তাঁরা দেশাত্মবোধ হ্রাসের আশু সম্ভাবনা সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করেন। দ্বিতীয় উপায় হোলো, সুপ্রজনন বিদ্যা নামক অপূর্ণ বিজ্ঞানকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা। অর্থাৎ বর্ত্তমানে সে বিজ্ঞানের যতটুকু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারি ততটুকুই প্রচার করা, এবং অন্যধারে তার অতিরিক্ত সিদ্ধান্তের ভুল দেখান। এই উপায়টি বইখানিতে গৃহীত হয়েছে, সেইজন্য তার মূল্য অত্যন্ত বেশী। লেখকদের সাধু উদ্দেশ্য সফল করবার জন্য প্রকাশকেরা দাম কমালে ভাল করতেন। কিন্তু যাঁরা বইএর দামের দিকে লক্ষ্য করেন না তাঁরা যদি প্রত্যেকে বইখানি কেনেন ও পড়েন তা হলে অন্ততঃ আংশিকভাবে পৃথিবীর উপকার হবে।

আংশিকভাবে লেখবার মূলে আমার একটি দৃঢ় ধারণা রয়েছে। সত্যকারের বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের শত্রু মিথ্যা সিদ্ধান্ত কিংবা আধ-কাঁচা আধ-পাকা সিদ্ধান্ত ততটা নয় যতটা হোলো সেই তন্ত্র যার আশীর্ব্বাদে দৈনিক খবরের কাগজ জনগণ-মনের অধিনায়কত্ব করে। দৈনিক কাগজ সস্তার খবর যোগান দেয়, এবং তারই জোরে অপক্ক হট্টমনের সৃষ্টি করে। তখন নিজের তৈরী আজব চীজের ওপর প্রভাব বিস্তার করা কাগজের কর্ত্তাদের পক্ষে সহজ হয়। অতএব সুপ্রজনন বিদ্যার সুসিদ্ধান্তের প্রতিদ্বন্দ্বী ধনিক তন্ত্র এবং তারই রচিত হট্টমন। আবার বলি, সত্যের বৈরী মিথ্যা নয়, মিথ্যাপ্রচারের সহায়গুলি অর্থাৎ দৈনিক কাগজের কর্তৃপক্ষ এবং হট্টমন। সেই জন্য We Europeansএর মত উৎকৃষ্ট বইখানিকে যদি জোনাথান কেপের মতন উচ্চশ্রেণীর প্রকাশক সস্তায় বাজারে ছাড়তেন উপকারের মাত্রা বেড়ে যেতো নিশ্চয়। হিটলার, মুসেলিনিকে দোষ দেওয়া লেখকত্রয় যাকে collective scapegoat তৈরী করবার প্রবৃত্তি বলেছেন, তারই একটি রূপ। কেন হিটলারের অনুপ্রেরিত ইতিহাস ও জাতিতত্ত্ব জার্ম্মানরা গ্রহণ করছে সেটাও আমাদের দেখা কর্ত্তব্য। বিজ্ঞানকে কেন জনসাধারণের মনের দ্বারে উপস্থিত করা যাচ্ছে না তার কারণ খুঁজব না?

সে যাই হোক—বইখানির পরিচয় দিই। এতে ভূমিকা নিয়ে নিম্নলিখিত নয়টি অধ্যায় আছে। জাতিতত্ত্বের ইতিহাস, মানুষের বেলা সুপ্রজনন বিদ্যার, বিশেষতঃ মেণ্ডেলীয়ান তত্ত্বেরপ্রয়োগ, জাতিবিভাগের ভিত্তি, জাতিবিভাগ সংক্রান্ত সাধারণ কয়েকটি মারাত্মক ভুলের তালিকা ও বিচার, য়ুরোপের জাতিবিভাগ, য়ুরোপীয়ান গোষ্ঠীর জাতিতত্ত্ব বিচার এবং কার সণ্ডার্স লিখিত য়ুরোপের বাইরে য়ুরোপীয়ান লোক-সমূহ, এই হোলো আটটি অধ্যায়। উপসংহারটি সমগ্র বইখানির সংক্ষিপ্তসার।

বইখানির গোটাকয়েক প্রকৃত বিজ্ঞান-সম্মত সিদ্ধান্ত আমি পরিচয়ের পাঠক-বর্গের নিকট উপস্থিত করছি।

(১) Race কথাটির বিভিন্ন অর্থ বিশ্লেষণ করে মনে হয় যে তার বদলে primary subspecies ব্যবহার করাই শ্রেয়।

(২) মেণ্ডেলীয়ান-তত্ত্বের প্রয়োগ ফলে দেখা যায় যে দুটি বংশের ধারা মেশে না, কিন্তু দুটি বংশের আদিম charactersগুলি বিচিত্র ভঙ্গীতে সজ্জিত হয়, কোনটার পুনরাবির্ভাব, কোনটা থাকে পাশাপাশি, কোনটা থাকে লুকিয়ে। সেইজন্য গোড়ায় যদিবা কালো চামড়ার সঙ্গে থাঁদা নাক কি মোটা ঠোঁট কল্পনা করা যায় তবু পাৎলা রঙ এবং সুচারু অবয়বের সঙ্গে মেশবার পর কাল চামড়ার সঙ্গে টিকল নাক ও পাৎলা ঠোঁটের সাক্ষাৎ পাওয়া সম্ভব এবং মেণ্ডেলীয়ান মতবাদ-সম্মত।

(৩) জন্তু জানোয়ারদের বেলা তবু familytree এবং একটা মূল কাণ্ড কল্পনা করা যায়। তার শাখা-প্রশাখাস্থিত জন্তুদের মধ্যে সঙ্গম সম্ভব নয়, কারণ তার ফলে বংশ লোপ হয়। মানুষের বেলা সাঙ্কর্য্য সম্ভব, কারণ জীবতত্ত্বের নিয়মানুসারে তাতে মানুষের বংশ লোপ হয় না। মানুষের ক্ষেত্রে কাল্পনিক শ্রেণী বিভাগ অবৈজ্ঞানিক। রক্তের শ্রেণী বিভাগ কল্পনা করা যায় এবং করা হচ্ছে।

(৪) অতএব জীবজন্তুর মধ্যে যে শ্রেণী বিভাগ তাতে অচলতার বদলে সংখ্যাতত্ত্বের সাহায্য নিতে হবে; পরিমাণ-যোগ্য দৈহিক বৈশিষ্ট্যের ওপর সিদ্ধান্ত গড়ে তুলতেই হবে; কিন্তু এখানে ভিন্ন ভিন্ন দলে কোন্ স্পষ্ট দৈহিক বৈশিষ্ট্য অন্য কোন্ দৈহিক বৈশিষ্ট্যের সাথে একত্রে কতবার লক্ষ্যিত হচ্ছে এবং তাদের অনুবন্ধের সাংখ্যিক অনুপাতই আমাদের বিচার্য্য। প্রত্যেক দলের contour map of frequency, তার উচ্চতা নিম্নতা বিভিন্ন হতে বাধ্য। দল অর্থে ethnic group, race নয়। ও কথাটির নির্ব্বাসন প্রয়োজন।

(৫) ভাষার দ্বারা জাতিবিচার অচল। আর্য্যজাতি নেই—আর্য্য বলে ভাষার গোষ্ঠী কল্পনা করা যায়।

(৬) একটি জাতি অন্য জাতির চেয়ে কৃষ্টিতে বড় হলেও তার মূলে কোন বীজগত প্রাধান্য নেই।

(৭) Race আর nation কিংবা people এক বস্তু নয়।

(৮) য়িহুদীরা race নয় people—তাদের নিজেদের মধ্যের দেহগত পার্থক্য তাদের থেকে অন্য জাতির পার্থক্য অপেক্ষা কম নয়। আফ্রিকান য়িহুদী আর পর্ত্তুগীজ য়িহুদীর মধ্যে দেহগত পার্থক্য অনেক। তেমনি জার্ম্মান জাতি বলে কোন একটা বিশেষ race নেই। জার্ম্মান-য়িহুদী সমস্যা genetic কিংবা racial নয়, কেবল সংস্কারগত। য়িহুদীরা একটা pseudo national group, তাদের বন্ধন ধর্ম্ম ও কৃষ্টি, সবচেয়ে বড় বন্ধন বোধ হয় অত্যাচার।

(৯) নর্ডিক জাতির প্রাধান্য সর্ব্বৈব মিথ্যা।

(১০) জাতিমিশ্রণের দোষ বীজগত নয়, তার গুণও বীজগত নয়। দোষের জন্য দায়ী সামাজিক সংস্কার ও শ্রেণী-বৈষম্য, গুণের জন্য দায়ী কৃষ্টির আদান প্রদান।

(১১) ভিন্ন বর্ণের বিবাহ সম্বন্ধে লেখকত্রয় অত্যন্ত সাবধানে মত প্রকাশ করেছেন। ঐ প্রকার বিবাহ সমাজ সহ্য করতে পারে না, তাতে সমাজ ভেঙ্গে চুরে যায়। একটি কোন nation মাত্র খানিকটা বিদেশী stock হজম করতে পারে। তার বেশী যে পারে না সেজন্য বিদেশী genesকে দোষী সাব্যস্ত করা যায় না, করা যায় কেবল বিদেশী অভ্যাস ও সংস্কার এবং সেই সংক্রান্ত নানা প্রকার ভুল

ধারণা ও বাধাবিঘ্নকে। এ-ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক কেবল উপদেশই দিতে পারেন, রাষ্ট্রিক রীতি বাৎলাতে পারেন না। ঔপনিবেশিক সমস্যাও জীবগত নয়।

(১২) Racial purity আদর্শ হিসেবেও অগ্রাহ্য, কারণ সেটি অসম্ভব, অতএব বিপজ্জনক, এবং সত্যকারের সম্ভাব্যতার প্রতিকূল।

বইখানি পুরোপুরি না পড়লে তার কদর করা যায় না, তাই যাঁরা পারবেন তাঁদের প্রত্যেককে কিনে পড়তে অনুরোধ করছি। বৈজ্ঞানিক মনোভাবের এমন প্রকৃষ্ট উদাহরণ সমাজতত্ত্বে বিরল। দাম সাড়ে আট শিলিং।

ধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।

The Serial Universe—By J. W. Dunne (Faber and Faber.)
Problems of Mind and Matter—By John Wisdom (Cambridge)

"Expriment with Time" নামক বিখ্যাত গ্রন্থের লেখক ডানের নাম সুপরিচিত। সেই বইখানাতে স্বপ্নের বিশ্লেষণ করে তিনি কালের শ্রৈঢ়ীকত্বের যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন, আলোচ্য পুস্তকখানাতে তারই পরিণতি দেখতে পাওয়া যায়। অবশ্য হিন্‌টন্‌-এর The Fourth Dimensionএর একটী মন্তব্য থেকেই ডানের চিন্তাধারার আরম্ভ; কিন্তু তিনি তাঁর থেকে বহুদূরে এগিয়ে গিয়েছেন। নূতন পুস্তকখানাতে তিনি তাঁর মতবাদের সাহায্যে পদার্থবিদ্যা, শারীরবিদ্যা ও মনোবিজ্ঞানের আপাত-বিরোধী সিদ্ধান্ত-সমূহের সামঞ্জস্য সমাধানের পথ প্রদর্শন করেছেন বলে দাবী করেছেন। তাঁর মতবাদ সম্বন্ধে ইংলণ্ডের দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক সমাজে কিছু কিছু আলোচনা হয়েছে; British Institute of Philosophy থেকে প্রকাশিত Philosophy নামক ত্রৈমাসিক দার্শনিক পত্রিকার ১৯৩৫ সালের এপ্রিল ও জুলাই সংখ্যায় অধ্যাপক ব্রড্‌, গ্রেগরি ও নিউম্যানের আলোচনায় তার নিদর্শন পাওয়া যায়। আলোচ্য পুস্তকখানির কয়েকটি অধ্যায়ের সারাংশ লণ্ডনের রয়্যাল কলেজ অব সায়ান্সে বক্তৃতাস্বরূপ পঠিত হয়েছিল।

বইখানার প্রথম ভাগে যে দার্শনিক আলোচনার ভিত্তিতে কালের শ্রেঢ়ীকত্ববাদ প্রতিষ্ঠিত, তার বিবরণ দেওয়া হয়েছে ও শেষভাগে বিজ্ঞানের আপত-বিরোধের মীমাংসায় তার প্রয়োগ বর্ণিত হয়েছে। প্রথমাংশ সম্বন্ধে বহু সমালোচনার অবকাশ আছে আর দ্বিতীয়াংশের বিষয়ে এই বলা যায় যে বিজ্ঞানের রাজ্যে এ জাতীয় বিরোধ আজ নূতন নয়, চিরকালই চলে এসেছে; এবং তার সামঞ্জস্যও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতেই হয়েছে। পদার্থবিদ্যার অনিশ্চয় বিধি প্রভৃতির বর্ত্তমান জ্ঞানের উপর নির্ভর করে কোন দার্শনিক তত্ত্বের সাহায্যে বিরোধের সমাধানের চেষ্টার সাফল্য সম্বন্ধে মন স্বতঃই একটু সন্দিহান হয়, কারণ এরূপ প্রচেষ্টার বিফলতার উদাহরণ প্রচুর আছে।

যে আলোচনার ভিত্তিতে অনন্ত প্রত্যাবৃত্তি (infinite regress) স্থাপিত হয়েছে সে সম্বন্ধে দু একটী কথা বলা যেতে পারে। আত্মজ্ঞান (self consciousness) বিশ্লেষণ করলে যে বিষয় ও বিষয়ী সম্পর্ক পাওয়া যায়, তাকে সাধারণ আন্বীক্ষিকী

রীতিতে অনুধাবন করে লেখক প্রথম বিষয়ী হতে দ্বিতীয় তৃতীয় পর্য্যায়ক্রমে নূতন নূতন বিষয়ীতে পৌছাতে পারেন বলে মনে হয় না; জ্ঞানের একমাত্র উপায় স্মৃতি; কিন্তু স্মৃতিতে জ্ঞানের পরে আত্মজ্ঞান, বড়জোর কল্পনা ও চিত্রকল্পাদির সাহায্যে তৃতীয় পর্য্যায় পর্য্যন্ত অনুসরণ করে আভাসিক স্বাত্মজ্ঞান অভিধেয় কোন অবস্থায় উপনীত হওয়া হয়তো যেতে পারে; অনন্ত প্রত্যাবৃত্তিতে উপস্থিত হবার কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। আর তাদৃশ প্রত্যাবৃত্তি ভিন্ন লেখকের অমর সমীক্ষণকারীর সাক্ষাৎ লাভের কোন সম্ভাবনা নেই। 'বর্ত্তমানের বেগ' (Velocity of the 'Now') শীর্ষক অধ্যায়ে গ্রন্থকার যে প্রত্যাবৃত্তির সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন, তার ভিত্তিতে বিখ্যাত দার্শনিক ম্যাক্‌ট্যাগার্ট কালের সত্তা অস্বীকার করেছিলেন। বাস্তব কালের অস্তিত্ব হয়তো জ্ঞানকেও অস্বীকার করতে বাধ্য হতে হবে, কারণ তিনি কালকে দেশভুক্ত করে ফেলেছেন তাঁর মতবাদের খাতিরে। এ সম্পর্কে বার্গসনের Simultaneeate et dureeতে আপেক্ষিকতত্ত্বে কালের দেশীভূতত্বের সমালোচনা এ ক্ষেত্রেও সম্পূর্ণ প্রযোজ্য মনে হয়। তবে হয়তো কালের এ মূর্ত্তি কল্পনা না করলে গাণিতিক পরিকল্পনার মধ্যে তাকে আনা সম্ভব হয় না; কিন্তু দার্শনিক তার প্রতিবাদ না করেও পারবেন না।

প্রকারক পরিকল্পনার (formal structure) অন্তর্ব্বিরোধশূন্য চিত্র সম্ভব হলেই যে তার কোন বাস্তব রূপ থাকতে বাধ্য এমন কোন কথা নেই। যদি মনোবিজ্ঞানের রহস্য কখনো সম্পূর্ণ উদ্‌ঘাটিত হয়, তবেই এ জাতীয় পরিকল্পনার সঙ্গে মানসিক তথ্যের সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা ফলপ্রসূ হতে পারে। নতুবা এ জাতীয় চমকপ্রদ প্রকারক পরিকল্পনা সত্যে উপনীত হতে কতটা সাহায্য করবে তা বলা শক্ত। তবুও নূতন চিন্তাভঙ্গির দৃষ্টান্ত-স্বরূপ এ পুস্তকখানি পাঠ করলে পাঠকের কিঞ্চিৎ কৌতূহল নিবৃত্তি হতে পারে; আর পুস্তকের ভাষাও বেশ সাবলীল—স্থানে স্থানে প্রায় সাময়িক পত্রের ভাষার কাছে এসে পৌঁছেছে। কাজেই পড়তে বেশ ভালই লাগবে আশা করা যায়।

ডানের পুস্তকে যেরূপ বিশ্লেষণের সঙ্গে আমরা পরিচিত হয়েছি, তার চেয়ে বহুগুণে উৎকৃষ্ট বিশ্লেষণের পরিচয় পাওয়া যায় জন্ উইজডমের পুস্তকখানিতে। যে বিশ্লেষণীশক্তির জন্য কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতি, মুর, রাসেল ও ব্রড প্রদর্শিত পন্থা অনুসরণ করে উইজডমও কেম্‌ব্রিজের সে খ্যাতি অব্যাহত রেখেছেন। রাসেলের Problems of Philosophy বা ব্রডের Mind and its Place in Nature-এর উত্তরাধিকারী হিসাবে পুস্তকখানি খুব বিশিষ্ট না হলেও অযোগ্য নয়। অবশ্য প্রসঙ্গক্রমে বলা দরকার যে হোয়াইটহেডের চিন্তাধারা কেম্‌ব্রিজে আরম্ভ হলেও, এখন তা সম্পূর্ণ ভিন্ন দিকে প্রবাহিত হয়েছে। অবশ্য বিশ্লেষণী শক্তির অভাব তাঁর আছে এ কথা কেউ বলতে পারবে না, কিন্তু সমগ্রতার দিক থেকে দার্শনিক প্রশ্ন সমাধানের চেষ্টা একা তাঁর মধ্যে দেখতে পাই যা মুর, রাসেল বা ব্রডের মধ্যে পাওয়া যায় না—উইজডমের মধ্যে তো নয়ই। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও বলা উচিত যে উইজডমের বইখানি স্বল্পপরিসর ও অল্প কয়েকটি প্রশ্নের সমাধানের চেষ্টায় নিয়োজিত, —অবশ্য বিশ্লেষণী পদ্ধতিতে। উপরন্তু ষ্টাউটের গিফোর্ট বক্তৃতার সমালোচনাও এই

পুস্তকখানির অন্যতম অঙ্গ; কাজেই বাদানুবাদের প্রাচুর্য্য রয়েছে। অবশ্য এ জাতীয় বাদানুবাদ পরিহার করে বিশ্লেষণী পদ্ধতিতে অন্যের মতামত সমালোচনা করা সম্ভব ছিল না।

গ্রন্থকার প্রথমতঃ বিশ্লেষণী পদ্ধতির সামান্য কিছু পরিচয় দিয়েছেন; পরে কয়েকটী সমস্যা সমাধানের চেষ্টায় নিয়োজিত এই পদ্ধতির বিশেষ ব্যবহারের দৃষ্টান্ত দিয়ে পদ্ধতির পরিচয় সম্পূর্ণ করতে চেয়েছেন। বিশ্লেষণী পদ্ধতির সাধারণ পরিচয় দান প্রসঙ্গে তিনি বিজ্ঞান, ইতিহাস, বৈজ্ঞানিক বিধি, চৈতন্য, জড়, সামান্য, বিশেষ, অস্তিত্ববত্তা ও ঘটনা প্রভৃতি বিষয়ে কিছু প্রাথমিক আলোচনা করেছেন। পরে দেহ ও মনের সম্পর্কে, স্বত্বস্বামিত্ব সম্বন্ধ, শারীরিক ও মানসিক ঘটনার পার্থক্য, দেহাত্ম-বাদ ও জড়বাদের দোষ, শারীরিক ও মানসিক ঘটনার মধ্যে কার্য্যকারণ সম্পর্ক, স্বতন্ত্র ইচ্ছার অস্তিত্ব প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করেছেন। অতঃপর জ্ঞানের বিষয়ে বিচার সম্পর্কে, প্রত্যক্ষ, ভৌতিক পদার্থের জ্ঞান ও সত্যের সম্বন্ধে বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদের সমালোচনা করেছেন। * কার্য্যকারণ সম্বন্ধ নির্ণয়ের প্রসঙ্গে স্বতন্ত্র ইচ্ছার বিষয়ে আলোচনার সময়ে তিনি একটি অত্যন্ত বিস্ময়জনক কথা বলেছেন—যে আমাদের পাপবোধের জন্য জন্মের পূর্ব্বেও আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করা প্রয়োজন।

এই ক্ষুদ্র পুস্তকে এত বেশী বিষয়ের আলোচনা করা হয়েছে যে তার সম্পূর্ণ পরিচয় দেওয়া এখানে অসম্ভব। তবে দুএকটী বিষয়ে যেখানে অসঙ্গতি-বোধ হয়েছে প্রসঙ্গক্রমে তার উল্লেখ করা যেতে পারে। "বক্তব্য"কে (proposition) তিনি জ্ঞানাতিরিক্ত অস্তিত্ব বা জ্ঞানক্রিয়ার (act of judging) অংশরূপে কল্পনা না করে একটা মাঝামাঝি জায়গায় দাঁড় করাতে চেষ্টা করেছেন (২০০—২০ পৃঃ)। তিনি জ্ঞাতা ও জ্ঞানের সময় এ দুই থেকে বিচ্ছিন্ন করে যা পাওয়া যায়, তাকেই 'বক্তব্য' বলেছেন। কিন্তু সে পদার্থটী কি তার কোন স্বরূপ এর থেকে স্পষ্ট হয় না। Ewingও তাঁর Idealism পুস্তকে প্রায় এর অনুরূপ কথাই বলেছেন। কিন্তু বক্তব্যকে যদি ক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত করতেই হয়, তবে বাচনিক ক্রিয়ার সঙ্গে তার সম্পর্ক দেখানই বেশী যুক্তিসঙ্গত বলে মনে হয়। এ বিষয়ে সম্পূর্ণ আলোচনা এখানে সম্ভব নয়।

সত্য সম্বন্ধে বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদের সমালোচনা আরও বিস্তৃত হওয়া উচিত ছিল। এত অল্পপরিসরের মধ্যে জ্ঞান ও সত্য সম্বন্ধে সুষ্ঠু আলোচনা অবশ্য সম্ভব নয়, কিন্তু আরও বিস্তৃত আলোচনা ভিন্ন এ বিষয়ে মত প্রকাশ করা অযৌক্তিক। অর্থক্রিয়াকারিত্ববাদ ও অন্যান্য দার্শনিক মতবাদের সম্পূর্ণ নিরসন না করে, নিজের মত প্রকাশ করা সমালোচনা ও বিশ্লেষণী পদ্ধতির আদর্শের পরিপন্থী।

তবে এ কথা নিঃসংশয়ে বলা যায় যে এ পুস্তকখানি প্রত্যেক দার্শনিক ও ও দর্শনশাস্ত্রানুরাগী পাঠকের পড়ে দেখা উচিত। অনার্স ক্লাসের ছাত্রদের পক্ষেও এ পুস্তকখানি বিশেষ উপযোগী। আমরা এ পুস্তকখানির বহুল প্রচার কামনা করি।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী।

---

* কার্য্যকারণসম্পর্ক বিষয়ে তিনি তিনটী বিধির উল্লেখ করেছেন—(১) ঘটনার কারণ সম্ভবত্ব বিধি (২) অখণ্ডক্রমত্ব বিধি (৩) জাতীয় সাদৃশ্য বিধি।

The Root and the Flower—By L. H, Myers (Jonathan Cape.)

আলোচ্য গ্রন্থখানি উপন্যাস। তিন খণ্ডে বিভক্ত—সন্নিকট ও সুদূর, রাজকুমার জালি ও রাজা অমর। প্রথম দুই খণ্ড ইতিপূর্ব্বে বিভিন্ন পুস্তকরূপে প্রকাশিত হইয়াছিল। এক্ষণে তাহাতে তৃতীয় খণ্ড সংযোজিত করিয়া গ্রন্থকর্ত্তা এক অবিচ্ছিন্ন উপন্যাস রচনা করিয়াছেন। কিন্তু ছয় শত পৃষ্ঠাব্যাপী এই সুদীর্ঘ পুস্তকেও আখ্যায়িকা সমাপ্ত হয় নাই। প্রস্তাবনাতে গ্রন্থকার লিখিয়াছেন,"the new portion,while it does not bring the story to an end, does bring it to an important climax"। ভবিষ্যতে কোনদিন আখ্যান সম্পূর্ণ করিবেন, এরূপ আশাও তিনি দিয়াছেন। পাঠক এই climax অবধি গল্প পড়িয়া তৃপ্ত হইবেন কি না, জানি না। আমরা সন্তুষ্ট হইতে পারি নাই।

পুস্তকখানি সম্বন্ধে যথার্থ মতামত বিবৃত করা কঠিন কাজ। বিবিধ ইংরেজ সমালোচক ইহার এরূপ উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়াছেন, যে তাহার পরে আর সাধারণ লোকের কথা চলে না। তথাপি আমাদেরও একটা কর্ত্তব্য আছে। স্পষ্টতঃ না পারি, ইঙ্গিতে আভাসে মনের ভাব ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করিব।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি পুস্তকখানি সুদীর্ঘ। গল্প সম্পূর্ণ হইলে হয়ত ইহার আয়তন সহস্র পৃষ্ঠা হইবে। দীর্ঘ উপন্যাস লেখা যে দোষাবহ তাহা আমরা বলিতেছি না। দীর্ঘ উপন্যাসের একটা সার্থকতা অবশ্যই আছে। তবে আমাদের মনে হয় যে, উপন্যাস অতিদীর্ঘ হইলে তাহার একটা epic quality থাকা চাই। এরূপ গ্রন্থ মহামানবের কীর্ত্তিগাথা হইতে পারে, কিংবা কোন মহাযুগের গৌরব-কাহিনী হইতে পারে, কিংবা, এমন কি, কোন অধঃপতিত মহাজাতির বিষাদগীতি হইতে পারে। নানাবিধ দীর্ঘ উপন্যাসের সহিত আমরা পরিচিত। Galsworthyর Forsyte Saga, Dumasএর Three Musketeers, দস্তয়েভস্কির People ইত্যাদি গ্রন্থ এই epic qualityর জন্যই খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছে। কিন্তু আলোচ্য পুস্তকে এই গুণের একান্ত অভাব। আখ্যায়িকার স্থান ভারতবর্ষ, কাল আকবরের যুগ, পাত্র স্বয়ং বাদশাহ হইতে আরম্ভ করিয়া নানা প্রকার ছোট বড় মানুষ। কিন্তু গ্রন্থকার সেই গৌরবময় যুগকে দেখিয়াছেন এমন এক জোড়া ভাঙ্গা চোরা রঙ্গীন চশমার মধ্য দিয়া যে তাঁহার পুস্তকের কোন পাত্রকে আর চিনিবার উপায় নাই। মুখবন্ধে তিনি এ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহা মোটামুটি এই, "এ পুস্তক ঐতিহাসিক উপন্যাসও নহে, প্রাচ্য জাতিসমূহের চাল চলন বা চিন্তার ধারার বিবৃতিও নহে। ভারতীয় রীতি-নীতি, ভারতের ইতিহাস বা ভূগোল কিছুই আমি মানিয়া চলি নাই। যেখানে যতটা প্রয়োজন বোধ করিয়াছি সত্যের অপলাপ করিয়াছি।" (Fact have been distorted or ignored where inconvenient)

বেশ করিয়াছেন! তবে আমাদের বক্তব্য যে গ্রন্থকার মাঞ্চুদিগের চীন কি টোলেমিদিগের মিসর সম্বন্ধে উপন্যাস লিখিলে তাঁহারও কোন ক্ষতি হইত না, আমাদেরও এতটা আপত্তি থাকিত না। ভারতবাসীর অতি সাধের, অতি গৌরবের একটা যুগ লইয়া এ খেলা না খেলিলেই ভাল হইত। আর এ কথাও বোঝা কঠিন যে ঐতিহাসিক গল্প লিখিতেছেন না বলিয়া ইতিহাসকে ও বাস্তবকে

Myers সাহেব এরূপ নির্দ্দয় ভাবে বিকৃত করিলেন কি মতলবে। প্রস্তাবনাতে তিনি কৈফিয়ৎ দিয়াছেন, তাহা সযত্নে পড়িয়াও আমাদের সমস্যার কোন সমাধান হইল না। বুঝিলাম মাত্র এইটুকু যে সাহেব অসাধারণ ও আশ্চর্য্য চিত্র অঙ্কিত করিবেন বলিয়া এক অসাধারণ ও আশ্চর্য্য canvas খাড়া করিয়াছেন।

পুস্তকখানি যে অসাধারণ হইয়াছে তাহাতে কোন সংশয় নাই। ঠিক এই ধরণের উপন্যাস আমরা পূর্ব্বে কখনও দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। এই অসাধারণত্বের জন্যই হয়ত এক আধজন অসাধারণ high brow পাঠকের এই পুস্তক ভাল লাগিতে পারে। কিন্তু সাধারণ পাঠকের আদ্যোপান্ত পড়িবার ধৈর্য্য থাকিবে কি না, সন্দেহ। ভারতীয় পাঠকের চক্ষে আবার তাহার আপন দেশবাসীর এই বিকৃত ও অদ্ভুত চিত্র অপ্রিয় ও অসুন্দর ঠেকাই সম্ভব। আগেই বলিয়াছি যে উপন্যাসের পাত্রগণের মধ্যে স্বয়ং আকবর শাহ একজন। সম্রাটের চিত্র সম্বন্ধে Mr. Myers বলিয়াছেন, "The only personage drawn with any regard for the truth is the Emperor"। কিন্তু আমাদের মত যাঁহারা সম্রাটকে গভীর শ্রদ্ধার চক্ষে দেখেন তাঁহারা Myers সাহেবের আকবর চরিত্রাঙ্কন দেখিয়া সুখী হইতে পারিবেন না, বরং ক্ষুণ্ণ হইবেন। গল্পে আর তিনজন ঐতিহাসিক ব্যক্তি স্থান পাইয়াছেন—দুই শাহজাদা, সেলিম ও দানিয়াল, এবং রাজগুরু মুবারক। ইহাদের চরিত্রের সহিতও ইতিহাস বা সত্যের বিশেষ কোন সম্পর্ক নাই। বাকী পাত্রগণ ও তাহাদের কার্য্যকলাপ সত্যই অদ্ভুত। দুই চারিজনের নাম করিব। পাঠক নিজেই বিচার করিবেন।

উপন্যাসের নায়ক, অমর, মধ্যভারতের মরু প্রদেশের একজন রাজা। জাতিতে রাজপুত, ধর্ম্মে বৌদ্ধ। তাঁহার রাণী জন্মিয়াছিলেন ককেসস্ প্রদেশে। ধর্ম্মে খৃষ্টান। পূর্ব্বে নাম ছিল হেলেন, এখন নাম হইয়াছে সীতা। সীতার পুত্রের নাম জালি। সেও খৃষ্টান। অমর সিংহের ভগ্নীর নাম অম্বিস্সা। তিনি বিবাহ করিয়াছেন একজন পাঠান যোদ্ধাকে। এই পাঠানের নাম হরি খান। হরি খানের প্রেমিকা এক আফগান সরদারের দুহিতা। তাঁহার নাম ললিতা। এ কথা শুনিয়া পাঠক হাসিবেন না। কারণ একজন তুর্কী সরদারের সহিতও তাঁহার পরিচয় হইবে যাহার নাম নরসিংহ খান। Myers সাহেব একজন বাঙ্গালীকে পর্য্যন্ত আসরে নামাইয়াছেন। অবশ্য বাঙ্গালীকে আর কি কাজ দিবেন, তাহাকে গোয়েন্দা বানাইয়াছেন! নামও দিয়াছেন অতি চমৎকার—মাবুন দাস। হরি খান ও ললিতার প্রণয়-কাহিনী বেশ আধুনিক রকমের। তথা, হরি খান ও তাঁহার শ্যালক-পত্নী সীতার গুপ্ত প্রেম একেবারে বিংশ শতাব্দীর ইউরোপের ব্যাপার! এই সব কাহিনী রচনা করার জন্য আকবরযুগের অবতারণার কোন প্রয়োজন ছিল না। অমরকে বৌদ্ধ করারই বা কি সার্থকতা! ধর্ম্ম-প্রবণ সংসার-ত্যাগী পুরুষ ত সকল দেশে সকল যুগেই থাকিতে পারে!

ললিতা, সীতা, অম্বিস্সা প্রভৃতি গল্পের পাত্রীগণ নিতান্ত একেলে মহিলা। সীতা শাহজাদা দানিয়ালের সহিত লাঞ্চ খাইতেছেন। হরি খান ললিতাকে প্রথম দেখিলেন তাহার পিতার ডিনার টেবিলে। ললিতা তাহার মাতা ও ভগ্নীদের

লইয়া ডিনার খাইলেন অপরিচিত অতিথির সহিত এক টেবিলে! এই নায়িকাগণ উপন্যাসাদি পড়িতেছেন, কাব্যচর্চ্চা করিতেছেন, আমাদের পরিচিত আধুনিকাদের মতই। দ্বিতীয় খণ্ডে বালক বালিকাদের একটা চায়ের বৈঠকের পর্য্যন্ত বর্ণনা আছে।

আমাদের মনে হয় যে এই সমস্ত অসঙ্গতি ইচ্ছাকৃত এবং সেই কারণেই আমাদের নজরে বেশী আপত্তিজনক। গ্রন্থকার যে ভারতবর্ষ ও মোগলযুগ সম্বন্ধে অনেক কিছু জানেন, সে বিষয়ে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। গ্রন্থের নানা স্থলে বিবিধ ধর্ম্মমত ও লোকাচার সম্বন্ধে যে সূক্ষ্ম বিচার আছে তাহা গভীর জ্ঞানের পরিচায়ক। তথাপি Myers সাহেব কেন যে একটা কৃত্রিম অস্বাভাবিক আবেষ্টনের সৃষ্টি করিয়া গল্প লিখিয়াছেন তাহা আমরা বুঝিতে অক্ষম।

গল্পের ঘটনাবলীও যত দূর সম্ভব জটিল। মূল কথাটা এই যে আকবর বাদশাহ ভারতব্যাপী বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়া এক্ষণে বৃদ্ধ বয়সে ধর্ম্মসমন্বয়ে মন দিয়াছেন ও দীন ইলাহীর প্রতিষ্টায় আপন শক্তি নিয়োজিত করিয়াছেন। তাঁহার দুই পুত্র জীবিত—সেলিম ও দানিয়াল। সেলিমকে গোঁড়া মুসলমান দল আপন নেতা বলিয়া মনে করেন। দানিয়ল ধর্ম্মের ধার ধারে না—সে সুন্দরের উপাসক, কলা-চর্চ্চাই তাহার প্রধান কাজ। সেলিম কিন্তু গোপনে তান্ত্রিক বামাচারে রত। আকবর তান্ত্রিকদের উচ্ছেদ সাধনে কৃতসংকল্প হইয়া আদেশ দিয়াছেন যে তান্ত্রিক সম্প্রদায়ের কতিপয় প্রধান লোককে হস্তীপদদলিত করিয়া মারিয়া ফেলা হউক। সেলিম পিতার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছেন। আগেই বলিয়াছি গল্প এখনও শেষ হয় নাই। কিন্তু এই যে পিতাপুত্রে, ভ্রাতায় ভ্রাতায় যুদ্ধ বাধিয়াছে এই যুদ্ধের জন্য উভয় পক্ষই লোক সংগ্রহ করিতেছেন। নানারূপ ষড়যন্ত্র চলিয়াছে। উপন্যাসের পাত্রপাত্রীগণ সকলেই অল্পবিস্তর এই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। এই ষড়যন্ত্রের মধ্যেই আবার নানা অবান্তর কাহিনী জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। ফলে এরূপ গোলযোগ বাড়িয়াছে যে পড়িতে পড়িতে গল্পের মূলসূত্রটী অনেক স্থলেই হারাইয়া যায়।

এত ক্ষণ বইখানির দোষই ধরিয়াছি। কেন না ইহার গুণ অপেক্ষা দোষ অনেক বেশী। অন্ততঃ আমাদের এই মত। তবে এ কথা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না যে পুস্তকের লিখন-ভঙ্গী চমৎকার, ভাষা অতি সুন্দর—স্থানে স্থানে কবিতার মত, গানের মত শ্রুতিমধুর। তেমনই মনস্তত্ত্ব-ঘটিত ব্যাপারের এরূপ সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ খুব কম উপন্যাসেই দেখিয়াছি। এই বিশ্লেষণ সর্ব্বত্র প্রাঞ্জল নয়, কিন্তু ইহার নৈপুণ্য সম্বন্ধে মতভেদ হইতে পারে না। উপন্যাসের পাত্রগুলি exotic, তাহাদের আবেষ্টন কৃত্রিম হইলেও Myers সাহেব তাহাদের যে চরিত্রাঙ্কন করিয়াছেন তাহা পাকা হাতের কাজ; চিত্রে যে রেখা টানিয়াছেন, তাহাতে যে রঙ্গ ফলাইয়াছেন, তাহার মধ্যে কোথাও কাঁচা কাজ নাই। রাজকুমার জালিকে আমাদের বিশেষ ভাল লাগে নাই। দ্বাদশ ত্রয়োদশ বৎসরের বালকের পক্ষে কিছু বেশী অকালপক্ব মনে হইয়াছে। কিন্তু ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে Myers সাহেব জালির যে চিত্র আঁকিয়াছেন তাহা সুস্পষ্ট, উজ্জ্বল, সুন্দর। তিনি ইচ্ছা

করিয়াই জালিকে অকালপক্ক করিয়াছেন, কেন যে এরূপ করিয়াছেন তাহার পরিষ্কার কারণও দেখাইয়াছেন। সর্ব্বত্রই এই রকম। হরি খানকে ভাল না লাগিতে পারে, কিন্তু হরি খানের চিত্রে যে এতটুকু অস্পষ্টতা আছে তাহা কেহ বলিতে পারিবে না। মোট কথা আলোচ্য গ্রন্থের ভাষা ও লিখনভঙ্গী সুন্দর। চরিত্রাঙ্কন ও চরিত্র-বিশ্লেষণ চমৎকার, কিন্তু আখ্যায়িকা অসম্বদ্ধ ও অসঙ্গত এবং অযথা দীর্ঘ। একটা কথা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি। পুস্তকের স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনার এমন আশ্চর্য্য সুন্দর বর্ণনা আছে যাহা একবার পড়িলে সহজে ভোলা যায় না। তবে এরূপ স্থল খুব বেশী নাই, আর সেগুলি সমগ্র পুস্তকের মাঝে এমন ভাবে লুকান আছে যে পরে খুঁজিয়া বাহির করাই কঠিন।

শ্রীচারুচন্দ্র দত্ত

A Study of History—By Arnold J. Toynbee-Vols, I, II and III
(Oxford University Press)

ইংরাজ অধ্যাপক আর্ণল্ড্ টয়েন্‌বির শ্রেষ্ঠ রচনা মানব ইতিহাসের এক বিরাট বিবরণের প্রথম তিন খণ্ড প্রকাশ ঐতিহাসিকদের জগতে বোধ হয় গত দু বছরের প্রধান স্মরণীয় ঘটনা বলে' গণ্য হবে। যে-উচ্চ আশা নিয়ে টয়েন্‌বি প্রায় অসাধ্য-সাধনে প্রবৃত্ত হয়েছেন তা' যে সফল হয়েছে একথা বল্‌ছি না কেন না আমার বিশ্বাস এই যে ইতিহাসের সমগ্ররূপের বর্ণনা ও ব্যাখ্যা মাত্রই অসম্পূর্ণ ও অনেকখানি একদেশদর্শী হ'তে বাধ্য এবং সে সম্বন্ধে মতভেদও অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু আমাদের এই খণ্ড খণ্ড সত্যানুসন্ধানের যুগে টয়েন্‌বির প্রচেষ্টার ব্যাপকতা বিস্ময়জনক ও প্রশংসনীয়; এবং তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য, অদম্য অধ্যবসায়, চিন্তার প্রসার ও লেখার প্রাঞ্জলতা পাঠকদের মন মুগ্ধ করবে একথা জোর করে বলা চলে।

আর্ণল্ড্ টয়েন্‌বি প্রবীণ ঐতিহাসিক নন, তিনি উত্তর-সামরিক যুগের লেখক। কিন্তু মহাযুদ্ধের পর পৃথিবীর অবস্থা সম্বন্ধে একটি ছোট অথচ উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা এবং আধুনিক আন্তর্জ্জাতিক ঘটনাবলীর বাৎসরিক বিশদ বিবরণীগুলির সম্পাদনা-কার্য্য তাঁকে ইতিপূর্ব্বেই খ্যাতি এনে দিয়েছে। তবুও সভ্যতার সূত্রপাত থেকে বর্ত্তমান অবস্থা পর্য্যন্ত সমস্ত ইতিহাসের পর্য্যালোচনা এবং সে সম্বন্ধে এক বিশাল গ্রন্থ প্রণয়নে তিনি যে নিজের জীবন নিয়োগ করেছেন এ-কথা সাধারণের অগোচর ছিল। সভ্যতার এই ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ তের ভাগে সম্পূর্ণ হবে। তার মধ্যে প্রথম তিনটি অংশ মাত্র এখন পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয়েছে। এই তিন খণ্ডে টয়েন্‌বি তাঁর মতামতের সংক্ষিপ্তসার উপক্রমণিকায় লিপিবদ্ধ করবার পর সভ্যতার উৎপত্তি এবং বিকাশ এই বিষয় দুটি মাত্র আলোচনা করেছেন। কিন্তু এর মধ্যেই ঐতিহাসিক দৃষ্টির একটি বিশিষ্ট রূপ পাঠকের চোখে ধরা দিচ্ছে।

টয়েন্‌বি মানব-সভ্যতার ধারাবাহিক ইতিহাস লেখবার চেষ্টা করেন নি, সভ্যসমাজগুলির জীবনের বাহ্যিক ঘটনার বিবৃতি অথবা তাদের কীর্ত্তিসম্পদ বিচারও

তাঁর লক্ষ নয়। তিনি শুধু মানুষের ইতিহাসের একটা সম্পূর্ণ রূপ দেখতে চেয়েছেন; তুলনামূলক বিচারের সাহায্যে ইতিহাসের গতি সম্বন্ধে কতকগুলি সাধারণ সত্য বা নিয়ম নির্দ্ধারণই তাঁর উদ্দেশ্য। ফলে তাঁর গ্রন্থ ইতিহাসের বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যার রূপ নিয়েছে। কিন্তু বিশেষ কোন ঘটনা অবিসংবাদিত সত্য হ'লেও সমস্ত ইতিহাসের রূপ বা ব্যাখ্যা সম্বন্ধে সকলের একমত হবার সম্ভাবনা নিতান্তই অল্প। ইতিহাসের সমগ্র মূর্ত্তি প্রকাশ পায় ঐতিহাসিকের দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্য দিয়ে, আর সে দৃষ্টি ভঙ্গী শ্রেণী জাতি বা ব্যক্তিগত পার্থক্য ও যুগধর্ম্মের বৈশিষ্ট্যের উপর গড়ে ওঠে। ভাববাদীর ইতিহাস সম্বন্ধে ধারণা বস্তুতান্ত্রিকের মন স্পর্শ করবে না একথা সহজেই বোঝা যায়। সমাজ-সম্পর্কিত সকল বিদ্যার আলোচনাতেই এ-জাতীয় মতানৈক্য স্বাভাবিক বলেই আমার বিশ্বাস—বিশুদ্ধ বিজ্ঞান এ ক্ষেত্রে বোধ হয় অচল। সেইজন্য টয়েন্‌বির মতবিশেষ খণ্ডন করার চেষ্টার চাইতে তাঁর বিশ্বাস ও ধারণার কিছু পরিচয়ই বর্ত্তমান আলোচনার প্রধান লক্ষ্য।

বিপুল আয়োজন ও ব্যাপক দৃষ্টির দিক থেকে টয়েন্‌বির উদ্যম অনেকখানি নূতন, কেন না বহুকাল ধরে ইতিহাসকে খণ্ড খণ্ড ভাবে দেখার অভ্যাস আমাদের মন অভিভূত করে' রেখেছে। টয়েন্‌বির মতে এ অভ্যাসের মূল যুগধর্ম্মে। পণ্যোৎপাদন প্রণালীকে যেমন এখন নানাভাগে বিভক্ত ক'রে বিশেষজ্ঞদের হাতে ন্যস্ত করা হয়েছে ঐতিহাসিক-বিশেষের আলোচনার ক্ষেত্রও তেমনি ক্রমশঃ সংকীর্ণ হয়ে এসেছে; ফলে সমাজ-জীবনের সমগ্র রূপ কারও চোখে প্রতিভাত হয় না। মম্‌সেন্ যৌবনে এক বিশাল ইতিহাস রচনা করেছিলেন, কিন্তু তাঁর পরিণত জীবন তিনি অতিবাহিত করলেন রোমান লিপিমালা ও শাসনপদ্ধতির পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনার মধ্যে। য়্যাক্টন্ মনস্থ করেছিলেন যে স্বাধীনতা বিকাশের বিচিত্র ইতিবৃত্ত তিনি উদ্ঘাটিত করবেন কিন্তু সারাজীবনের পরিশ্রমেও তিনি তার যথেষ্ট উপাদান সংগ্রহ করে' উঠতে পারেন নি। অনেক সময় সামান্য আয়াসের লেখার ভিতরও গভীর ঐতিহাসিক সত্য নিহিত থাকে—টুর্গো বা দ্য গোবিনোর প্রবন্ধগুলি এর উদাহরণ। আধুনিক কালে রাষ্ট্রীয় মহাশক্তিদের উত্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে এ ধারণাও বদ্ধমূল হয়েছে যে জাতি বা দেশই হচ্ছে ইতিহাসের মূল আধার। এইজন্য ফরাসী ইতিহাস-লেখক জুলিয়ান্ সুদূর প্রস্তর যুগের মধ্যেও ফ্রান্সের স্বতন্ত্র সত্তার পরিচয় পেয়েছেন। যুগবৈশিষ্ট্যের প্রভাব এত প্রবল হওয়া সত্ত্বেও টয়েন্‌বি কিন্তু বিশ্বাস করেন যে ইতিহাস চর্চ্চার মধ্যে কিছু সার-সত্য নিহিত আছে এবং সেই সত্যানুসন্ধান ঐতিহাসিকের ধর্ম্ম ও সে-সত্যনির্দ্ধারণই ইতিহাসের সার্থকতা।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যে অন্ততঃ ইংল্যাণ্ডের ইতিহাস সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ভাবে বোধগম্য কিন্তু খৃষ্টধর্ম্মগ্রহণ থেকে আরম্ভ ক'রে পণ্যোৎপাদন পদ্ধতির পরিবর্ত্তন পর্য্যন্ত সে ইতিহাসের সকল প্রধান ঘটনাগুলি বুঝতে গেলেই অন্য অনেক দেশের কথা জানা প্রয়োজন হয়ে পড়ে। সুতরাং কোন দেশের ইতিহাসই সম্পূর্ণ পৃথক নয়—অংশবিশেষের সম্যক্ পরিচয় পেতে গেলে সমগ্রের রূপ প্রথমে উপলব্ধি করতে হবে। ইংল্যাণ্ডের ইতিবৃত্ত ইউরোপ সম্বন্ধে জ্ঞানের উপর নির্ভর করে। কিন্তু তাই বলে ইংল্যাণ্ডের কথা জানতে গেলে সমস্ত জগতের ইতিহাস আয়ত্ত করতে হবে

একথাও সত্য নয়। ঐতিহাসিক পরিচয় বা জ্ঞান রাষ্ট্র বা জাতিবিশেষের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না বটে কিন্তু তার ক্ষেত্র সর্ব্বদাই জগদ্ব্যাপী হবার প্রয়োজন নেই। অর্থাৎ একই সময় আমরা পৃথিবীতে একাধিক সভ্য সমাজের পরিচয় পাই—তাদের পরস্পরের মধ্যে যোগ সামান্য; তাদের প্রত্যেকের পৃথক সত্তা আছে; তাদের ইতিহাস পরস্পরের থেকে স্বতন্ত্র ও পৃথকভাবে বোধগম্য; কিন্তু প্রতি সমাজের অন্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন দেশগুলি পরস্পরের সঙ্গে গভীর যোগসূত্রে আবদ্ধ, তাদের মিলন অত্যন্ত নিবিড়। টয়েনবি বলেন যে বর্ত্তমানে পাঁচটি বিভিন্ন সভ্যতা বা সমাজ বিরাজ করছে—পাশ্চাত্য জগৎ, পূর্ব্ব ইউরোপের সনাতনী খৃষ্টীয় সমাজ, মুসলমান জাতিগুলি, হিন্দু সভ্যতা এবং সুদূর প্রাচ্য। আমবা আজকাল পৃথিবীর যে একতা অনুভব করি সে ঐক্য নিতান্ত অভিনব ও অসম্পূর্ণ—আর্থিক বা রাষ্ট্রিক মিলনেব চাইতে সংস্কৃতিগত পার্থক্য নাকি এখনও প্রবলতর।

কিন্তু এইভাবে যে সভ্যসমাজগুলির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নির্দ্ধারিত হ'ল তারা কেউ চিরদিনের নয়, ব্যক্তিবিশেষের মত সমাজেরও জন্ম, বৃদ্ধি, বার্দ্ধক্য, মৃত্যু (এমন কি অকালমৃত্যু পর্য্যন্ত) আছে। সুতরাং আজকেব দিনের পাঁচটি সভ্যতা ছাড়াও অন্য সমাজেব পরিচয় আমরা পুরাকালের তথ্যানুসন্ধান করে পেতে পারি—তারা এখন মৃত, যদিও তাদের মধ্যে কারও কারও সন্তানসন্ততি হিসাবে আধুনিক সমাজ কয়েকটিকে গণ্য করা যায়। ঠিক একশ' বছর আগে ফরাসী অভিজাত দ্য গোবিনো সমাজ সম্বন্ধে এই ধারণা প্রচার করেছিলেন—তখন তাঁব তালিকায় দশটি সভ্যতা স্থান পেয়েছিল। মানুষের সমস্ত ইতিহাস বিচার করে' টয়েনবি সবশুদ্ধ উনিশটি সভ্যসমাজের সন্ধান পেয়েছেন। জীবিত পাঁচটি ছাড়া অন্যগুলির নাম এখানে করা যেতে পারে—ইরানীয় ও আরব (ষোড়শ শতকে উভয়ের মিলনে বর্ত্তমান ইস্‌লাম্ সমাজের উৎপত্তি হয়), হেলেনিক্ (গ্রীস্ ও রোম) ও মিনোয়ান্ (লাটীন ঈজীয় দ্বীপমালার সভ্যতা), সিরিয়াক (হিব্রু জাতি ও পারস্যের অভ্যুদয় থেকে ইস্‌লামের উত্থান পর্য্যন্ত), হিটাইট ও বাবিলোনীয়, প্রাচীন চৈনিক ও প্রাচীন ভারতীয়, সুমেরীয় ও মিশরী এবং আমেরিকার আণ্ডেস্ অঞ্চলের সমাজ ও মায়া সভ্যতা ও শেষোক্তটির থেকে উদ্ভূত মেক্সিকো ও য়ুকাটনের সমাজ। ইরানীয় ও আরব সভ্যতা ইস্‌লামী সমাজে একত্র অবস্থান করছে বলে' অবশ্য তালিকায় কুড়িটির জায়গায় উনিশটি সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট হয়েছে।

এই বিভিন্ন সমাজগুলির সম্বন্ধ নির্ণয়ের চেষ্টায় টয়েন্‌বি প্রভূত পরিশ্রম করেছেন। এর মধ্যে মিশরী ও আণ্ডেস্-সভ্যতার সঙ্গে পূর্ব্বগামী বা পরবর্ত্তী কোন সভ্যতার যোগ তিনি স্বীকার করেন না—এ দুটি স্বয়ম্ভু ও সন্তানহীন। আর চারটি সমাজের ক্ষেত্রে পূর্ব্ববর্ত্তী কোন সভ্যতার সম্পর্ক পাওয়া যায় না। এদের নাম প্রাচীন চৈনিক, সুমেরীয়, মিনোয়ান্ ও মায়া। অন্য সবকয়টি সমাজই পূর্ব্বগামী কোনও সভ্যতার উত্তরাধিকারী। উদাহরণ হিসাবে বলা যেতে পারে যে হেলেনিক্ সভ্যতা মিনোয়ান্ থেকে উদ্ভূত ও বর্ত্তমান পাশ্চাত্য জগৎ এবং সনাতনী খৃষ্টীয় সমাজের জননী। আধুনিক হিন্দু সমাজ প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার সন্তান ও সে-সভ্যতা (মহেঞ্জোদোরোর প্রমাণে) টয়েন্‌বি সুমেরীয় সমাজের থেকে উৎপন্ন বলে'

সন্দেহ করেছেন। মিনোয়ান জননীর আর এক সন্তান সিরিয়াক সভ্যতা আর তার থেকে ইরানীয় ও আরব সমাজের উৎপত্তি।

কিন্তু এক সমাজ অন্য সভ্যতার সন্তান এ-তথ্য আবিষ্কারের উপায় কি? টয়েনবি হেলেনিক্ সভ্যতার সঙ্গে পাশ্চাত্য জগতের সম্পর্ক বিচার করে কতকগুলি চিহ্ন পেয়েছেন এবং খানিকটা কল্পনার আশ্রয় নিয়ে প্রতি ক্ষেত্রে সে চিহ্নগুলির অনুসন্ধানে মন দিয়েছেন। এক সমাজ থেকে অন্য সমাজের উৎপত্তির ইতিহাস (অনেক ক্ষেত্রে, যদিও সর্ব্বত্র নয়) খানিকটা এই রকম। সমাজের জীবনে একটা অরাজক অবস্থা আসতে পারে যাকে আমাদের সাহিত্যে মাৎস্যন্যায় বলা হত। তার ফলে ক্রমে ক্রমে সার্ব্বভৌম সাম্রাজ্য স্থাপিত হয় (ঈজিপ্টের দ্বাদশ বা অষ্টাদশ রাজবংশ, সুমের ও আক্কাদ, আকেমেনীয় রাজত্ব, হান্ রাজকুল, মৌর্য্য বা গুপ্ত সাম্রাজ্য, রোম, খিলাফৎ, ইন্‌কা ও আজটেক রাজ্য প্রভৃতি)। সভ্যতাবিশেষের জীবনী-শক্তি যতদিন প্রবল থাকে ততদিন সার্ব্বভৌম সাম্রাজ্য সামাজিক ঐক্য সংরক্ষণ করতে পারে, তারপর আসে বার্দ্ধক্য ও মৃত্যু। সেই শেষযুগে মুষ্টিমেয় শাসকসম্প্রদায় প্রাচীন সভ্যতাকে আবার ধরে আত্মরক্ষার চেষ্টা করে; তখন একদিকে সে সমাজের সীমান্তস্থিত বর্ব্বরেরা তাকে বিধ্বস্ত করে' তোলে (যেমন টিউটনেরা রোমকে ও শক-হূণেরা গুপ্ত সাম্রাজ্যকে বিপন্ন করেছিল) এবং অন্যদিকে অভ্যন্তরস্থিত নিম্ন শ্রেণীরা উদীয়মান কোন সার্ব্বভৌম ধর্ম্মের আশ্রয়ে নূতন জীবন লাভ করে (রোম সাম্রাজ্যের অবসানে খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রভাবের মতন)। যদি পূর্ব্ব ও পর দুই সভ্যতার মধ্যে কোন সার্ব্বভৌম ধর্ম্মের সেতু পাওয়া যায় তবে দ্বিতীয়টি প্রথমের সন্তান, একথা নিঃসন্দেহ প্রমাণিত হয় (খ্রীষ্টধর্ম্মের কল্যাণে হেলেনিক সভ্যতা পাশ্চাত্য জগতের জননী রূপে গণ্য হচ্ছে)। নূতন ধর্ম্ম উপরোক্ত ক্ষেত্রে প্রাচীন সমাজের বাইরে থেকে এসেছিল অবশ্য; কিন্তু অন্যত্র সার্ব্বভৌম ধর্ম্ম পুরাতনের ভিতর থেকে উত্থিত হয়েছে—ইস্‌লামের উৎপত্তি যেমন সিরিয়াক্ সভ্যতার মাঝখানেই। যদি পুরাতন সভ্যতার প্রচলিত ধর্ম্মই নূতন সমাজে প্রতিষ্ঠিত দেখা যায় তবে পরবর্ত্তী সভ্যতার স্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধে সন্দেহ ওঠে—সুমেরীয় ও বাবিলোনীয় সমাজের সম্পর্ক সম্বন্ধে এ প্রশ্ন স্বাভাবিক। অন্যদিকে যদি দুই সমাজের মধ্যে সার্ব্বভৌম ধর্ম্মের সেতু না পাওয়া যায় তবে তাদের পারস্পরিক যোগ নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় না—সুমেরীয় সভ্যতার সঙ্গে প্রাচীন ভারতের সম্বন্ধ স্থাপন এইজন্য সুসাধ্য নয়।

এরপর টয়েন্‌বি আলোচনা করেছেন যে বিভিন্ন সমাজের তুলনা চলে কি না। মানবজাতির জীবনের অধিকাংশই বর্ব্বর অবস্থায় কেটেছে—এখনও অসভ্য জাতির বিশেষ অভাব নেই। মানুষ হয়ত এই পৃথিবীতে তিন লক্ষ বছর বাস করেছে কিন্তু সভ্যতার প্রথম উদয়ও ছয় হাজার বছরের বেশী নয়। সুতরাং এক হিসাবে সকল সভ্য সমাজই প্রায় সমসাময়িক। মূল্যবিচারের দিক থেকে দেখতে গেলেও স্বীকার করতে হবে যে একদিকে অসভ্য অবস্থা ও অন্য দিকে মানুষের যে চরম সিদ্ধি সম্ভব এ উভয়ের তুলনাতেই ইতিহাসের পরিচিত সকল সভ্যতাই প্রায় একই গোত্রের—অন্ততঃ টয়েন্‌বির তাই বিশ্বাস। তিনি একথাও

বলেন যে এক হিসাবে ইতিহাসের প্রতি ঘটনারই নিজস্ব স্বাতন্ত্র আছে বটে কিন্তু ঐতিহাসিকের ব্যাপক দৃষ্টিতে ঘটনার সাদৃশ্যও ধরা পড়তে বাধ্য ; এই সাদৃশ্যজ্ঞানই ইতিহাস লেখকের মূলসূত্র এবং এরই উপর সভ্যতার তুলনামূলক পর্য্যালোচনার প্রতিষ্ঠা।

তবুও প্রশ্ন উঠতে পারে যে সকল সভ্যতাই কি মূলতঃ এক নয়? অনেক সময় ইতিহাসকে অবিচ্ছিন্ন স্রোতের রূপে কল্পনা করা হয়েছে, সামাজিক বিবর্ত্তনকে বলা হয়েছে সরল রেখায় প্রগতি। টয়েন্‌বি এর কারণ দেখাবার চেষ্টা করেছেন। পাশ্চাত্য জগৎ সারাপৃথিবীর আর্থিক ও রাষ্ট্রীয় কর্ত্তৃত্ব হস্তগতপ্রায় করেছে বলে পশ্চিমের ঐতিহাসিকেরা মনে রাখেন না যে এ ঐক্য সাম্প্রতিক মাত্র। সেই কারণেই তাঁরা সমসাময়িক অন্যান্য জীবন্ত সমাজগুলিকে অগ্রাহ্য করেন এবং প্রাচীন সভ্যতাগুলিকেও হয় তুচ্ছজ্ঞান নয়ত পাশ্চাত্য সমাজের উপাদান মাত্র গণ্য করেছেন। প্রাচ্য দেশগুলি তাঁদের অনেকের মতে পরিবর্ত্তনহীন সুতরাং তাদের ইতিহাস নেই। এখানে ইতিহাসকে শুধু রাষ্ট্রনীতির সংকীর্ণ ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ করা হয়েছে এবং সেই সঙ্গে পূর্ব্ব জগতের বিভিন্ন সমাজের পার্থক্যের কথাও মনে রাখা হয় না। সামাজিক গতির রূপ সরল রেখা রূপে কল্পনা করাও শিশুসুলভ—তাতে ইতিহাসের যথার্থ বৈচিত্র্য সম্পূর্ণ লোপ পেতে বাধ্য। আসলে গত ষাট শতাব্দীতে নানা সভ্যতার উৎপত্তি ও লোপপ্রাপ্তি ঘটেছে, ঐতিহাসিককে তাদের সকলের কথাই মনে রাখতে হবে। মানুষ একদা মনে করত যে পৃথিবীই বিশ্ব-জগতের কেন্দ্রস্থল; স্বজাতি বা নিজের সমাজই যে মানুষের ইতিহাসের কেন্দ্র নয়, এ বিশ্বাস এখনও সুপ্রতিষ্ঠিত হয়নি।

সভ্যতার উৎপত্তির কারণ সম্বন্ধে আলোচনা টয়েন্‌বির লেখায় অনেকখানি স্থান অধিকার করে রয়েছে। যে-কয়েকটি সভ্যসমাজকে প্রাথমিক আখ্যা দেওয়া চলে তাদের উদ্ভব নিশ্চয় বর্ব্বর অবস্থার রূপ-পরিবর্ত্তনের মধ্যে। অপরাপর সভ্যতার বিকাশের মূলে এক বা ততোধিক পূর্ব্ববর্ত্তী সমাজের প্রভাবও বিদ্যমান থাকে। সভ্যতার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে জীবনের একটা দ্রুতগতি, পক্ষান্তরে সভ্যতার উদ্ভবের পূর্ব্বাবস্থার প্রকৃতিই হচ্ছে স্থিতিশীল। এই স্থিতি ও গতির পর্য্যায়কে টয়েন্‌বি জগতের মূলছন্দ বলেছেন—কবি ও ভাবুকের ভাষায় তিনি সমস্ত বিশ্বসংসারে এই স্পন্দনের লীলা দেখেছেন। চীন ভাষায় এই দুই প্রকৃতিকে নাকি ইন্ ও ইয়াং বলা হয়, টয়েন্‌বি অন্ততঃ সে কথা দুটি তাঁর গ্রন্থে স্থিতি ও গতির অর্থে ব্যবহার করেছেন।

প্রাগৈতিহাসিক বর্ব্বরতার সুদীর্ঘ যুগকে টয়েন্‌বি ভাববাদের ভাষায় সাধারণ ভাবে গতিবিমুখতার নিদর্শন বলেই ব্যাখ্যা করেন কিন্তু সভ্যতার উৎপত্তির বিশেষ কারণ নির্দ্দেশের চেষ্টার অভাবও তাঁর লেখার মধ্যে নেই। অনেকে মনে করেন জাতিগত বৈশিষ্ট্যই সভ্যসমাজ গঠনের আদি কারণ। গত শতাব্দীতে গোবিনোর পদাঙ্ক অনুসরণ করে' প্রথমে আর্য্যরক্তাভিমানী জার্ম্মান পণ্ডিতেরা ও পরে চেম্বারলিন্ প্রমুখ ঐতিহাসিকেরা নর্ডিক্ পূজার প্রবর্ত্তন করেন। ইয়োরোপীয় প্রভুত্ব বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে শ্বেতজাতির শ্রেষ্ঠত্বের ধারণা প্রচারিত হয়েছে। আমেরিকা-বিজয়ের সময়ে প্রটেষ্টাণ্ট্ প্রভাব বিস্তার লাভ করেছিল; প্রটেষ্টাণ্টেরা আবার বাইবেলের

পুরাতন বিধান পাঠের থেকে নিজেদের বিধাতার আশ্রিত ও নির্ব্বাচিত জাতি হিসাবে গণ্য করতে শেখে। কিন্তু জাতির এই স্পর্দ্ধার ভাব আধুনিক, ও সর্ব্বত্র সমান প্রবল নয়; জাতির কোন বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞাও নির্দ্দেশ করা শক্ত। শারীরিক সাদৃশ্য থাকলেই একতার ভাব উদয় হয় না—পক্ষান্তরে বিশুদ্ধ রেসের সন্ধান বাস্তব জগতে দুর্লভ। এইরূপ নানা কারণে মনে হয় যে সভ্যতার উৎপত্তির কারণ রেসের শ্রেষ্ঠত্ব নয়। গ্রীকদের অবশ্য মত ছিল যে পারিপার্শ্বিক অবস্থাই ঐতিহাসিক বৈচিত্র্যের কারণ। কিন্তু নীল নদ মিশরের সভ্যতার মূল হলে মিসিসিপি উপত্যকায় তার অনুরূপ সমাজের উদয় হয়নি কেন? মায়া সভ্যতা মেক্সিকোর মালভূমিতে আবির্ভূত হলেও দক্ষিণের নিকটতর অনুরূপ দেশে পৌঁছাতে পারেনি। সুদূর প্রাচ্যের সভ্যসমাজ জাপানকে জয় করে কিন্তু ইন্দোনেসিয়ায় তার প্রসার হল না। টয়েন্‌বি এজন্য সিদ্ধান্ত করেছেন যে রেস্‌ বা পারিপার্শ্বিক অবস্থা এর কোনটাই সভ্যতার উৎপত্তির অবিমিশ্র হেতু নয়।

কিন্তু যে কারণকে টয়েন্‌বি শেষ পর্য্যন্ত বৈধ বলে' ঘোষণা করেছেন তা' নিয়ে কেউ সন্তুষ্ট থাকবে বলে আমার মনে হয় না। তিনি তাকে challenge and response নাম দিয়েছেন। পারিপার্শ্বিক প্রাকৃতিক কিম্বা মানুষিক অবস্থার মাঝে মাঝে পরিবর্ত্তন হয়, তার ফলে বিভিন্ন লোক-সমষ্টির জীবনে সমস্যা বা পরীক্ষার আকস্মিক আবির্ভাব হয়ে পড়ে। কেউ কেউ সে বিপদ সগৌরবে উত্তীর্ণ হয়ে নিজের শক্তির বিকাশ লাভ করে; কারো পক্ষে সঙ্কটের কাছে পরাজয় স্বীকার করতে হয়। টয়েন্‌বি ঈজিপ্ট, সুমের, চীন প্রভৃতির ক্ষেত্রে দেখাবার চেষ্টা করেছেন যে এইভাবে সর্ব্বত্রই পারিপার্শ্বিক অবস্থার বিপর্য্যয় ও মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তির সদ্ব্যবহারের মিলিত ফলে সভ্যসমাজের উদ্ভব হয়েছে; কিন্তু কোনখানেই সংগ্রামের শেষ ফল আগে থাকতে নির্দ্দিষ্ট থাকে না কেন না সমস্যার সামনে কে কেমন আচরণ করবে সে কথা পরীক্ষার আগে কেউ বলতে পারে না।

উপরে টয়েন্‌বির ইতিহাস সম্বন্ধে বিশ্বাসের যে সামান্য পরিচয় দেওয়া হ'ল তার প্রতি কথারই প্রতিবাদ করা যায় কিন্তু সে তর্কের কোন শেষ আছে কিনা সন্দেহ। সমাজের সংজ্ঞা নির্দ্দেশ ও ভিন্ন ভিন্ন সভ্যতার তালিকা সম্বন্ধে মতভেদ খুবই স্বাভাবিক। টয়েন্‌বির প্রধান দোষ বোধ হয় analogy বা ঐতিহাসিক সাদৃশ্যের অনুসন্ধান; আমার বিশ্বাস তার ফলে অনেকস্থানে ইতিহাসের বিকৃতি ঘটা অনিবার্য্য। তাছাড়া অনেক সমাজ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান এত স্বল্পপরিসর যে তার উপর নির্ভর ক'রে তুলনা দুঃসাহসিকের কাজ বলে' মনে হয়। কিন্তু টয়েন্‌বি তাঁর সিদ্ধান্ত-সমুদয় প্রতিপন্ন করবার বিশেষ প্রয়াস করেছেন, সেজন্য তাঁর বক্তব্য প্রণিধান করা সকলের উচিত। লেখার কৌশলে ইতিহাসের এক অভিনব রূপ তাঁর রচনায় মূর্ত্তি পেয়েছে, এটা কম কৃতিত্বের কথা নয়। তাঁর গ্রন্থের পাঠক মাত্রের ইতিহাস সম্বন্ধে কৌতূহল বাড়তে বাধ্য, এজন্য আর্ণল্‌ড টয়েন্‌বি ইতিহাসের সকল ছাত্রের শ্রদ্ধা ও প্রীতি অর্জ্জন করেছেন এ-সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই।

শ্রীসুশোভন সরকার

সংক্ষিপ্ত পুস্তক পরিচয়

সপ্তপর্ণ—শ্রীকিরণশঙ্কর রায় প্রণীত (গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্‌)

বাঙলা কথা-সাহিত্যে স্বরাজ-পার্টির নায়ক বঙ্গীয় কংগ্রেস সমিতির নেতা শ্রীযুক্ত কিরণ শঙ্করের শুভাগমনে আমরা অত্যন্ত তৃপ্ত হয়েছি। তাঁর কংগ্রেসের দলপতি হওয়ার পূর্ব্বাবস্থা সমলোচকের স্মরণ আছে। সবুজ-পত্র প্রকাশিত হবার অল্প কয়েকদিন পরেই যে-সব যুবক সবুজ-দল গঠন করেন, প্রমথ চৌধুরীকে কেন্দ্র করে, কিরণশঙ্কর ছিলেন তাঁদের অগ্রণী। সে দলের বিশেষত্ব ছিল পঠনে ও মননে। তারা ছিল সর্ব্বগ্রাসী অথচ রসিক; দৃষ্টিভঙ্গীর স্বকীয়তা ফোটানই ছিল তাদের উদ্দেশ্য। চলতি ভাষায় তারা লিখত এবং দু-একজন ব্যতীত তাদের প্রত্যেকের ভাষা ছিল স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল। কিরণ শঙ্করের রচনায় একটি অধিক গুণ ছিল, মাধুর্য্য।

সবুজ-পত্র উঠে গেল—তার পূর্ব্বেই বোধ হয় কিরণশঙ্কর কংগ্রেসে যোগ দিলেন। সেও আজ প্রায় এক যুগ হয়ে গেল। মধ্যে তিনি আর কিছু লিখেছিলেন বলে মনে পড়ে না। আজ হঠাৎ তিনি তাঁর পুরানো গল্পগুলি একত্রিত করে সাহিত্যের দরবারে হাজির। সুখবরটা ঠিক সংগ্রহ করার মধ্যে নয়, সুখবর হোল এই যে সাতটি গল্পের একটি,নাম তার 'কাহিনী',অল্প কিছুদিন পূর্ব্বের লেখা। কাহিনী পড়ে দেখলাম কিরণশঙ্করের রচনাভঙ্গীতে তিলমাত্র দোষ বর্ত্তায়নি, অনভ্যাসে কলম আড়ষ্ট হয়নি, আমার পরিচিত সদ্‌গুণের সবগুলিই অক্ষুণ্ণ রয়েছে। কাহিনীতে যে প্রচ্ছন্ন পলিটিক্যাল মতবাদ রয়েছে তাই থেকে প্রমাণ হয় অন্ততঃ এইটুকু যে কিরণশঙ্কর আসলে সাহিত্যিক। 'সেকাল আর নেই'—সেকালের দোষ ছিল, গুণও ছিল—কিন্তু 'সেকাল আর নেই' বাক্যটি একটি বিশেষ সাহিত্যিক মনোভাব-প্রসূত আক্ষেপ ছাড়া কোন পলিটিক্যাল জ্ঞানের কথা নয়। অতীত গৌরবের স্মৃতি, এই sense of romance সাহিত্যিকের উপকরণ, বিলাসবস্তু, দেশ-নায়কের নয়। কাহিনী ব্যতীত অন্য দুটি গল্পে, 'কবির বিদায়' ও 'স্বপনপসারী'তে কিরণশঙ্করের পূর্ব্বোক্ত senseটি অত্যন্ত পরিস্ফুট হয়েছে। 'হেঁয়ালি'ও ঐ সুরের একটি ছোট্ট তান।

তাই বলে কিরণশঙ্করকে romantic ভাবা ভুল হবে। তাঁর রসজ্ঞান এতই উন্নত যে ভাববিলাসকে তিনি আসকারা দেন না। তিনি নিজেকে ঠাট্টা করতে জানেন, পরকেও তাই পারেন। কিন্তু সে ঠাট্টা মৃদু ও হাল্‌কা—কড়া বিদ্রূপ নয়। 'শুকতারা'র বাল্য প্রেমের বর্ণনা পড়লে না হেসে থাকা যায় না—কিন্তু অট্টহাস্যও অসম্ভব। তেমনি গ্রামের 'সাহিত্য সভা' পড়তে পড়তে হাসিও পায় কান্নাও আসে—কিন্তু কোথাও লেখকের মনে সহানুভূতি কিংবা বিদ্বেষের আধিক্য ধরা পড়ে না।

লেখকের এই ভদ্রতা, এই সংযম, হালকা রসিকতা ও দরদ তাঁর সব গল্পগুলিকেই নিতান্ত সুখপাঠ্য করে তুলেছে।

'ক্ষেমী' গল্পটি সম্পূর্ণ অন্য ধরণের। বাড়ির পোষ্যা এক ননদ ও তার বৌদি—ননদ পাড়াগাঁয়ের বুনো মেয়ে, বৃহৎ জমিদার পরিবারের চাপে পিষ্ট অথচ তেজিয়ান—বৌদির আছে হৃদয়। ননদের বিবাহ হোলো—অল্প কয়েক দিনের জন্য বোধ হয় সে সুখীও হয়—দুঃখ আবার চাকার তালে ঘুরে আসে। হোলো তার যক্ষ্মা, ফিরে এলো ননদের কাছে—তারপর যা বাঙালী মেয়েদের হয় তাই হোলো। মারা গেল অল্প বয়সে। এই ত সাধারণ ঘটনা—এতই সাধারণ যে তাকে নিয়ে বক্তৃতা দেওয়া, গল্প লেখা, সব কিছুই চলে। কিন্তু মাত্র বিশ পাতার মধ্যে ঐ মেয়েটির মানসিক পরিবর্ত্তনের সুসংযত ও সুচারু বর্ণনা ক'জনের হাতে সম্ভব জানি না।

কিরণ শঙ্করের হাত পাকা, পাকা হাতের আরো লেখা চাই।

টাকার কথা—শ্রীঅনাথ গোপাল সেন প্রণীত। (মডার্ণ বুক এজেন্সী) শ্রীপ্রমথ চৌধুরীর ভূমিকা সম্বলিত।

বইখানিতে সাতটি অধ্যায় আছে—রাজনীতি বনাম অর্থনীতি, স্বর্ণমান, ভারতে মুদ্রানীতি, আমাদের রেশিও সমস্যা, বর্ত্তমান অর্থ-সঙ্কট, দেশীয় শিল্পের অন্তরায় এবং 'যে দেশে টাকা নেই'।

অধ্যায়গুলি দেখেই পাঠকবর্গ বুঝবেন যে লেখকের বিষয় হোলো সেই দুরূহ ইকনমিকস্ যা নিয়ে বাঙলা ভাষায় অত্যন্ত কম আলোচনা হয়েছে। অবশ্য তার কারণও আছে—প্রথম হোলো সেই বিষয় সম্বন্ধে সাধারণের নিরাগ্রহতা এবং বিশেষজ্ঞের অজ্ঞানতা। দ্বিতীয় কারণ, আমাদের ভাষার অক্ষমতা। কিন্তু অনাথবাবুর বইটি আদ্যোপান্ত পড়ে আমার ধারণা আংশিকভাবে বদলেছে। আর আমি বাঙলা ভাষার দোষ দিই না। সহজ ও সুখপাঠ্য ভাষায় যে ইকনমিক্সের গভীর সমস্যাগুলো অমন স্পষ্টভাবে বোঝান যায় আমার বিশ্বাসের বাইরে ছিল। অনাথ বাবু অধ্যাপক নন, এবং বিশেষজ্ঞ কিনা তাও জানি না, তবে তাঁর রচনা পড়ে মনে হোল যে বিশেষজ্ঞের হাতে পড়েই সঙ্কটময় অবস্থার নিরাকরণ শক্ত হয়ে উঠেছে। আজ প্রায় চোদ্দ পনেরো বৎসর আমি ঐ সব সমস্যার সমাধান নিয়ে পড়ছি, চিন্তা করছি, কতদিন ধরে বাঙলা ভাষায় তার খসড়া করছি—কিন্তু অমন প্রাঞ্জলভাবে আমি বুঝিও নি, বোঝাতেও পারি না অকপটভাবে স্বীকার করছি। ইকনমিক্স্ সংক্রান্ত মতবাদে দু-একস্থলে আপত্তি তুলতে হয়ত পারা যায়। কিন্তু অনাথবাবু যে সুসাহিত্যিক সে বিষয়ে আমি প্রমথবাবু ও অতুল গুপ্ত মহাশয়ের সঙ্গে সম্পূর্ণ এক মত। বইখানি ইতিমধ্যে সকলেরই প্রশংসা অর্জ্জন করেছে, তাই আমি কেবল তার বহুল প্রচার কামনা করেই ক্ষান্ত হলাম।*

ধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

---

* স্থানাভাববশতঃ এবং সময়ের অভাবে শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গাঙ্গুলীর "রাগ ও রাগিণী" এবং শ্রীযুক্ত শচীন্দ্র সেনের 'Studies in the Land Economics of Bengalএর সমালোচনা পরিচয়ের এ সংখ্যায় ছাপানো গেল না।

From Wrong Angles—By Gaganvihari Mehta. Published by the author.

মানুষের জীবনের উপর রসিকতা আদিম কাল থেকে তার প্রভাব বিস্তার করেছে। মানুষের সাহিত্যে অবশ্য এর আবির্ভাব অপেক্ষাকৃত অনেক অল্প দিনের। কিন্তু আমাদের জীবনে অথবা ভাষায় আমরা এই প্রাচীন ব্যাপারটাকে নিত্য নূতন ভাবে ও ভঙ্গীতে দেখতে চাই, নতুবা এর সার্থকতা নষ্ট হয়। এর কাজ আমাদিগকে খুসি করা। রসিকতার মোটামুটি তথ্য এইরূপ।

রসিকতার আর একটা দিক আছে। জীবনে যেটা অশোভন অথবা অসমঞ্জস তাকে সোজাপথে সিধে করা শক্ত কথা। তাকে খুসির পথে দূর করা রসিকতার কাজ। এই শেষোক্ত কথাটা মুখবন্ধে সরসভাবে বুঝিয়ে দিয়ে, শ্রীযুক্ত গগনবিহারী মেটা তাঁর 'বে-কায়দা কোণ থেকে'-নামক ইংরাজী পুস্তক আরম্ভ করেছেন। পুস্তক-খানি কতকগুলি প্রবন্ধের সমষ্টি। এগার বৎসরের মধ্যে নানা সময়ে বিভিন্ন পত্রে এই সকল প্রবন্ধ প্রথম প্রকাশিত, এবং (আমরা জানি) সমাদৃত হয়েছিল। আলোচ্য বিষয়গুলি তিনভাগে বিভক্ত, যথা, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং বিবিধ। সমসাময়িক বাগ্বিতণ্ডা, ঘটনাঘটন, উদ্যম, উদ্বেগ, আশা, নিরাশা, প্রভৃতিকে আশ্রয় করে প্রবন্ধগুলি লিখিত। সুতরাং সেই সকল ব্যাপারের সংবাদ যাঁরা রাখেন, তাঁরা পুস্তক-খানি পড়ে খুসি হবেন; যাঁরা রাখেন না, তাঁরাও লেখকের রসিকতা উপভোগ করবেন। পুস্তকের মুদ্রণ এবং বাঁধাই সুন্দর।

রসিকতা পদার্থটা অতি প্রাচীন, নিত্য, উপাদেয় এবং উপযোগী বলেই এর প্রয়োগ এবং শেষ রক্ষা করা কঠিন কাজ। সামান্যমাত্র তারতম্য, ত্রুটি, স্খলনে আকস্মিক মৃত্যু পরিলক্ষিত হয়। একটিমাত্র বিষয়, ঘটনা অথবা চিন্তা উপলক্ষ্যে অনেক সময়ে উপযুক্ত রসিকতার সম্যক প্রয়োগ সম্ভব, কিন্তু প্রবন্ধাকারে এবং বহুপ্রবন্ধের সমষ্টিতে, রসিকতাকে সমভাবে সঞ্জীবিত রাখা কঠিনতর ব্যাপার। গতযুগের বাংলার সঙ্গে যাঁদের পরিচয় আছে, তাঁরা 'হুতুম প্যাঁচার নক্সা' ভুলে যান নাই। নক্সাখানি মেটা মহাশয়ের পুস্তকের ধরণেই প্রবন্ধ সমষ্টি, অবশ্য তাতে প্রত্যক্ষভাবে রাজনৈতিক বিষয়ের আলোচনা নাই; সেদিনে ও আপদ ছিল না। নক্সাখানি বাংলায় কেন, যে কোন ভাষার রসিক-সাহিত্যে উচ্চস্থান নিতে পারে, তথাপি তার মধ্যে যে কোথাও রসভঙ্গ হয় নাই, এমন কথা বলা যায় না। একথা সত্য যে নিজের ভাবে এবং নিজের ভাষাতেই রসিকতাকে ঠিকপথে নিয়ে যাওয়া কঠিন। তারপর পরদেশী ভাষায় একে সচেতন এবং প্রাণবান করা আরও দুরূহ। সুতরাং স্থানে স্থানে শ্রীযুত মেটা মহাশয়ের কষ্টকল্পিত রসিকতার অবতারণা সমালোচকের দৃষ্টির বাইরে রাখাই কর্ত্তব্য। রবীন্দ্রনাথ একবার বলেছিলেন যে অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে না এলে রস ধারণ করা যায় না। কথাটা সত্য। রসগ্রহণেচ্ছু হলেই ত আমরা রসের সন্ধান পাই। কীর্ত্তনীয়া তাঁর অক্ষরে (আসরে) বলেছেন—

রসিক সে যে, রসিক সুজন,
সে জন জানে রসিক যে জন।

শ্রীশিবনাথ অধিকারী।

দোলা (উপন্যাস) প্রথম ভাগ—শ্রীদিলীপকুমার রায় প্রণীত।
(গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্)

"'দোলা' আদ্যন্ত লিখিত—য়ুরোপে—তিন সপ্তাহে ১৯২৭ সালে—বোধ করি এপ্রিল মাসে।" বই-এর প্রথমেই এই রোমাঞ্চকর সংবাদ বিজ্ঞাপিত করিয়া লেখক পাঠকের চিত্তকে তিন সপ্তাহব্যাপী য়ুরোপীয় বায়ু সেবনের ফলভোগের জন্য প্রস্তুত করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। পাঠকের প্রতি তাঁহার মমতা প্রশংসনীয়। কিন্তু, এই প্রস্তুতি সত্বেও 'দোলা' আরম্ভ হইতে না হইতেই পাঠকের মানসিক ও স্নায়বিক সাম্য প্রায় বিপর্য্যস্ত হয়, কেননা দোলার একেবারে প্রথম পাতাতেই কলির এপ্রিল মাসে মন্থিত পশ্চিম সাগর হইতে উদিতা হন্ কুন্দশুভ্র নগ্নকান্তি সুরেন্দ্রবন্দিতা উর্ব্বশী নয়—আর্টিষ্টের মডেল ফরাশী তরুণী শ্রীমতী আনা।

শ্রীমান্ স্বপন সেন—দোলার নায়ক—অকস্মাৎ অলক্ষিতে তাঁহার শিল্পগুরুর ষ্টুডিয়োতে ঢুকিয়া এই দৃশ্যে যে বিহ্বল হইবেন তাহাতে আশ্চর্য্য কি? কিন্তু, স্বপন সদ্বুদ্ধিসম্পন্ন চরিত্রবান যুবক, তদুপরি বিবাহিত এবং পত্নীগতপ্রাণ, সুতরাং তাহার বিহ্বলতা ঠিক রূপমত্ত শিল্পীর ন্যায় না হইয়া হয় অনেকটা ভয়চকিতা হরিণীর মতন। অনেকটা, সম্পূর্ণ নয়। কেননা, ভগবানের দত্ত চক্ষু, তদুপরি শিল্পীর চক্ষু, এবং ভগবানের সৃষ্টি তন্বীর মহিমা, সুতরাং চোখে যাহা ভালো লাগে, মন তাহাতে একটুও সায় না দিয়া কি পারে? এই অবস্থার বর্ণনা লেখক যে-ভাবে করিয়াছেন তাহাতে যদি আদিরসের প্রাচুর্য্য থাকিত তাহা হইলে আপত্তি ছিল না। লেখকের উদ্দেশ্য সহজেই বোঝা যাইত। কিন্তু লেখকের উদ্দেশ্য তিনি 'ভূমিকায়' ব্যক্ত করিয়াছেন—মানব মনের নানামুখী সত্য সন্ধানকে ফটাইয়া তোলা। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যে-পন্থা তিনি অবলম্বন করিয়াছেন তাহা এক ভারতীয় যুবকের উন্মুখ ও সুকুমার চিত্তের উপর য়ুরোপীয় জীবন ও সাধনার বিচিত্র ঘাতপ্রতিঘাতের বর্ণনা ও সেই প্রসঙ্গে বিশ্বজগতের একাধিক গুরুতর সমস্যার আলোচনা। এই উদ্দেশ্যে যে বই লিখিত ঠিক এই ভাবে তাহার গোড়া পত্তন কি জাতীয় রুচির ও বুদ্ধির পরিচায়ক তাহা ভাবিয়া পাওয়া কঠিন।

কিন্তু, যাই হোক, দোলা সুখপাঠ্য, কেননা লেখক গল্প বলিতে পারেন এবং সেই কারণে তাঁহার নানা তর্কবিতর্কের অবতারণা পাঠক উপভোগ না করিলেও অবশ্যই সহ্য করিবেন। কিন্তু লেখক ভূমিকায় এই বলিয়া অত্যন্ত ক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছেন যে তাঁহার উপন্যাসে গল্প (তাঁহার মতে) গৌণ হওয়া সত্বেও নানা সমালোচক 'আমার উপন্যাস পড়তে গিয়ে তাতে গল্পই খোঁজেন।' শ্রীযুক্ত দিলীপ কুমার রায় আশ্বস্ত হউন। আমি তাঁহার উপন্যাসে গল্প খুঁজি নাই, না খুঁজিয়াই পাইয়াছি, এবং পরম আনন্দে তাহা উপভোগ করিয়াছি।

বোধ হয় একটু অবিচার করিলাম। গল্প নয়, পাইয়াছি গল্পের সমষ্টি। কেননা, শ্রীমান স্বপন সেন-এর য়ুরোপীয় জীবনের যে সকল অভিজ্ঞতা দোলার উপকরণ, তাহার প্রত্যেকটিকে এক একটি 'এপিসোড্' বলা যাইতে পারে এবং এপিসোড্গুলির নায়ক বা নায়িকা প্রায় প্রত্যেক ক্ষেত্রেই স্বতন্ত্র। উপন্যাসের

যিনি নায়ক তাঁহার জীবনের একমাত্র নায়কোচিত কার্য্য অকল্পিতা বিবসনা মডেল দর্শন। এই রমণীয় অভিজ্ঞতার পর তাঁহার এমনই বিরতি আসে যে এপিসোড্ হইতে এপিসোডান্তরে সেতুবন্ধন ভিন্ন আর বিশেষ কিছু তিনি করিয়া উঠিতে পারেন নাই।

কিন্তু, এই সেতু-বন্ধনের প্রণালীর মধ্যে বিলক্ষণ মৌলিকতা আছে, এবং দিলীপকুমারের প্রধান কীর্ত্তি সেইখানে। শ্রীমান স্বপন একএকটি অধ্যায়ের পর প্রথম অত্যন্ত কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়েন, তাহার পর যেই চেতনার সঞ্চার হয় অমনি প্রোষিত-ভর্ত্তৃকা শ্রীমতী সন্ধ্যা দেবীকে অলঙ্কার-বহুল এমন এক প্রেমপত্র প্রেরণ করেন যাহা প্রজাপতির যে কোনো উপাসক আদর্শ রচনা বলিয়া নিরাপদে অনুকরণ করিতে পারেন। অবশ্য সন্ধ্যাদেবীও যোগ্য ভাষায় এবং যথাসময়ে—অর্থাৎ দৃশ্যপট পরিবর্ত্তনের অবসরে—তাহার প্রত্যুত্তর প্রদান করেন। অত্যন্ত আশা হয়, তিনি ইহার বেশি আরও কিছু করিবেন—শুধু নেপথ্যে সঞ্চার না করিয়া অকস্মাৎ সমারোহে রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইবেন এবং তাহা না করিলেও শব্দভেদী বাণ প্রয়োগে এমন এক মহাপ্রলয়ের সৃজন করিবেন যে দোলার ভিন্ন ভিন্ন অধ্যায়ের একাধিক পাত্রপাত্রীদের খণ্ডযুদ্ধ এক অখণ্ড সর্ব্বনাশের সূত্রে গ্রথিত হইয়া দোলা সম্পূর্ণ শিল্প সৃষ্টিতে পরিণত হইবে। হায়, সে আশা পূর্ণ হয় না। সন্ধ্যাদেবী নেপথ্যেই থাকিয়া যান, শুধু তাই নয়, তাঁহার কণ্ঠস্বর ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া অবশেষে একেবারে মিলাইয়া যায়।

দোলার কি আর কোনো বিশেষত্ব নাই? অবশ্য আছে। ইহার রচনাভঙ্গী। ইহা একান্তই দিলীপীয়। যদিও তাঁহার পাত্রপাত্রীরা অন্য একাধিক বর্ত্তমান বাংলা উপন্যাসের পাত্রপাত্রীর ন্যায় হয়তো একটু আগে 'বসিয়াছিল' তাহার পর উদাস 'হইয়া যায়', হয়তো ডিনার 'খাইতেছিল' হঠাৎ শ্যাম্পেন 'খায়' এবং কত কি 'ভাবে' এবং এই অতি সহজ উপায়ে তুচ্ছ অতীত ঘটনাকে চিরন্তন অভিজ্ঞতায় ব্যাপ্ত করে, তথাপি দিলীপবাবুর রচনারীতি অতীত ও বর্ত্তমান এবং আশা করি ভবিষ্যৎ সকল লেখকের রচনা-রীতি হইতে আমূল ভিন্ন। The style is the man—এই আপ্তবাক্যের তিনি জলন্ত প্রমাণ। এই ষ্টাইল কিরূপ তাহা বলা আমার অসাধ্য। শুধু এই বলিতে পারি বাংলাদেশের নিরীহতম পাঠক দোলার লেখকের নাম না দেখিলেও উচ্চতম আদালতে নির্ভয়ে শপথ করিয়া বলিতে পারেন—দোলার রচয়িতা স্বয়ং দিলীপকুমার, সম্পূর্ণতঃ দিলীপকুমার এবং দিলীপ কুমার ব্যতীত অন্য কেহ নহেন।

শ্রীহিরণকুমার সান্যাল

আই হ্যাজ—শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত (গুরুদাস লাইব্রেরী)

'এই দুনিয়াটা চিড়িয়াখানা'—সেই চিড়িয়াখানার তর বেতর প্রাণীদের নিখুঁত চিত্র। চল্লিশের উপরদের অভিজ্ঞতার সঙ্গে অনেক চিত্রই মিলে যাবে এবং তারা আনন্দ পাবে প্রচুর। তরুণদের ভাল না লাগলে, আশ্চর্য্য হবার নেই। "গ্রামার দুরস্ত" লোকদের কানে "আই হ্যাজ্" "বেসুরো" লাগলেও, সেটাই যে কেন ঠিক, সে কথা বইখানির শেষ ছয়খানি পাতায় বিশদ করে বোঝান হয়েছে। বিশেষ করে যখন "বিশ্বটা সজ্ঞানে ভুলের ওপর দে' বুক ফুলিয়ে চলেছে" আর সেটা দশ ইন্দ্রিয়ের কোন ইন্দ্রিয়েই বেসুরো লাগেনা, যত লাগে কিনা "আই হ্যাজ্" শ্রবণ-ইন্দ্রিয়ে? "I (আই) বলে কিছু নেই রে—সব it—third person singular! I টা আমাদের ঝুটো অভিনয়ের মুখোস"। সুতরাং আলবৎ—'আই হ্যাজ্"। আর তা ছাড়া "পাসের পরীক্ষাপত্র ছাড়া" সর্ব্বত্রই "আই হ্যাজ"-ই যে "কাজ দেয়" তা পুত্রের জন্য Deputy-mountainship (ডেপুটী গিরি) ভিক্ষাপ্রার্থী বিচক্ষণ সবজজ্ রায় বাহাদুর হরগোবিন্দের উক্তিতে concrete example হিসাবে বড়ই উপভোগ্য রূপে প্রকাশ পেয়েছে।

রস-সাহিত্যিক শ্রীকেদার বন্দ্যোপাধ্যায় পাঠকবর্গের নিকট নিজগুণে সুপরিচিত। তাঁর মানস-গুরু রসসিন্ধু ৺ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের আশীর্ব্বাদ তাঁর উপর সুপ্রচুর ভাবেই বর্ষিত হয়েছে লক্ষিত হয়। একটা কথা কিন্তু না বলে থাকা যায় না সেটা হচ্ছে লেখকের বড় বেশী অনুপ্রাস-প্রিয়তা। অনেক যায়গায় মতি রায়ের যাত্রায় কুশীলবদের কথা মনে করিয়ে দেয়। নচেৎ সুন্দর বই; সুন্দর বাঁধানো।

নিরালায়—শ্রীপ্রমথনাথ রায় প্রণীত (মডার্ণ পাব্লিশিং সিণ্ডিকেট)

শ্রীপ্রমথ নাথ রায়ের এই পুস্তিকাটিতেই চারটি ছোট গল্প আছে। আখ্যানবস্তুগুলি বড়ই মামুলী। সকল গুলিই নিরাশ প্রেমিকের দীর্ঘশ্বাসের রেশ্ পাঠকের মনে রেখে যেতে চায়। ভাষা শুদ্ধ সুন্দর মোলায়েম। আখ্যানবস্তু সুনির্ব্বাচিত ও সুচিন্তিত হ'লে, ছোটগল্পলেখকদের মধ্যে উচ্চ আসন লেখকের অত্যল্প আয়াসসাধ্য বলে মনে হয়।

সমর্পণ, অন্তর্য্যামী—শ্রীমতী আশালতা সিংহ প্রণীত। (মডার্ণ পাব্লিশিং সিণ্ডিকেট)।

"তা'ও ছাপালি গ্রন্থ হ'ল"র দেশে এক অভিনব আমদানী। এ "হাল ফ্যাসানে নূতন ঢংএ লেখা উপন্যাস" নয়। "মানুষের যা কিছু নিভৃত যা কিছু সুন্দর তা'কেই আধুনিক উপন্যাস প্রকাশ্যভাবে লাঞ্ছনা" করে যে গোলমালের সৃষ্টি করেছে সে "হাটের গোলমাল" এতে নেই। বিদুষী মহিলার ছাপ এ পুস্তকখানিতে সর্ব্বত্র।

শ্রীমতী অনুরূপা ও নিরুপমা দেবীর পর এমন সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর পুস্তক কোন লেখিকার কলম থেকে নির্গত হয়েছে কিনা সন্দেহ। "একান্নবর্ত্তী হিন্দু পরিবারের একান্ন খোপের" অধিবাসিনীদের বিভক্ত হবার পর সেই পরিবারের "ব্রহ্ম-ঘেঁষা" শিক্ষিত ছোট বৌয়ের "দিন যাপনের সাধারণ পদ্ধতি" এমন নিখুঁত ভাবে বর্ণিত হয়েছে যে তার জোড়া মেলা ভার। সেই ছোট বৌএর কন্যা সুরমা এই গল্পের নায়িকা। ছোট বেলায় একান্নবর্ত্তী প্রকাণ্ড পরিবারে মানুষ হয়েছিল সে। সেখানে ক্ষণে ক্ষণে চোখে পড়েছে তার কত কুশ্রীতা, চিত্তবৃত্তির কত দৈন্য। কিশোর বয়সে স্কুলে পড়তে যেয়ে স্কুলের মেয়েদের যে আবেষ্টনে দেহে মনে একটা স্থূল ক্লেদসিক্ত আবরণ পড়ে যায়, যে সব অভ্যাস গড়ে ওঠে, যাতে করে ফুলের বিমর্দ্দিত পাপড়ির মত মনের কত সুমধুর, সুকুমার বস্তু ভেঙ্গে খান্ খান্ হয়ে পড়ে, তার মধ্যেও পড়েছিল সে। তার পরে তরুণ বয়সে যে সমাজে মেলা মেশা করতে হোলো সেখানকার কৃত্রিম আবহাওয়া আর অর্থপূজার চরম দুর্গতির ফাঁদেও তাকে পা দিতে হয়েছিল। কেমন করে সেই সব প্রভাব এড়িয়ে সে নিজকে খুঁজে পেয়েছিল আর পরে মনোমত স্বামীর হাতে নিজেকে সমর্পণ করে সুখী হয়েছিল, বইখানি তারই ইতিহাস। বড় সুন্দর বই। তাড়াতাড়ি পাতা উল্টান অসম্ভব। ঘন ঘনই পাতা মুড়ে ভাবতে হয়। 'দুধারা' 'প্রেমের চেয়ে বড়ো' প্রভৃতি নামীয় পুস্তক দ্বারা লেখিকা যে সব উপন্যাসগুলির প্রতি ইঙ্গিত করেছেন সেই উপন্যাসগুলি বাংলা সাহিত্যে যে 'অসুন্দরের' সৃষ্টি করেছে তার প্রতিক্রিয়া হিসাবে এই ধরণের পুস্তকের বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।

অন্তর্যামী—শ্রীমতী আশালতার লেখা আর একখানি পুস্তক। এতে পাঁচটি গল্প আছে। প্রথম গল্প "অন্তর্যামী" অবহেলেই প্রথম স্থান পাবার যোগ্য। কবিগুরু শ্রীমতীকে তাঁর "মনন-শক্তি অসাধারণ" বলে কেন সার্টিফিকেট দিয়েছেন তা' একমাত্র এই গল্পটি পড়লেই বোঝা যায়। আর চারটি গল্পও ভারি সুন্দর। যেমন সুন্দর লিখনভঙ্গী তেম্‌নি শুদ্ধ ও সুন্দর ভাষা—আখ্যান-বস্তুর ত কথাই নেই।

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র দত্ত

'অর্কেষ্ট্রা'—শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দত্ত প্রণীত, (ভারতী ভবন)।

শ্রীসুধীন্দ্র দত্তের নতুন কবিতার বই 'অর্কেষ্ট্রা' পড়তে বসে প্রথমেই তার কোষ্ঠিকা খোঁজ করবার কৌতুহল যে হয়েছিল একথা স্বীকার না করে পারছি না। ব্যাপারটা সত্যিই অস্বাভাবিক বোধ হয় নয়। 'অর্কেষ্ট্রা'র কবিতা সে জাতের নয় যাকে বিচ্ছিন্নভাবে পূর্ণমাত্রায় উপভোগ করা যায়। বয়ঃসন্ধিগতা কিশোরী অহৈতুক আনন্দের উচ্ছ্বাসে যখন তখন নিজের মনে এ সব কবিতার কলি আবৃত্তি করছে, এ কথা কল্পনা করা শক্ত। এ কবিতা তার চেয়ে অনেক পরিণত মনের বায়না নিয়েছে। 'অর্কেষ্ট্রা'-কে বুঝতে হলে শুধু নয়—উপভোগ করতে হ'লেও তার জাতকের রাশিচক্র প্রভৃতি জানতে হয়।

অর্কেষ্ট্রার জন্ম-পত্রিকায় যাদের প্রস্তাব পড়েছে সে সমস্ত নক্ষত্র নির্ণয় করা কিন্তু একটু কঠিন। গ্রন্থাবরণে প্রকাশকের ইঙ্গিত থেকে কোন সাহায্যই পাওয়া যায় না। রবীন্দ্রনাথের কথা অবশ্য বাদ দিলাম কারণ আমাদের আকাশের ধূমকেতুরাও এখনো সৌরমণ্ডলের সম্পর্ক ছাড়াতে পারে নি। কিন্তু আর যে সব প্রভাব এ কাব্যের রূপ নিয়ন্ত্রিত করেছে তাদের উৎস সহজে ধরা যায় না। এ যুগের আরো অনেক কবির মত আধুনিক বিদেশী কবিতার আওতাতেই অর্কেষ্ট্রার কবির প্রতিভার স্ফুরণ হয়েছে বলে আপাতঃ দৃষ্টিতে মনে হতে পারে। কিন্তু সে ধারণা ধোপে টেঁকে না। অডেন প্রভৃতিকে পেরিয়ে গিয়ে ইলিয়ট পাউণ্ডের সঙ্গেও তাঁর কুলজি কোন রকমে মেলে না। তার আগের নক্ষত্রেরা ত' অনেক আলোকবর্ষ দূরে।

বিদেশ থেকে দৃষ্টি স্বদেশে ফিরিয়েই 'অর্কেষ্ট্রা'র প্রেরণার উৎস যেন পাওয়া যায়। পশ্চিমের দিকে একান্তভাবে দৃষ্টি নিবদ্ধ করার ফলেই বোধহয় সন্ধান গোড়ায় দুরূহ মনে হয়েছে। 'সোনার পাথর বাটির' মত অসম্ভব শোনালেও অর্কেষ্ট্রা দেশী সুরেরই ঐক্যতান। সংস্কৃত কবিদের পাহাড়-বাঁধান হ্রদ, খরতোয়া নদী হয়ে উঠেছে বটে কিন্তু তার পিতৃ-পরিচয় প্রচ্ছন্ন নয়। সুধীন্দ্র দত্তের কবিতায় ভঙ্গিমার যে নূতনত্ব আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, প্রকাশ-রীতির যে দুর্ব্বলতাহীন ঋজুতা আমাদের কৌতূহলী করে তোলে, ভুঁইফোড় অর্থে তা মৌলিক নয়। তার ভিৎ সত্যই আছে ঐতিহ্যে।

অর্কেষ্ট্রার কবিতা কিন্তু তাই বলে ধ্রুবপদী নয়। মোহিতলালের ক্ল্যাসিসিজমের পরিণামই বোধহয় তাঁর পরবর্ত্তী কবিদের সে প্রবণতা অনেকটা শুধরে দিয়েছে। সুধীন্দ্র দত্ত গীতি-কবিতাকেই অতি-লালিত্যের অভিশাপ থেকে মুক্ত করবার দুরূহ সাধনায় লেগেছেন। তাকে দিতে চেয়েছেন ধ্রুপদের মর্য্যাদা।

বাঙ্গালা কবিতায় এ চেষ্টা সুধীন্দ্র দত্তের রচনা প্রকাশিত হবার আগে থাকতেই হচ্ছিল, হওয়া অনিবার্য্য ছিল। সে চেষ্টা নানা কবির মধ্যে অবশ্য বিভিন্ন রূপ নিয়েছে। কবি মোহিতলালই এ বিষয়ে আধুনিক কবিদের অগ্রণী। বাঙ্গলা কবিতায় ভাস্কর্য্যের ছায়া প্রথম তাঁর লেখাতেই পাই। সত্যেন্দ্র দত্তের খ্যাতি-নিনাদিত যুগে রচনা সুরু করলেও তিনি আধ আধ ললিত ভাষণ ও নিছক ছন্দ-চাতুর্য্যের মোহ পেরিয়ে এসেছিলেন দৃঢ় ব্যঞ্জনার পৌরুষত্বে। শেষ পর্য্যন্ত প্রাণহীন ক্ল্যাসিসিজমের নীরস মরুতে গিয়ে না পড়লে তাঁর কাব্য-প্রতিভা এমন অকালে শুকিয়ে বোধহয় যেত না। বাঙ্গলা কাব্য তাঁর দ্বারা আরো সমৃদ্ধ হতে পারত। তবু মোহিতলালের ভাস্কর্য্যে মসৃণ মার্ব্বেলের লীলায়িত রেখাই পাই—আয়নার মত তা পালিশ করা। সে লীলায়িত রেখাকে ভেঙে দেবার চেষ্টা বা সাহস তাঁর ছিল না। অপ্রত্যাশিত কোণ তুলে ধরে দুঃসাহসিক নূতন বিন্যাসের সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি করবার কল্পনাই তিনি সম্ভবতঃ করেন নি। সচেতন ভাবে যাঁরা এ চেষ্টা করে সার্থক হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে সুধীন্দ্র দত্তের নাম কিন্তু সর্ব্বাগ্রে নয়। তাঁর কাব্যে ঋজু দৃঢ়তা আছে কিন্তু তাকে কেমন আড়ষ্টতা বলেই সন্দেহ হয় মাঝে মাঝে। তাঁর বলিষ্ঠতা অধিকাংশ সময়ে কাঠিন্যের বেশী আর কিছু নয় এবং সে কাঠিন্য কৃত্রিম না হলেও নিতান্ত বাহ্যিক। নরম 'পুরের'

ওপর তিনি প্রধানতঃ শব্দের কড়াপাক লাগিয়েছেন। শব্দ-কণ্টকিত তাঁর কাব্যের চেহারা তাই বেশীক্ষণ ধোঁকা দিতে পারে না, তার পরিচয় প্রকাশ হয়ে যায়। বোঝা যায় আধুনিক অন্যান্য কবিদের তুলনায় তিনি অনেক বেশী মামুলি। কিন্তু সেই মামুলিয়ানাতেই তাঁর শক্তি ও সার্থকতা।

মামুলি শব্দটা আমাদের ভাষায় দাগী হয়ে গেছে, বর্ত্তমানে আমরা কথাটা প্রায় গালাগালির সামিল করে তুলেছি। তাই এখানে একটু টীকা বোধহয় প্রয়োজন। 'অর্কেষ্ট্রা'র কবি এই অর্থে মামুলি যে রসের সনাতন উৎসেই তাঁর নিষ্ঠা অটুট আছে। কাব্যের ছাঁচ বদলাবার উত্তেজনায় জীবনের ছকও বাতিল করবার উন্মত্ততা তাঁর ভেতর দেখা যায় নি, কোন কোন সমসাময়িক কবির মত। ভাবাবেগ-ভীতিও ব্যাধিরূপে তাঁর ভেতর সংক্রামিত হয় নি। সুধীন্দ্র দত্ত এ দিক দিয়ে একান্তভাবে সনাতন-পন্থী। উদ্ভট ইঙ্গিত ও উল্লেখের ছড়াছড়ি করে রচনাকে ঝুটা জৌলস দেবার আধুনিক বাতিক থেকেও তিনি সৌভাগ্যক্রমে মুক্ত। তাঁর রচনায় শব্দের ভ্রুকুটি যতই থাক, তার অন্তরালে সেই পরিচিত পৃথিবীই দেখতে পাই যেখানে সূর্য্য ওঠে, মানুষ ভালবাসে, বেদনা পায়, ব্যাকুল প্রশ্ন তোলে। সংস্কৃতি-সমৃদ্ধ আধুনিক মনের আধারে তাই চিরন্তন রস-ধারাই উচ্ছল হয়ে উঠেছে।

শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র

শ্রীসরস্বতী প্রেস লিঃ, ১নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে শ্রীকুলভূষণ
ভাদুড়ী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও তৎকর্ত্তৃক ২৪।৫এ, কলেজ ষ্ট্রীট, হইতে প্রকাশিত।

ত্রৈমাসিক পত্রিকা

বার্ষিক ৫।০

প্রতি সংখ্যা ১৲

পঞ্চম বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা

বৈশাখ, ১৩৪৩

বিষয়-সূচী

সম্পাদক :
শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দত্ত

ভারতী ভব
কলিকাতা

৫ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা
বৈশাখ ১৩৪৩

পরিচয়

প্রাচীন ও আধুনিক

মানব জীবন ও মানব সভ্যতা সম্বন্ধে, মানুষের ধর্ম্ম, সমাজ, শিল্প, সাহিত্য, আচরণ সম্বন্ধে মানুষ চিরকাল ধরিয়া চিন্তা করিয়া, আলোচনা করিয়া আসিতেছে। এই সকল চিন্তা ও আলোচনার ইতিহাস মানুষের অন্তরঙ্গ ইতিহাসের একটা বৃহৎ অংশ অধিকার করিয়া আছে। মানুষের বহিরঙ্গ ইতিহাসে যেমন দেখা যায় জাতির সহিত জাতির, দেশের সহিত দেশের, স্বার্থের সহিত স্বার্থের, অনবরত সংঘর্ষ চলিতেছে, মানুষের অন্তরঙ্গ ইতিহাসও সেইরূপ বিভিন্ন মতবাদের দ্বন্দ্বকোলাহলে মুখর। অদ্বৈতবাদের সহিত পরমাণুবাদের, জড়বাদের সহিত অধ্যাত্মবাদের, সমষ্টিবাদের সহিত ব্যষ্টিবাদের, স্বদেশিয়ানার সহিত বিদেশিয়ানার, প্রাচীনের সহিত আধুনিকের বাদ-প্রতিবাদ আমাদের চিন্তাজগৎ উত্তপ্ত করিয়া রাখিয়াছে। এই তাপ ও সংঘর্ষ অবশ্য জীবনেরই লক্ষণ, সুতরাং আক্ষেপের বিষয় নহে। কিন্তু সময়ে সময়ে এই বাদ-প্রতিবাদ ঘিরিয়া এমন একটা ভাবের তাপ-মণ্ডল গড়িয়া উঠে যাহাতে প্রতিপাদ্য বিষয় চাপা পড়িয়া যায়, উত্তেজনার নেশাই আমাদিগকে পাইয়া বসে। মতের সংঘর্ষ তখন আর চিত্তস্বাস্থ্যের অনুকূল হয় না, চিত্তবিকারেরই সৃষ্টি করে।

সেইজন্য মাঝে মাঝে আবশ্যক ভাবের কুজ্ঝটিকা সরাইয়া দিয়া বিচার-বুদ্ধির স্বচ্ছ আলোকে এই সকল পরস্পর-বিরোধী তত্ত্বের পরিচ্ছিন্ন

স্বরূপ বিশ্লেষণ করিয়া দেখা। তাহাতে বিরোধের সমাধান না হইতে পারে কিন্তু তর্কবিতর্কের ঘূর্ণিবাত্যায় বাস্তব সত্যের যে সমস্ত দিক আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে, তাহা পুনরায় দৃষ্টিগোচর হয়, বিরোধের উত্তেজনা প্রশমিত হয় এবং চিত্তের স্বাস্থ্য ফিরিয়া আসে।

আজকাল সাহিত্যে, সমাজে, ধর্ম্মে, আচারে সর্ব্বত্রই নানা চিন্তা, নানা মনোভাবের যে জটিল সংঘর্ষ চলিতেছে, অনেকে তাহা সহজ করিয়া বুঝিয়া লইয়া বলেন—ইহা মুখ্যতঃ প্রাচীন ও আধুনিকের দ্বন্দ্ব। আমাদের আলস্যপ্রিয় মন কেবল চায় বাস্তবের জটিলতা এড়াইয়া তাড়াতাড়ি একটা সাধারণ সংজ্ঞা, একটা ফর্‌মুলা আশ্রয় করিতে। ফরমুলা একবার পাওয়া গেলে আর সত্যানুসন্ধান আবশ্যক হয় না, ব্যাপক চিন্তার আবশ্যক হয় না; ফরমুলা তখন হয় রণ-পতাকা, তাহার চারিধারে ঘিরিয়া আসে উদ্দীপনার ঝটিকাবর্ত্ত, পক্ষপাতী যুক্তির মর্ম্মভেদী তীক্ষ্ণবাণ।

কিন্তু 'প্রাচীন' ও 'আধুনিক' এই দুই শব্দের প্রকৃত তাৎপর্য্য কি, কি ইহাদের আনুষঙ্গিক দ্যোতনা, মানবজীবনের সমস্যা সমাধানের পক্ষে কি ইহাদের বিশিষ্ট উপযোগিতা, এ সকল প্রশ্ন ধীরভাবে বিচার করিতে বলিলে কি প্রাচীন-পন্থী, কি আধুনিক-পন্থী, কাহারও নিকট একরূপ উত্তর পাওয়া যাইবে না। দেখা যাইবে শব্দ দুইটি ব্যবহৃত হয় কতকগুলি অস্পষ্ট মনোভাবের, অনির্দ্দিষ্ট প্রবণতার প্রতীক-স্বরূপ, কোন সুসম্বদ্ধ চিন্তা বা সুনির্দ্দিষ্ট তথ্যের প্রতিনিধি-স্বরূপ নহে। সুতরাং শব্দের অর্থ যে ক্ষেত্রে এত পিচ্ছিল ও বিবর্ত্তনশীল সে ক্ষেত্রে বিচার-প্রণালীর প্রয়োগ অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। উভয় পক্ষের তর্কযুক্তি বিশ্লেষণ করিয়া একটা সালিশী মীমাংসা করিয়া দেওয়া আমার এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। আমি কেবল এমন একটা ব্যাপকতর ক্ষেত্র নির্দ্দেশ করিতে চাই যেখান হইতে দৃষ্টি করিলে এ দ্বন্দ্ব-সমস্যার চূড়ান্ত সমাধান না হউক অপ্রমত্ত ভাবে ইহাকে ধারণা করা সম্ভব হইতে পারে।

মানব জীবন সম্পর্কে এত যে দ্বন্দ্ব এত যে সমস্যার উদ্ভব হয় তাহার মূল কারণ মানুষের প্রকৃতির মধ্যেই অন্তর্নিহিত। মানব প্রকৃতির গঠন

সরল নহে। তাহাতে নানা তত্ত্ব দ্বন্দ্ব করিতে করিতে চলিয়াছে। সে চলিতেও চায়, আবার বসিয়া থাকিতেও ভালবাসে; তারকামণ্ডিত সুনীল আকাশ দূর হইতে তাহাকে ডাক দেয়, আবার শ্যামল ধরণীর স্নেহ-বন্ধনও সে ছিঁড়িতে পারে না; আত্মা তাহার ভূমা ও অনন্তের মধ্যে ব্যাপ্ত হইতে চাহে, ইন্দ্রিয় তাহাকে সসীম সান্তের মধ্যে বাঁধিয়া রাখে; সে কখনও বাহিরের সমস্ত বন্ধন ছিঁড়িয়া ব্যক্তি-স্বরূপের স্বাধীন স্ফুরণ চাহে, কখনও সে ব্যক্তিত্বের দাবী সঙ্কোচ করিয়া সমাজের ক্রোড়ে আশ্রয় চাহে, সমাজের সঞ্চিত শক্তি ও সম্পদে নিজকে সম্পন্ন ও শক্তিমান্ করিতে চাহে। সুতরাং মূল সমস্যা হইল মানুষ, মানুষের নানা-মুখী প্রবৃত্তি, মানুষের প্রকৃতির জটিল বৈচিত্র্য।

আবার যে রঙ্গমঞ্চে মানুষের জীবন-নাট্য প্রকটিত হইতেছে, দেশে কালে বিস্তীর্ণ সেই বিশ্বব্যাপারও জটিলতায় ও বৈচিত্র্যে মানব প্রকৃতিরই অনুরূপ। ভিন্ন ভিন্ন দেশ ও ভিন্ন ভিন্ন কালে সে যে মানব-চিত্তকে কত বিচিত্ররূপে প্রভাবিত করিতেছে তাহা ধারণা করিতে গেলে অভিভূত হইতে হয়। এই বিশ্ব-ব্যাপারের সহিত মানব প্রকৃতির কারবারই মানবজীবন। সুতরাং মানবজীবনের মূলে রহিয়াছে নানা বিরোধী তত্ত্বের দ্বন্দ্ব। প্রাচীন ও আধুনিকের যে দ্বন্দ্ব তাহা এই মূলগত দ্বন্দ্বেরই প্রকার-ভেদ।

মানুষ অনেক সময়ে এই মৌলিক দ্বন্দ্বের একদেশদর্শী সমাধান করিয়া জীবন-সমস্যা সরল করিয়া লইতে চাহিয়াছে। কখনও সে নিছক প্রাচীন-পন্থী হইয়া বলিয়াছে—"যদি শান্তি চাও, শৃঙ্খলা চাও, রক্ষা চাও, তাহা হইলে প্রাচীন পন্থা ধরিয়া থাক। নবীন কেবল অশান্তি আনে, বিক্ষোভ আনে, অরাজকতা আনে, ধ্বংস আনে, তাহাকে ঠেকাইয়া রাখ, তাহাকে বর্জ্জন কর।" আবার কখনও সে নিছক নবীন-পন্থী হইয়া বলিয়াছে—"প্রাচীনের মধ্যে জীবনের চাঞ্চল্য নাই, মৃত্যুর ছায়া তাহাকে ঘিরিয়া আছে; যদি বাঁচিতে চাও ত অতীতের ইতিহাস, অতীতের দলিল ভস্মসাৎ করিয়া নবীনকে বরণ কর; প্রচলিত পদ্ধতির গণ্ডী কাটাইয়া জীবনকে নূতন করিয়া গড়িয়া লও।"

মানবসভ্যতার ইতিহাসে প্রাচীন-নবীনের এই দ্বন্দ্ব পুনঃপুনঃ অভিনীত হইয়াছে। কিন্তু মানবপ্রকৃতি এই একদেশদর্শী সমাধান কখনই সম্পূর্ণভাবে স্বীকার করিয়া লইতে পারে নাই, বারবার ইহার বিরুদ্ধে সে বিদ্রোহ করিয়া আসিয়াছে। তাহার যেন দুই দিকেই সমান আকর্ষণ, যে সমাধানে এই উভমুখী আকর্ষণের সামঞ্জস্য সাধিত হয় না মানবসভ্যতার মূল ধারায় তাহা স্থায়ী আসন পায় নাই।

পূর্ব্বে বলিয়াছি বিশ্বব্যাপারের সহিত মানবপ্রকৃতির কারবারই মানবজীবন ও মানবসভ্যতা। এই বিশ্বব্যাপার দেশে ও কালে বিস্তীর্ণ। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন প্রাকৃতিক বেষ্টনী ও আবহাওয়ার মধ্যে মানব-প্রকৃতি বিভিন্নরূপে বিকশিত হয়, মানবসভ্যতা বিভিন্ন আকৃতি ধারণ করে। তেমনি আবার বিভিন্ন কালে বিভিন্ন ঐতিহাসিক অবস্থানের মধ্যে মানবসভ্যতার রূপান্তর হয়। দেশ ও কালের প্রভাব সম্পূর্ণরূপে অতিক্রম করিয়া মানুষ একপদও চলিতে পারে না, ইহা বাস্তব তথ্য। কিন্তু এই বৈষম্যই কি চরম কথা? সকল বৈষম্যের অন্তরালে মানুষের মধ্যে এমন কিছু কি নাই যাহা দেশাতীত ও কালাতীত? মানবসভ্যতার ইতিহাস কিন্তু বিপরীত সাক্ষ্য দেয়। বিভিন্ন দেশ ও বিভিন্ন কালে মানুষ যে সমস্ত মূল্য-বিচারের মানদণ্ড অবলম্বন করিয়া আসিয়াছে তাহার মধ্যে কতকগুলি আছে স্থানীয় ও সাময়িক; কিন্তু আবার কতকগুলি আছে যাহাদের প্রসার সর্ব্বদেশে ও সর্ব্বকালে। তাহা যদি না হইত তাহা হইলে মানবসভ্যতা গড়িয়া উঠিত না; তাহা হইলে প্রাচীন গ্রীসের কবি হোমার যে বীরত্বগাথা রচনা করিয়াছিলেন তাহা বিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালী আমার মনে কোন স্পন্দনই জাগাইতে পারিত না। সুতরাং মানুষের একটা বিশ্বজনীন রূপ আছে। নানা পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া এই রূপটি বজায় রাখিবার চেষ্টাই মানবসভ্যতার ইতিহাস।

অনেকে মনে করিতে পারেন মানুষের এই বিশ্বজনীন রূপ ত মানুষের সহজ প্রতিকৃতি, ইহা বজায় রাখিবার জন্য আবার সাধ্যসাধনার আবশ্যক কি? পূর্ব্বেই বলিয়াছি মানবপ্রকৃতি জটিল, তাহার মধ্যে

নানা তত্ত্বের বিরোধ চলিতেছে। এই সকল বিরোধী শক্তিকে সংযত করিয়া, শোধিত করিয়া, ইহাদের মধ্যে সামঞ্জস্য ও শৃঙ্খলা স্থাপন করিয়া, তবে মানুষ নিজের যথার্থ স্বরূপ ফুটাইয়া রাখিতে পারে। প্রত্যেক মুহূর্ত্তেই সজাগ সতর্কতার সহিত মানুষ নিজেকে সৃষ্টি করিয়া চলিতেছে। যখনই সে শৈথিল্য করিয়াছে, উদ্দাম প্রবৃত্তি বা উদ্দাম কল্পনার কাছে অবশভাবে আত্মসমর্পণ করিয়াছে, তখনই তাহার স্বরূপ বিকৃত হইয়াছে, তাহার মনুষ্যত্ব নষ্ট হইয়াছে। সুতরাং সহজ পন্থা মানুষের পন্থা নহে। পূর্ব্বে যে প্রাচীনপন্থী ও নবীনপন্থীর কথা বলিয়াছি উভয়েই সহজ পথের পথিক। প্রাচীনপন্থী বলিতেছেন, "শিশু যেমন মাতৃক্রোড়ে বিশ্রাম করে, তুমিও তেমনি প্রাচীনপন্থা ও প্রাচীন পদ্ধতির ক্রোড়ে আশ্রয় লও। যাহা চিন্তা করিবার, যাহা চেষ্টা করিবার পূর্ব্বপুরুষেরাই করিয়া গিয়াছেন, আমাদের আর কিছু করিবার নাই। পূর্ব্বপুরুষার্জ্জিত সম্পদ ভোগ করিয়া যাওয়াতেই আমাদের জীবনের সার্থকতা।" নবীনপন্থী বলিতেছেন, "প্রাচীন কেবল শৃঙ্খল রচনা করিয়া গিয়াছে, শৃঙ্খল ভাঙ্গিয়া নবীন কালের স্রোতে গা ভাসাইয়া দাও, কল্পনাকে মুক্তি দাও, প্রবৃত্তিকে মুক্তি দাও, ব্যক্তিত্বকে মুক্তি দাও, সহজকে বরণ কর।"

একথা বলা বাহুল্য উপরে যে নিছক প্রাচীনপন্থী ও নিছক নবীন-পন্থীর অবতারণা করিলাম তাহা কল্পিত মূর্ত্তি মাত্র। কি সাহিত্যের ক্ষেত্রে কি জীবনের ক্ষেত্রে নিছক আদর্শ সর্ব্বত্রই দুর্ল্লভ। কিন্তু একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে আজকাল হাওয়ার মধ্যে এই দুই ছাঁচের সহজপ্রবণতা ভাসিয়া বেড়াইতেছে।

প্রথমে ধরা যাউক নবীনপন্থীকে। তিনি অতীতের ঋণ স্বীকার করিতে মোটেই প্রস্তুত নহেন। তাঁহার দাবী তিনি আগাগোড়া নূতন উপাদানে গঠিত। তাঁহার চিন্তা, তাঁহার ভাব, তাঁহার ধর্ম্ম, তাঁহার মূল্য-বিচারের মানদণ্ড সমস্তই তিনি নিজে গড়িয়া লইয়াছেন। কিন্তু বাস্তবিক কি তাহাই? যে পরিবারের মধ্যে তিনি মানবসম্বন্ধের বিচিত্র মাধুর্য্যের প্রথম আস্বাদ পাইয়াছেন, যে সাহিত্য বিজ্ঞানের সম্পদ আত্মস্থ

করিয়া তিনি শিক্ষিত হইয়াছেন, যে সমাজের আবেষ্টনীর মধ্যে তিনি সভ্যতাসুলভ সংস্কার ও মনোভাব লাভ করিয়াছেন, যে ভাষায় তিনি তাঁহার মনোভাব প্রকাশ করিতেছেন, তাহা কি তাঁহার নিজের সৃষ্টি? পরম্পরাগত মানবসভ্যতা ও জাতীয় সভ্যতার দান তিনি অস্বীকার করিবেন কিরূপে? সভ্যতা একদিনের সৃষ্টি নহে, সহজের অভিব্যক্তি নহে, বহু যুগের সাধনা ও অভিজ্ঞতায় ইহা পুষ্টিলাভ করে, বহু অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান রীতি পদ্ধতির মধ্যে ইহার দেহাবয়ব গড়িয়া উঠে। যুগে যুগে নানা অবস্থা-বিপর্য্যয়ের মধ্য দিয়া, নানা বিরোধী শক্তির ঘাত প্রতিঘাত সামলাইয়া মানুষ তাহার সভ্যতার মধ্যে তাহার আদর্শস্বরূপ ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়া আসিয়াছে। মানবসভ্যতার ইতিহাস নিরবচ্ছিন্ন উন্নতির ইতিহাস নহে। মানুষের সাধনায় মাঝে মাঝে শৈথিল্য আসে, অবসাদ আসে, বিক্ষোভ ও বিশৃঙ্খলা আসে। সে সময় প্রাণহীন প্রতিষ্ঠান উদ্দীপনাহীন অনুষ্ঠান ও জড় অভ্যাসের চাপ মানবাত্মাকে পীড়ন করিতে থাকে। তখন বিদ্রোহই হয়ত স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া। কিন্তু নিছক বিদ্রোহের মধ্যে সৃষ্টির বীজমন্ত্র নাই। ইউরোপে এই বিদ্রোহের সুর সমগ্র উনবিংশ শতাব্দী ধরিয়া উগ্র হইতে উগ্রতর, ব্যাপক হইতে ব্যাপকতর ভাবে ধ্বনিত হইয়া আসিয়াছে। প্রচলিত প্রতিষ্ঠানের উপর আর আস্থা রহিল না, সভ্যতার ইতিহাস সয়তানের লীলাক্ষেত্ররূপে প্রতিভাত হইল। আস্থা স্থাপিত হইল মানুষের স্বাভাবিক শুভবুদ্ধির উপর, সহজাত প্রবৃত্তির উপর। বাস্তবক্ষেত্রে সে আস্থা ফলবতী হইল না বটে, কিন্তু কল্পজগতের স্বপ্নরাজ্যে বাস্তববিমুখ মন একটা আশ্রয়স্থল গড়িয়া লইল। তাহার পর চেষ্টা হইল ভিক্টোরীয় যুগের বাণিজ্য বিস্তার ও সাম্রাজ্য বিস্তারের সঙ্গে একপ্রকার আদর্শবাদ জুড়িয়া দিয়া বাস্তবজগৎকে কল্পনার রঙে রঙ্গীন করিয়া তোলার। তারপর আসিল মানবজীবনের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ—কল্পনার রঙ্ মুছিয়া গেল, আদর্শবাদের আকাশ হইতে এক একটি করিয়া নক্ষত্র খসিয়া পড়িল, গণতন্ত্রের উদ্ধত পতাকা উঠিতে উঠিতেই শ্লথ বিস্রস্ত হইয়া পড়িল—রহিল শুধু উলঙ্গ প্রবৃত্তির কর্দ্দম। এ কর্দ্দম লইয়া শিশুসুলভ ক্ষণিক উত্তেজনা

চলে কিন্তু জীবন চলে না। ফলে আসিল অবসাদ ও অকালবার্দ্ধক্য ও মৃত্যুর সাধনা। ঐতিহ্য ছাড়িয়া, মানবসভ্যতার ধারা ছাড়িয়া, সহজ পথের এই যে অভিযান ইহার ইতিহাস শিক্ষাপ্রদ। 'নবীন' ও 'আধুনিক' শব্দ বিগত শতাব্দীর মধ্যে কতবার যে কত বিচিত্র দ্যোতনার সহিত ধ্বনিত হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। ফলে এই 'নবীনের বিদ্রোহ' এখন তাহার নবীনত্ব হারাইয়া ফেলিয়াছে, এ যেন একটা বহু বিশ্রুত সুরের একঘেয়ে প্রতিধ্বনি।

তাহা হইলে উপায় কি? প্রাচীন কোথাও মৃত, কোথাও মুমূর্ষু, অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানের শুষ্ক কঙ্কাল ভিন্ন তাহার মধ্যে আর ত কিছু দেখিতেছি না, তাহার মধ্যে জীবনের রসদ ত কিছু খুঁজিয়া পাই না। এদিকে নবীনের সহজ অভিযানও ত দেখিতেছি মৃত্যু-পথেরই শ্মশান-যাত্রা। দেখা যাউক প্রাচীনপন্থী কি বলেন। নবীন-পন্থীর ন্যায় প্রাচীন পন্থীও আছেন নানা তন্ত্রের। কেহ কেহ বলেন—"উত্তরাধিকার সূত্রে পূর্ব্বপুরুষের নিকট যাহা পাইয়াছ তাহা বজায় রাখিয়া যাও; প্রগতির পথ আপদ-সঙ্কুল, বিক্ষুব্ধ, আয়াসসাধ্য; স্থাবরতার মধ্যেই আরাম আছে, শান্তি আছে। নূতন করিয়া চিন্তা করিতে গেলে, কর্ম্ম করিতে গেলে পদে পদে বিপদের সম্ভাবনা।" এ দলের মতে স্থাবরতাই মানবধর্ম্ম, নিরাপদে টিঁকিয়া থাকাই মানব-জীবনের চরম লক্ষ্য। প্রাচীন ইঁহাদের মতে অব্যবহিত প্রাচীন, যে প্রাচীনের জীর্ণ প্রাকার পরিখা বিনা আয়াসে আমার হাতে আসিয়া পড়িয়াছে সেই প্রাচীন। আমাদের কাছে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ কালই এই অব্যবহিত প্রাচীন। মানস জগতে রোম্যাণ্টিক ভাবধারার একটানা স্বপ্ন-প্রবাহ, রোম্যাণ্টিক ও ভিক্টোরীয় চিন্তার পৌনঃপুনিক প্রতিধ্বনি, কর্ম্মজগতে প্রাচীন প্রথা পদ্ধতির শীর্ণ কঙ্কালের মধ্যে ব্যক্তিতন্ত্র অর্থনীতির সঙ্কীর্ণ প্রতিষ্ঠা, সবে মিলিয়া যে একটা এলোমেলো অসম্বন্ধ গোঁজামিলের সংসারে জন্মলাভ করিয়াছি, তাহাই আমাদের সহজলব্ধ প্রাচীন, তাহার মধ্যেই আমাদের আরাম-স্বাচ্ছন্দ্য। কিন্তু এই প্রাচীনকে কি শুদ্ধমাত্র জড়তার দ্বারা টিঁকাইয়া রাখা যায়? কাল-প্রবাহের প্রচণ্ড শক্তিকে চক্ষু মুদিয়া অস্বীকার করিতে পারি, কিন্তু

কেবল নিষ্ক্রিয়তার বাঁধ দিয়া তাহাকে কি ঠেকাইয়া রাখিতে পারি ? পুরাতন জীর্ণ সেতুর কঙ্কাল যদি বা টিঁকিয়া যায় জীবন-প্রবাহ কাল-প্রভাবে চলিবে অন্য খাতে ; জীবন ক্রিয়াশীল, চঞ্চল, নিষ্ক্রিয় জড়তার দ্বারা তাহাকে বাঁধিয়া রাখা যায় না ; তাহার গতি নিয়ন্ত্রণ করিতে হইলে সক্রিয় শক্তির প্রয়োজন।

আর একদল প্রাচীনপন্থী আছেন, তাঁহারা নিষ্ক্রিয়তায় আস্থাবান্ নহেন। সহজে বিনা আয়াসে যাহা হাতে আসিয়াছে সেই অব্যবহিত প্রাচীনদের জীর্ণকঙ্কাল তাঁহাদিগকে প্রলুব্ধ করে না। তাঁহারা ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্বের সাহায্যে এক গৌরবোজ্জ্বল জীবন্ত প্রাচীনের সন্ধান পাইয়াছেন, যাহার তুলনায় আধুনিক হইয়া যায় ম্লান বিবর্ণ অশোভন। সেই অতীতকে ফিরাইয়া আনিয়া বর্ত্তমানে প্রতিষ্ঠা করা, এই হইল তাঁহাদের সাধনা। এ সাধনায় সক্রিয়তা আছে, হৃদয়াবেগ আছে, কিন্তু সীমাজ্ঞান নাই। মানুষ কল্পনার সাহায্যে দেশকালের সীমা অতিক্রম করিতে পারে বটে, কিন্তু জীবনের ক্ষেত্রে এ সীমা তাহাকে মানিয়াই চলিতে হয়। জীবন একখানি রোম্যান্টিক কাব্য নহে। বাস্তবের সীমার মধ্যে কাম্য আদর্শের প্রতিষ্ঠা এই হইল মানবজীবনের যথার্থ সংজ্ঞা। বাস্তবের সীমা, দেশকালের সীমা অস্বীকার করিয়া রোমান্টিক কাব্য সৃষ্টি করা চলে, সৌখীন খেলাঘর তৈরি করা চলে, কিন্তু জীবনের প্রবাহ নিয়ন্ত্রিত করা চলে না।

তাহা হইলে দাঁড়াইল কি ? প্রাচীন ও নবীনের বিষম সমস্যার মধ্যে পাক খাইয়া মানুষ কি কেবল ব্যর্থতার আবর্ত্তে ঘুরিয়া মরিবে ? মানুষের জীবনসমস্যার কি কোন সমাধান নাই ? পূর্ব্বেই বলিয়াছি মানবপ্রকৃতির বহুমুখী জটিলতার মধ্যেই এই সমস্যার মূল নিহিত। দেশ-বিশেষে বা যুগ-বিশেষে যদি এ সমস্যার চূড়ান্ত সমাধান হইয়া যাইত তাহা হইলে সেই স্থলেই বিশ্বরঙ্গমঞ্চের মানবলীলানাট্যের যবনিকা পতন হইত, মানুষের ভাগ্যবিধাতা যে এ রঙ্গমঞ্চ দেশে ও কালে বিস্তার করিয়া দিয়াছেন তাহার কোন সার্থকতা থাকিত না। এক দেশ অন্য দেশের, এক যুগ অন্য যুগের, এক মানুষ অন্য মানুষের

হুবহু প্রতিচ্ছবি হইত। সে অচলায়তন তাসের ঘরে বিশ্বনটের বিচিত্র রসপিপাসা মিটিত না। সুতরাং চূড়ান্ত সমাধানের সন্ধান মৃত্যুরই সন্ধান, জীবনের নহে।

অথচ জীবনের ধর্ম্ম চলা, নিরুদ্দেশ চলা নহে, এলোমেলো ঘুরিয়া মরা নহে, একটা উদ্দেশ্য ধরিয়া সেই অভিমুখে চলা। সুতরাং চলিতে গেলে একটা পথ বাঁধিয়া লইতে হয়। মানবসভ্যতা বহু আয়াসে এইরূপ একটা পথ কাটিয়া লইতে চাহিয়াছে। তাহা প্রাচীন পন্থাও নয় নবীন পন্থাও নয়, অথবা তাহা এককালে প্রাচীন ও নবীন পন্থা। তাহার নাম দেওয়া যায় ধাবাবাহিক পন্থা। মানবসভ্যতা স্বীকার করে না যে মানুষ বহুরূপীব মত যুগে যুগে কেবল রং বদলাইয়া যাইতেছে, তাহার কোন চিরন্তন স্বরূপ নাই। রঙ্গমঞ্চে ঘন ঘন পট পরিবর্ত্তন হইতেছে বটে কিন্তু মানুষ চাহিয়াছে নানা বিবর্ত্তনশীল শক্তির ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে নিজেব এই নিত্যস্বরূপটি সমগ্র সম্পূর্ণভাবে ফুটাইয়া তুলিতে। সে সকল তথ্য, সকল তত্ত্বকে স্বীকার করিতে চাহিয়াছে, তাহার জীবনের নক্সার মধ্যে সকলকেই যথাযোগ্য স্থান দিতে চাহিয়াছে। এই চেষ্টার ইতিহাসই মানব সভ্যতার মূল ধারা। এ ধারা কখনও ক্ষীণ, সঙ্কীর্ণ ও মন্দগতি হইয়া পড়িয়াছে, কখনও বা পরিপূর্ণ সম্প্রসারিত ও খরপ্রবাহিণী হইয়াছে। সে কালকে স্বীকার করিয়াছে কিন্তু কালের নিকট মস্তক নত করিতে চাহে নাই। নূতন নূতন কালে যে সমস্ত নূতন শক্তি, নূতন অবস্থানের উদ্ভব হইয়াছে, তাহার চিরন্তন শুভবুদ্ধির মানদণ্ডে যাচাই করিয়া লইয়া তাহার সহিত বোঝা-পড়া করিতে চাহিয়াছে। ধারাবাহিক পন্থায় আলস্যের স্থান নাই, জড়তার স্থান নাই, প্রাচীন সাধনায় উত্তরাধিকারী হইয়া নিশ্চিন্ত হইয়া থাকার উপায় নাই। এ উত্তরাধিকার টাকার থলি নয় যে পায়ের উপর পা দিয়া বসিয়া নিশ্চিন্ত ও নিশ্চেষ্টভাবে ভোগ করা চলে। এ যেন ভূসম্পত্তির উত্তরাধিকার। ইহার ফলভোগ করিতে হইলে বৎসরের পর বৎসর অক্লান্তযত্নে সার দিয়া ইহাকে সজীব করিতে হয়, লাঙ্গল ধরিয়া ইহাকে চাষ করিতে হয়, সজাগ সাবধানতার সহিত বেড়া

বাঁধিয়া, বাঁধ বাঁধিয়া ইহাকে আকস্মিক আপদ হইতে রক্ষা করিতে হয়। আবার কালের স্রোতে গা ভাসাইয়া দিবারও উপায় নাই। কাল নূতন সমস্যা আনে, নূতন নূতন জ্ঞান বিজ্ঞান আনে, কিন্তু মানুষের শুভবুদ্ধিকে আমূল বদলাইয়া দিতে পারে না। মানবসভ্যতার ধারা আধুনিকতাকে ধর্ম্মের মর্য্যাদা দেয় নাই। কালের স্রোতে যাহা কিছু ভাসিয়া আসিতেছে তাহাই মূল্যবান্ ও বরণীয় এ কথা সে স্বীকার করে নাই। এ ধারা এককালে আধুনিক ও প্রাচীন। সে প্রাচীন কেন না মানবের যুগব্যাপী সাধনায় যে মূল্যবান্ ধনরত্ন সঞ্চিত হইয়াছে, মানুষের যে সমগ্র সম্পূর্ণরূপে গড়িয়া উঠিয়াছে. তাহা সে অপচয় করিতে চাহে না, বিকৃত করিতে চাহে না। সে আবার আধুনিক, কারণ বিশেষ বিশেষ যুগের বিচিত্র উপাদানের মধ্যেই তাহার জীবনলীলা, এই সমস্ত উপাদান লইয়াই সে মহামানবের সমগ্র সম্পূর্ণ মূর্ত্তি গড়িয়া তুলিতেছে। এ লীলার শেষ নাই, এ গঠনক্রিয়ার পরিসমাপ্তি নাই, যদি শেষ হয় তাহা হইলে বিশ্বরঙ্গমঞ্চে মানুষের অস্তিত্বের আর কোন সার্থকতা থাকে না।

শ্রীরবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ

বাংলা কাব্য সঙ্কলন

ছাত্র বয়সে Arthur Quiller-Couch সম্পাদিত Oxford Book of English Verse-এর আদর্শে বাংলা কবিতার একখানি ধারাবাহিক সঙ্কলন-গ্রন্থ প্রকাশ করার ইচ্ছা ছিল—সেই উদ্দেশ্যে তখন থেকেই কিছু কিছু মালমসলা সংগ্রহ ক'র্‌তে থাকি, তারপর কলেজের এলাকা পার হ'য়ে সেই সব কাগজপত্র ঘেঁটে একখানি পাণ্ডুলিপিও তৈরি ক'রে ফেলি। কিন্তু ইতিমধ্যে জান্‌তে পারি যে এ জাতীয় বইয়ের প্রকাশক দুর্লভ—এদেশে উপন্যাস, গল্প প্রভৃতি তৃতীয় শ্রেণীর হ'লেও অপ্রকাশিত থাকে না, অপুরস্কৃতও হয় না; কিন্তু প্রবন্ধ বা কবিতা মূল্য দিলেও কেউ ছাপ্‌তে চায় না—যেহেতু বাজারে তার চাহিদা নেই।

এ জন্যে দোকানদারদের কোন দোষ দেওয়া চলে না—তারা সবাই কেন সাহিত্য-রসিক নয় বা দেশের রুচি ও মনোবৃত্তি গ'ড়ে তোলার কঠোর দায়িত্ব কেন নেয় নি, এ সমস্ত তর্কও অপ্রাসঙ্গিক। যে দেশের বিশ্ববিদ্যালয় পর্য্যন্ত সমসাময়িক সাহিত্যের সঙ্গে যোগ-রহিত এবং সে সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন, সে দেশে গ্রন্থ-বণিকের কাছে রসজ্ঞতার দাবী অন্যায় আবদার ছাড়া আর কিছুই নয়! বাংলা বই এদেশে পড়েন মেয়েরা এবং সেই পাঠিকা-সমাজের শতকরা নব্বুই জনই প্রাথমিক শিক্ষার কিছু দূর গিয়ে ইস্তফা দিয়েছেন, কাজেই তাঁদের কাছে প্রবন্ধ বা কবিতার কদর কি থাক্‌তে পারে? আমরা যাঁরা লেখা-পড়া নিয়ে কারবার করি, আমরা ক'খানা বাংলা বই কিনি বা পড়ি? আমাদের পড়াশুনা মূলতঃ ইংরাজীগত এবং ইংরাজীর মারফতে ইউরোপের অন্যান্য ভাষাগত—বাংলা বই আমরা পড়ি সাহিত্যিক বন্ধুর দ্বারা উপহৃত হ'লে, নয়ত পাঠ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত হ'লে, আর সাময়িকপত্রে সমালোচনা ক'র্‌তে হ'লে। কাজেই চাহিদার অনুযায়ী গল্প উপন্যাস

নিয়েই বাংলার লেখক ও প্রকাশক সম্প্রদায় ব্যস্ত এবং নারী-সমাজের তুষ্টি-রুষ্টির ওপর সাহিত্যিকের ভবিষ্যৎ নিবদ্ধ।

কিন্তু এ কথা আমি বিশ্বাস করি এবং সকলেই নিশ্চয় করেন যে সঙ্কলন-গ্রন্থের উপযোগিতা সর্ব্বপ্রকার গ্রন্থের চেয়ে বেশী। একান্ত ভাবে প্রথম শ্রেণীর লেখক ভিন্ন ব্রহ্মাণ্ডের কোন লেখকই স্বকীয়তার জোরে অবিনশ্বর হ'তে পারেন না—এমন কি প্রথম শ্রেণীর স্রষ্টারও সমুদয় রচনা বাঁচ্‌তে পারে না—যেগুলো সার্ব্বজনীন আকর্ষণের বস্তু, সকলের হৃদয় যেগুলিকে অপরিহার্য্য ব'লে গ্রহণ ক'রেছে, সেগুলিকে তাদের অদৃষ্টের ওপর নির্ভয়ে ছেড়ে দেওয়া যায়; কিন্তু বাকীগুলোকে বাঁচাবার জন্যে প্রোপাগ্যাণ্ডা দরকার হয়—স্বয়ং শেক্‌সপিয়ারের ক্ষেত্রেই তার দরকার বার বার অনুভূত হ'তে দেখা গেছে। অদ্বিতীয়ের অবস্থাই যখন এই দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণীর জন্যে তখন আরো কি করা দরকার তা সহজেই অনুমেয়। তাঁদের অধিকাংশ রচনাই জীবনকাল অতিক্রান্ত হ'লে লোকে ভুলে যায় এবং এক শতাব্দী পর তাঁদের নাম গল্পের বিষয় হ'য়ে ওঠে। বলা বাহুল্য তাঁদের সমস্ত রচনা টেঁকার কোন প্রয়োজন নাই; তা টেঁকাবার সার্থকতাও কম—কিন্তু গ্রহণযোগ্য রচনা যে অতি সাধারণ লেখকের গ্রন্থেও ছড়ানো থাকে, একথা প্রত্যেকেই স্বীকার ক'রবেন। এই লেখাগুলোকে সঙ্কলন গ্রন্থে আহরণ ক'র্‌লে এরা স্থায়িত্ব লাভ ক'রে থাকে।

ধরা যাক্ এলিজাবেথের যুগের অগণ্য কবিদের কথা—এঁদের মধ্যে স্পেন্সার, শেক্স্‌পিয়ার, মার্লো, বেন্-জন্‌সন্, বোমণ্ট্-ফ্লেচার ছাড়া আর কারুরই নিজস্বতার দাবী বড় বেশী নেই—কিন্তু ওয়াট্, সারে, সিড্‌নি, বার্ণফিল্ড, গাইল্‌স্ ফ্লেচার এঁরাও ত দিব্যি বেঁচে আছেন। তার কারণ Tottle's Miscelleny, Passionate Pilgrim, England's Helicon প্রভৃতি তদানীন্তন সঙ্কলনগুলিতে এঁদের বাছা বাছা কবিতা-সমূহ স্থান পেয়েছিল—তাই মার্লোর Come with me and be my love এবং ওয়াল্টার রালের লেখা তার উত্তর; ফ্লেচারের Faithful shepherdess, সারের ও ওয়াটের সনেট্, গান প্রভৃতি টিকে

গেছে, শেক্সপিয়ারের Sunday Notes পর্য্যন্ত টিঁকেছে—আজ আমরা এঁদের তারিফ্ ক'র্‌ছি, কিন্তু এঁদের নিশ্চিহ্ন হওয়া থেকে বাঁচিয়েছে ঐ সঙ্কলনগুলি—সে কথা আমাদের ভাবা দরকার। তারপর ধরা যাক্ গ্রীন্, পীল্, ন্যাশ্, কীড্, শার্লি, ওয়েবষ্টার প্রভৃতি নাট্যকারদের কথা—তদানীন্তন থিয়েটারে তাঁদের কদর ছিল নিশ্চয়, কিন্তু চার্লস্ ল্যাম্বের Specimens from the Dramatic Poets না বের হ'লে এঁদের নাম লোকে ভুলে যেতো নিশ্চয়! এমন কি Restoration নাট্যকারদের মধ্যেও ড্রাইডেন্, কন্‌গ্রীভ্, সেরিডান্ প্রভৃতির দু'এক খানা বই ছাড়া আর গুলিকে বাঁচাতেও লে হান্টের সঙ্কলন প্রয়োজন হ'য়েছিল—উইচার্লি, ফার্কোয়ার, অটোয়ে, ভ্যান্‌ব্রুর্গ, এথ্‌রেজ বাঁচলেন এই বইখানির জন্যে এবং 'এডিন্‌বরা রিভিউ'এ এর সমালোচনা প্রসঙ্গে সেকালের সুদীর্ঘ প্রবন্ধের জন্যে! এর পর নাম করা যেতে পারে Bishop Percyর Reliques of Ancient Poetryর—এই বইখানি ইংল্যাণ্ড ও স্কট্‌ল্যাণ্ডের বিখ্যাত গাথা-কবিতাগুলিকে বাঁচিয়েছে —সেই অপূর্ব্ব Nut Brown Maid, Cherry Chase, Robin Redbreast—যা আজ ইংরাজী কবিতা-পাঠকদের মুখে মুখে তা কি এতদিন পৃথিবীতে থাকৃত? আর নাম করা যায় পল্‌গ্রেভের—এলিজাবেথীয় যুগ থেকে সুরু ক'রে টেনিসান্ পর্য্যন্ত ইংরাজী কাব্যের সুদীর্ঘ ইতিহাস মন্থন ক'রে তিনি বাছা বাছা কবিতা ও গানগুলিকে যে ভাবে বিষয় ও সময় অনুসারে গ্রথিত ক'রে গেছেন, তা তাঁর অসামান্য রসজ্ঞতার পরিচায়ক—হেরিক্, জর্জ হার্ব্বার্ট, এণ্ড্রু মারভেল্, ডেন্‌হাম্, ব্রাউন্, ডন্, হেন্‌রি ওটোন্, লাভ্‌লেস্, বানিয়ানের পর্য্যন্ত যে একাধিক ভালো কবিতা আছে এর সন্ধান পল্‌গ্রেভই প্রথম দেন। তারপর সাহিত্যিকদের নজর পড়ে কেরোলাইন্ কাব্য-সাহিত্যের দিকে—এখন ডনের যে খ্যাতি ও মর্য্যাদা বৃদ্ধি হ'য়েছে, এর মূল হ'চ্ছেন পল্‌গ্রেভ। এ ছাড়া গ্রে, ব্লেক্, উল্‌ফ্, ক্যাম্পবেল্ প্রভৃতি গৌণ কবিদেরও পল্‌গ্রেভই অপমৃত্যু থেকে রক্ষা করেন। বর্ত্তমান কালে Ward প্রভৃতি যে সমস্ত সুবৃহৎ সঙ্কলন প্রকাশ ক'রেছেন তার মূল

উৎস হচ্ছেন পল্‌গ্রেভ্‌—এমন কি আধুনিক কাব্যের সঙ্কলয়িতারা—যেমন লরেন্স্‌ বিনিয়ান্‌, হ্যারলড্‌ মান্‌রো, নিউবোল্ট্‌ পর্য্যন্ত পল্‌গ্রেভের আদর্শের কাছে ঋণী।

প্রোপ্যাগ্যাণ্ডা কথাটা সাহিত্যের ক্ষেত্রে ভালো শোনায় না—কিন্তু ইংরাজী সাহিত্যের মতো সমস্ত জগতে প্রচলিত সচল সাহিত্যের ইতিহাসেই দেখা গেল যথেষ্ট প্রোপাগ্যাণ্ডা ছাড়া এর বর্ত্তমান উন্নত অবস্থা আসে নি—অবশ্য এই সঙ্গে ছিল ল্যাম্ব্‌, কোল্‌রিজ্‌ হেজ্‌লিট্‌ প্রভৃতির সমালোচনা-সাহিত্য, যা এই সব পরিত্যক্ত সাহিত্যকে নূতন দৃষ্টির আলোকে পরিস্ফুট ক'রে তুলেছিল। আর ছিল ও দেশের শিক্ষায়তনের সাহিত্যসেবীদের সম্বন্ধে কৃতজ্ঞতা-বোধ—নইলে শুদ্ধ-মাত্র সাহিত্যিকের প্রচেষ্টায় এঁরা স্বীকৃতির দাবী উপস্থিত করতে পার্‌তেন কিনা সন্দেহ!

কথা উঠতে পারে মানুষের মন যা স্বাভাবিক প্রীতিবশেই ধ'রে না রাখ্‌লো, কবর খুঁড়ে তাকে টেনে তোলা নিষ্ফল! একথা আমরা স্বীকার কর্‌তে পারিনে—কারণ পুরাণো গহনা বা পোষাকের মতো মানুষের মানস-সৃষ্টি সময়াতিক্রম ক'র্‌লেই যাদুঘরের সামগ্রীতে পরিণত হয় না—মানুষের মন যা কিছু ধ'রে রাখেনি তাই যে বৈশিষ্ট্যবর্জ্জিত তাও না হ'তে পারে। সমসাময়িক সমাজে অনেক সময়ই বড় স্রষ্টাকে পেতে হয় উপেক্ষা—গতানুগতিকতার বিরোধী কোন নূতন পথের পথিকই সমকালবর্ত্তীয়দের প্রীতি লাভ ক'রে গেছেন কিনা সন্দেহ! ভাসের নাটক, অজন্তা ইলোরার শিল্প তাই হাল আমলে নূতন ক'রে আবিষ্কৃত হ'য়েছে—যদিও হাজার বছরের আগে এদের উদ্ভব। এছাড়া প্রতিভার সঙ্গে যশের সম্পর্কও প্রায়শঃ অহি-নকুল জাতীয়, তাই কালিদাস-ভবভূতির অতিখ্যাতির আড়ালে এক সময় বিশাখদত্ত বা শূদ্রক চাপা প'ড়ে গিয়েছিলেন। রাজতন্ত্রীয় শোষণ বা সামাজিক মর্য্যাদার অভাবও অনেক সময় খ্যাতির পথ অবরুদ্ধ করে—এ অবস্থায় সাধারণ-কর্ত্তৃক বিস্মৃত হওয়া কিছু বিচিত্র নয়, বা অন্যায়ও নয়। এসবের হাত থেকে রক্ষার একমাত্র উপায় Anthology.

এখনকার মতো প্রাচীনেরাও এর উপযোগিতা হৃদয়ঙ্গম ক'রে-ছিলেন—তাই পৃথিবীর প্রাচীনতম গ্রন্থ ঋগ্বেদ সঙ্কলন গ্রন্থ—চীনের 'শীকিং', মিশরের 'মৃতের বই', জাপানের 'মাইনো সু', আরবের 'মুল্লাকাৎ,' সবই সঙ্কলন-গ্রন্থ! নানা জনের রচিত কবিতা, গান, গাথা, স্তোত্র এই সকল গ্রন্থে সঙ্কলিত হয়েছে, অতি প্রাচীন আমলে—একেবারে মানব-সভ্যতার বা বিশ্ব-সাহিত্যের ইতিহাসের প্রথম যুগে। এই দিক থেকে বাংলা 'সাহিত্য' কথাটার চমৎকার সার্থকতা দেখা যায়। দুঃখের বিষয় ক্ল্যাসিক্যাল্ সংস্কৃতের কোন প্রাচীন Anthology পাওয়া যায় নি—যদি না ভর্ত্তৃহরির বৈরাগ্য-শতক, শান্তি-শতক বা অমরুর (প্রেম) শতক মৌলিক গ্রন্থ না হয়ে সঙ্কলন হয়। পারসিক, জার্ম্মান, প্রভেন্সাল্ এমন কি আইস্‌ল্যাণ্ডিক্ সাহিত্যেরও প্রাচীন কাব্য-সংগ্রহ পাওয়া গেছে—এই সংরক্ষণীবৃত্তি মানুষের প্রকৃতির সঙ্গে অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে জড়িত—নইলে পিরামিড্ বা গ্রীসিয়ান্ আর্ণেরই বা মূল্য কি?

পূর্ব্বে যে সঙ্কলনগুলির নাম ক'রেছি সেগুলিকে অবলম্বন ক'রে আধুনিক কাল আবার নিজের প্রয়োজনানুরূপ অনুবাদ-সঙ্কলন প্রকাশ ক'রেছে। খাস ইউরোপেও আজ মুষ্টিমেয় লোক মূল গ্রীক্, ল্যাটিন্ বা হিব্রুর চর্চ্চা করে—এই সব ক্ল্যাসিক্যাল ভাষা এখন এংলো স্যাক্সন্ বা নর্স্ ভাষার মতোই অতীতের বস্তু ব'লে গণ্য। যেমন এসিয়ার সংস্কৃত, আর্বি, ফার্সি প্রভৃতিও এখন antiquated হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। শুনেছি চীন খুব রক্ষণশীল, তবে জাপানেও ক্লাসিকের মৌলিক চর্চ্চা কম, একথা Lafcadio Hearn লিখেছেন—এ সমস্তই আজ অনুবাদ-সঙ্কলনের সাহায্যে সুলভে এবং সহজে আমরা আয়ত্ত ক'রে থাকি। আধুনিক পল্লবগ্রাহিতাকে নানা কারণে বিদ্রূপ করা হ'য়ে থাকে, কিন্তু প্রাচীন পুষ্পগ্রাহিতার চেয়ে এই দ্রুততার যুগে এ অনেক বড় জিনিষ একথা আমাদের মনে রাখতেই হবে।

কিন্তু আমার ভূমিকা আমার মূল বক্তব্যের অনেকখানি স্থান অপহরণ ক'রেছে—কাজেই এখন সংক্ষেপে বাংলা সাহিত্যের কথায় নেমে আসা যাক্।

প্রথমেই ব'লে রাখা দরকার যে আবাল্য ইংরাজী সাহিত্যের আবেষ্টনে পুষ্ট আমাদের মন বাংলা কাব্যের সমালোচনা বিষয়ে ইংরাজী রসাদর্শেরই অনুসরণ ক'রে থাকে—কিন্তু বাংলা সাহিত্যে সমগ্র ভাবে ইংরাজী রসাদর্শ আত্মপ্রতিষ্ঠা ক'রেছে মাইকেল থেকে। কাজেই আদি থেকে আরম্ভ ক'রে মাইকেলের আবির্ভাব পর্য্যন্তকার বাংলা সাহিত্যে তৃপ্তি পাবার উপাদান আমরা বড় বেশী পাইনে। প্রাচীন বাংলা সাহিত্য মূলতঃ লোকায়ত—অনুষ্ঠান ও নীতিমূলক, পুনরাবৃত্তি-দুষ্ট, আধিদৈবিক উপপ্লবে ক্লিষ্ট এবং অনেকাংশে অসংস্কৃত। শুধু বৈষ্ণব কাব্যসাহিত্য কিয়ৎপরিমাণে লোকোত্তর এবং আধ্যাত্মিক কঙ্কালের ওপর সংস্থিত হ'লেও আসলে রোমান্টিক্ রচনা—তাই ওতে আমরা আনন্দ পেয়ে থাকি। তাছাড়া স্ফুফী মিষ্টিক্‌দের বা ভারতীয় মিষ্টিক্‌দের কাব্যের নিগূঢ়ার্থ যাই হোক, আমরা ওর লৌকিক ব্যঞ্জনা-কেই গ্রহণ ক'রে থাকি—ওরা আমাদের কাছে দৈবী প্রকাশ নয়, পুরোদস্তুর লিরিক্ কবিতা—বৈষ্ণব কবিতাকে আমরা এর বেশী কিছুই মনে করি না। বরং এও আমরা মনে করি যে স্ফুফী মিষ্টিকদের সঙ্গে বৈষ্ণব মিষ্টিক্‌দের কোথাও কোন রকম প্রচ্ছন্ন যোগ ছিল এবং তা আধ্যাত্ম-সম্পর্কীয় যোগ নয়, তা রক্তমাংসের ক্ষুধাতৃষ্ণাকে উপলক্ষ ক'রেই উৎসারিত, অথচ এদের স্থূল অস্তিত্বকে অতিক্রম ক'রে তা রসায়িত। বলাবাহুল্য এখানে আমরা ইংরাজী রসাদর্শের অনুসরণেই কাব্য বিচার ক'রছি এবং এই জন্যই রাধাকৃষ্ণ প্রসঙ্গ আমাদের হিসাবে কাব্যের লৌকিক কঙ্কাল ছাড়া অন্য কিছুই মনে হ'চ্ছে না। প্রাচীন বাংলা সাহিত্য ব'ল্‌তে আমরা মূলতঃ বৈষ্ণব সাহিত্যকেই বুঝে থাকি—হয়ত প্রাচীনেরাও তাই বুঝেছিলেন। তাই এদেশে পদাবলী সাহিত্যের অনুশীলন ও সংরক্ষণ যে পরিমাণে হয়েছে—অন্য জাতীয় সাহিত্যের তা আদৌ হয়নি। কারণ যা রসায়িত সৃষ্টি নয়, তার জন্যে কারুরই আগ্রহ থাকার কথা নয়।

দীর্ঘ কাল আগেই পদকল্পতরু নামক anthologyতে বিভিন্ন মহাজনের পদ সঙ্কলিত হ'য়েছিল। এই বইকে কেন্দ্র ক'রেই পরবর্ত্তী

গবেষণাদির উদ্ভব—এবং বর্ত্তমানের সটীক শোভন সংস্করণ-সমূহের মূলও এই গ্রন্থ।

কিন্তু বৈষ্ণব কাব্যই বাংলার সবচেয়ে পুরাণো সাহিত্য নয়—ওর সময় চৈতন্যের শতাধিক বৎসর পূর্ব্ব থেকে চৈতন্যের পরবর্ত্তী শ' দুই বৎসরের ভেতর। এর আগে ধরা হ'ত কাশীদাস, কৃত্তিবাস ও মুকুন্দরামকে—এঁরা, বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিরা এবং রামপ্রসাদ এই নিয়েই বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন যুগ সীমাবদ্ধ ছিল। রামগতি ন্যায়রত্ন যখন 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব' লেখেন তখন তাঁর পুঁজিও এর বেশী ছিল না—হারাণ রক্ষিতের 'ভিক্টোরিয়া যুগের বাংলা সাহিত্য' বা রমেশ দত্তের 'Literature of Bengal'ও আর বেশীদূর অগ্রসর হয়নি। সৌভাগ্যবশতঃ দীনেশ বাবুর বই প্রকাশের সময় বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শনের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়—নেপালে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী একখানি পুঁথি আবিষ্কার করেন—আশ্চর্য্যের বিষয় এটিও একটি সঙ্কলন গ্রন্থ। বৌদ্ধতন্ত্রের ভাঙার অবস্থায় কয়েকজন মঠাশ্রয়ী ভিক্ষুর লেখা কতকগুলি হেঁয়ালি—এই হ'ল প্রাচীনতম বাংলা রচনা—এদের অল্প পরের রচনা ময়নামতী ও গোপীচাঁদের গান, শূন্যপুরাণ, কৃষ্ণকীর্ত্তন—এদের রচনা কাল নাকি ৬ষ্ঠ শতাব্দী থেকে সুরু, কারণ বৌদ্ধ দোঁহার অন্যতম লেখক কাহ্নুপাদের সঠিক তারিখ পাওয়া গেছে। সুনীতি চট্টোপাধ্যায় এই আমলটাকে তুর্কীবিজয়ের সমকাল বা তার প্রাক্কাল ব'লেছেন—মোটা কথায় এই যুগটাকে বৌদ্ধ প্রভাবের যুগ বলা হয়ে থাকে।

বৌদ্ধ মহাযান ও হীনযান উভয় তন্ত্রের ছাপই এই সাহিত্যে সুস্পষ্ট—মন্ত্রতন্ত্র ঝাড়-ফুঁক প্রভৃতি হীনযানী রীতি ও ত্যাগ নিষ্ঠা সংযম প্রভৃতি মহাযানী রীতি অঙ্গাঙ্গি ভাবে জড়িত হয়ে এই আড়ষ্ট পুঁথিগুলির কলেবর বৃদ্ধি ক'রেছে—কিন্তু অসাহিত্য হ'লেও এদের উপেক্ষা করা কঠিন—কারণ পরবর্ত্তী সাহিত্যে এদের প্রভাব জাজ্জ্বল্যমান! কৃষ্ণকীর্ত্তন বৈষ্ণব লিরিক্ পর্য্যায়ের অগ্রদূত, আর গোপীচাঁদে পরবর্ত্তী মঙ্গল কাব্যাদির প্রথম পত্তন—শূন্যপুরাণ বা দোঁহার ছায়া পরবর্ত্তী পরকীয়া-

বাদী বৈষ্ণবের ও বামাচারী শ্যামাসাধকের রচনায় নিজেকে সূক্ষ্ম বা স্থূল ভাবে প্রকাশ ক'রেছে—অর্থাৎ বৌদ্ধগান থেকে রামপ্রসাদ পর্য্যন্ত বাংলা সাহিত্যে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে উপ-ধর্ম্মের আধিপত্য চলেছে এবং তারই অয়নকে কেন্দ্র ক'রে সুসাহিত্য কুসাহিত্য দুইই গড়ে উঠেছে—এই বাঁধা রাস্তার মধ্যে এমন একটি অবিচ্ছিন্ন পারম্পরিকতা বিদ্যমান যে পুনরাবৃত্তি-দোষে ও উদ্ভাবনের অভাবে এই সুদীর্ঘ ইতিহাস দস্তুরমতো ভারাক্রান্ত।

শুধু ময়মনসিংহ গীতিকা যদি শূন্যপুরাণী আমলের লেখা হয় তো বিস্ময়ের সঙ্গে ব'লতে হবে যে এই আটঘাট-বাঁধা orthodoxyর ভেতর কি ক'রে অতবড় একটা ধর্ম্মসম্পর্কহীন লৌকিক পর্য্যায় গ'ড়ে উঠ্‌লো। কিছু মাত্র পরমার্থিকতার ভান্ নেই— সম্পূর্ণ মানুষী সুখ দুঃখ, প্রভৃতির সঙ্গে মানুষের মুখোমুখী সম্বন্ধ—তার ভেতর বৈষ্ণবের রূপকের অবকাশ নেই, নেই মঙ্গলকাব্যের দেবদেবীর অনুগ্রহ-নিগ্রহ বিতরণের সুযোগ—বর্ণাশ্রমকে এমন নিশ্চিন্ত উপেক্ষা এবং হৃদয়বৃত্তিকে সমস্ত নীতি বা রীতির ওপর প্রাধান্য দেওয়া এ কি ক'রে অত পুরাণো আমলে সম্ভব হয়? পরবর্ত্তী মঙ্গলকাব্যগুলি—সে একেবারে ভারতচন্দ্র পর্য্যন্তই—যে পরিমাণ আড়ষ্ট এবং আধ্যাত্মিকতার পুটপাকে শোধিত অপধর্ম্মের মাহাত্ম্যকীর্ত্তনে পঞ্চমুখ বারমাস্যা, দেবদেবীর কোঁদল, রস-শাস্ত্রানুযায়ী রূপবর্ণনার ঘনঘটায় সমাচ্ছন্ন, তাতে ওদের রীতি-মতো আধুনিকই মনে হয়। কবিকঙ্কণে, ঘনরামে, কেতকা দাসে, ভারতচন্দ্রে আমরা মানুষের দেখা পাই না এমন নয়—মানুষের সুখ দুঃখ, আশা আকাঙ্ক্ষার পার্থিব চেহারা দেখি না এমন নয়—কিন্তু তাদের সমস্ত সুখ অসুখের পরিধিকে বেষ্টন ক'রে যে দেবদেবীরা ভীড় ক'রে আছেন, তাঁদের উপদ্রবেই ওদের মানবীয় শক্তি ও সম্ভাবনীয়তা পদে পদে বিড়ম্বিত হ'য়েছে এবং একেকে অপরের সঙ্গে অভিন্ন ক'রে দিয়েছে।

অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত এরই জের চ'লেছে—শ্যামাসঙ্গীত, সখীসংবাদ, পাঁচালী প্রভৃতি মঙ্গলকাব্য ও বৈষ্ণব কাব্যেরই জারক রসে সঞ্জীবিত এবং একই মামুলি রীতির অনুধাবক। রামপ্রসাদ, দাশুরায়,

কৃষ্ণকমল সবই একই দলভুক্ত। শুধু গোপাল উড়ে ও নিধুবাবুতে মানুষের সামাজিক মনের ব্যথা বেদনার ভাষা ভাঙা ভাঙা ভাবে শুন্‌তে পাওয়া যায়—আর যায় বাউলদের গানে। বাউল গানের যে তাত্ত্বিকতা-টুকু বহু তারিফ পেয়েছে, ময়মনসিংহ গীতিকার মতো তাও সংগ্রাহক-বৃন্দের রিপুকর্ম্মজাত ব'লে মনে করার যথেষ্ট অবকাশ আছে।

আদি থেকে এই পর্য্যন্ত হ'ল প্রাচীন বাংলা সাহিত্য—অর্থাৎ ইংরাজী আমলের ঠিক পূর্ব্ব পর্য্যন্ত। এই দীর্ঘ সময়ের সাহিত্যকে মোটামুটি কয়েকটা ভাগে ভাগে ক'রে নেয়া যাক্—

১। বৌদ্ধ কাব্য
২। ময়মনসিংহ গীতিকা
৩। বৈষ্ণব কাব্য
৪। মঙ্গল কাব্য
৫। লোকসঙ্গীত

এর মধ্যে একমাত্র বৈষ্ণব সাহিত্য নিয়েই অনেকগুলি উৎকৃষ্ট সঙ্কলন গ্রন্থ প্রকাশিত হ'য়েছে—পুরাণো 'পদকল্পতরু'র কথা আগেই ব'লেছি—আধুনিককালে জগদ্বন্ধু ভদ্রের 'গৌরপদ-তরঙ্গিণী' ও খগেন্দ্রনাথ মিত্রের 'পদামৃতমাধুরী' সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। এছাড়া আরো অনেকগুলি প্রচলিত বই বাজারে পাওয়া যায়—এ সমস্ত বই'ই পালা অনুসারে সাজানো। গৌরচন্দ্রিকা দিয়ে এদের সুরু এবং যে melodramatic ধরণে কীর্ত্তনীয়ারা গান গান্ সেই অনুযায়ী নানা কবির রচিত পদ সন্নিবেশে এরা গ্রথিত—কাজেই সাধারণ কাব্য-রসিক পাঠকের পক্ষে এই বই-গুলো বিশেষ উপযোগী নয়—অবশ্য ভক্তেরা ব'ল্‌বেন বৈষ্ণব কাব্য আসলে সাহিত্য নয়, ও হ'চ্ছে বৈষ্ণব রসশাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট সংজ্ঞা-সমূহের দৃষ্টান্ত মাত্র। কিন্তু আমরা ভক্ত ন'ই—সুতরাং সাহিত্য হিসাবেই আমরা ওর বিচার ক'র্‌বো! আর চারু বাবুর সচিত্র 'পদাবলী' সম্বন্ধে কি ব'ল্‌বো? ও বই ত সাহিত্যিকদের জন্যে আহৃত হয় নি! দীনেশচন্দ্র ও খগেন্দ্রনাথের যৌথ সম্পাদনায় প্রকাশিত বিশ্ববিদ্যালয়ের ছোট সঙ্কলনখানিই আমার মনে হয় কৌতূহলী পাঠকের পক্ষে উৎকৃষ্ট।

প্রথম, দ্বিতীয় ও চতুর্থ পর্য্যায় নিয়ে একমাত্র সংগ্রহপুস্তক যা আমার নজরে প'ড়েছে, তা হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়কর্ত্তৃক প্রকাশিত Typical Selections। কিন্তু এই বিশালকায় বইটির মূল্য ততটা সাহিত্যগত নয়, যতটা ইতিহাসগত—তাই ডাক ও খনার বচন থেকে সুরু ক'রে কিছুই এ থেকে বাদ পড়ে নি। সত্যিকার কবিতা অপেক্ষা কাব্যের উপকরণ সংগ্রহকেই সঙ্কলয়িতা সমধিক প্রাধান্য দিয়েছেন—উপধর্ম্মের উৎপত্তি, পূজাবিধি, নায়িকা-লক্ষণ থেকে সুরু ক'রে বেশ-বিন্যাস পদ্ধতি সমরসজ্জা, গৃহস্থালী-বর্ণন পর্য্যন্ত এতে নির্ব্বিচারে সবই সংগৃহীত হ'য়েছে—অবশ্য Ballad ও বৈষ্ণব-পর্য্যায় ছাড়া সত্যিকার কবিতাও প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে সুলভ নয়, কিন্তু বিষয়বস্তুকেই কাব্যের পক্ষে ষোল আনা প্রয়োজনীয় মনে করার দরুন এই অসংলগ্ন বস্তুপিণ্ড অকাব্যের গুদামঘরে পরিণত।

পঞ্চম পর্য্যায়ের যে কখানা সঙ্কলন আছে, তার মধ্যে দুর্গাদাস লাহিড়ীর 'বাঙ্গালীর গান,' ক্ষিতিমোহন সেনের 'বাউল গান' এবং মনসুর উদ্দীনের 'হারামণি' উল্লেখযোগ্য। দুর্গাদাস বাবু রামপ্রসাদ থেকে সুরু ক'রে পাঁচালী, ঢপ্, দেহতত্ত্ব, সখীসংবাদ নানাজাতীয় গানই সংগ্রহ ক'রেছেন—আধুনিক গান পর্য্যন্ত। কিন্তু মালগাড়ীলক্ষণাক্রান্ত এই বইয়ে না আছে শৃঙ্খলা, না আছে আয়তন বা বিষয়বিন্যাস সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র সতর্কতা—এর থেকে বেছে নিয়ে ছোট একখানি সুন্দর সংগ্রহ হ'তে পারে। বৈষ্ণবীয় সঙ্গীত শাখার সঙ্গে সঙ্গে শ্যামা-সঙ্গীত সখীসংবাদ ও লোকসঙ্গীত—বাউল, ভাটিয়াল—টপ্পা প্রভৃতি সাহিত্যকে কি ভাবে আশ্রয় ক'রেছিল, পূর্ব্ববর্ত্তী সাহিত্যের সঙ্গে তাদের সম্বন্ধ কি এবং পরবর্ত্তী কালের সাহিত্য তাদের কোন ধ্বংসাবশেষ কি না—এ সব বইয়ে তার কোন উল্লেখ নেই। তাই ওরা অনায়াসে পরস্পর মিশে প্রাচীন সাহিত্যের সাধারণ তালিকাভুক্ত হ'য়েছে—ওদের বৈশিষ্ট্য পাঠকের কাছে অনাবিষ্কৃত থেকে গেছে।

উৎকৃষ্ট সঙ্কলনগ্রন্থের অভাবে এই আনুমানিক এক হাজার বছরের কাব্য-সাহিত্য সমগ্রভাবে সকলের পড়াও যেমন অসম্ভব হয়েছে,

এদের মূল্য সম্বন্ধেও তেম্‌নি বহু ভ্রান্ত ধারণার অবসর ঘটেছে—বস্তুতঃ কাব্য-সাহিত্যের ক্রমবিকাশ এবং তার পরিণতি বোঝানোর এবং জীবনের সঙ্গে সেই পরিণতির সম্বন্ধ নির্ণয় করার উপযোগী সংক্ষিপ্ত কোন উপায় থাকা যে প্রয়োজন ছিল একথা স্বীকার ক'রতেই হ'বে। Orthodox ও Secular উভয় শাখার কাব্যসাহিত্যের ধারা কি পারিপার্শ্বিকের ভেতর থেকে পুষ্টিলাভ করেছে এবং বর্ত্তমান সাহিত্যের ভেতর তাদের কোন চিহ্ন আর পাওয়া যায় কি না, অথবা প্রাচীন সাহিত্য নিজস্ব ভাবেই শেষ হ'য়ে গেছে এবং যা'কে আমরা আধুনিক বলি তার উৎপত্তি একেবারে স্বতন্ত্র, এসব কথা অনেকেই জানেন না। হাস্যরসের নামে ভাঁড়ামি, আধ্যাত্মিকতার নামে ধর্ম্মকোলাহল, সৌন্দর্য্যসৃষ্টির নামে অলঙ্কার-শাস্ত্রের বাঁধা বুলি আবৃত্তি ও ধার্ম্মিকতার আবরণে কুৎসিৎ দেহসর্ব্বস্বতা নিয়ে যে সনাতন সাহিত্য, তার সঙ্গে প্রাক্‌-চৈতন্য লিরিক্‌, গীতিকা বা কৃষ্ণচন্দ্রের যুগের লোক-সঙ্গীত পর্য্যায়ের তফাৎটা কোথায়—তা বুঝতে হ'লে হাজার পাতা কুগ্রন্থ পাড়ি দিতে হয়। একত্র আহৃত সুন্দর সংক্ষিপ্ত বই নেই—গন্ধমাদন গোত্রীয় প্রাচীন সাহিত্যের ভালো-মন্দ তাই নিবদ্ধ র'য়েছে তথাকথিত পণ্ডিতদের হাতে, লোকের ঘরে ঘরে তার প্রচার হয় নি।

এরপর আসে আধুনিক কালের কথা--এই আমলের পায়োনিয়র ঈশ্বর গুপ্ত, যাঁর অর্দ্ধেক হাফ্‌ আখ্‌ড়াই, তরজা, পাঁচালীর যুগে সংস্থিত, বাকী অর্দ্ধেক গোপালভাঁড়ী হাস্যরসে ভরপুর। ভারতচন্দ্রের মোগলাই রুচির আমরা বিরোধী, কিন্তু গুপ্ত কবি কি তাঁর চেয়ে বেশী রুচিপ্রাপ্ত ছিলেন? কিন্তু তবু ঈশ্বর গুপ্ত এ দেশের সাহিত্যের জন্‌সন্‌ স্বরূপ—যে লেখক-গোষ্ঠী তিনি গ'ড়ে যান তার মধ্যে আমরা বড় কবিদের পেয়েছি—যদিও প্রত্যক্ষভাবে যাঁরা তাঁর সাগ্‌রেদ্‌ ছিলেন, বড় কবি তাঁরা কেউ নন্‌—বঙ্কিমচন্দ্র, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, দীনবন্ধু, রঙ্গলাল, দ্বারকানাথ—সবাই চলনসই কবি—কিন্তু মাইকেল, নবীন সেন এবং হেমচন্দ্র এই যুগের ছায়াতেই আবির্ভূত এবং ঈশ্বর গুপ্ত প্রাচীন সাহিত্যের সমাধির ওপর যে খাল কেটেছিলেন এঁরা তারই ওপর একটা মজবুত্‌ ইমারত

গ'ড়ে তুল্‌লেন—মালমশলা এলো সবই পাশ্চাত্য থেকে। মাইকেল হ'লেন অগ্রদূত—বাকী দু'জন অনুগামী। হেমচন্দ্র অকবি ছিলেন, তবে অধ্যবসায় তাঁকে দিয়ে কিছু কিছু কাব্য লিখিয়ে নিয়েছে; নবীন-চন্দ্রের মধ্যে কবির মেরুদণ্ড ছিল, হাতে ভাষাও ছিল, শুধু ক্ষেত্রের অভাব তাঁকে আট্‌কেছিল। তবু মহাকাব্য নামধারী এঁদের উপাখ্যানগুলি এবং অব্যবহিত পরবর্ত্তী অগণ্য কাব্য-লেখকের গ্রন্থগুলিই লিরিকের পুনর্জ্জন্মে সহায়তা ক'রেছে—যাঁদের মধ্যে শিবনাথ শাস্ত্রী, আনন্দ মিত্র, দীনেশ বসু, হরগোবিন্দ লস্কর চৌধুরী, বলদেব পালিত প্রভৃতির নাম করা যেতে পারে। এই যুগের ফ্যাশান্ অনুযায়ী কারুকে মিল্টন, কারুকে বাইরন্ ব'লে নিজের দৈন্যকে আরো বড় ক'রে তুলে লাভ নেই—তবে ইংরেজী কাব্যের অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ও উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভের বইগুলোকে এঁরা আদর্শ মেনেছিলেন—তার ফলে বাংলা কাব্যে সর্ব্ব-প্রথম দেব-মাহাত্ম্য থেকে এলো দেশমাহাত্ম্য—পদ্মিনী, পলাশীর যুদ্ধ ইত্যাদি তারই ফল। অবশ্য এ বিষয়ে ঈশ্বর গুপ্তই প্রথম পয়গম্বর—আর বঙ্কিমচন্দ্রে এর গতি সম্পূর্ণ। সুকাব্য এখনো দেখা দেয় নি, তবে কাব্যের মন্দিরাঙ্গন প্রতিষ্ঠা হ'য়েছে এঁদের হাতে—মাইকেলই সে বিষয়ে ক্ষণজন্মা কর্ম্মী-বিশেষ।

এই যুগের সাহিত্যের অপমৃত্যু হয়নি—ঈশ্বরগুপ্ত থেকে যাঁদের নাম ক'রেছি, তাঁরা সকলেই পাঠ্য পুস্তকের পৃষ্ঠায় বেঁচে রয়েছেন। তাঁদের উল্লেখযোগ্য কবিতাগুলো সবই চাপা প'ড়েছে। তবে নাম ডোবে নি—ছেলেরা সবাই তাঁদের লেখা প'ড়ে থাকে। আমাদের কর্ত্তব্য-বুদ্ধি এখানেই সমাপ্ত হ'য়েছে; তবু মন্দের ভালো। কিন্তু উপাখ্যান-কাব্য-শাখার উদ্ভব ও লয় এদেশে আকস্মিক ও মরসুমী ধরণের কেন, তা বোঝাবার উপযোগী সত্যকার কোন সঙ্কলন নেই—হবারও আশা নেই। Childe Harold হয়ত আমরা এখনো প'ড়বো, কিন্তু প্রভাস-কুরুক্ষেত্র, কি বৃত্রসংহার, কি হেলেনাকাব্য আর প'ড়্‌বো কিনা সন্দেহ! সুতরাং ও সবের উল্লেখযোগ্য অংশগুলি সঙ্কলিত হওয়া খুবই দরকার ছিল—সেটুকু কি সত্যকিঙ্কর বাবুর 'কবিতা রত্নাবলী'তেই সমাপ্ত হবে?

তারপরের যুগ বর্ত্তমান যুগ—মাইকেল থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত আস্‌তে মধ্যে বিহারীলাল, সুরেন্দ্র মজুমদার, দ্বিজেন্দ্র ঠাকুরকে নিয়ে যে সংক্ষিপ্ত সময়টা তাকে আর একটা স্বতন্ত্র যুগ বলা যায় না—ওটা রবীন্দ্র যুগেরই প্রস্তাবনা, যেমন রবীন্দ্রনাথ থেকে আমাদের সময় পর্য্যন্ত সময়টা হ'চ্ছে রবীন্দ্র যুগেরই পটভূমি। মাইকেলেই আমরা দেখেছি পুরাণো traditionএর সর্ব্বাঙ্গীণ বিলোপ হয়, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ আবার বৈষ্ণব শাখা ও বাউল শাখাকে নিজের গীতের মধ্যে জড়িয়ে নিলেন, সেই সঙ্গে জড়িয়ে নিলেন ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ থেকে সুইনবার্ণ পর্য্যন্ত ইংরাজী কাব্যধারাকে নিজের কবিতায়—কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কাব্যপ্রতিভা এসবকে অতিক্রম ক'রে সুদূরস্পর্শী উচ্চতাকে আশ্রয় ক'রলো। বাংলা কাব্যের সমস্ত ইতিহাস তাঁর মধ্য দিয়ে মূর্ত্ত হ'ল এবং সেই সঙ্গে এমন আরো কিছু তাঁর মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পোলো যা তাঁকে পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবিদের সঙ্গে দিল সমানজ্ঞাতিত্ব। সৌভাগ্যবশতঃ রবীন্দ্রনাথ তাঁর সমগ্র কাব্য গ্রন্থাবলী থেকে ক্রমিক রীতিতে সঙ্কলন ক'রে সঞ্চয়িতা নামক anthology নিজেই সম্পাদন ক'রেছেন—আর রবীন্দ্রনাথের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী লিরিক কবিদের থেকে সুরু ক'রে একেবারে আধুনিক কাল পর্য্যন্তকার কবিতা অবলম্বনে নরেন্দ্র দেব 'কাব্যদীপালী' নামক সঙ্কলন বের ক'রেছেন।

'কাব্য দীপালী'র সঙ্কলনে বিবাহের বাজারের প্রতি লক্ষ্য রাখ্‌তে হ'য়েছে—কাজেই কবিদের বিশেষত্ব অনুসারে কাব্য সঙ্কলিত হয়নি। তা ছাড়া বহু অবাঞ্ছিতের ওতে প্রবেশ হ'য়েছে, অথচ যোগ্যের স্থান হয় নি—স্বয়ং বিহারীলালই ওতে নেই, আর আধুনিকদের অনেকের সম্বন্ধেও পক্ষপাত আছে—এর ওপর কেবলমাত্র প্রেম-কবিতাকেই প্রাধান্য দিতে গিয়ে সম্পাদক তাঁদের ওপর অন্যায়াচরণ ক'রেছেন, যাঁরা প্রেম-কাব্য লিখে প্রসিদ্ধ নন্‌। বিশেষ ক'রে আধুনিক সম্বন্ধে—আধুনিক বাংলা কাব্য অবয়বের জন্য রবীন্দ্রনাথের কাছে ষোল আনা ঋণী, দৃষ্টি ভঙ্গিমার জন্যেও প্রায় ততটাই—কিন্তু তার আত্মায় বিংশ

শতাব্দীর ইংরেজ ও মার্কিন কবিদের চিন্তার ঢেউ এসে লেগেছে—সুতরাং একই লেবেলে রবীন্দ্রমণ্ডলের সঙ্গে তাদের গুদামজাত করাও সঙ্গত হয় নি। কালিদাস রায় ও সত্যেন্দ্র দত্ত রবীন্দ্র প্রতিক্রিয়া বিষয়ে কিছুটা অবহিত হ'য়েছিলেন—তাঁহাদের নিজস্বতার দাবী আছে, পক্ষান্তরে যতীন্দ্র বাগচী রবীন্দ্র-প্রভাবে অভিভূত—আবার যতীন্দ্র সেনগুপ্ত, মোহিত লাল, নজরুল অনেকাংশে নূতন পথের পথিক—তারপর নবীনেরা যাঁরা আজো স্বীকৃতির অধিকার পাননি—অথচ সকলকেই 'কাব্য দীপালী' এক সূত্রে গেঁথেছেন এবং এক জাতীয় ক'রে বেছে নিয়ে—আধুনিক ইংরাজী কাব্যের যে সব Anthologyর কথা ইতিপূর্ব্বে ব'লেছি তাদের সঙ্গে তুলনা ক'র্‌লেই আমার কথার যাথার্থ্য উপলব্ধি হবে।

কিন্তু এ পর্য্যন্ত একখানি বইয়ের আমি উল্লেখ করিনি—তা হ'চ্ছে চারু বন্দোপাধ্যায় ও ললিত মোহন চট্টোপাধ্যায় সঙ্কলিত 'বঙ্গবীণা'—রবীন্দ্রনাথ এর ভূমিকা লিখে দিয়েছেন, দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরীর আঁকা একখানি তম্বুরা-ধারিণী মোগল মহিলার ত্রি-বর্ণ চিত্র এর গোড়াতেই দেওয়া হ'য়েছে—অর্থাৎ অনুষ্ঠানের কিছুমাত্র ত্রুটীই এতে করা হয় নি—এটি হ'চ্ছে সমগ্র বাংলা কাব্য সাহিত্যের সটীক সঙ্কলন—মানে শূন্য পুরাণ থেকে আরম্ভ ক'রে রবীন্দ্রনাথ ও মৃত রবীন্দ্র-সমসাময়িক কবিদের আমল পর্য্যন্ত অনেক কবিতা এতে গৃহীত হ'য়েছে। যুগ-পর্য্যায়ে এর কবিতাগুলিকে সাজানো হয় নি—তাই ময়নামতীর গান প্রভৃতির পরই ভারতচন্দ্র আছেন, তারপর বৈষ্ণব পদাবলী আছে, তারপর ময়মনসিংহ গীতিকা, মঙ্গল কাব্য, তারপর কৃত্তিবাস, তারপর পাঁচালী যুগের কবিতা গান—ধর্ম্ম-মঙ্গল, পদ্ম-পুরাণ, মনসা-মঙ্গল, শিবায়ন লৌকিক-শাখার এই সব বইকে সম্পাদকরা ধরেন নি—কাশী দাসকেও ধরেন নি—বৈষ্ণব পদাবলীর মধ্যে যথেচ্ছ ছাঁট কাট ক'রেছেন। আধুনিক কালে এসে তাঁদের এই mutilation policy একেবারে মারাত্মক হ'য়ে উঠেছে—রবীন্দ্রনাথের এবং সত্যেন্দ্র দত্তের বহু কবিতাকেই তাঁরা সামে পিছনে ছেঁটে ছোট ক'রে ফেলেছেন—

তা ছাড়া নির্ব্বাচন বিষয়ে যে পরিমাণ বে-পরোয়া রুচির অবসর নিয়েছেন, তাও প্রণিধানযোগ্য।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রাক্কাল থেকে বিংশ শতাব্দীর বর্ত্তমান মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত বাংলা কাব্যের যে পরিণতি, তা স্বভাবতঃই প্রত্যাশিত নয়—ভারতচন্দ্র থেকে ঈশ্বর গুপ্ত খুব স্বাভাবিক, ঈশ্বর গুপ্ত থেকে মাইকেল কতকটা অভাবনীয়—কিন্তু মাইকেল থেকে রবীন্দ্রনাথে আসা যেন অলৌকিক গোছের—প্রচলিত সাহিত্য-ধারার সজাগ অনুসরণে, এমন কি অপরিমিত গঠনশক্তি ব্যবহারেও বাংলা কাব্যের দেহ ও মনে এই পূর্ণতা সংসাধন অন্য যে কোন কবির শক্তির বাইরেই ছিল। কিন্তু রবীন্দ্র কাব্যের বৈশিষ্ট্য আমার আলোচনার অন্তর্গত নয়—আমি বলতে চাচ্ছিলাম বাংলা কাব্যের বর্ত্তমান যুগ তার নিজস্ব ঐতিহ্য গ'ড়েছে—রবীন্দ্রনাথই সে গঠনের পুরোধা। কিন্তু চারু বাবু ও ললিত বাবুর বই প'ড়ে মনে হয় পরের পর আমরা স্বাভাবিক রীতিতেই আস্‌ছি এবং একের সঙ্গে অন্যের তফাৎ বিশেষ কিছুই না। প্রকৃত পক্ষে ব'ল্‌তে গেলে এখনো পর্য্যন্ত রবীন্দ্রনাথই বাংলা ভাষার একমাত্র কবি, আর আদি থেকে যাবতীয় প্রাক্-রবি কাব্য রবীন্দ্র কাব্যের ভূমিকা স্বরূপ—কিন্তু এই অধ্যাপক সাহিত্যিকদ্বয় মুড়ি-মিছরি এক গোত্রীয় ক'রে যে ভাবে এই পসরা সাজিয়েছেন, তাতে নির্ব্বিবাদে বলা যেতে পারে যে বাংলা সাহিত্য যদি এই হয়, তবে তার দাম কিচ্ছু নেই।

যুগ-পর্য্যায়ে সঙ্কলন করার অর্থ হ'চ্ছে প্রত্যেক যুগের ভাব-ধারা, পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও দৃষ্টি-ভঙ্গীকে আবিষ্কার করার মতো সূক্ষ্ম মাত্রা-বোধ থাকা—অবশ্য সাহিত্যের যুগ-ভাগ প্রত্নতত্ত্বের অনুরূপ নয়—এক যুগের চিন্তাধারা পূর্ব্বতন কোন যুগে বীজাকারে থাকে; পরে হঠাৎ তার বিকাশ হয়—কত ধারার আবার যুগপৎ উদ্ভব ও বিলয় হ'য়ে থাকে—এগুলোকে রসিকের দৃষ্টি দিয়ে দেখতে হবে, ঐতিহাসিক মাপকাঠি এখানে অচল। তবু মোটা কথার হিসাবে সময়কে ত উপেক্ষা করা যায় না—কারণ সময়ের ধারা অমিত শক্তিধরকেও স্পর্শ না করে ছাড়ে না—ইংল্যাণ্ড এমেরিক'র যে কবিরা সমরের পূর্ব্ব থেকে পর

পর্য্যন্ত লেখনী চালনা ক'রেছেন, তাঁদের outlook-এর ভেতর রীতিমতো পরিবর্ত্তনের বন্যা বয়ে গেছে—রবীন্দ্রনাথও তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। কিন্তু এ দেশের পাঠক এ ভাবে সাহিত্যকে প'ড়তে অভ্যস্ত নয়—কারণ এ ভাবে সাহিত্যকে নির্ব্বাচন ও সঙ্কলন ক'রে তাঁদের সাম্নে ধরা হয় না। উপযুক্ত সঙ্কলনের অভাবই এর প্রধানতম কারণ।

শ্রীনন্দগোপাল সেন গুপ্ত।

রাসলীলা

২

কাম না প্রেম ?

বিগত মাঘ 'পরিচয়ে' আমরা রাসলীলার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। আমরা দেখিয়াছিলাম যে, রাস সেই ক্রীড়া, যাহাতে 'রস' পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত। রসরাজ শ্রীকৃষ্ণ 'রস-ব্রহ্ম' আস্বাদের জন্য রাসেশ্বরী শ্রীরাধার সহিত বৃন্দাবনে নাকি এই চিদানন্দময়ী রাসক্রীড়া করিয়াছিলেন। বৈষ্ণব ভক্তের ভাবদৃষ্টিতে এই রাসলীলা 'সর্ব্বলীলোৎসবের মুকুটমণি'।

মহাভারতের খিল পর্ব্ব হরিবংশে এবং ব্রহ্মপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ, ভাগবত প্রভৃতি পুরাণে এই রাসলীলার কথা আছে। তন্মধ্যে ভাগবতের বিবরণই সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। ভাগবতের ঐ অংশের নাম রাস-পঞ্চাধ্যায়। আমরা গত বারের 'পরিচয়ে', ঐ রাস-পঞ্চাধ্যায়ে বর্ণিত রাস-ক্রীড়ার যথাসম্ভব পরিচয় দিয়াছি। পাঠক নিশ্চয়ই তন্মধ্যে প্রচুর কামায়ন (eroticism) লক্ষ্য করিয়াছেন।

'নিশম্য গীতং তদনঙ্গবর্দ্ধনং' 'জারবুদ্ধ্যাপি সঙ্গতা' 'উৎতম্ভয়ন্ রতিপতিং রময়াঞ্চকার' 'সুরতনাথ! তেঽশুল্ক-দাসিকাঃ' 'মনসি নঃ স্মরং বীর! যচ্ছসি' 'কৃণু কুচেষু নঃ কৃন্ধি হৃচ্ছয়ং' ইত্যাদি ইত্যাদি।

এখন প্রশ্ন এই—রাসলীলা কি কাম-ক্রীড়া না প্রেমোৎসব ?

কাম ও প্রেমে যে আকাশ পাতাল প্রভেদ, এ বিষয়ে মতভেদ নাই। কাম = Lust ; প্রেম = Love. ঐ Love kills Lust.

অতএব কাম প্রেমে বহুত' অন্তর
কাম অন্ধতমঃ, প্রেম নির্ম্মল ভাস্কর—চরিতামৃত

কামে রিরংসা (রন্তুম্ ইচ্ছা), সে চায় দেহের মিলন,—প্রেম অতীন্দ্রিয় সম্বন্ধ—'Wedding of the Soul.'

'Now will I wed thy *Soul*' says the Voice to St. Catherine of Siena, 'which shall ever be conjoined and united to me.'

I will draw near to Thee in silence, and will uncover Thy feet that it may please Thee to unite me to Thyself, making *my Soul* Thy bride ; I will rejoice in nothing till I am in *thine* arms.—St. John of the Cross.

কামে সঙ্গম সুখ—প্রেমে 'সব দুখসুখমন্থন' 'আনন্দং নন্দনাতীতম্'—কবিরাজ-রাজ ভবভূতির ভাষায়,—অদ্বৈতং সুখদুঃখয়ো রণুগুণং সর্ব্বাস্ববস্থাসু যৎ। ইহাকেই পাশ্চাত্যেরা Platonic Love বলেন —যাহা আধিদৈহিক নয়, আধ্যাত্মিক। যে প্রেমে 'মনের মিলন চাহে দেহের মিলন', সে প্রেম কাম-ভাবিত,—কাম-বর্জ্জিত নয়।

শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে গোপীর কি ভাব ?

'শ্রীঅঙ্গ রূপে হরে গোপিকার মন'।

গোপী বলেন—

বীক্ষ্যালকাবৃতমুখং * * * ভবাম দাস্যঃ—ভাগবত, ১০।২৯।৩৬

রূপ লাগি আঁখি ঝুরে-গুণে মন ভোর
প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর।

গোপীদিগের এই কৃষ্ণ-লালসাকে গোড়ীয় বৈষ্ণবেরা কাম বলিতে নারাজ—তাঁহারা বলেন, উহা কাম নয়—প্রেম।

কামগন্ধহীন স্বাভাবিক গোপী-প্রেম
নির্ম্মল উজ্জ্বল শুদ্ধ যেন দগ্ধ হেম

* * *

শুদ্ধ প্রেম ব্রজদেবীর কামগন্ধহীন
কৃষ্ণসুখ তাৎপর্য্য এই তার চিহ্ন—
গোপীগণের প্রেমের 'রূঢ়' ভাব নাম
শুদ্ধ নির্ম্মল প্রেম, কভু নহে কাম।—চরিতামৃত

তাঁহাদের মতে যদিও গোপীপ্রেমের কামের সহিত কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য থাকে, তথাপি উহা কাম নয়—

সহজে গোপীর প্রেম নহে প্রাকৃত কাম
কামক্রীড়া সাম্যে তারে কহে কাম নাম।—চরিতামৃত
প্রেমৈব গোপরামাণাং কাম ইত্যগমৎ প্রথাম্—ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

এ মত কিন্তু ভাগবতের বিরোধী। ভাগবত স্পষ্ট ভাষায় বলেন—

ব্রজপুরবণিতানাং বর্দ্ধয়ন্ কামদেবং—১০।২৯.২৪

ভাগবতের মতে যেমন—'দ্বেষাৎ চৈদ্যঃ', তেমনি 'কামাৎ গোপ্যঃ' —অর্থাৎ, শিশুপাল যেমন শ্রীকৃষ্ণে দ্বেষ অর্পণ করিয়া তাঁহাকে পাইয়াছিল, গোপীরা তেমনি তাঁহাতে কামার্পণ করিয়া তাঁহাকে লাভ করিয়াছিল।

এ সম্পর্কে শুকদেবের উক্তি এই :—

উক্তং পুরস্তাদেতৎ তে চৈদ্যঃ সিদ্ধিং যথা গতঃ।
দ্বিষন্নপি হৃষীকেশং কিমুতাধোক্ষজপ্রিয়াঃ॥
কামং ক্রোধং ভয়ং স্নেহমৈক্যং সৌহৃদমেব চ।
নিত্যং হরৌ বিদধতো যান্তি তন্ময়তাং হি তে॥

—ভাগবত, ১০।২৯।১২,১৪

'শিশুপাল যেরূপে ভগবানে দ্বেষ অর্পণ করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছিল, তাহা তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সেই হৃষীকেশকে যাহারা কান্তভাবে ভজনা করিল, তাহারা যে তাঁহার সাযুজ্যলাভ করিবে ইহাতে বিচিত্র কি? কাম, ক্রোধ, ভয়, স্নেহ, ঐক্য বা সৌহার্দ্দ্য, শ্রীহরিকে যিনি ইহার কোন একটিও অর্পণ করেন, তাঁহার তন্ময়তাপ্রাপ্তি সুনিশ্চিত।'

ইহাতে দেখা গেল, শুকদেবের মতে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গোপীর ভাব কামগন্ধহীন প্রেম নয়—সত্যকার কাম। সেই জন্যই রাসের বর্ণনায় এত কামায়ন—সেইজন্যই রাসের ব্যাপারে দেখা যায় অষ্টাঙ্গ মৈথুনের সকল অঙ্গই প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান—

স্মরণং কীর্ত্তনং কেলিঃ প্রেক্ষণং গুহ্যভাষণম্।
সঙ্কল্পোঽধ্যবসায়শ্চ ক্রিয়ানিবৃত্তিরেব চ॥

আর একটি কথা লক্ষ্য করিতে হয়। শুকদেব গোপীর কৃষ্ণ-সঙ্গম লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন,—

তমেব পরমাত্মানং জারবুদ্ধ্যাপি সঙ্গতা—ভাগবত ১০।

শ্রীকৃষ্ণ পরমাত্মা বটেন কিন্তু গোপীদিগের তাঁহাতে 'জার'-বুদ্ধি (উপপতি ভাব)।

কৃষ্ণং বিদুঃ পরং কান্তং নতু ব্রহ্মতয়া মুনে !

অর্থাৎ গোপীরা কৃষ্ণকে 'স্ব রমণং বিদুঃ—ব্রহ্মতয়া ন বিদুঃ (বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী)

তবেই গোপীদিগের সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ "রমণ"—শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধে গোপীরা "রমণী"।

অর্থাৎ রাসে গোপীদিগের শ্রীকৃষ্ণের সহিত যে সঙ্গম, তাহা কামকৃত—কামীর সহিত 'পরকীয়া' কামিনীর দেহ-সম্বন্ধ। এ ভাবে রাসবিলাস উল্লসিত কাম-ক্রীড়া। সেই জন্য ভাগবতে দেখি, আকাশ হইতে এ ক্রীড়া দর্শন করিয়া দেববালাগণ "কামার্দ্দিতা" হইয়াছিলেন—হইবারই কথা !

কৃষ্ণ-বিক্রীড়িতং বীক্ষ্য ব্যমুহ্যন্ খেচরস্ত্রিয়ঃ।
কামার্দ্দিতাঃ, শশাঙ্কশ্চ সগণো বিস্মিতোহভবেৎ ॥—১০।৩৩।১৯

আরও দেখা যায়, গোপীভাবে ভাবিত হইলে শ্রীগৌরাঙ্গদেব সর্ব্বদা বলিতেন,—

'এইত' পরাণনাথে পাইনু, যার লাগি মদন-দহনে দহিনু।'

অতএব গোপিকার প্রেমকে কিরূপে 'কামগন্ধহীন' বলিব ?

ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা গোপিকা-দিগের প্রেমকে যে ভাবে বুঝিয়াছেন, তাহাতে ঐ প্রেমে আত্মবিস্মৃতি থাকিলেও ঐ প্রেম কামসঙ্কুল,—কামগন্ধশূন্য নয়। গোপীপ্রেমের পরিচয় দিতে কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন,—

কাম প্রেম দোহাকার বিভিন্ন লক্ষণ—
লৌহ আর হেম যৈছে স্বরূপ বিলক্ষণ।
আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি ইচ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম ॥
কামের তাৎপর্য্য নিজ সম্ভোগ কেবল
কৃষ্ণসুখ-তাৎপর্য্য মাত্র প্রেমেতে প্রবল ॥
সর্ব্বত্যাগ করিয়ে করে কৃষ্ণের ভজন
কৃষ্ণসুখ হেতু করে—প্রেমের সেবন।
অতএব গোপীগণের নাহি কাম গন্ধ
কৃষ্ণসুখ লাগি মাত্র কৃষ্ণের সম্বন্ধ।

—চরিতামৃত, আদি, ৪র্থ অধ্যায়

নিজেন্দ্রিয় সুখ হেতু কামের তাৎপর্য্য—
কৃষ্ণসুখের তাৎপর্য্য গোপীভাব-বর্য্য।
নিজেন্দ্রিয় সুখ বাঞ্ছা নাহি গোপিকার
কৃষ্ণে সুখ দিতে করে সঙ্গম বিহার।

—চরিতামৃত, মধ্য, ৮ম অধ্যায়

এইরূপে গোপিকার প্রেমে সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃতি দেখি বটে—সেই রাজকবি টেনিসনের কথা—

Love took up the harp of life and smote
the chords with might
Smote upon the chord of *self*, which trembling passed
in music out of sight.

ইহাও ঠিক যে, গোপীর যে কাম-সেবা, তাহা আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি-ইচ্ছায় নহে—কিন্তু কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি-ইচ্ছা-প্রণোদিত। গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা চন্দ্রাবলীর সহিত রাধিকার প্রভেদ প্রদর্শন করিয়া এই তত্ত্বই বিশদ করিয়াছেন। চন্দ্রাবলী একজন spiritual glutton, প্রকৃত vampire— সে আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি চায়—সে নিঃশেষে নিঙাড়িয়া কৃষ্ণকে ভোগ করিতে চায়—তাই সে কামুকী। গোপীমহলে তাই তাহার এত অপযশঃ। তাই উপভুক্ত শ্রীকৃষ্ণের 'কথায়িতম্ অলসনিমেষং' দেখিয়া জয়দেব রাগ করিয়া বলেন—'হরি! হরি! যাহি, মাধব যাহি!'

আর রাধিকা? তিনি প্রেমিকা—তাঁহার মাত্র কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি-ইচ্ছা। তিনি নিজে ভোগ করেন না—কৃষ্ণকে ভোগ করান—

কৃষ্ণকে করায় সোমরস মধুপান
নিরন্তর পূর্ণ করে কৃষ্ণের সর্ব্বকাম।

তাঁহার আদান নাই—কেবলই প্রদান—

কিছু নাহি চা'ব, চরণ সেবিব, দেহ নাথ এই বর।

রাধা বলেন,—আমি তোমার বিনি মূল্যে কেনা দাসী

—সুন্দরনাথ! তে অশুল্কদাসিকা—Do with me what you will। যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটঃ (শ্রীচৈতন্য)

খৃষ্টীয় Mysticism-এও আমরা এই ধরণের কথা শুনিতে পাই—

"Oh Love," said St. Catherine of Genoa, "I do not wish to follow thee for sake of these delights, but solely from the motive of true love."

The true mystic claims no promises and makës no demands* *

Only with the annihilation of self-hood, comes the fulfilment of love.

এসব খুব উচ্চাঙ্গের কথা এবং গোপীপ্রেম এই ভাবেই উদ্ভাসিত বটে। কিন্তু তাহা কি 'কামগন্ধহীন'?

এই কাম ও প্রেম লইয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা বেশ একটু বিব্রত হইয়াছেন দেখা যায়।

মৈথুনং সহ কৃষ্ণেন গোপিকাচরিতঞ্চ যৎ।
তন্ন কামাদ্ অকামাদ্ বা ভাবদেহেন তৎ কৃতম্॥

—রাসোল্লাসতন্ত্র

অর্থাৎ, গোপীদিগের শ্রীকৃষ্ণসঙ্গম মৈথুন বটে—যৌনসম্মিলন বটে, কিন্তু উহা অপ্রাকৃত রমণ, যেহেতু ভাবদেহ-কৃত।

ভাবদেহ কি? বৈষ্ণব ভাবে ভাবিত ঐ 'রসোল্লাস'-তন্ত্রের পঞ্চম উল্লাসে শিব দেবীকে বলিতেছেন—

যথা শরীরে দেহানি স্থূলং সূক্ষ্মঞ্চ কারণম্।
তথৈবান্যং দেহং জ্ঞেয়ং ভাবদেহং প্রকীর্ত্তিতম্॥
কৃপালব্ধমিদং দেহং সহজং জন্মজন্মনি।
অথবা সাধনালব্ধং কদাপি বা মহেশ্বরি!
ন সগুণং নির্গুণম্বা দেহমিদং পরাত্মিকে।
কুত্রাপি নহি দ্রষ্টব্যম্ লোকে বৃন্দাটবীং বিনা॥

প্রামাণিক বৈষ্ণবগ্রন্থে কিন্তু এ ভাব-দেহের কোন উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। ইহা কতকটা থিয়সফির 'মায়াবী রূপে'র অনুরূপ। চণ্ডীদাস একটি পদে লিখিয়াছেন,—

সিনান করিবি নীর না ছুঁইবি,
ভাবিনী ভাবের দেহা॥

—কিন্তু সে অন্য ভাবের কথা - যে ভাবে শ্রীরাধা 'মহাভাবময়ী'। রাসে বর্ণিত গোপিকাদিগের সহিত শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গম যদি যৌন সম্মিলন (Physical মৈথুন) না হয়, তবে ভাগবত—

'উত্তম্ভয়ন্ রতিপতিং রময়ঞ্চকার' বলিলেন—কেন? এবং শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে 'অবরুদ্ধ-সৌরত' (১০।৩৩।২৬)—এই বিশেষণের প্রয়োগ করিলেন কেন?

আত্মনি অবরুদ্ধঃ সৌরতঃ চরমধাতুঃ, নতু স্খলিতো যস্ত ইতি কামজয়োক্তিঃ
—শ্রীধর।

ইহা হইতে বুঝা যায়, রাসে অপ্রাকৃত যাহা থাকে থাকুক,—প্রাকৃত রমণও ছিল।

বৈষ্ণবেরা একথা অস্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে প্রপঞ্চ রূপে রমণ পঞ্চধা—

তেতো রূপপ্রপঞ্চস্য পঞ্চধা রমণং মতং।
আত্মনা প্রথমা লীলা, মনসা তু ততঃ পরা॥
বাক্ প্রাণৈস্তু তৃতীয়া স্যাদিন্দ্রিয়ৈস্তু ততঃ পরা।
শারীরী পঞ্চমী বাচ্যা ততো রূপং প্রতিষ্ঠিতম্॥

অর্থাৎ, প্রথম রমণ আত্মাতে, দ্বিতীয় মনে, তৃতীয় বাক্যে ও প্রাণে, চতুর্থ ইন্দ্রিয়ে—পঞ্চম রমণ শরীরে (Physical Bodyতে)।

ভাগবত পুরাণের প্রবীন সম্পাদক শ্রীখগেন্দ্রনাথ শাস্ত্রী মহাশয় বলেন যে, রাসপঞ্চাধ্যায়ের উত্তরোত্তর পাঁচ অধ্যায়ে এই পঞ্চবিধ রমণলীলা অভিব্যক্ত হইয়াছে। তিনি একথাও বলেন যে, শ্রীকৃষ্ণকে ভজনা করিয়া গোপিকাগণ আন্তর ও বাহ্য—উভয়বিধ রমণফলই লাভ করিয়াছিল—

অতোহি ভগবান্ কৃষ্ণঃ স্ত্রীষু রেমে হ্যহর্নিশম্।
বাহ্যাভ্যন্তরভেদেন, আন্তরং তু পরং ফলম্॥

বলা বাহুল্য, এই বাহ্যফল যৌনসম্মিলন—Physical Union.

আর এক কথা। পুরাণে রাসের যে বিবরণ রক্ষিত হইয়াছে, তাহা হইতে দেখা যায় কয়েকজন গোপী শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি শুনিয়া

রাসে যাইবার নির্ব্বন্ধ সত্ত্বেও গুরুজনের বাধায় যাইতে পারে নাই। এসম্বন্ধে বিষ্ণুপুরাণের শ্লোক এই

কাচিদাবসথস্যান্তঃ স্থিতা দৃষ্ট্বা বহির্গুরূন্‌।
তন্ময়ত্বেন গোবিন্দং দধ্যৌ মীলিতলোচনা ॥

ভাগবতে এ শ্লোকের প্রতিধ্বনি শুনিতে পাই,—

অন্তর্গৃহগতাঃ কাশ্চিদ্‌গোপ্যোঽলব্ধ-বিনির্গমাঃ।
কৃষ্ণং তদ্ভাবনাযুক্তা দধ্যুর্মীলিত-লোচনাঃ ॥—১০।২৯।৮

'কোন কোন গোপী গুরুজনের ভয়ে নিজালয়ের অন্তঃপুরে অবরুদ্ধ রহিল।' এই শ্লোকের টীকায় বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী বলেন,—

ন লব্ধো বিনির্গমো যাভিস্তা ইতি পতিভির্দ্বার্য্যেব সতর্জ্জনং সযষ্টিকম্‌ উপবিষ্টত্বাদিতি ভাবঃ।

আমি আশা করি, ইহা চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের অত্যুক্তি। কারণ, 'গোঁয়ার' হইলেও সেই সকল অবরুদ্ধা গোপীর বৃন্দাবনবাসী স্বামীরা যে দ্বারদেশে পত্নীদিগকে লগুড় উঠাইয়া তাড়না দ্বারা নিরুপদ্রব বৃন্দাবনে violence-এর অভিনয় করিয়াছিল, ইহা বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় না।

সে যাহা হউক, আমাদের সম্প্রতি লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, রাসে গোপীদিগের শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্গম যদি ভাবদেহকৃত হইত, তবে এই সকল অবরুদ্ধা গোপীরা রাসে যোগ দিতে পারিল না কেন? তাহারা অন্তঃপুরেই নিরুদ্ধা রহিল। সেখানে তাহাদের কি দশা হইল?

দুঃসহ প্রেষ্ঠ বিরহতীব্রতাপধুতাশুভাঃ।
ধ্যানপ্রাপ্তাচ্যুতাশ্লেষনির্বৃত্যা ক্ষীণমঙ্গলাঃ ॥
তমেব পরমাত্মানং জারবুদ্ধ্যাপি সঙ্গতাঃ।
জহুর্গুণময়ং দেহং সদ্যঃ প্রক্ষীণ-বন্ধনাঃ ॥—ভাগবত, ১০।২৯।৯-১০

'প্রিয়তমের তীব্র বিরহতাপে সেই ব্রজবধূদিগের সমস্ত পাপ দগ্ধ হইল এবং ধ্যানপ্রাপ্ত কান্তের আলিঙ্গনসুখে তাহাদের সমস্ত পুণ্যপুঞ্জ তুচ্ছ হইয়া গেল। সেই পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণকে জার-বুদ্ধিতে সঙ্গতা হইয়া তাহারা সমস্ত ভববন্ধন-নির্ম্মুক্ত হইয়া সদ্য সদ্য ত্রিগুণময় দেহ পরিত্যাগ করিল।'

বিষ্ণুপুরাণের বর্ণনা আরও মনোহর—

তচ্চিন্তা-বিপুলাহ্লাদ ক্ষীণ পুণ্যচয়া তথা।
তদপ্রাপ্তি-মহাদুঃখ বিলীনাশেষপাতকা॥
চিন্তয়ন্তী জগৎসূতিং পরব্রহ্মস্বরূপিণম্।
নিরুচ্ছ্বাসতয়া মুক্তিং গত্যান্যা গোপকন্যকা॥

—বিষ্ণুপুরাণ, ৫।১৩।২১-২২

'গৃহের মধ্যে অবরুদ্ধা গোপী তন্ময়চিত্তে গোবিন্দের ধ্যান করিতে লাগিল। তজ্জনিত বিপুলাহ্লাদে তাহার সমস্ত পুণ্যপুঞ্জ অবসিত হইল এবং তাঁহার সঙ্গমের অভাবজাত মহাদুঃখ দ্বারা তাহার সমস্ত পাপ ভস্মীভূত হইল। জগৎসবিতা পরব্রহ্মরূপ শ্রীকৃষ্ণকে ধ্যান করিয়া নিস্তরঙ্গ চিত্তে সেই গোপী সদ্যঃ সদ্যঃ মুক্তিলাভ করিল।' ঐ শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামী লিখিয়াছেন,—

তদেবং তৎক্ষণমেব ভোগেন ক্ষীণাঃ সমস্তপুণ্যপাপা ভগবদ্ধ্যানমহিম্না চ লব্ধাপরোক্ষাত্মজ্ঞানাৎ সদ্য এব মুক্তিং প্রাপ।

অতএব গোপিকার শ্রীকৃষ্ণ-রমণ ভাব-দেহকৃত—এ মত ভিত্তিহীন মনে করা অসঙ্গত নয়।

ভাগবতের প্রসিদ্ধ টীকাকার শ্রীধরস্বামী এই রাসলীলা যে ভাবে বুঝিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায় তিনি গোপীতে কামগন্ধহীনতা আরোপ করিতে প্রস্তুত নন। তিনি বলেন, এই রাসলীলায় শ্রীকৃষ্ণের কামবিজেতৃত্ব প্রকটিত হইয়াছে। তপোবিঘ্নকারী মদনকে উমাপতি দহন করিয়াছিলেন—রাসলীলায় রমাপতি মন্মথকে মথন কবিলেন। রাস পঞ্চাধ্যায়ের মুখবন্ধে শ্রীধরস্বামী মঙ্গলাচরণরূপে এই শ্লোকটি সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন—

ব্রহ্মাদি-জয়সংরূঢ় দর্পকন্দর্পদর্পহা।
জয়তি শ্রীপতি র্গোপীরাসমণ্ডলমণ্ডনঃ॥

'ব্রহ্মাদির উপর জয়লাভ করিয়া কামদেবের মহাদর্প হইয়াছিল। গোপীদিগের রাসমণ্ডলে কামবিজেতৃত্ব প্রদর্শন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ আজ সেই কন্দর্পেরও দর্প চূর্ণ করিলেন।' রাসপঞ্চাধ্যায়ের প্রথম শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামী এইরূপ লিখিয়াছেন—

নমু বিপরীতমিদং পরদারবিনোদেন কন্দর্পবিজেতৃত্ব প্রতীতেঃ? মৈবং—'যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ' 'আত্মারামো প্যরীরমৎ' 'সাক্ষাৎ মন্মথমন্মথঃ' * * ইত্যাদিষু স্বাতন্ত্র্যাভিধানাৎ। তস্মাৎ রাসক্রীড়া-বিড়ম্বনং কামবিজয়খ্যাপনায় ইত্যেব তত্ত্বম্।

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ যখন সাক্ষাৎ মন্মথমন্মথ—তখন সেই স্বতন্ত্র মদন-মোহনের রাসক্রীড়ায় কামবিজয়িত্বই খ্যাপিত হইয়াছে।

আমার এক বন্ধু প্রায় ৩১ বৎসর পূর্ব্বে 'শ্রীকৃষ্ণ' নাম দিয়া একখানি ইংরাজী পুস্তিকা প্রণয়ন করেন। তাঁহার অনুরোধে আমি ঐ পুস্তিকার একটি নাতিদীর্ঘ ভূমিকা লিখিয়া দিই। ঐ পুস্তিকায় গ্রন্থকার এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন—

Srikrishna is represented (in the Rasha) as immaculate, cold in the midst of temptation. Just imagine His position when surrounded by a number of lovely damsels, burning in love for Him and using various artifices to ensnare Him. And yet He remains perfectly unmoved, when any amount of love-making on His part would have had the full sanction of His own society.'

ঐ সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করিয়া আমি এইরূপ লিখিয়াছিলাম—

Is it enough that Srikrishna remained cold as stone, whereas the Gopis were burning with lust for his sake? This may be very wonderful self-possession in an ordinary mortal who has yet to subdue his flesh * * It is unlikely that the authors of the Puranas should deem it necessary to record of the Supreme that He did what is expected of every Yogi of any pretentions * * And even assuming that Srikrishna came out scatheless in this ordeal, what about the poor Gopis who had their moral constitution shattered by this combat, who thirsted but were not allowed to drink the nectar though at hand and experienced the misery of Tantalus?

যিনি অচ্যুত, যিনি 'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং'—যিনি 'অকাম নিষ্কাম আপ্তকাম আত্মকাম'—তিনি কামজয়ী—এই স্বতঃসিদ্ধ প্রতিপন্ন করাই রাসলীলার প্রয়োজন—একথা স্বীকার করিতে বেশ দ্বিধা হয়।

কিন্তু জবর উকিলির (যাহাকে special pleading বলে) অন্ত আছে কি? এক দল বলেন শ্রীকৃষ্ণের কামবিজেতৃত্ব নয়—গোপীদিগের নির্লিপ্তভাবে কামসেবা-প্রদর্শনই রাসের উদ্দেশ্য। চণ্ডীদাসের নামের সহিত জড়িত একটি পদে এই ধরণের কথা আছে:—

তোরা, পর পতি সনে, শয়নে স্বপনে,
সদাই রাখিবি লেহা।
সিনান করিবি নীর না ছুঁইবি,
ভাবিনী ভাবের দেহা ॥
কহে চণ্ডীদাসে, এমতি হইলে
তবেতো পিরীতি সাজে।
(তোরা) না হবি গো সতী না হবি অসতী,
থাকিবি রমণী মাঝে ॥

বাউলের গানেও আমরা শুনি—

সাপের মুখেতে ভেকেরে নাচাবি
সাপ না গিলিবে তায়
অমিয় সাগরে, সিনান কবিবি
কেশ না ভিজিবে তায়।

গীতায় ও উপনিষদেও ঐ ধরণের কথা আছে—

উদাসীনবৎ আসীনং পদ্মপত্রমিবাম্ভসা—গীতা

যথা পুষ্করপলাশে আপো না শ্লিষ্যন্তে তথা এবংবিদি পাপং কর্ম্ম ন শ্লিষ্যতে—ছান্দোগ্য

যিনি প্রকৃত ব্রাহ্মণ, যিনি ব্রহ্মজ্ঞ, বুদ্ধদেবও তাঁহার সম্বন্ধে ঐরূপ কথা বলিয়াছেন—

মাতরং পিতরং হন্ত্বা রাজানং দ্বে চ শোত্তিয়ে।
রট্ঠং সানুচরং হন্ত্বা অনীহো যাতি ব্রাহ্মণো ॥—ধম্মপদ

কিন্তু গোপীদিকের কামক্রীড়া কি বাস্তবিকই ঐরূপ ছিল? শুকদেবের বর্ণনায় ত' তাহা মনে হয় না। বরং ইহাই মনে হয়, গোপীরা শ্রীকৃষ্ণের রূপে আকৃষ্টা হইয়া জারবুদ্ধিতে কৃষ্ণ-ভগবানে কামার্পণ করিয়াছিলেন এবং তাহার ফলে পরানির্বৃতি লাভ করিয়াছিলেন।

ভগবানে কামার্পণ! তাঁহার সহিত রমণ! হাঁ, তাহা-ই। তাঁহাকে প্রিয়তম—'প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ প্রেয়ঃ অন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাৎ' জানিয়া, তাঁহাকে কান্তভাবে ভজন—চৈতন্যমহাপ্রভু গোপী-

ভাবের অনুকরণ করিয়া যে প্রণালী "আপনি আচরি ধর্ম্ম" অপরকে শিখাইয়াছিলেন, এ সেই প্রণালী। কিন্তু এস্থলে এবিষয়ের বিস্তার করিব না। কারণ, ১৩৪০ সালের কার্ত্তিক সংখ্যা 'পরিচয়ে' এ সম্পর্কে অনেক আলোচনা করিয়াছি। যাঁহার অনুসন্ধিৎসা আছে, তিনি ঐ সংখ্যায় প্রকাশিত আমার 'যৌনাতীত' প্রবন্ধ পাঠ করিতে পারেন। এভাবের ভজনে কামের বর্জ্জন করিতে হয় না, শোধন করিতে হয়— suppression করিতে হয় না, sublimation করিতে হয়। এ প্রণালীর ভজনের একটা গভীর আধ্যাত্মিক ভিত্তি আছে। এ সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ দার্শনিক উস্‌পেনেস্কির (Ouspensky) কয়েকটি সার কথা আমাদের প্রণিধানযোগ্য—

Of all we know in life, only in love is there a taste of the mystical, a taste of ecstasy. Nothing else in our life brings us so near to the limit of human possibilities, beyond which begins the unknown. And in this lies, without doubt, the chief cause of the terrible power of sex over human life.

তিনি আরও বলেন—

Love, 'sex', these are but a foretaste of mystical sensations... Consequently in true mysticism, there is no sacrifice of feeling. Mystical sensations are sensations of the same category as the sensations of love, only infinitely higher and more complex.

ইহাই ভগবানে কামার্পণের সার্থকতা। অতএব কামশব্দে গোড়ীয় বৈষ্ণবেরা যেরূপ ভয় পান, তাহা ভিত্তিহীন মনে হয়। ঋগ্‌বেদের ঋষি বলিয়াছেন—

কামস্তদগ্রে সমবর্ত্ততাধি

উপনিষদেও কয়েকবার ব্রহ্মসম্বন্ধে শোনা যায়—'স অকাময়ত'। সৃজনের মূলে যে কাম—স্বয়ং ব্রহ্মণ্যদেব যে কামকে আশ্রয় করিয়া প্রলয় হইতে সৃষ্টির উদয় করিয়াছেন, সেই কামকে ভয় করিবার হেতু আছে কি ?

শেষ কথা। রাসলীলার আস্বাদন করিবার অধিকারী কে? রাস-পঞ্চাধ্যায়ের শেষ শ্লোকে শুকদেব বলিয়াছেন,—

বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদংচ বিষ্ণোঃ
শ্রদ্ধান্বিতোঽনুশৃণুয়াদ্ অথ বর্ণয়েদ্ যঃ।
ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য, কামং
হৃদ্‌রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ॥

অর্থাৎ, যিনি ব্রজবধূদিগের সহিত শ্রীকৃষ্ণের এই রাসক্রীড়া শ্রদ্ধান্বিত হইয়া শ্রবণ বা বর্ণন করেন, তিনি অচিরে শ্রীভগবানে পরাভক্তি লাভ করিয়া জীবের যে হৃদ্‌রোগ কাম—তাহাকে নিঃশেষে নিঃসংশয়ে নিরসন করিতে পারেন।

ঠিক্ কথা—যাঁহাদের প্রাণমনঃ ভগবানে নিবেদিত, যাঁহারা কন্দর্প-বিজয়ী, রাসলীলার শ্রবণবর্ণনে তাঁহারাই চিরনির্বৃতি লাভ করেন। কিন্তু অপরের পক্ষে এ পথ বড় কঠিন পথ—ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া—ক্ষুরধারের ন্যায় শাণিত। অনধিকারীর রাসলীলার চর্চ্চায় কামবৃদ্ধি ঘটে। তাই শুকদেব সতর্ক করিয়াছেন—warning দিয়াছেন—

নৈতং সমাচরেৎ জাতু মনসাপি হ্যনীশ্বরঃ।
বিনশ্যত্যাচরন্ মৌঢ্যাদ্ যথাঽরুদ্রোঽব্ধিজং বিষম্॥

এ জহরকা পুরিয়া—নীলকণ্ঠ নহিলে কে এ গরল পান করিতে পারে? Physically ত' দূরের কথা, mentallyও—কার্য্যতঃ নয় ভাবতঃও ইহার অনুকরণ করিলে আশু বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। সেইজন্য কল্যাণ-ইচ্ছুর প্রতি মহাজনদিগের উপদেশ—

বর্ত্তিতব্যং শম্ ইচ্ছদ্ভিঃ ভক্তবৎ ন তু কৃষ্ণবৎ।

কারণ, একটুকু পদস্খলন হইলেই সহজিয়া, বাউল, নেড়ানেড়ি! সহজিয়ার কয়েকটি পদ শুনুন—ইহা 'বৌদ্ধগান ও দোঁহা' হইতে গৃহীত।

রম রম পরম মহাসুখ বজ্জু।
প্রজ্ঞোপায়ই সিজ্জউ কজ্জু॥ বৌদ্ধগান ও দোঁহা, ১৬১ পৃষ্ঠা

'রমণই পরম মহাসুখ—ইহাই প্রজ্ঞার উপায়, ইহা হইতেই সর্ব্ব কার্য্য সিদ্ধি।'

জোইনি তঁই বিনু খনহিঁ ন জীবমি।
তো মুহ চুম্বী কমলরস পীবমি॥

'হে যোগিনী! তোমা বিনা এক ক্ষণও রহিতে নারি। তোমার মুখ চুম্বিয়া কমলরস পান করি।'

সহজিয়ারা বলেন—সহজ পথই একমাত্র পথ—যদি ভববন্ধ খণ্ডন করিতে চাও তবে 'সইপর রজ্জহ'।

> আরে বট! (মূঢ়) সহজ সইপর রজ্জহ।
> মা ভববন্ধ গন্ধ পড়ি বজ্জহ॥

ইহার প্রতিবাদে মহাপ্রভু বলিতেন—হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।

> বহিরঙ্গ সঙ্গে কর নাম সংকীর্ত্তন।
> অন্তরঙ্গ সঙ্গে কর রস আস্বাদন॥

ইহাই নিরাপদ পথ (safe method)। কিন্তু যাঁহারা সাহসিক পুরুষ—যাঁহারা adventurous souls, যাঁহারা প্রকৃত 'রসিক', যাঁহাদের 'শ্রীহরিস্মরণে সরসং মনঃ'—যেমন জয়দেব, বিল্বমঙ্গল, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, রায় রামানন্দ—মনে হয়, ইঁহারা সাধনজীবনে ঐ রাসবিহারীর রাসলীলার অনুকরণ করিতেন—হয়ত' তাহাতে তাঁহাদের ক্ষতি হইত না—লাভই হইত। কারণ, তাঁহারা ছিলেন উত্তম অধিকারী। জয়দেব আপনাকে 'পদ্মাবতী-রমণ' বলিয়াছেন (জয়তি পদ্মাবতীরমণো জয়দেবঃ) এবং নিজেকে 'পদ্মাবতীচরণচারণচক্রবর্ত্তী' বিশেষণে বিশেষিত করিয়াছেন। বিল্বমঙ্গলের চিন্তামণি-ঘটিত ব্যাপার সুপরিচিত—বারাঙ্গনা চিন্তামণি ঐ লীলাশুকের সাধনপথে উত্তর সাধিকা। তাঁহার 'কর্ণামৃতের' মঙ্গলাচরণ শ্লোকের মুখেই চিন্তামণির নাম—

> চিন্তামণির্জয়তি সোমগিরি গুর্রুমে
> প্রেম-পথ প্রদর্শিলে তুমি চিন্তামণি!
> বর্ত্মগুরু! তোমারে প্রণমি;
> প্রেমমন্ত্রে সোমগিরি! করিলে উদ্ধার,
> দীক্ষাগুরু! করি নমস্কার।
>
> —শ্রীভুজঙ্গধর রায়চৌধুরী-কৃত অনুবাদ

চণ্ডীদাসের জীবন নাটকের নায়িকা রজকিনী রামী—'তুমি কামহীনা রতি'—

রজকিনী রূপ　　কিশোরী স্বরূপ
কামগন্ধ নাহি তায়

বিদ্যাপতির কবিতার উৎস লছিমা দেবী—তাঁহার সঙ্গীত ঐ লছিমার লাবণ্যঝঙ্কারে মুখরিত, তাঁহার পদাবলীর 'ধ্রু' 'লছিমা দেবী পরমাণ'। আর রায় রামানন্দ ? চৈতন্য চরিতামৃতের বিবরণ শুনুন—

এক দেবদাসী আর সুন্দরী তরুণী
তার সব অঙ্গ সেবা করেন আপনি।
স্নানাদি করায় পরায় বাস-বিভূষণ
গুহ্য অঙ্গের হয় তার দর্শন স্পর্শন।
তবু নির্ব্বিকার রায় রামানন্দ মন
নানা ভাবোদ্গাম তায় করায় শিক্ষণ
নির্ব্বিকার দেহ মন কাষ্ঠপাষাণ-সম
আশ্চর্য্য! তরুণী-স্পর্শে নির্ব্বিকার মন॥

এই নয় জনকে লক্ষ্য করিয়া বৈষ্ণবেরা 'নবরসিকে'র কথা বলেন—জয়দেব-পদ্মাবতী, বিল্বমঙ্গল-চিন্তামণি, চণ্ডীদাস-রামী, বিদ্যাপতি-লছিমা এবং রায় রামানন্দ। বৈষ্ণবজগতে এ পর্য্যন্ত মাত্র ঐ নয়জন প্রকৃত রসিকের আবির্ভাব হইয়াছে—চার জন পুরুষ ও চার জন প্রকৃতি—এই আট জন, আর নবম রায় রামানন্দ, যিনি একাধারে প্রকৃতি ও পুরুষ। খৃষ্টানেরা যে বলেন, এই ২০০০ বৎসরে একজন মাত্র খৃষ্টানের উদ্ভব হইয়াছে—তিনি স্বয়ং যীশু খৃষ্ট—There has so far been only one Christian and he died with Jesus Christ—এও সেই ধরণের কথা। এই সকল উচ্চ অধিকারী 'রসিক' মহাজন—স্বয়ং চৈতন্য দেব যাঁহাদের 'পদ' রাত্রিদিনে আস্বাদন করিতেন—

চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি　　রায়ের নাটকগীতি
কর্ণামৃত শ্রীগীতগোবিন্দ।
স্বরূপ রামানন্দ সনে　　মহাপ্রভু রাত্রিদিনে
গায়, শুনে পরম আনন্দ॥

—তাঁহাদের সমালোচনা আমার পক্ষে অশোভন। প্রথমতঃ তাঁহারা 'মহাজন'—আমরা তাঁহাদের খাতক, চির-ঋণে আবদ্ধ—

তাঁহাদের পদাবলীর ধার অশোধ্য। তাঁহারা (খৃষ্টান Mysticismএর ভাষায়)—are the Troubadours of God, Poets of the Infinite, Minne-singers of the Holy Ghost.

দ্বিতীয়তঃ তাঁহারা প্রকৃত রসিক—শ্রীকৃষ্ণের প্রেমরসে ভরপুর —full of the love of God. তাঁহারা সমালোচনার ঊর্দ্ধে। কিন্তু একথা সুনিশ্চিত যে ঐরূপ রসিক সুদুর্ল্লভ, অতিশয় বিরল—কোটিতে একজন।

ভাবিয়া গণিয়া বুঝিয়া দেখিলে
কোটিতে গোটিক হয়—চণ্ডীদাস

অনেক বৈষ্ণবই বৃন্দাবনে অনুষ্ঠিত রাসলীলাকে নায়ক-নায়িকার সত্যকার দেহের মিলন মনে করেন—গোলোকে রাসেশ্বর ও রাসেশ্বরীর যে নিত্য রাস, তাহারই ভৌম প্রতিকৃতি জ্ঞান করেন—সেইজন্য কাম শব্দে এত আপত্তি।—যিনি মদনমোহন, যিনি অপ্রাকৃত কামদেব, তাঁহাতে প্রাকৃত কামের সম্ভাবনা কোথায়? কিন্তু, রাস যদি ঐতিহাসিক ঘটনা না হয়—ইহা যদি একটা অলৌকিক অপূর্ব্ব আধ্যাত্মিক রূপক (Spiritual Allegory) হয়, মিষ্টিকের অনুভূতি-সাপেক্ষ হয়, ভক্ত-ভাবুকের হৃদয়রাসমন্দিরে শ্রীকৃষ্ণ বংশীহস্তে ত্রিভঙ্গভঙ্গীতে শ্রীরাধাকে বামে লইয়া যে দণ্ডায়মান হ'ন, তাহাই যদি প্রকৃত রাস হয়—তবে আর কামপ্রেমের সূক্ষ্ম ভেদ লইয়া বিবাদ করিতে হয় না। অতএব আগামী বারে আমাদের আলোচ্য হইবে—রাস কতটা রূপক, কতটা ইতিহাস।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত

সৌন্দর্য্যের মূল্য কি স্বাশ্রয়ী ?

মহাযুদ্ধে যে-প্রলয়ঘূর্ণাবর্ত্তের সৃষ্টি হয়েছিল তাতে কেবল শত সহস্র মানুষের ধনপ্রাণই তলিয়ে গেল না, তার ক্রমপ্রসারী আলোড়ন একদিন এসে পৌঁছুল মনের তটভূমিতে, তোলপাড় ঘটাল বহু শতাব্দীর সংস্থাপিত বিশ্বাস ও সংস্কারের স্তরে স্তরে। মর্য়্যালিটির শাশ্বত নীতি-গুলি ফাঁকা ঠেকতে লাগল, গির্জ্জের পাদ্রিরা পাত্তাড়ি গুটোতে ব্যস্ত হলেন, রাষ্ট্রক্ষেত্রে সমাজব্যবস্থায় সাহিত্যে আদর্শবাদের দিন এল ফুরিয়ে। এমন কিছুই টিঁকল না যাকে মানুষ আপন চিন্তায় ও কাজে চরম ব'লে গ্রহণ করতে পারত, যার অটল ভূমির উপর তার বহুবিচিত্রিত সাধনার প্রতিষ্ঠা সম্ভব হতে পারত। এই মূল্যবোধের বিনাশই গত মহাযুদ্ধের ইতিহাসে সব চেয়ে অবিস্মরণীয় অধ্যায়। প্রগতির বিবিধ উপকরণ দিনে দিনে বেড়ে চলেছে, কিন্তু তার লক্ষ্যের কথা ভাবাটাকে ভিক্‌টোরীয় ভাবুকতা নাম দিয়ে ঠাট্টা করা হয়েছে যুদ্ধপরবর্ত্তী মেজাজ। চরম মূল্য সম্বন্ধে অনাস্থা ও অবজ্ঞা আজ এত সার্ব্বজনীন যে সে বিগত সমস্যার পুনরুত্থাপনে পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতি অপ্রত্যাশিত নয়।

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অপার রহস্য পাটীগণিতের গোটাকয়েক সংখ্যার মধ্যে নিহিত, মুনিপ্রবর পাইথাগোরসের এই বচনটাকে যাঁরা আষাঢ়ে ব'লে উড়িয়ে দিতে চান, তাঁরাও মানবজীবনের উপর "তিন" সংখ্যাটির প্রভাবের কথা চিন্তা করলে বিস্মিত হবেন। খৃষ্টানধর্ম্মের ত্রিত্ব আর হিন্দুদের ত্রিমূর্ত্তি, ত্রিগুণ প্রভৃতির কথা বাদ দিলেও, জার্ম্মানির একজন শ্রেষ্ঠ দার্শনিকের সমগ্র দর্শনকে তিনের নামতা বললে খুব অন্যায় হয় না ; এবং নবজগতের চতুর্থ মহাশিল্পেও ঐ সংখ্যাটির অখণ্ড প্রতাপ বর্ত্তমান, কারণ এমন ফিল্‌ম কমই পাওয়া যায় যার মূল বিষয় নরনারীর eternal triangle নয়। কাজেই উল্লিখিত চরম মূল্যও যে ওর ঐন্দ্র-জালিক গণ্ডির মধ্যে পড়বে, এবং সত্য, শ্রেয় ও সুন্দর, এই ত্রিমূর্ত্তি রচনা

ক'রে বিশ্ববিধান রক্ষা করবে, তা আর আশ্চর্য্য কী। তবু পাটীগণিত আর গ্রীক দর্শনের নিতান্ত অভক্ত যারা, তারা প্রশ্ন তুলতে পারে যে সে-মূল্যত্রয়ের চরমত্বের পক্ষে একটি বিশেষ সংখ্যার উপর আমাদের পক্ষপাত ছাড়া কোনো প্রকৃষ্টতর যুক্তিও আছে কি না। এ-প্রবন্ধে প্রশ্নটা বিশেষ ক'রে সৌন্দর্য্য সম্বন্ধেই তোলা হবে; সত্য ও শ্রেয় যে চরম, তাদের মূল্য যে স্বাশ্রয়ী (intrinsic), একথা আমরা আপাতত মেনে নিচ্ছি।

অবশ্য এমন মতবাদেরও অভাব নেই যাতে পূর্ব্বোক্ত মূল্যের কোনোটাকেই চরম ব'লে গ্রাহ্য করা হয় নি। উনিশ শতকে ডারুয়িন স্পেন্‌সর প্রভৃতির কল্যাণে জীববিজ্ঞানের প্রতিপত্তি ও পরাক্রম এমনি দুর্নিবার হয়ে উঠেছিল যে মূল্যজ্ঞানও তার কবল এড়াতে পারে নি। জীবনের মূল্যই হয়ে দাঁড়াল পরম ও স্বাশ্রয়ী, আর সব কিছুর মূল্য স্বীকৃত হল কেবল জীবনধারণের উপায় বা সহায়রূপে। জীবের ধর্ম্মই হ'ল জীবনকে পরম জ্ঞান করা, এবং মানুষের বেলাতেও এর কোনো ব্যত্যয় ঘটত না, যদি তার অস্তিত্বের পরিধি জীববিজ্ঞানের ক্ষেত্রকে ছাড়িয়ে না যেত। জড়প্রকৃতির সঙ্গে জীবপ্রকৃতির সংঘাত ও সমন্বয় যে-নিয়মের প্রবর্ত্তনায় পরিচালিত তার অমোঘ জালে মানুষও বন্দী। তবু এই বন্ধনের মাঝখানে সে আপন মুক্তির পথ ক'রে নিয়েছে জৈব-প্রয়োজনের তাগিদকে উপেক্ষা ক'রে, জীবনের মূল্যকে তুচ্ছ ক'রে। চারিদিকে নিঃসীম নিরাত্ম প্রকৃতির অন্ধ শাসন, অসংখ্য ও অটল তার নিয়মকানুন তার রীতিনীতি,—সেই বিরাট শক্তির চরণে প্রণত আমরা নগণ্য মনুষ্যকীটরা কোনো গতিকে বেঁচে বর্ত্তে থাকব, অথবা বাঁচবার নিদারুণ সংগ্রামে ম'রে মিটে নিঃশেষ হয়ে যাব,—এই তো আমাদের জৈবধর্ম্মকৃত বিধান। সে বিধান আমরা প্রত্যাখ্যান করেছি, প্রকৃতির অপরিসীম রাজত্বে আমরাই রাজদ্রোহী। আমাদের কাছে বাস্তবের চেয়ে আদর্শের প্রেরণা প্রবল, অবস্থাবিশেষে জীবনের চেয়ে মৃত্যু বরণীয়।

কোনো জিনিষের মূল্য স্বাশ্রয়ী কি পরাশ্রয়ী, এটা অবশ্য ন্যায়-শাস্ত্রের আইনগত যুক্তিতর্কের দোহাই পেড়ে প্রমাণ করবার উপায়

নেই। ব্যক্তিভেদে রুচিভেদে সিদ্ধান্ত ভিন্ন হতে পারে বইকি। যদি সংস্কারমুক্ত পক্ষপাতশূন্য চিত্তে কোনো বিষয়ে সম্যক বিবেচনা ক'রে আমার মনে হয় যে তার মূল্য চরম, কিম্বা চরম নয়, তা'হলে সে বিষয়ে সেইটা আমার পক্ষে শেষ কথা। এ-সূত্রে মূল্য বিষয়গত কি বিষয়ীগত, সে-চিরন্তন দার্শনিক উৎপাত টেনে এনে প্রবন্ধকে অযথা পারিভাষিক ও পীড়াদায়ক করা আমার অভিপ্রায় নয়। এইটুকু মেনে নেওয়াই যথেষ্ট যে মূল্যের বিচার ব্যক্তিগত, সর্ব্বসম্মতিগত নয়। এমন একটি সুস্পষ্ট স্বীকৃতি চোখের সামনে থাকতে, সৌন্দর্য্যের মূল্য চরম কি না বিচার করতে যাওয়া হয় বদ্ধ পাগল নয় বিশুদ্ধ দার্শনিকের কর্ম্ম—এ-সন্দেহ খুবই স্বাভাবিক। তবে সে-উভয়সঙ্কট বাঁচিয়েও কয়েকজন বিশিষ্ট সৌন্দর্য্যতাত্ত্বিকের মতামত আলোচনা ক'রে দেখানো যেতে পারে যে সৌন্দর্য্যের যে-ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণ তাঁরা করেছেন তাতে তার মূল্যের স্বাতন্ত্র্য বজায় থাকে না। প্লেটো টল্‌ষ্টয় অথবা কান্ট্‌ হেগেল প্রভৃতি অবশ্য প্রকাশ্যতই সৌন্দর্য্যকে পরাশ্রয়ী ব'লে স্বীকার ক'রেছেন, এবং সত্যান্বেষণের কিম্বা শ্রেয়সাধনের অঙ্গরূপেই তার মূল্য নির্দ্ধারণ করেছেন। এঁদের কথা না হয় বাদ দেওয়া যাক, কিন্তু এ সি ব্র্যাড্‌লি বা মোর'র মতো ঐকান্তিক সৌন্দর্য্য-স্বাতন্ত্র্যবাদীরাও যে তাঁদের লেখায় সে-স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করতে পেরেছেন, এমন কথা বলা চলে না।

ব্র্যাড্‌লি তাঁর সুবিখ্যাত প্রবন্ধে কাব্যকে অনন্যাধীন প্রমাণ করতে গিয়ে বলেছেন যে তার মূল্য তো অন্য কিছুর উপর নির্ভরশীল নয়ই, বরঞ্চ কোনো কাব্যেতর মূল্যের আমেজ ঘটলে তার স্বকীয় মূল্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়, পাঠকের একাগ্র কাব্যরসবোধের তন্ময়তা ভেঙ্গে যায়। অথচ, এই প্রবন্ধেরই শেষ পৃষ্ঠায়, আত্মবিরোধের দিকে ভ্রূক্ষেপ না ক'রে, তিনি লিখেছেন যে কাব্যের তাৎপর্য্য তার প্রকাশ্য রূপে নয়, সে-রূপের অতীত কোনো এক বৃহত্তর সত্তার ব্যঞ্জনায়। শ্রেষ্ঠ কাব্যমাত্রই একটি রহস্য-নিবিড় ইঙ্গিতের স্পর্শে অনুপ্রাণিত। তার বিষয় হয়তো অতি সামান্য—"আকন্দ ফুল", কি "বলাকা" পাখী, কি পাঠশালা-পলাতক "ছেলেটা", কিন্তু সেই তুচ্ছ সামান্যতায় কবি

দেখতে পায় অমরাবতীর ছায়া। এ ধরণের কথা আমরা হেগেল এবং তাঁর শিষ্যবর্গের মুখে শুনতেই অভ্যস্ত। তাঁরাই তো ইন্দ্রিয়গম্য ও ইন্দ্রিয়াতীতের মধ্যে সেতুবন্ধনের ভার দিয়েছেন শিল্পীর উপর। তবে হেগেল গোড়া থেকেই এবং খোলাখুলি ভাবেই সৌন্দর্য্যবোধকে ব্রহ্ম-জ্ঞানের মার্গ ব'লে গণ্য করেছেন। অবশ্য প্রথম মার্গ মাত্র। ধর্ম্ম-সাধনা ও দর্শন হল যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় মার্গ। সৌন্দর্য্যানুভূতিতে যে-পরম সত্তার সুদূর ইঙ্গিতটি কেবল পাওয়া যায়, দর্শনে তার পরিপূর্ণ ও অনাবৃত প্রকাশ। দর্শনকে নিয়ে এতখানি বাড়াবাড়ি হয়তো ব্র্যাড্‌লির কাছে আত্মস্তুতি ব'লে ঠেকবে, কিন্তু গোড়ার কথা যখন দু'জনের এক তখন ব্র্যাড্‌লি সৌন্দর্য্যকে সত্যাশ্রয়ী বলতে কুণ্ঠা বোধ ক'রে অকারণে দলভ্রষ্ট হয়েছেন। বিশেষত যখন প্রসঙ্গক্রমে তিনি এক জায়গায় কবুল ক'রেই নিয়েছেন যে কাব্যের এই যে স্বাতিক্রমণশীল নির্দ্দেশ, পরমার্থ-লোকের সূচনা—এর উপরই তার মূল্যের অনেকখানি নির্ভর করে।

সৌন্দর্য্য-সম্ভোগের যে-অক্রিয় উপলব্ধিগত স্বরূপ সচরাচর বিবেচনায় আসে, তার চেয়ে তার সক্রিয় প্রবর্ত্তনাগত দিকটাকে রিচার্ড্‌স্ মূল্য-বিচারের পক্ষে অধিকতর প্রাসঙ্গিক জ্ঞান করেন। বহির্জ্জগতের কোনো বস্তুর অভিঘাতে যখন আমাদের মনে তার বোধ জন্মায়,তখন সেই সঙ্গে কতকগুলো উন্মুখীন ও বিমুখীন প্রবর্ত্তনারও (appetitive and aversive impulses) উদ্রেক হয়। সে-প্রবর্ত্তনাগুলির মধ্যে সাধারণত কোনো ঐক্য থাকে না, প্রত্যেকটি উচ্ছৃঙ্খল ও স্বেচ্ছাচারী ভাবে নিজের তৃপ্তি খোঁজে। অভিজ্ঞতার এই অরাজকতা স্বভাবতই পীড়াদায়ক। সৌন্দর্য্যানুভূতির বৈশিষ্ট্য রিচার্ড্‌স্-এর কাছে এই যে তার আনুষঙ্গিক প্রবর্ত্তনাসমূহ অন্তর্বিরোধে বিক্ষুব্ধ নয়, তারা যে-সমাহিত আত্ম-প্রতিষ্ঠার সৃষ্টি করে তা' একটি নিবিড় অক্ষণভঙ্গুর শান্তির বাহন। কিন্তু সৌন্দর্য্যের মূল্য এই দিক দিয়ে বিচার করতে গেলে আর্ট ও ধর্ম্মনীতির সম্বন্ধ আর পরোক্ষ থাকে না। নির্বিরোধ আত্মসমাহিতি যে চরিত্রোৎকর্ষেরই পরিপূর্ণতা, এমন কথা ধর্ম্মনীতিশাস্ত্রে বিরল নয়; প্লেটো তো স্পষ্টই বলেছেন যে শ্রেষ্ঠ চরিত্রবান পুরুষ সেই যার মনের অভিমুখীনতা বহুধা-

বিভক্ত নয়, যার বুদ্ধির সঙ্গে হৃদয়বৃত্তি ও কর্ম্মপ্রবৃত্তির নিবিড় সংযোগ ও সহকারিতা। পরিপূর্ণ সমন্বয় মর‍্যালিটির আদর্শ; আর্টের উদ্দেশ্য যদি হয় শুধু প্রবর্ত্তনাগত সংহতি, তা' হলে সুন্দরকে শ্রেয়ের আংশিক বিকাশ মনে করাতে আপত্তি হতে পারে না।

রিচার্ড্‌স্‌-এর প্রায় বিপরীত মত প্রকাশ করেছেন ফরাসী সৌন্দর্য্যতাত্ত্বিক শার্ল্‌ মোরঁ। তাঁর বিশ্বাস যে সৌন্দর্য্য-উপলব্ধির বৈশিষ্ট্য প্রবর্ত্তনার সমন্বয় নয়, প্রবর্ত্তনার বিরতি। আমাদের আটপৌরে জীবনে প্রাণধর্ম্মের অনুশাসনই সব চেয়ে প্রবল, সেই জন্য প্রত্যেক অভিজ্ঞতাকে আমরা দেখি উদ্বর্ত্তনের দৃষ্টিকোণ থেকে। অভিজ্ঞাত বিষয়ের ব্যবহারিক দিকটাই সর্ব্বপ্রধান হয়ে ওঠে, আমরা জানতে চাই তার সঙ্গে আমাদের লাভ-ক্ষতির সম্বন্ধ কেমনতরো, চেষ্টা করি তার সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে এবং তাকে জৈবপ্রয়োজন-সিদ্ধির কাজে লাগিয়ে নিতে। প্রাণধর্ম্মের এই আধিপত্য থেকে অব্যাহতি দেয় শিল্পী। তার রচনার কোনো ব্যবহারিক মূল্য নেই, প্রয়োজন-সিদ্ধির দিক থেকে তার কোনোই সার্থকতা নেই। তাকে আমরা দেখি বিশুদ্ধ প্রয়োজনমুক্ত দৃষ্টি দিয়ে। আর্টের ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতার বিষয় কী তাতে কিছু এসে যায় না, অভিজ্ঞতার ভঙ্গিটাই সেখানে সর্ব্বেসর্ব্বা। যদি টল্‌ষ্টয়ের কথা মেনে নেওয়া যায় যে আর্ট বিশেষরূপে হৃদয়াবেগেরই বাহন, তা হলেও মোরঁ বলতে পারেন যে প্রকৃত রসানুভূতি তখনই ঘটে যখন সে-হৃদয়াবেগ আমাদের সম্ভোগের বিষয় না হয়ে, নৈর্ব্যক্তিক নির্ব্বিকার ধ্যান-দৃষ্টির বিষয় হয়। সে-শিল্পসৃষ্টি ব্যর্থ যাতে দ্রষ্টার মন আবেগ ও সংরাগে অভিভূত হয়ে যায়, তার অন্তর্দর্শনের অপার্থিব স্ফটিক-স্বচ্ছতা স্নায়বিক চাঞ্চল্যের দ্বারা বিক্ষুব্ধ হয়। মোরঁর এই মতবাদের উপর আরিষ্টটল-এর সুবিদিত ক্যাথার্সিস্‌-তত্ত্বের ছায়াপাত নিঃসন্দেহ। অবশ্য তিনি ট্র্যাজেডির যে-সংজ্ঞা দিয়েছেন তার যদি সোজাসুজি এই অর্থ করা হয় যে প্রেক্ষাগৃহে ভয় ও করুণার উদ্রেক ক'রে ঐ আবেগদ্বয়ের ভারলাঘব ট্র্যাজেডির উদ্দেশ্য, তা হলে পুরাতত্ত্বের পরিধির বাইরে এর অস্তিত্বের চিহ্ন খুঁজতে যাওয়া বৃথা। আবেগ

জিনিষটা এমন নয় যে হাত খু'লে খরচ ক'রে দিলেই উদ্বৃত্তের পরিমাণ তলায় এসে ঠেকবে, বরঞ্চ আবেগের পুনঃ পুনঃ উদ্রেকে আবেগ-প্রবণতা বাড়বারই কথা। তবু যে সে-ঐতিহাসিক সংজ্ঞার প্রভাব আজও দুর্নিরীক্ষ্য নয় তার কারণ হেগেলের মনোজ্ঞ ব্যাখ্যা। হেগেল মনে করেন যে ট্র্যাজেডি আবেগের অভিভূতি থেকে আমাদের মুক্তি দেয় বটে, কিন্তু প্রেক্ষাগৃহে তার নিষ্কাশন ক'রে নয়, একটি অপরিচিত দৃষ্টিকোণ থেকে তার পরিচয় সাধন ক'রে। বাস্তব জীবনে আবেগ আসে তার আটপৌরে রূঢ় মূর্ত্তিতে, ফলাফলের অসংখ্য জঞ্জালে আচ্ছন্ন হয়ে। ট্র্যাজেডির অবস্থিতি কল্পনার অন্তরীক্ষে ব'লে তার আনুষঙ্গিক আবেগও বস্তুজগতের রূঢ় স্পর্শের অতীত, আমরা তাতে অভিভূত হই না, অনাবিষ্ট ধ্যানসৌম্য চিত্তে তার নির্ব্বিকার রূপ অবলোকন করি। আরো ব্যাপক ভাবে সমগ্র আর্টের ক্ষেত্রে এই কথারই দ্বিরুক্তি করেছেন মোর্। কিন্তু এই যদি আর্টের সার্থকতা হয়, তা হলে রিচার্ড্স্-এর মতো মোর্‌কেও মর‍্যালিটির প্রাধান্য মানতে হবে। হৃদয়াবেগের সঙ্গে এই মোহমুক্ত অন্তর্দর্শনজাত পরিচয় যে চরিত্রোৎকর্ষ-সাধনের একটি অপরিহার্য্য স্তর, এ-কথা নীতিকাররা সর্ব্বত্রই স্বীকার করেছেন। প্রাচ্যের ধর্ম্মনীতির চরম বাণী হচ্ছে আত্মানং বিদ্ধি ; পাশ্চাত্য নীতিবিশারদের আদি গুরু সক্রেটিস্ তাঁর সমস্ত তর্কবিতর্ককে সংহত করেছেন know thyself—এই ক্ষুদ্র বাক্যটিতে। মোর্ রসানুভূতিকে আত্মজ্ঞানে পরিণত করেছেন, অথচ সুন্দরকে শ্রেয়ের অঙ্গীভূত করতে অনিচ্ছুক। এ-অনিচ্ছার মূলে কোনো যুক্তি নেই।

সৌন্দর্য্যের শুচিতা বাঁচাতে গিয়ে কেউ কেউ তার মূল্যকে এমনই অকিঞ্চিৎকর ক'রে দিয়েছেন যে জীবনের পরম সাধনার ক্ষেত্র থেকে তার বিচ্যুতি অনিবার্য্য। এঁদের কাছে শিল্প-সৃষ্টির চরম সার্থকতা হচ্ছে শিল্প-উপাদানের উপর পরিপূর্ণ প্রভুত্ব ফুটিয়ে তোলাতে। বিভিন্ন চারু-শিল্পে যে-বিশেষ উপাদানের আবশ্যক, যার মধ্যস্থতায় তার রূপায়ণ সম্ভব হয়,—যেমন ভাস্কর্য্যে পাথর, চিত্রকলায় বর্ণ ও রেখা, কাব্যে ধ্বনি ও কল্পচ্ছবি—সেইটাকে সম্পূর্ণরূপে আপন বশে এনে তাকে যদৃচ্ছাক্রমে

ব্যবহার ক'রে শিল্পী দেখিয়ে দেয় যে তার জড়-ধর্ম্মের বাধা কত তুচ্ছ, তার উপর মনের একাধিপত্য কত অপরিসীম। এই মনোবৃত্তিটা না কি আমাদের দেশের কলাসৃষ্টিতেই সব চেয়ে প্রকাশমান; এবং, একজন কলাতত্ত্ববিদের মতে, এর উৎপত্তি যোগসাধনার ব্যভিচারে। প্রাণায়াম আসন প্রভৃতি শারীরিক অনুশীলনের আদি উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই আধ্যাত্মিক ছিল। কিন্তু কালক্রমে সর্ব্বসাধারণের মধ্যে পরিব্যাপ্তির সঙ্গে তার বিকৃতিও অনিবার্য্যরূপে এসে পড়ল; দেখা গেল যে ষাণ্মাসিক উপবাস থেকে বিষপান পর্য্যন্ত যত সব দুর্ঘট ব্যাপার ঘটিয়েই যোগীরা পরম তৃপ্তি পেতে লাগলেন। যোগের উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়াল শরীরকে সম্পূর্ণ বশবর্ত্তী ক'রে তার দ্বারা সর্ব্ববিধ অসাধ্য সাধন। এরই অনুপ্রেরণায় শিল্পীরাও পাথরে রঙে রেখায় আপন অফুরন্ত শক্তির লীলা দেখানোকেই চরম জ্ঞান করলেন। উপাদানের মার্ফতে শক্তির অবাধ বিকাশের নামই টেক্‌নীক। আর্টকে টেক্‌নীক-সর্ব্বস্ব করলে সত্য বা শ্রেয়কে তার এলেকা থেকে দূরে রাখা হয় বটে, কিন্তু এ যে ঠক বাছতে গাঁ উজার ক'রে দেওয়া। টেক্‌নীকের দ্বারা যদি কোনো বৃহত্তর উদ্দেশ্য সাধন করা না হয়, টেকনীক্‌কারের চমকপ্রদ নৈপুণ্য প্রদর্শনই তার শেষ লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়, তা হলে তো পাভ্‌লোভার নৃত্যের চেয়ে সার্কাসে তারের উপর যে নৃত্য দেখানো হয় সেটারই মূল্য বেশী, কারণ তাতেই অধিকতর শক্তি ও নৈপুণ্যের প্রকাশ। পাভ্‌লোভার নাচের কদর নিশ্চয়ই এ জন্যে নয় যে অঙ্গচালনায় তার কৃতিত্ব অন্য সকলের চেয়ে বেশী। উঁচু দরের আর্টিষ্ট্ হতে গেলে উচ্চাঙ্গের টেক্‌নিক্ অপরিহার্য্য, কিন্তু টেক্‌নিক্ আয়ত্ত করলেই বড় আর্টিষ্ট হওয়া অনিবার্য্য নয়। অন্তত ইতিহাসে তার প্রমাণাভাব।

সৌন্দর্য্যের মূল্য স্বাশ্রয়ী হোক আর নাই হোক, সত্য ও শ্রেয়ের সঙ্গে সুন্দরকেও চরম মূল্যের মধ্যে গণ্য করাই সাধারণ রীতি। আমাদের জীবনের অনেকখানি শক্তি ও সুযোগ চ'লে যায় কেবলমাত্র জীবন ধারণের নিরন্তর সংগ্রামে, যেটুকু উদ্‌বৃত্ত থাকে তার বিকাশের যে তিনটি সর্ব্বপ্রধান ক্ষেত্র—বিজ্ঞান ধর্ম্মনীতি ও শিল্পসৃষ্টি—তাদের লক্ষ্য-

রূপেই সত্য শ্রেয় ও সুন্দরকে চরম আদর্শ ব'লে গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু মানব-সংস্কৃতির ইতিহাসে রিলীজন নামক বস্তুটা এতখানি জায়গা জুড়ে আছে যে তার বিশিষ্ট সাধনার বিষয়কে মূল্য নির্দ্ধারণের তালিকা থেকে বাদ দেওয়া কেমন যেন আশ্চর্য্য ঠেকে। রিলীজন-পন্থীরা অবশ্য বলবেন যে ঈশ্বরের সত্তা সমস্ত মূল্যের বহু উর্দ্ধে; কেউ কেউ এমন কথাও বলেছেন যে ঈশ্বরের অস্তিত্বের সব চেয়ে বড় প্রয়োজন ও প্রমাণ মূল্য-বোধের সংরক্ষকরূপে। প্রকৃতির অন্ধ নিয়মানুবর্ত্তিতার রথচক্রে নিষ্পেষিত হয়ে আমাদের সমস্ত আদর্শ যাতে ধূলায় বিকীর্ণ না হয়ে যায় সেজন্যে দরকার এমন এক শক্তির যে প্রকৃতির নিয়মকে নিয়ন্ত্রিত করবে আমাদের আদর্শকে বাঁচিয়ে রাখতে, আমাদের সাধনাকে নির্ব্বিঘ্ন করতে। হতে পারে যে এই জন্যেই ঈশ্বরকে চতুর্থ মূল্যরূপে গণ্য করা হয় না। কিন্তু এমনও হতে পারে যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব অন্য তিনটি মূল্য থেকে আদৌ পৃথক নয়। সংস্কৃতির আদিপর্ব্বে যখন আমাদের মূল্যজ্ঞান সবেমাত্র জেগেছে, যখন সমাজ-জীবন এত প্রাথমিক ছিল যে বিজ্ঞানের সঙ্গে আর্টের এবং আর্টের সঙ্গে ধর্ম্মনীতির প্রভেদ পরিস্ফুট হয় নি, মানব মনের সেই শৈশবাবস্থায় তার সমস্ত উর্দ্ধপ্রয়াস অগত্যা আবদ্ধ ছিল একটিমাত্র অনির্দ্দিষ্ট অসংজ্ঞাত পথে ও লক্ষ্যে—রিলীজন ও ঈশ্বর। কিন্তু বিবর্ত্তনের গতি নির্বিভাগ থেকে বিভাগের দিকে। ক্রমশ মানুষের মন বিশ্লেষণক্ষম হয়ে এল, তার কর্ম্ম ও চিন্তার ধারা ভেঙ্গে পড়ল বহু শাখায় প্রশাখায়। "রুদ্ধদ্বার দেবালয়ের কোণ" থেকে ঈশ্বরের উপাসনা এল মুক্ত পৃথিবীতে, এল বিজ্ঞানে শিল্পরচনায় সর্ব্বমানবের কল্যাণ-কামনায়।

আবু সয়ীদ আইয়ুব

সিল্ভ্যাঁ লেভি

অধ্যাপক সিলভ্যাঁ লেভি গত ৬ই নবেম্বর কোন এক অধিবেশনে সভাপতিত্ব করবার সময় হঠাৎ হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হ'য়ে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছেন। তিনি ১৮৬৩ সালে পারিসে জন্মগ্রহণ করেন ও প্রায় পঞ্চাশ বৎসরকাল প্রথমে সোরবোনে ও পরে কলেজ্ দ' ফ্রান্সে সংস্কৃতভাষা ও ভারতীয় কৃষ্টির অধ্যাপক ছিলেন। এ দেশের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ পরিচয় তিনবার ঘটেছিল—প্রথম ১৮৯৭-৯৮ সালে যখন তিনি নেপালের প্রাচীন ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহের জন্য নেপালে কিছুকাল অতিবাহিত করেন, দ্বিতীয়বার ১৯২১-২২ সালে তিনি রবীন্দ্রনাথের আমন্ত্রণে বিশ্ব-ভারতীতে এক বৎসর অধ্যাপনার ভার গ্রহণ করেন ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েও কয়েকটী বক্তৃতা দেন, শেষবার ১৯২৯ সালে তিনি জাপান হ'তে স্বদেশ প্রত্যাবর্ত্তনের মুখে এদেশে আসেন।

এদেশের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ সম্বন্ধ দীর্ঘকালস্থায়ী না হ'লেও লেভির নাম এদেশের শিক্ষিত সমাজের নিকট সুপরিচিত; তার কারণ তিনি প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী ধরে ভারতের পুরাতত্ত্ব নিয়ে আলোচনায় ব্যাপৃত ছিলেন। আর যে সব ভারতীয়েরা হয় ফ্রান্সে না হয় এদেশে তাঁর সংস্পর্শে এসেছিল তারা সকলেই তাঁর ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে পড়েছিল। বহু দেশের ছাত্র তাঁর নিকট অধ্যয়ন করেছে—সেই শিষ্যমণ্ডলীর সঙ্গে তাঁর একটা সহজ মধুর সম্বন্ধ ছিল যার ফলে সকলেই তার গুণে আকৃষ্ট হয়েছিল। লেভি ছিলেন স্বভাবকোমল ও স্নেহশীল—তিনি বিদেশী ছাত্রদের নানাভাবে সাহায্য করতেন ও সাহায্য করবার জন্য প্রস্তুত থাকতেন—যাতে প্রবাসের কষ্ট লঘু ও বিদেশ স্বদেশে পরিণত হ'ত। লেভির এই সস্নেহ ব্যবহারের জন্য শুধু যে ভারতীয় ছাত্রেরাই তাঁকে শ্রদ্ধা করত তা' নয়, সুদূর জাপান, চীন, ইন্দোচীন জাভা, শ্যাম, আমেরিকা ও ইউরোপের নানা দেশের শিষ্যমণ্ডলীই তাঁকে এত ভালবেসে ফেলেছিল যে তাঁর বিদেশযাত্রায় বা কঠিন অসুস্থতায় সকলকেই বিচলিত

হ'য়ে পড়ত। এই শিষ্যমণ্ডলীর জন্য লেভির দরজা সব সময় উন্মুক্ত থাকত আর তা' ছাড়া প্রতি শনিবারে তাঁর বাড়ীতে তারা সকলে সমবেত হ'ত। যাঁরা লেভির প্রাচীন ছাত্র এবং যাঁদের ভিতর দু'একজন লেভির মৃত্যুর পূর্ব্বেই মারা যান (—ইউবের, লুই ফিনো...) তাঁরা সকলে লেভির অধ্যাপনার পঞ্চবিংশতি বৎসরে যে শ্রদ্ধাঞ্জলি দেন তাতেই তাঁদের শ্রদ্ধার গভীরতার পরিমাপ পাওয়া যায়। এই প্রাচীন ছাত্রদের মধ্যে অনেকেই—পল পেলিও, (Paul Pelliot), ফুশে (Foucher), ফিনো (Louis Finot), ইউবের (Ed. Huber), জুল ব্লক (Jules Bloch) মাস্‌পেরো (Henri Maspero) ইত্যাদি সকলেই বিশ্ববিখ্যাত পণ্ডিত।

ফ্রান্সে লেভি পাণ্ডিত্যের সেই ধারা অনুসরণ করেছিলেন যে ধারার প্রবর্ত্তক ছিলেন ইউজেন বুর্ণুফ (Eugene Burnouf) ও পরিপোষক ছিলেন আবেল বেরগেঙ্গ (Abel Bergaigne) ও এমিল সেনার (E. Senart)। বুর্ণুফের সময় থেকে শতাধিক বৎসর গত হয়েছে—কিন্তু তাঁর কাজের মূল্য এখনো কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নি। আঁক্-তিল দু-পেরোঁ (Anquetil du Perron) প্রাচীন ইরাণের ধর্ম্মশাস্ত্র আবেস্তা উদ্ধার করে যখন ইউরোপীয় পণ্ডিতদের সামনে দিলেন তখন যে সব পণ্ডিত সেই প্রাচীন গ্রন্থের ভাষা ও ভাব নিয়ে আলোচনা করলেন তাঁদের মধ্যে বুর্ণুফ হচ্ছেন শীর্ষস্থানীয়। বুর্ণুফ তাঁর কঠোর সাধনার দ্বারা আবেস্তার আলোচনায় পরবর্ত্তী পণ্ডিতদের পথপ্রদর্শক হ'লেন—তাই তাঁর গ্রন্থ ১৮৩৩-৩৫ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হলেও এখনো সমাদরণীয়। কিন্তু বুর্ণুফ ছিলেন কলেজ দ' ফ্রান্সে (College de France) সংস্কৃতের অধ্যাপক। তাই ১৮৪৩ সালের পর তিনি আবেস্তার আলোচনা ছেড়ে দিয়ে সংস্কৃত বৌদ্ধ-সাহিত্যের আলোচনা সুরু করেন। তখন নেপাল থেকে হজসন (Hodgson) ইউরোপে বহু সংস্কৃত পুঁথিপত্র পাঠিয়েছেন। এই সব পুঁথির সাহায্যে বুর্ণুফ বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে যে বিরাট গ্রন্থ প্রণয়ন করলেন—Introduction a l'histoire du Bouddhisme Indien সে গ্রন্থেও রয়েছে নূতন পথের পরিচয়। এই সংস্কৃত বৌদ্ধ-সাহিত্যের সঙ্গে যথাসম্ভব মাঞ্চু, মঙ্গোল,

তিব্বতী ও চীনা বৌদ্ধ-সাহিত্যের তুলনা করে তিনি বৌদ্ধসাহিত্যের যে খসড়া দিলেন তা'কে আমরা এখনো উপেক্ষা করতে পারিনে।

বুর্ণুফের কথা তুলবার কারণ এই যে তিনিই ইউরোপীয় পণ্ডিতদের মধ্যে প্রথম ভারতীয় কৃষ্টির ব্যাপকতা সম্বন্ধে অবধানচিত্ত হয়েছিলেন, আর তিনিই প্রথম বুঝতে পেরেছিলেন যে সে কৃষ্টির প্রাচীন ইতিহাস কেবলমাত্র সংস্কৃত সাহিত্য থেকে উদ্ধার হ'তে পারে না। বুর্ণুফের পর ফ্রান্সে যিনি সংস্কৃত সাহিত্যের আলোচনায় পথপ্রদর্শক হলেন তাঁর নাম হচ্ছে আবেল বেরগেঙ্গ (Abel Bergaigne)। আবেস্তার আলোচনায় বুর্ণুফের যে স্থান বৈদিক গবেষণায় বেরগেঙ্গেরও সেই স্থান। ইউরোপে তাঁর পূর্ব্বে যাঁরা বেদ বা বৈদিক সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করেছিলেন তাঁরা কেহই ঠিক পথ খুঁজে পান নি। বেদের অর্থ নির্ণয়ে তাঁরা অনেক স্থলেই হয় সায়ণভাষ্যের ন্যায় পরবর্ত্তী সাহিত্যের না হয় কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন—সেই জন্য প্রায়ই তাঁরা একই শব্দের নানা অর্থ নির্দ্ধারণ করে অসামঞ্জস্যের সৃষ্টি করেছিলেন। কিন্তু বেরগেঙ্গ প্রথম দেখাতে চেষ্টা করলেন যে বৈদিক ভাষার সাহায্যেই বেদের অর্থ নির্ণয় না করলে তার কদর্থ করা হবে কারণ পরবর্ত্তীকালে শাস্ত্র-কারেরা বেদের সঠিক অর্থ ভুলে গেছেন। বেরগেঙ্গের নির্ণিত অর্থ সব সময়ে গ্রাহ্য না হলেও তিনি ঋগ্বেদের নানা মণ্ডলের তুলনামূলক বিচার করে—মণ্ডলগুলির যে পারম্পর্য্য নির্ণয় করলেন ও তাঁর বিরাট গ্রন্থ—La Religion vedique d' apres les hymnes du Rigvedaএ বৈদিক দেবতাদের যে স্বরূপ নির্দ্ধারণ করলেন তা আধুনিক পণ্ডিতেরা স্বীকার করে নিয়েছেন। তা ছাড়া বৈদিক interpretationএ তিনি যে প্রণালী অবলম্বন করলেন তা পরবর্ত্তী পণ্ডিতদের অনুসরণীয় হ'ল। বেরগেঙ্গ ৪২ বৎসর বয়সে তাঁর কাজ অসম্পূর্ণ রেখে আল্‌প্‌সের হিমানী গহ্বরে মৃত্যুমুখে পতিত হ'ন, কিন্তু বৈদিক গবেষণা ও বৃহত্তর ভারত, বিশেষ করে চম্পার প্রাচীন ইতিহাসের উদ্ধার কার্য্যে তাঁর নাম স্মরণীয় হয়ে রয়েছে।

বেরগেঙ্গের কথা উত্থাপন করতে হ'ল তার কারণ লেভি হচ্ছেন বেরগেঙ্গের শিষ্য আর লেভি নিজেই চেয়েছেন যে তাঁর সম্বন্ধে যদি কেউ চার লাইন লিখ্‌তে চায় তার ভিতর অন্ততঃ তিন লাইন যেন বেরগেঙ্গের সম্বন্ধে লেখা হয়। বেরগেঙ্গের শিষ্যত্ব গ্রহণে লেভিকে পরামর্শ দেন বিখ্যাত ঐতিহাসিক রেনাঁ (Ernest Renan)। লেভি যে সে শিষ্যত্বের সম্পূর্ণ উপযুক্ত ছিলেন তা'তে সন্দেহ নেই। বুর্ণুফ ও বেরগেঙ্গের প্রভাবে লেভির প্রতিভা বহুমুখী হয়ে উঠেছিল—বুর্ণুফের প্রভাবে তার দৃষ্টি ব্যাপকতা ও বেরগেঙ্গের শিক্ষায় তীক্ষ্ণতা লাভ করেছিল।

যে সব পণ্ডিত ভারতের পুরাতত্ত্ব আলোচনা করেছেন লেভি তা'দের মধ্যে শীর্ষস্থানীয়। তার কারণ এ নয় যে তিনি বহু ভাষাবিৎ ছিলেন। তিনি সংস্কৃত ভাষা জান্‌তেন, কিন্তু সে ভাষায় তাঁর চাইতেও বড় পণ্ডিত জন্মেছেন। তিনি চীনা ও তিব্বতী ভাষায় পণ্ডিত ছিলেন—কিন্তু তাই বলে তাঁকে Sinologist অথবা Tibetanist বলা চলে না। মধ্য এশিয়ার ছিন্ন পুঁথিপত্র থেকে তিনি লুপ্ত ভাষার উদ্ধার সাধন করেছিলেন—কিন্তু সে কাজে অন্যান্য পণ্ডিতও আত্মনিয়োগ করেছেন। লেভির পাণ্ডিত্যে বিশেষত্ব হচ্ছে তাঁর মধ্যে এই সমস্ত বিদ্যার একত্র সমাবেশ হয়েছিল—আর সেই সমস্ত বিদ্যাকে তিনি নিয়োগ করেছিলেন ভারতের প্রাচীন ইতিহাসের উদ্ধারকল্পে।

লেভি প্রথম থেকেই বুঝতে পেরেছিলেন যে ভারতবর্ষের ইতিহাস কেবলমাত্র ভারতীয় সাহিত্য হ'তে উদ্ধার করা সম্ভব নয়। ভারতীয় সাহিত্যে ঐতিহাসিক রচনা নাই বল্‌লেই চলে, কোন প্রাচীন গ্রন্থকারের রচনার কাল সঠিক নির্দ্দেশ করবার মত উপাদান সে সাহিত্যে নাই, শিলালিপি বা প্রাচীন মুদ্রা থেকে রাজাদের নাম পাওয়া যায়, রাজনৈতিক ইতিহাসের উপাদান তা থেকে কিছু সংগৃহীত হতে পারে, কিন্তু দেশের বা জাতির সত্যকার ইতিহাস সে উপাদানের সাহায্যে অঙ্কিত হ'তে পারে না। তা ছাড়া, ভারতের প্রাচীন সাহিত্য আংশিকভাবে বিনষ্ট হয়েছে, বিপুল বৌদ্ধ সাহিত্যের প্রায় তিন-চতুর্থাংশ শুধু চীনা ও

ও তিব্বতী অনুবাদে পাওয়া যেতে পারে। এ সব কারণে লেভির দৃষ্টি প্রথম থেকেই চীনা ও তিব্বতী সাহিত্যের দ্বারা আকৃষ্ট হয়।

লেভির প্রথম বই Le Theatre Indien ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এ বইয়ে তিনি প্রাচীন যুগ থেকে আধুনিক কাল পর্য্যন্ত ভারতীয় নাট্যশাস্ত্র ও নাটকের ক্রমবিকাশের আলোচনা করেন। তাঁর পূর্ব্বে জার্ম্মাণ পণ্ডিত বিন্দিশ (Windisch) দেখাবার চেষ্টা করেছিলেন যে গ্রীক প্রভাবেই হচ্ছে ভারতীয় নাটকের জন্ম। লেভি এ মতবাদ খণ্ডন করে প্রমাণ করেন যে যে-মনোবৃত্তি থেকে ভারতীয় নাটকের জন্ম সে হচ্ছে ধর্ম্মভাব—আর সে হিসাবে ভারতীয় নাটক তার স্বকীয়তা বরাবর রক্ষা করেছে। Le Theatre Indien প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে লেখা হলেও এখনো যে সে বই তার শ্রেষ্টত্ব হারায় নি তার সাক্ষ্য সম্প্রতি কিথ (Keith) তাঁর নূতন Indian Drama গ্রন্থে দিয়েছেন। লেভির এ বই পড়তে সকলেরই ভাল লাগে তার কারণ লেভির লেখা হচ্ছে সরস—যে গুণ সাধারণত এ জাতীয় লেখার মধ্যে পাওয়া যায় না। ষ্টাইল হিসাবে লেভি রেনাঁর শিষ্য; সুতরাং ইতিহাস বা আলোচনামূলক প্রবন্ধে রচনারীতিতে লেভি বরাবর রেনাঁর আদর্শই অনুসরণ করেছেন।

Le Theatre Indien লিখবার পর নেপালের ইতিহাস Le Nepal ছাড়া লেভি আর কোন সত্যকার বই লেখেন নি। তাঁর সম্বন্ধে বেরগেঙ্গের ভবিষ্যৎ বাণী সফল হয়েছে—বেরগেঙ্গ তাঁকে বলেছিলেন যে "লেভি তুমি যদি বই লিখ্‌তে চাও তাহলে ২৫ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে তা লিখে ফেল—পরে আর বই লিখতে পারবে না"। Le Theatre Indien লেখা শেষ হয় যখন লেভির বয়স ২৪ বৎসর।

নূতন বই না লিখতে পারবার কারণ এই যে ভারতীয় কৃষ্টির প্রাচীন যুগের ইতিহাসে এত নূতন সমস্যা ও ঐতিহাসিক উপাদানের এত অভাব যে সে সব সমস্যার সমাধান না করলে ও নানা দিক থেকে উপাদান সংগ্রহ না করতে পারলে কোন বই লেখার চেষ্টা বিফল হ'তে বাধ্য। আর সেই ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ করা কি কষ্টসাধ্য তা' লেভির নিজের কথাতেই বলা ভাল—From the Mediterranean to the

Pacific ocean nations near and far gather round India and bring together converging rays to shine upon the voiceless night of her past. The picture that emerges is not, to be sure, as clear and complete as we could wish ; too often the documents say nothing or break off just at the moment when curiosity is on the track ; too often besides the portions upon which light is thrown give us minute details which by their seeming insignificance weary and discourage the student.

এই কষ্টসাধ্য কাজেই লেভি তাঁর সমস্ত জীবন নিয়োগ করেছিলেন। তিনি প্রথম গ্রীক ও লাতিন সাহিত্য থেকে প্রাচীন ভারত ও ভারতীয় কৃষ্টি সম্বন্ধে যে সব উল্লেখ পাওয়া যায় সেগুলির আলোচনা করেন—এই আলোচনার ফল তিনি তাঁর লাতিন ভাষায় লিখিত বই—Quid de Graecis veterum indorum monumenta tradiderint (1890) ও অন্যান্য প্রবন্ধে—La Grece et l' Inde d'apres les monuments, 1891, Le Bouddhusime et les grecs 1891... লিপিবদ্ধ করেন। এই সব প্রবন্ধে তিনি প্রাচীন ভারতের সঙ্গে গ্রীসের যোগাযোগের ইতিবৃত্ত অঙ্কন ও পাণিনীয় সূত্রে উল্লিখিত ভারতের উত্তর পশ্চিম সীমান্তের নানা জাতির সম্বন্ধে সমসাময়িক গ্রীক সাহিত্যে যে সব সংবাদ পাওয়া যায় তার তুলনামূলক বিচার করেন। তাঁর মতে ভারতীয় বৌদ্ধধর্মের ঢেউ গ্রীস পর্য্যন্ত পৌঁছেছিল ও খৃষ্টধর্ম্ম খুব সম্ভব তার কিছু প্রভাবে পরিপুষ্টি লাভ করেছিল।

লেভির মতে বৌদ্ধধর্ম্ম হচ্ছে ভারতের শ্রেষ্ঠ অবদান। ব্রাহ্মণ্য কৃষ্টি জাতীয় কৃষ্টি, তা' বরাবর ভারতের জাতীয়তা অক্ষুণ্ণ রাখবার চেষ্টা করেছে আর সেই উদ্দেশ্যে হচ্ছে দেশের আভ্যন্তরিক শৃঙ্খলা অটুট রাখবার জন্য বর্ণাশ্রমের সৃষ্টি, সমাজ নিয়ন্ত্রণে, শাসন সংক্রান্ত বিষয়ে, ভাষা, ধর্ম্ম, সাহিত্য প্রভৃতিতে ব্রাহ্মণ্যপ্রভাবে ঐক্য আনবার চেষ্টা। বৌদ্ধ-ধর্ম্ম জাতীয়তার গণ্ডী অতিক্রম করে বিজাতীয়দের ভারতের অঙ্কে স্থান

দিয়েছে আর ভারতের যা কিছু শ্রেষ্ঠ বস্তু তা বিদেশে বিলিয়েছে। এশিয়াখণ্ডের নানাজাতি এক সময়ে এই বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাবে সভ্যতার গণ্ডীতে উন্নীত হয়ে ভারতের অনেক অধুনালুপ্ত রত্ন সযত্নে রক্ষা করেছে। সুতরাং বিশ্বমানবিকতার ইতিহাসে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের চাইতে বৌদ্ধধর্ম্মের স্থান উচ্চে।

লেভি এই মনোবৃত্তি পোষণ করতেন বলে বৌদ্ধসাহিত্য ও বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাস উদ্ধারকল্পে তিনি আত্মনিয়োগ করেছিলেন। সেই ইতিহাসের আলোচনায় তিনি প্রথম এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে প্রাচীনতম বৌদ্ধ-সাহিত্য এখন লুপ্ত। সে সাহিত্য লেখা হয়েছিল মগধের ভাষায় যে ভাষায় বুদ্ধদেব নিজে ও তাঁর শিষ্যমণ্ডলী এই নূতন ধর্ম্ম-প্রচার করেছিলেন। ধর্ম্ম যখন প্রসার লাভ করল ও পশ্চিম ভারতে—অবন্তী, কাশ্মীর প্রভৃতি দেশে ছড়িয়ে পড়ল তখন সেই সেই দেশের ভাষায় নূতন সাহিত্য সৃষ্টি হ'ল, পশ্চিম ভারতে পালিভাষায় ও কাশ্মীরে সংস্কৃতে। এই দুই নূতন সাহিত্য যে প্রাচীন মাগধী সাহিত্যকে গ্রাস করে ফেলেছে তার প্রমাণ হচ্ছে—প্রথম, ঐ দুই নূতন সাহিত্যের ভাষা মাগধী না হ'লেও তাদের উপর মাগধীর সুস্পষ্ট ছাপ ধরা যায়, দ্বিতীয়, ঐ দুই সাহিত্যের বিষয়বস্তু তুলনা করলে দেখা যায় যে প্রায়শই তারা এক মূল সাহিত্যের অনুবর্ত্তী। সুতরাং পালি এবং সংস্কৃত বৌদ্ধ-সাহিত্য উভয়েই অর্ব্বাচীন, মূল প্রাচীন সাহিত্য তার রূপ হারিয়ে তাদের মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে। সংস্কৃত বৌদ্ধ-সাহিত্য আমরা আংশিকভাবে পাই নেপাল ও মধ্যএশিয়ার পুঁথিপত্রে এবং চীনা ও তিব্বতী অনুবাদে।

বৌদ্ধ দর্শনের দু'টী প্রধান সম্প্রদায় যোগাচার ও বিজ্ঞানবাদ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান পূর্ব্বে অত্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল। এই দুই দর্শনের মূলগ্রন্থের উদ্ধারের জন্যও আমরা লেভির নিকট ঋণী। যোগাচারের মূল গ্রন্থ অসঙ্গের সূত্রালঙ্কার ও বিজ্ঞানবাদের প্রতিষ্ঠাতা বসুবন্ধুর বিজ্ঞপ্তিমাত্রতাসিদ্ধির পুঁথি লেভি নেপাল থেকে উদ্ধার করেন ও তাদের তিব্বতী ও চীনা অনুবাদ ও টীকাটিপ্পনীর সঙ্গে তুলনা করে ঐ দুই দার্শনিক মতবাদের আলোচনার প্রধান ভিত্তি স্থাপন করেন।

মধ্যএশিয়ায় বৌদ্ধধর্ম্মের প্রসার ও প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধেও লেভি Pelliot ও Stein-এর আবিষ্কৃত পুঁথিপত্র ও চীনা বৌদ্ধসাহিত্যের থেকে বহু উপাদান সঙ্কলন করেন। ফরাসী সরকারের পক্ষ থেকে Paul Pelliot প্রায় তিন বৎসর (১৯০৮-১৯১১) মধ্যএশিয়ার নানাস্থানে অনুসন্ধান চালান। তিনি যে সব পুঁথিপত্র সংগ্রহ করেন তার মধ্যে ভারতীয় প্রাচীন লিপিতে লিখিত পুঁথির পাঠোদ্ধারের ভার পড়ে লেভির উপর। এই সব পুঁথির মধ্যে সংস্কৃত ভাষায় লিখিত বৌদ্ধসাহিত্যের খণ্ডিত পুঁথির পাঠোদ্ধার করবার সময় লেভির দৃষ্টি এক নূতন ও লুপ্ত ভাষায় লিখিত পুঁথির দ্বারা আকৃষ্ট হয়। এই অজ্ঞাত ভাষায় লিখিত পুঁথির পাঠোদ্ধার যত সহজে সম্ভব হয় তার অর্থবোধ ততটা সহজসাধ্য ছিল না। এই পুঁথির মধ্যে কতকগুলি ছিল দ্বৈভাষিক অর্থাৎ সংস্কৃত সূত্র ও তার এই অজ্ঞাত ভাষায় অনুবাদ। তা ছাড়া অন্যান্য পুঁথিগুলির চীনা অনুবাদও লেভি খুঁজে বের করলেন। এই সব উপাদানের সাহায্যে লেভি এই লুপ্ত ও অজ্ঞাত ভাষার পাঠ ও অর্থ উদ্ধার করলেন। এ ভাষা ছিল মধ্যএশিয়ার উত্তরাংশে অবস্থিত কুচা প্রদেশের ভাষা, ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ও এশিয়া খণ্ডের একমাত্র কেণ্টুম ভাষা—অর্থাৎ সে ভাষা হচ্ছে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা গোষ্ঠীর সেই শাখা থেকে উদ্ভূত যা' থেকে গ্রীক লাতিন প্রভৃতি ভাষা উদ্ভূত হয়েছিল। শুধু সে ভাষার উদ্ধার সাধন করেই লেভি নিশ্চেষ্ট রইলেন না—চীনা ও মধ্যএশিয়ার সাহিত্য থেকে তিনি প্রাচীন কুচা ও কুচীয় জাতির ইতিহাস উদ্ধার করলেন। এই জাতি বৌদ্ধধর্ম্ম ও ভারতীয় কৃষ্টি বহু পরিমাণে গ্রহণ করেছিল, ও তার প্রসারে সহায়তা করেছিল। সুতরাং প্রাচীন কুচার অধুনালুপ্ত ভাষা, কুচার প্রাচীন ইতিহাস ও সে দেশের সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ সম্বন্ধেও আমরা লেভির নিকট ঋণী।

সারাজীবন ধরে লেভি যে কাজ করেছেন তার ফলাফল অধস্তনেরা ভোগ করবে। তিনি শতাধিক প্রবন্ধে ভারতের ইতিহাসের সব চাইতে অজ্ঞাত কোণগুলির উপর আলোকপাত করবার চেষ্টা করেছেন, ভারতের কৃষ্টির বিদেশে প্রচার ও প্রসার প্রভৃতি সম্বন্ধে ভারতীয় ও

বৈদেশিক সাহিত্য থেকে বহু নূতন উপাদান সংগ্রহ করেছেন ও নূতন আলোচনার জন্য পথ নির্দ্দেশ করেছেন। সে সব পথ অনুসরণ করে আরও নূতন তথ্য সংগ্রহ করে ইতিহাসের পূর্ণ রূপ দেওয়া সম্ভব হ'বে হয়ত বর্ত্তমান যুগে—তা' লেভির যুগে সম্ভব না হলেও লেভির নাম সেখানে অমর হয়ে থাকবে।

ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্বন্ধে লেভির পরিকল্পনা ছিল বিরাট। ভারতের ইতিহাস তার বর্ত্তমান পরিস্থিতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, সে ইতিহাসে স্থান থাকা চাই—ইন্দোচীন, শ্যাম, যবদ্বীপ, বলিদ্বীপ, মধ্য-এশিয়া, তিব্বত, চীন প্রভৃতি দেশের। সে সব দেশের সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ ছিল বলেই যে ভারতের ইতিহাসে তা'দের স্থান থাকবে তা' নয়, ভারতীয় সভ্যতা তার বিচিত্ররূপে বৈদেশিক জাতিকে সভ্যতার কোঠায় তুলেছে—সুতরাং রূপের সে বিচিত্রতাকে অঙ্কিত না করলে ভারতের ইতিহাস হবে কঙ্কালসার। এ পর্য্যন্ত ভারতের যে সব তথাকথিত ইতিহাস লেখা হয়েছে সে ইতিহাস হচ্ছে রাজনৈতিক—কিন্তু সত্যকার ইতিহাস অঙ্কিত করতে হ'লে দেশের সাহিত্য, ধর্ম্ম প্রভৃতির ক্রমবিকাশ উপেক্ষা করা চলে না।

বর্ত্তমান ভারতের রাজনৈতিক আশা ভরসা সম্বন্ধে লেভির মতামত জান্‌তে আমরা স্বতই কৌতূহলী—তার কারণ তিনি এক হিসাবে ভারতবর্ষের সেবায় আত্মোৎসর্গ করেছিলেন। তিনি যদি জাতিতে ইংরাজ হতেন তাহলে এ সম্বন্ধে স্পষ্টভাবে তাঁর মতামত ব্যক্ত করতে হয় ত কোন কুণ্ঠা হ'ত না। কিন্তু তিনি ফরাসী বলেই হয় ত এ সম্বন্ধে কোন মতামত প্রকাশ করেন নি। তাঁর অন্যান্য লেখায় যে সব ইঙ্গিত পাওয়া যায় তা' থেকে বুঝতে পারি, যে তাঁর মতে আমাদের বর্ত্তমান যুগের যে জাতীয়তা এসেছে তা'র মূলে রয়েছে ইউরোপীয় প্রভাব। প্রচীন ভারতে কোন জাতীয় ও রাজনৈতিক ঐক্য ছিল না। প্রাচীন সাম্রাজ্য হচ্ছে ক্ষণস্থায়ী—ক্ষুদ্র রাজ্যগুলি হচ্ছে স্থায়ী। ব্রাহ্মণ্যপ্রভাবে সমস্ত ভারতীয় কৃষ্টিতে একটা ঐক্য এসেছিল—কিন্তু সে ঐক্য থেকে জাতীয়তা আসে নি। আর সেই জাতীয়তার অভাবেই ভারতের রাজনৈতিক

দুর্গতি। পাশ্চাত্যের প্রভাবে ভারতের রূপ বদলেছে এ কথা সত্য—কিন্তু লেভি স্বীকার করেছেন যে সেই প্রভাবে তার দৈন্যও বেড়েছে। পাশ্চত্যের ঢেউ যেখানেই লেগেছে সেখানেই প্রাচ্যজাতি দুর্দ্দশার চরম সীমায় পৌঁছেছে, নিজের জাতীয় কৃষ্টির সঙ্গে যোগ হারিয়েছে। প্রাচ্যজাতিসমূহ তাদের এই দুর্দ্দশার কারণ সম্বন্ধে বর্ত্তমানে সাবধান হয়েছে ও সেইজন্য প্রতীচ্যের সঙ্গে তার বিরোধ ও দ্বন্দ্ব। প্রাচ্যের আশা ভরসা বুঝে যদি প্রতীচ্য তা'কে পথের অনুসন্ধানে সাহায্য না করে তা হ'লে সেই বিরোধই হ'বে ভবিষ্যতের পক্ষে সর্ব্বনেশে।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বাগচী

পুরানো কথা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

আমাদের বিজাপুরের আমলা সমাজের কত গল্পই ত করলাম! কিন্তু একজনের নাম এতক্ষণ করি নেই এই জন্য যে তাঁকে কখনও আর পাঁচ জনের মত দুদিনের পথের সাথী মনে হয় নেই। প্রথম পরিচয়ের পর হপ্তা খানেক যেতে না যেতে তিনি ও তাঁব স্ত্রী অতি সহজেই আমাদের বড় ভাইবোনের স্থান অধিকার করে বসলেন। তাঁদের সঙ্গে এই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ পূর্ণমাত্রায় বজায় ছিল যতদিন বন্ধু এ জগতে ছিলেন। ১৯০৮ সালের ঘূর্ণিবায়ুতে পড়ে দুবছরের জন্য আমি বাংলা দেশে চলে এলাম, আর তিনিও গেলেন চলে কোন দূর অজানা দেশে। সব সম্বন্ধ ঘুচে গেল। কিন্তু তার আগের সাতটী বছর তাঁদের দুজনের জন্য কখনও বিদেশকে বিদেশ বলে মনে হয় নেই। কত বার কত জায়গায় তাঁদের সঙ্গে থেকেছি। একবার ত বোম্বাইএ সপরিবারে তিন মাস তাঁদের বাড়ীতে ছিলাম। বিবি সাহেব মেয়েমানুষ, কতকটা সেকেলে, তিনি অতি সহজ ভাবে বড় বোনের মত আদর যত্ন করতেন, কিন্তু আহমদী কখন অলক্ষ্যে ধীরে ধীরে আমার অন্তরে গুরুর স্থান অধিকার করে-ছিলেন তা নিজেই বুঝতে পারি নেই। একটা কথা নিশ্চিত যে বিজাপুরে দুটী বছর ওই ছোট্ট ইংরেজ সমাজের মাঝে কাটান সত্ত্বেও যে আমার মনুষ্যত্ব উবে যায় নেই সে অনেকটা এই বন্ধুর গুণে। তিনি নিজে ক্লাবের একজন খুব চাঁই ছিলেন। রসিক পুরুষ, কত রকমের গল্প করে লোককে হাসাতে পারতেন! তাঁর হাসি তামাসা গল্প গুজব শুনতে শুনতে ক্লাবে সকলেরই সন্ধ্যাটা আনন্দে কেটে যেত। কিন্তু মানুষটা ত কোনও ক্রমেই হালকা ছিলেন না, তাই এ সব করেও অনায়াসে নিজের ইজ্জৎ, নিজের ব্যক্তিত্ব বজায় রাখতে পেরেছিলেন। বিবি সাহেব ইংরেজী বলতেন না। ক্লাবেও আসতেন না। সাহেব-মেম বাড়ীতে দেখা করতে গেলে একবার দেখা দিতেন মাত্র। কিন্তু আমার

আত্মীয়স্বজনের কাছে তাঁর কোন পর্দ্দাই ছিল না। কলকাতা হতে আমাদের কেউ বিজাপুর এলে তাঁর রাঁধাবাড়া খাওয়ান দাওয়ানের ধুম লেগে যেত। শেষে এক মজা হল। ছোট জায়গায় এ রকম কি আর চলে! সাহেবরা আস্তে আস্তে টের পেলেন যে বিবি সাহেবের সত্যি কোনও পর্দ্দা নেই। এক আধজন এ সম্বন্ধে আমাকে জিজ্ঞাসা-পড়াও করলেন। দুই বন্ধু পরামর্শ করতে বসে গেলাম, কি করা যায়। একটা খানাপার্টি না দিলে ত চলে না। কিন্তু গিন্নীকে রাজী করা ত সহজ নয়! ঘণ্টা দুই ধরে নানা তর্ক বিতর্ক করে তাঁকে আমরা বোঝালাম যে একটীবার এদের খাইয়ে না দিলে আর চলছে না। তিনি বললেন, "আপনারা খানা দিন না, আমি কি মানা করছি! মুসলমানের মেয়ে আমি টেবিলে বসব না।" বন্ধু হেসে উঠলেন "হ্যাঁ, তুমি মস্ত বড় পর্দ্দা বিবি! দস্তুর ভায়েদের সঙ্গে কি করে খাও?" বিবি সাহেব এমন গম্ভীর ভাবে উত্তর দিলেন, "ছিঃ! ও কথা মুখে আনবেন না। তারা যে আমার আপন জন", যে বন্ধু তথা আমি লজ্জায় তখনকার মতন চুপ হয়ে গেলাম। পরে দুচার দিন ধরে অনেক বুঝিয়ে সুজিয়ে তাঁকে একটীবারের মতন সাহেবদের সাথে খানা খেতে রাজী করা গেল। কিন্তু তিনি কড়া তাকীদ দিলেন যে সাহেব মেমেরা যেন বাড়ী থেকে মদটদ খেয়ে আসে, টেবিলে সরবৎ বই কিছু থাকবে না। তাই হল। আমাদের আমলা সমাজ খুব আনন্দ করে একদিন খেয়ে গেলেন। তাঁরা সত্যিই আহমদীকে ভাল বাসতেন, ও খাতির করতেন। কলেকটর D. বিবি সাহেবকে বলে গেলেন, "আপনি আমাদের সঙ্গে বসে খেলেন, এজন্য আমরা যথার্থই কৃতজ্ঞ।"

স্বামী স্ত্রী দুজনেই এঁরা কংগ্রেসভক্ত ছিলেন আর দেশকে ভাল বাসতেন অন্তরের থেকে। আমাদের সঙ্গে আলাপ হওয়ার কিছুদিন পরে আহমদী একখানা ছবি তুললেন, বিবি সাহেব, আমার স্ত্রী ও একটী পার্শী মেয়ের এক সঙ্গে। বিবি সাহেবের হুকুমে ছবিখানার নীচে লেখা হল "ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস।" সেই ছবিখানা নিয়ে বিবি সাহেব অনেক দিন ধরে কত Sentimental কথাই যে বলতেন।

এঁদের বিজাপুরের বাড়ীতে এখনকার দুজন বিখ্যাত লোকের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। একজন পরম শ্রদ্ধেয় দেশনেতা আব্বাস তৈয়বজী সাহেব, আর একজন হায়দরাবাদের প্রবীণ মন্ত্রী আকবর হায়দরী সাহেব। আব্বাস সাহেবের তখন প্রৌঢ় বয়স, কিন্তু কি বিশাল বলিষ্ঠ শরীর! আমরা ত জোয়ান ছিলাম। তবু তাঁর একটা ঘুষো খেয়ে দাঁড়িয়ে থাকা সহজ ছিল না। ভদ্রলোক খুব আমুদে, বিজাপুরে যে কদিন ছিলেন, দিবারাত্র হৈ হৈ করে কাটিয়ে দিয়ে গেলেন। বাহিরে থেকে দেখাত যেন একজন সাধারণ বড় ঘরের ছেলে, পয়সা কড়ির অভাব নেই, তাই ভাবনা চিন্তাও নেই। কিন্তু ভেতরে হালকাপনার লেশমাত্র ছিল না। আমার সঙ্গে বেশ ভাল করে আলাপ হয়েছিল। ঐ কদিনের মধ্যেই দুতিন বার আমাকে আলাদা বেড়াতে নিয়ে গিয়ে দেশ সম্বন্ধে, দেশী কর্ম্মচারীর দায়িত্ব সম্বন্ধে, কত উপদেশ দিয়েছিলেন। উপদেশ দিয়ে ছিলেন বটে, কিন্তু মোটেই গুরুমহাশয়ের মতন নয়। তাঁর কথা-বার্ত্তা আমার এত ভাল লেগেছিল এইজন্য যে তার পেছনে একটা সরল অথচ জ্বলন্ত দেশাভিমান ছিল। ভদ্রলোক বয়োবৃদ্ধ, উচ্চ কর্ম্মচারী, শিক্ষা দীক্ষা আদব কায়দায় বিলাত ফেরত, জাতে মুসলমান, তাঁর প্রাণে ঐ রকমের দেশপ্রেম দেখে আমি খুব আশ্চর্য্য হয়েছিলাম। বন্ধু আহমদীকে বলাতে তিনি যে উত্তর দিয়েছিলেন তা আজও মনে আছে—যত দিন যাবে ততই বুঝতে পারবে যে আব্বাসের মত খাঁটি লোক জগতে খুব কম। পরে আব্বাস সাহেবের সঙ্গে সম্বন্ধ যত ঘনিষ্ঠ হতে লাগল ততই বুঝতে পারলাম যে বন্ধু এক বর্ণও বাড়িয়ে বলেন নেই। একটা কথা মনে করে পরে অনেক হেসেছি যে তখনকার আব্বাস আজকের মতই দেশভক্ত ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁর তখনকার দিনের দেশ-প্রেমকে non-violent কোন ক্রমেই বলা যেত না।

আকবর হায়দরী ছিলেন আহমদীর ভাগ্নে। তিনি তখনকার দিনে কলকাতায় finance বিভাগে বড় চাকরী করতেন। খোশ মেজাজ লোক ছিলেন বটে, কিন্তু কতকটা চাপা। বেশী কথা কইতেন না। তৈয়বজী পরিবারের অন্য সকলের মত তিনিও খুব কংগ্রেসভক্ত ছিলেন।

মুসলমানদের যে কোনও একটা আলাদা রাষ্ট্রনীতি থাকতে পারে, তা তিনি মোটেই স্বীকার করতেন না। শুধু তাই নয়। কোনও রকম সাম্প্রদায়িক ইস্কুল কলেজকে তিনি দুচক্ষে দেখতে পারতেন না। আলীগড় বেনারস-এর নামে জ্বলে উঠতেন। এ বিষয়ে আমাদের মতভেদ ছিল, তাই দুজনের মাঝে মাঝে বিষম তর্ক লেগে যেত। যখন খুব গরম হয়ে উঠতাম তখন আহমদী হেসে দুজনকেই থামিয়ে দিতেন। হায়দরী আমাকে ঠাট্টার সুরে বলতেন, "এই তুমি দেশকে ভালবাস! মোল্লা আর পুরোহিতগুলোকে ছেঁটে ফেলে দিতে পার না!" সেদিনের হায়দরী আর এখনকার Sir Akbarএ কত তফাৎ! সময় সময় ভাবি। ভেবে মনে আনন্দ হয় না।

আগেই বলেছি যে বিজাপুর শহরে ভদ্র মুসলমানের বাস বড় একটা ছিল না, তবে, গরীব-গুরবো মুসলমান সহরে ও আশেপাশে অনেক ছিল। তাদের মধ্য থেকে অতি অল্প-সংখ্যক ছেলেই ইস্কুলে পড়তে যেত। যাতে আরও বেশী গরীবের ছেলে হাই ইস্কুলে ঢুকতে পারে সেই উদ্দেশ্যে হেডমাষ্টার মহাশয় দরিদ্র মুসলমান ছাত্র ভাণ্ডার নামে এক ফণ্ড করলেন। আহমদীর ও আমার এই কাজে প্রথম থেকেই যোগ ছিল। আমরা সহজেই আমলা মহল থেকে মাসিক ষাঠ টাকা চাঁদা তুলে দিতে পারলাম। কিন্তু দরিদ্রের ত নানা বালাই! এক বছর না যেতে যেতেই মুসলমানেরা দুই দল হয়ে গেলেন। আমরা অনেক চেষ্টা করেও মিটমাট করতে পারলাম না। এক দল খোট ধরলে যে নিরক্ষর মুসলমান সমাজের প্রধান দরকার মকতব, হাই ইস্কুল নয়। তারা কাউকে কিছু না বলে পুরানো সন্দল মসজিদে এক মকতবের পত্তন করে বসল। কাজেই আমাদের ফণ্ডের টাকা দু ভাগ করে দিতে হল। কালেকটর D. যে কত দূর উদারহৃদয় ছিলেন তা এই থেকে বোঝা যায় যে তিনি এক কথায় তাঁর মাসিক দশ টাকা চাঁদা ডবল করে দিলেন। আমরা সকলে তা করে উঠতে পারি নেই।

সারা জেলাতে মুসলমানের বাস কমই ছিল। তবে এক একটা বড় গ্রামে অনেক ঘর জোলা মুসলমান বাস করত। তাদের বেশীর ভাগ

তখনও জাত ব্যবসা ছাড়ে নেই। এই জোলারা সম্ভবতঃ আগেকার কালে উত্তর ভারত থেকে এসেছিল। খান্দেশ, নাসিক, ঠাণা জেলাতেও অনেক গ্রামে এই রকম হিন্দুস্থানী জোলাদের বসতি দেখেছি। বিজাপুর জেলায় এদের সব চেয়ে বড় কেন্দ্র ছিল ইলকল। সেখানকার রেশমী সাড়ীর নাম ডাক তখনও খুব। তেমন চমৎকার নরম রেশম, তেমন সুন্দর নানা রঙ্গের চৌখুপী বুনন অন্যত্র বড় একটা দেখতে পাওয়া যেত না। এখন সে শিল্পের অবস্থা কি, তা আমি জানি না। সব গ্রামে কিন্তু রেশমী কাপড় হত না। বেশীর ভাগ জোলা রঙ্গীন সুতীর লুগড়ী (দক্ষিণী সাড়ী) বুনে দিন গুজরান করত। সাধারণ লুগড়ীর দাম ছিল এক টাকা। কাজেই কারীগরের মুনাফা খুব বেশী থাকত না। এরা কাপড় বুনত সেই সেকেলে মান্ধাতার আমলের তাঁতে। কোন রকম ঠকঠকি তাঁতের সঙ্গে এদের পরিচয় ছিল না। জেলায় বয়ন-শিল্পের উন্নতি করার উদ্দেশ্যে আমাদের ডিষ্ট্রীক্টবোর্ড স্থির করলেন যে ঠকঠকি তাঁতের প্রচলন করতে হবে। নানা তর্ক-বিতর্ক জল্পনা-কল্পনা করে বাঙ্গালা দেশ থেকে একজন বিশেষজ্ঞ আমদানি করা হল। এই expert-এর নাম ছিল সতীশবাবু, পদবী এখন ভুলে গেছি। ইনি সঙ্গে করে নিয়ে এলেন একজন ফরাসডাঙ্গার বাঙ্গালী তাঁতি। শহরের মাঝখানে এক লম্বা চালাতে সতীশবাবু তাঁর ঠকঠকি তাঁত দুখানা বসালেন। হাকীমেরা আপন আপন তহসীলের জোলাদের নিমন্ত্রণ করে পাঠালেন সদরে এসে নূতন তাঁত দেখে যেতে। আমার মহকুমাতে চড়চন বলে এক বিখ্যাত জোলা গ্রাম ছিল। আমি উৎসাহের আতিশয্যে স্বয়ং সেখানে গিয়ে জনা দুই বুড়ো সরদারকে ধরে নিয়ে এলাম। কিন্তু এতেও বিশেষ ফল পাওয়া গেল না। জোলারা একজন দুজন করে এসে নূতন তাঁত দেখে চলে যেতে লাগল, কিন্তু fly-shuttle কেউ কিনতে চাইলে না, শিখতেও চাইলে না। আহমদী ও আমি জেলার নানা জায়গায় ঘুরে বক্তৃতাদি করে এলাম, কিন্তু তাতেও কিছু হল না। বুড়োদের মুখে সেই পুরানো গজগজানি, ও তাঁতে কোন সুবিধা নেই, জোরে ত চালান যাবে না, জোরে চালালেই সূতো ছিঁড়ে যাবে, ইত্যাদি।

শেষে সতীশ বাবুর মাথায় এক ফিকির এল। তিনি এক প্রকাশ্য সভায় দাঁড়িয়ে হিন্দীতে বললেন, আমি চ্যালেঞ্জ করছি, আমার তাঁতী যতক্ষণে দুখানা সাড়ী বুনবে ততক্ষণে আপনাদের কোন জোলা যদি একখানা সাড়ী শেষ করতে পারে ত আমি দশটাকা বাজী হারব। এই রকম একটা অবজ্ঞা-ভরা চ্যালেঞ্জের কথা শুনে জোলারা বেশ উত্তেজিত হয়ে উঠল। চড়চনের এক জোলা সেইখানেই পালটা জবাব দিলে, সে দশ রূপেয়া বাজী লাগাতে তৈয়ার আছে। যথোচিত ধুমধাম করে এক শনিবারে ম্যাচ-এর ব্যবস্থা করা গেল। আমলাবর্গ, মহাজন-মণ্ডলী, উকীল-মোক্তার, সকলের সামনে বাজী সুরু হল। তাঁতশালের এক কোণে বাঙ্গালী তাঁতী কোমরে রঙ্গীন গামছা বেঁধে সতীশবাবুর ঠকঠকি তাঁতে বসল। অপর কোণে চড়চনের জোলাটী তার নিজের ঘরের তাঁতে কাপড় বুনতে আরম্ভ করলে। কত ঘণ্টা বাজী চলেছিল তা এখন মনে নেই, কিন্তু পুরানো তাঁতে যখন একখানা সাড়ী শেষ হল তখন দেখা গেল যে বাঙ্গালী তাঁতি প্রায় আড়াইখানা বুনে ফেলেছে। সতীশবাবু কিন্তু বাজীর টাকা কিছুতেই নিলেন না। কলেকটর সাহেব দুই প্রতিদ্বন্দ্বীকেই কিছু কিছু দিলেন ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের তরফ থেকে ইনাম স্বরূপ। এই বাজীর ফল কিন্তু খুব ভাল হল, কেন না চড়চনের সেই সরদার জোলাটী তৎক্ষণাৎ fly-shuttle শিখতে লেগে গেল। কিছুদিন না যেতে যেতে সতীশ বাবুর আরও অনেকগুলি ছাত্র জুটল। তিনি দ্বিগুণ উৎসাহে তাঁর কাজ করে যেতে লাগলেন। এই তরুণ ভদ্রলোকটীর মত একনিষ্ঠ কর্ম্মী আমি খুব কমই দেখেছি। তিনি কি পারিশ্রমিক রোজগার করেছিলেন তা এখন ভুলে গেছি। তবে এইটুকু মনে আছে যে সেটা তাঁর কাজের তুলনায় যৎসামান্য। এই তাঁতের কাজকে তিনি একটা ব্রতের মত মাথায় তুলে নিয়েছিলেন। কিন্তু বেশী দিন চালাতে পারলেন না। বছর খানেকের মধ্যে শোলাপুরে হঠাৎ কলেরায় মারা গেলেন। বিজাপুরের জোলারা শেষ পর্য্যন্ত সবাই ঠকঠকির তাঁত গ্রহণ করলে কি না, তা আমি জানি না। না করে থাকে ত মিলের আড়াআড়িতে কি আর এতদিন টিঁকে আছে!

এইবার আপনাদিগকে বিজাপুর জেলার সাধারণ লোকের বিষয় দুচার কথা বলব। এই জেলাটী কানাড়া বা কর্ণাট প্রদেশের এক ভাগ। লোকের ভাষা কানাড়ী। ভাষাটী তেলেগুর মত আধা আর্য্য, আধা দ্রাবিড়ী। মহারাষ্ট্রের লাগা প্রদেশটায় আর্য্য শব্দগুলোর বেশী প্রয়োগ। তেমনি খাস মহীশূরের কথিত ভাষায় আর্য্য শব্দের ব্যবহার নেই বললেই হয়। বিজাপুর জেলার চাষী বেশীর ভাগ লিঙ্গায়ৎ জাতের। এই জাতকে একটা আলাদা সম্প্রদায় বললেও ভুল হয় না কেন না এরা ব্রাহ্মণকে মানে না। এদের নিজেদের পুরোহিত আছে। তাদিকে জঙ্গম বলে। প্রত্যেক লিঙ্গায়ৎ কোমরে একটী ছোট শিবলিঙ্গ ধারণ করে। সাধারণ গৃহস্থ এই প্রতীক এক সুন্দর সুঠাম রূপার বাক্সে রেখে রূপার জিঞ্জির দিয়ে সেই বাক্স কোমরে ঝোলায়। অসমর্থ গরীবের পক্ষে রজতাধারের বদলে লাল শালুর পুঁটুলির ব্যবস্থা। এই লিঙ্গায়ৎরা যে শুধু চাষী, তা নয়। অধিকাংশ ব্যাপারী মহাজনও ছিল এই জাতের। তবে তখনকার দিনে বিজাপুর জেলায় এঁদের মধ্যে ইংরেজী শিক্ষার চল হয় নেই। তাই ব্রাহ্মণদের সঙ্গে এঁদের তেমন বেশী রেশারেশিও ছিল না। ব্রাহ্মণেরা ছিলেন উকীল, ডাক্তার ও সরকারী আমলা, এঁরা ছিলেন চাষী, ব্যাপারী ও মহাজন, কাজকর্ম্ম একরকম নির্ব্বিবাদে চলে যাচ্ছিল। তবে পাশের ধারোয়াড় বেলগাঁও জেলায় এই দুই জাতের মধ্যে বিদ্বেষ অতি বিশ্রী রকম বেড়ে উঠেছিল। সেখান থেকে মাঝে মাঝে লিঙ্গায়ৎ প্রচারক আসতেন আমাদের জেলায় এই বিদ্বেষের আগুন ছড়াতে। আমি প্রথম প্রথম জিনিসটা ঠিক বুঝতাম না। হিন্দু সমাজের মধ্যেই দুটো জাত যে এই রকম নির্লজ্জভাবে পরস্পরের সর্ব্বনাশ করতে কোমর বাঁধতে পারে, তা বুঝব কি করে! সাধারণতঃ শহরে ব্রাহ্মণদের জোর ছিল বেশী, কিন্তু দূর পল্লীগ্রামে লিঙ্গায়ৎরাই ছিল সর্ব্বেসর্ব্বা। আমার প্রথম বছরের সফরেই এই বর্ণ-বিদ্বেষের একটা বেশ স্পষ্ট নিদর্শন দেখতে পেয়েছিলাম। গল্পটা বলি, শুনুন।

এক নূতন ক্যাম্পে এসে পৌঁছেছি সন্ধ্যাবেলাতে। সারা পথটা হরিণ শিকার করতে করতে এসেছি, তাই বড় শ্রান্ত। তাড়াতাড়ি স্নান

করে খেয়ে দেয়ে, শুয়ে পড়বার উদ্যোগ করেছি, এমন সময় চাপরাসী এসে খবর দিলে যে মামলতদার রাও সাহেব এসেছেন। এত রাত্রে, তখন নটা বেজে গেছে, রাও সাহেবের শুভাগমনে খুব খুশী হলাম তা বলতে পারি না। একবার ভাবলাম, সকাল বেলায় আসতে বলে দিই। ফের মনে হল, ভদ্রলোকের তালুকাতে প্রথম এসেছি, ওঁর সঙ্গে এখনও পরিচয় হয় নেই, ফিরে যেতে বললে হয় ত ক্ষুণ্ণ হবেন। বাহিরে চৌকী কেদারা রাখতে বলে বেরিয়ে এলাম। রাও সাহেব যথারীতি আদর অভ্যর্থনা করে বললেন, "এত রাত্রে আপনাকে বিরক্ত করছি, মাপ করবেন। কিন্তু আজ সন্ধ্যাবেলা এখানে একটা অপ্রিয় ঘটনা ঘটেছে, সেটা আপনাকে জানান আমার কর্ত্তব্য।" দূরে জনা দুই তিন লোক দাঁড়িয়েছিল। তাদিকে কাছে ডেকে বললেন, "এঁরা এই গ্রামের ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, এঁদের কিছু নালিশ আছে।" আমার বিরক্ত বোধ হল। দাঁড়িয়ে উঠে উত্তর দিলাম, "এত রাত্রে আমি নালিশ শুনতে পারব না, মহাশয়। আপনি ত তালুকা ম্যাজিষ্ট্রেট, যা হয় ব্যবস্থা করবেন আজ রাত্রির মত।" একজন ব্রাহ্মণ, দীর্ঘকায় সৌম্য-মূর্ত্তি, কাছে এগিয়ে এসে হাত তুলে আশীর্ব্বাদ করলেন, "শুভমস্তু, মহারাজ। আমরা দীন দরিদ্র ব্রাহ্মণ, সারা দিন উপবাসী, আমাদের পূজা পণ্ড হল, আজ আর জলগ্রহণ করতেও পাব না। এর কি কোন প্রতিবিধান নেই এ রাজ্যে ?" ব্রাহ্মণের অনুযোগ শুনে বড় লজ্জা হল। তাড়াতাড়ি বসে বললাম, "অবশ্য প্রতিবিধান আছে, শাস্ত্রী মহাশয়। বসুন। বলুন, কি হয়েছে।" ব্রাহ্মণ তখন তাঁদের দুঃখের কথা বললেন, "আজ কার্ত্তিকী একাদশী। আমরা প্রতিবৎসর এই দিনে গোধূলি-লগ্নে আমাদের দেবতাকে মিছিল করে এক মন্দির হতে আর এক মন্দিরে নিয়ে যাই। তার পর সেইখানে যথারীতি সন্ধ্যা আরতি পূজা-অর্চ্চনা করে উপবাসের পারণা করি। বাদশাহী আমল হতে এই ব্যবস্থা চলে আসছে। তিন বছর আগে এখানকার লিঙ্গায়ৎ সম্প্রদায় আমাদের মিছিল বন্ধ করার চেষ্টা করে, কিন্তু আমারা সময়মত জেলা হাকিমকে দরখাস্ত করায় কোন গোলযোগ হয় নেই। এ বছর আমরা নিশ্চিন্ত ছিলাম। আগে হতে

কোন ব্যবস্থাই করি নেই। হঠাৎ বাজারের মাঝখানে প্রায় শতখানেক লিঙ্গায়ৎ লাঠি-সোটা নিয়ে আমাদের মিছিলের পথ রোধ করে দাঁড়াল। আমরা অনেক অনুনয় বিনয় করলাম কিন্তু তারা কিছুতেই পথ ছাড়লে না। অগত্যা দেবতাকে পূর্ব্বস্থানে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়ে রাও সাহেবকে জানালাম। আপনি এসেছেন শুনে তিনি আমাদিকে আপনার হুজুরে নিয়ে এসেছেন।" সে রাত্রে আর কিছু করণীয় ছিল না। রাও সাহেবকে বলে দিলাম যেন সকাল বেলায় উভয় পক্ষ সঙ্গে নিয়ে উপস্থিত থাকেন। পরদিন প্রায় দু ঘণ্টা ধরে উভয় দলের বক্তব্য শুনে, দলীল নকশা ইত্যাদি দেখে আমার কোন সন্দেহই রইল না যে ব্রাহ্মণেরা কার্ত্তিকী একাদশীব মিছিল গাঁয়ের মধ্য দিয়ে নিয়ে যেতে পারেন। স্থানীয় লিঙ্গায়ৎদের প্রমুখও একথা স্বীকার করলেন। কিন্তু একজন ইংরেজী জানা তরুণ লিঙ্গায়ৎ ছিল, সে কিছুতেই চুপ করে না। বলতে লাগল, "আমরা কিছুতেই যেতে দেব না, সাহেব। আগে ওরা আদালতে ওদের অধিকার সাব্যস্ত করুক।" খবর নিয়ে জানলাম লোকটা ধারোয়াড়ের লোক, পেশা মোক্তারী, এই রকম করে সর্ব্বত্র গোলমাল বাধিয়ে দুপয়সা রোজগার করে। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, "আপনি ত বাহিরের লোক, এখানকার ব্যাপার নিয়ে এত মাথা ঘামাচ্ছেন কেন?" সে একটু গরম হয়ে জবাব দিলে, "এ আমাদের বীরশৈব সম্প্রদায়ের অধিকারের কথা—" আমি তাকে থামিয়ে দিয়ে বললাম, "আপনি বীরও হতে পারেন, শৈবও হতে পারেন, কিন্তু এখান থেকে মানে মানে আজই সরে পড়ুন। আমি ফৌজদার সাহেবকে বলে দিচ্ছি আপনার গাড়ীর ব্যবস্থা করে দিতে।" লোকটা রাগে ফোঁস ফোঁস করতে লাগল। কিন্তু লিঙ্গায়ৎদের প্রমুখ মহাশয় বললেন, "ফৌজদার সাহেবকে কিছু বলতে হবে না, হুজুর। আমিই ওঁর সব বন্দোবস্ত করে দিচ্ছি।"

সন্ধ্যাবেলা বাজারের চৌমাথায় গিয়ে দাঁড়ালাম। আগের ব্যবস্থামত লিঙ্গায়ৎদের চার পাঁচজন মাতব্বর আমার পাশে এসে দাঁড়িয়ে রইলেন। রাস্তা লোকে লোকারণ্য। অধিকাংশই লিঙ্গায়ৎ। কিন্তু কারও হাতে লাঠি-সোটা না দেখে আশ্বস্ত হলাম। আমার পেছনে

একটু দূরে ফৌজদার (Sub-inspector) বারোজন বন্দুকধারী পাহারা-ওয়ালা নিয়ে খাড়া ছিলেন। সকাল বেলায় মাতব্বররা লিখে দিয়েছিলেন যে কোন গোলমাল হলে তাঁরা দায়ী, তাঁরা গেরেপ্তার হতেও প্রস্তুত। ধারোয়াড়ের বক্তাটী ঠিক সরে পড়েছিলেন। একজন মাতব্বর হেসে বললেন, "লোকটা ভাল নয়, সাহেব। ছোকরাগুলোকে খেপিয়ে তুলেছিল।" যথাসময়ে ব্রাহ্মণদের মিছিল এসে পৌঁছল। সঙ্গে রাও সাহেব মামলতদার, মাত্র তুজন নিরস্ত্র কনষ্টেবল নিয়ে। আমাকে দেখে ব্রাহ্মণদের প্রাণে ভরসা এল। তাঁরা বার বার দেবতার জয়ধ্বনি দিতে লাগলেন। আমি লিঙ্গায়ৎ প্রমুখকে বললাম, "আমি ওঁদের সঙ্গে যাচ্ছি। আপনারাও আসুন না! প্রসাদ ভক্ষণ করে ফিরবেন।" "চলুন, সাহেব। আপনিই যখন যাচ্ছেন আমাদের কি আপত্তি!" বলে তিনি এগিয়ে এলেন। লিঙ্গায়ৎ যারা ভিড় করে দাঁড়িয়েছিল ধীরে ধীরে তারাও অনেকে সঙ্গ নিলে। প্রধান ব্রাহ্মণ পুরোহিত ছলছল চোখে বললেন, "এই রকমই হত, সাহেব, আগেকার দিনে। কেন যে আজ মানুষের মাথা বিগড়ে যাচ্ছে, কে জানে!" মন্দিরে পৌঁছে মহা ধুমধাম লেগে গেল। রাত বারোটা অবধি নাচ গান প্রসাদ ভক্ষণ চলল। একটা কথা বলতে ভুলে গেছি, ফৌজদার ও সেপাইরা শেষ পর্য্যন্ত সঙ্গেই ছিলেন, তবে দূরে দূরে। এটা হয়েছিল আমার প্রবীণ রাও সাহেবের পরামর্শমত। তিনি আমাকে কানে কানে বলেছিলেন, "তুমি অঘটন ঘটাচ্ছ, তা সত্যি, সাহেব। তবু বন্দুক সঙ্গে থাকা ভাল।"

লিঙ্গায়ৎদের অনেক গল্পই করা যায়। তবে আপনাদের ধৈর্য্যচ্যুতি হবে। মোটের উপর এদিকে আমার খুব ভাল লাগে নাই। অন্ততঃ গুজরাতের পাটীদারদের মত লাগে নেই। এদের দেহে গুণের অভাব নেই। চাষী হিসেবে বুদ্ধি-সুদ্ধি যথেষ্ট। ইজ্জতের জ্ঞানও প্রবল, দরকার পড়লে সবাই একজোটও হতে পারে, তবে বড় নিষ্ঠুর জাত। শত্রু নিপাতের জন্য এমন কাজ নেই যা করতে পারে না। একবার কোন গ্রামের লোক একজোট হয়ে তাদের গ্রামস্থ মহাজনকে

খাতাপত্র দলীল দস্তাবেজ সমেত ঘরে বন্ধ করে জ্বালিয়ে মেরেছিল। আর একবার, এক চাষী তার দশ বছরের ছেলেকে স্বহস্তে খুন করে, লাশটা শত্রুর বাগানে ফেলে দিয়ে, পুলিসে এত্তেলা দিয়েছিল যে অমুক আমার ছেলেকে ভুলিয়ে নিয়ে গিয়ে তার বাগান বাড়ীতে বন্ধ করে রেখেছে। এই রকম অনেক ছোট বড় ঘটনার কথা শুনেছিলাম দু-বছরের মধ্যে। তবে এইটুকু বলব যে লিঙ্গায়ৎ সম্প্রদায়ের মহাজন শ্রেণীকে আমার ওরই মধ্যে ভাল লেগেছিল। তারা খয়রাত করত, গান বাজনা কুস্তী কসরতের চর্চ্চাও করত, গুজরাতের বেনেদের মতন সারাক্ষণ কেবল পয়সার ধ্যানে মশগুল থাকত না।

বিজাপুর অঞ্চলে আমার Criminal tribesদের সঙ্গে প্রথম পরিচয় হয়। Criminal tribe মানে এই যে সারা tribeটার জাতিগত পেশা চুরী-চামারী। বাহিরে হয়ত তারা অন্য কোন রকম ধান্দার ঢঙ্গ করে, কিন্তু তাদের যথার্থ পেশা বলতে চুরীই বোঝায়। এদের কোন কোন জাত ঘরদোর বেঁধে গ্রামে বাস করে, আবার কোন কোন জাত বা আমাদের বেদেদের মতন ভবঘুরে, তিন দিনের বেশী এক জায়গায় থাকে না। ছেলেমেয়েরা অতি অল্প বয়স থেকেই জাতব্যবসায় শেখে, আর সে ব্যবসায়কে কোন রকমে হীন বা অন্যায় মনে করে না। জাতের কেউ অকালে মরে গেলে, কি জেলখানায় বন্ধ হলে, সমস্ত জাতে মিলে তার ছেলেপিলেদের খেতে পরতে দেয়। ভবঘুরে tribeগুলোর মধ্যে সব চেয়ে বিখ্যাত কায়খাড়ী জাত। এদের জাত-ব্যবসা সিঁদকাটা। ছাদের এক কোণে এমন সুন্দর, artistic, সিঁদ কাটে যে দেখলে আশ্চর্য্য হতে হয়। অথচ ছাদ ভাঙ্গবার সময় কোন আওয়াজ হয় না, গৃহস্থের ঘুমও ভাঙ্গে না। কায়খাড়ী মেয়েরা টুকরী সাজী ইত্যাদি ঘরে ঘরে বেচে বেড়ায়, আর কোন বাড়ীতে গহনাপত্র টাকাকড়ি কত আছে, বাড়ীর লোকে কোন ঘরে শোয়, এই সব দরকারী খবর সংগ্রহ করে ক্যাম্পে আনে। তারপর দলপতি চুরীর ব্যবস্থা করেন। বড় লোকের বাড়ীতে, কিংবা যেখানে ধরা পড়ার ভয় আছে সেখানে, দলপতি স্বয়ং সিঁদ কাটতে যান। ছোট খাটো চুরী করতে ছেলেছোকরাদিকে পাঠান।

প্রত্যেক দলের সঙ্গে একটী চমৎকার ছোট্ট লোহার সিঁদ-কাঠি বা গাঁতি থাকে। তারা নিত্য ফুল সিন্দুর দিয়ে এই কাঠির পূজা করে। কায়খাড়ীরা বলে যে, তাদের এই দেবতা বজ্র দিয়ে গড়া। ভাল নীল ইস্পাত সন্দেহ নেই। আজ কয়েক বছর থেকে বোম্বাই গভর্ণমেণ্ট এই কায়খাড়ী ও অন্য Criminal জাতদের চরিত্র সংশোধন করার উদ্দেশ্যে Criminal Settlement (বস্তী) বসিয়েছেন। সেখানে তাদিকে চাষের জমী দেওয়া হয়েছে, তাঁতের কাজ শেখান হচ্ছে, ছোট ছেলেমেয়েদিকে ইস্কুলে পড়ান হচ্ছে। এর কত দূর স্থায়ী ফল হবে, তা আরও কয়েক বছর না গেলে বোঝা যাবে না।

বিজাপুরে আর এক Criminal জাত আছে, তাদের নাম ছপ্পর বন্দ অর্থাৎ ঘরামি। তারা কায়খাড়ীদের মত ঘুরে ঘুরে বেড়ায় না, গ্রামে থাকে, নিয়মিত চাষ বাসও করে। ঘরামির কাজ ত বেশ ভাল রকমই জানে। কিন্তু তাদের আসল পেশা, মেকী টাকা তৈরী করা। বর্ষার চার মাস যখন সবাই গ্রামে থাকে তখন চাষের কাজও পুরোদমে চলে, আবার মাটির নীচে পাতাল ঘরে গোপনে অজস্র টাকাও তৈরী হয়। অগ্রহায়ণ মাস নাগাদ জোয়ারীর ফসল ঘরে তুলে দিয়ে জোয়ান মরদরা সব বেরিয়ে যায় মেকী টাকার পুঁজী সঙ্গে নিয়ে। কত দূর দেশ-দেশান্তরে যে এরা চলে যায় এই টাকা চালাবার জন্য! পুবে হংকং, পশ্চিমে জাঞ্জিবার পর্য্যন্ত এই ছপ্পরবন্দ coiners সব ধরা পড়েছে। এরা যে শুধু টাকা তৈরী করে, তা নয়। দুয়ানী, সিকি, আধুলি, টাকা গিনি, এমন কি সেকেলে আকবরী মোহর পর্য্যন্ত এমন হুবেহুব গড়ে যে সাধারণ লোকের ধরা অসম্ভব। আমি একবার খুব বোকা বনেছিলাম।

এক মোকদ্দমাতে চোরাই মালের ভেতর একখানা পুরানো মোহর এসে পড়ে। কেউ সে মোহর দাবী না করায় ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব হুকুম দেন যে সেটা বিক্রী করে দামটা সরকারে জমা হোক। সোজা-সুজি নিলাম না করে তিনি আমাকে এক পত্র লিখলেন, "আপনার প্রাচীন মুদ্রার উপর খুব ঝোঁক আছে জানি। তাই লিখছি যে আমার

কাছারীতে একখানা আকবরী মোহর বিক্রী আছে, দাম পঁচিশ টাকা। নেবেন কি ?” আমি তৎক্ষণাৎ টাকা পাঠিয়ে দিয়ে মোহরখানা আনিয়ে নিলাম। মোহর যে পুরানো তা দেখেই বোঝা গেল। একখানা পরকলা (lens) নিয়ে পরীক্ষা করতে বসলাম। কিন্তু অনেক পরীক্ষা করেও কোন বাদশাহের নাম বুঝতে পারলাম না। একটা শব্দ “আল্লাহ” মাত্র পড়তে পারলাম। বন্ধু আহমদী তখন ক্যাম্পে ছিলেন। তিনি ফিরে এলে তাঁর হাতে lens ও ঐ মোহর দিয়ে বললাম, “দেখ ত, কোন বাদশাহের মোহর।” তিনি অনেকক্ষণ উলটে পালটে দেখে হেসে উঠলেন, “ছপ্পর-বন্দ বাদশাহদের মোহর! এক আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন আরবী শব্দই নেই এর উপর।” একটু নিরাশ হলাম। আমার স্ত্রী মোহরটা তুলে রাখলেন, পরে গহনা গড়াবার কাজে লাগবে। মাস ছয়েক বাদে কিছু সোনার দরকার হওয়াতে সেটা বার করে এনে সোনারের হাতে দিলেন। সোনার তাকে যথারীতি ঘোরালে ফেরালে, কষ্টি পাথরে ঘষে পরখ করলে, তার পর নিয়ে চলে গেল। আমরা মনে করলাম, যাক্, মোহরটা কাজে লাগল! কিন্তু কাজে ত লাগল না। সোনার সেটাকে ভেঙ্গে দুখানা করে এনে দিলে। ভেতরটা মোটেই সোনা নয় কিন্তু এমন কোন মিশ্র ধাতু যে ঝাঁ করে হাতে ওজন ধরা পড়ে না। বাহিরে সোনার পাত তারই উপর আরবী হরফের হিজি-বিজি। সুন্দর কাজ সন্দেহ নেই, তবে কোন বড়মানুষ মার্কিনীকে বেচলেই পারত। শীতকালে ছপ্পর-বন্দ গ্রামে অনেকবার গেছি। বাহিরে থেকে মনে হত সব সাদাসিধে মানুষ, চাষ মজুরী করে খায়। তবে একটা বিষয় নজরে পড়েছিল বটে, যে গ্রামে জোয়ান বয়সের পুরুষ দেখা যেত না, কেবল ছেলে আর বুড়ো। বুড়োগুলোর নমাজ পড়ার কি ঘটা!

শ্রীচারুচন্দ্র দত্ত

ধর্ম্ম, যাদুবিদ্যা ও আর-আর ম্যারেট্

ইংলণ্ডের প্রধান নৃতত্ত্ববিদ্‌দিগের মধ্যে আর্ আর্ ম্যারেট্ যে অন্যতম সে-বিষয়ে বোধ হয় কাহারও মতভেদ নাই। টাইলার ও ফ্রেজারের পরেই হয় ত তাঁহার স্থান। তিনি ফ্রেজারের ন্যায় অনেক গ্রন্থ লিখেন নাই, কিন্তু যাহাই লিখিয়াছেন তাহাই পণ্ডিত সমাজে অত্যুৎকৃষ্ট ও শীর্ষস্থানীয় বলিয়া সমাদৃত। তাঁহার পুস্তকাবলীর মধ্যে "Threshold of Religion" বহুজনবিদিত, কিন্তু তদ্ব্যতীত তিনি "Anthropology", "Man in the Making", এবং গত তিন চারি বৎসরের মধ্যে আরও তিনখানি গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন যথা—"Faith, Hope and Charity in Primitive Religion", "Sacraments of Simple Folk" ও "Head, Heart and Hands in Human Evolution"। এই শেষ গ্রন্থখানি যদিও এখনও পর্য্যন্ত দেখিতে পারি নাই, তথাপি অপর গ্রন্থগুলি পড়া থাকায় তাঁহার মতামতের সঙ্গে আমি অল্পবিস্তর পরিচিত।

ম্যারেটের লেখার মধ্যে একটু বৈশিষ্ট্য আছে। তিনি একাধারে দার্শনিক ও নৃতত্ত্ববিদ্, এবং দর্শন চর্চ্চা করিতে করিতে নৃতত্ত্বে মনোনিবেশ করায়, তাঁহার লেখার প্রতি ছত্রেই প্রখর কল্পনাশক্তির নিদর্শন আছে। এই Imaginative Construction বা কল্পনানির্ম্মাণ বৈজ্ঞানিক বস্তু-তন্ত্রের পক্ষে সাধারণতঃ অনুপকারী বটে, কিন্তু ম্যারেট তাঁহার মেধাবলে সমস্ত বিঘ্নই অনায়াসে অতিক্রম করিয়া যথার্থ বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপরে তাঁহার কল্পনার বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছেন। ইংরাজ নৃতত্ত্ববিদ্-দিগের মত তাঁহার দৃষ্টিও অন্তরাভিমুখী ও মনস্তত্ত্বপ্রবণ; অধিকন্তু তিনি একজন অদ্ভুত কল্পনা-কৌশলী এবং নৃতত্ত্ববিদ্ হিসাবে কল্পনা-কৌশলই তাঁহার বিশেষত্ব। তাহার গ্রন্থগুলি ফ্রেজারের রচনাবলীর ন্যায় দীর্ঘ আয়তন অথবা বিষয়বৃত্তান্তের (Factsএর) অপূর্ব্ব সমাবেশ নহে তাঁহার কৃতিত্ব এই যে অপরে যাহা বহু চেষ্টায় ও পরিশ্রমে

আহরণ করিয়া পুঁথিজাত করিয়াছেন, তিনি তাহাই কল্পনাশক্তি ও গভীর অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে একেবারে নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিয়া পুনরায় জগতকে প্রত্যর্পণ করিয়াছেন।

ম্যারেট্ Religion সম্বন্ধে যে সব মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহাই এই প্রবন্ধের আলোচ্য। Religion বলিতে ইংরাজিতে যাহা বুঝায় তাহা বাংলা কোন কথায় সঠিক বুঝান যায় না। তবে ধর্ম্ম কথাটি Religion অর্থে ব্যবহার করিলেও করা যাইতে পারে, কারণ ধর্ম্মাধর্ম্ম যে শুধু কর্ত্তব্য-অকর্ত্তব্য ইত্যাদি লোকাচারসম্পর্কেই (Ethico-social Practice) ব্যবহার হয় তাহা নহে, শব্দটিকে আমরা সাম্প্রদায়িক অথবা ব্যক্তিগত faith অথবা বিশ্বাস-অবিশ্বাস সম্বন্ধেও প্রয়োগ করিয়া থাকি, যথা—হিন্দুধর্ম্ম, মুসলমানধর্ম্ম, খৃষ্টানধর্ম্ম প্রভৃতি।

ম্যারেট্ বলেন যাহাকে আমরা Religion অর্থাৎ সাম্প্রদায়িক বা ব্যক্তিগত বিশ্বাস-অবিশ্বাস বলি—অর্থাৎ যাহা আমরা পূজা, উপাসনা ইত্যাদি কথার দ্বারা সচরাচর প্রকাশ করিয়া থাকি—তাহা সভ্যতার নিম্নাবস্থায় যাদুবিদ্যা ইন্দ্রজাল প্রভৃতি হইতে অভিন্ন ছিল। অর্থাৎ মানুষ যতদিন সভ্য হয় নাই, ততদিন তাহার ধর্ম্মোপাসনাদি ছিল এক-প্রকার Magic বা যাদুবিদ্যা। ধর্ম্ম, দেবার্চ্চনা ইত্যাদির সঙ্গে যাদুকরী বিদ্যার প্রভেদ করা ম্যারেটের মতে অন্যায়। ইহারা একই কাণ্ডের দুইটি শাখা মাত্র। মূলে যাহা ধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হইত তাহাকে আর এক হিসাবে যাদুও বলা চলে। আবার যাহা এক সময়ে সম্মোহন কার্য্যে নিযুক্ত ছিল তাহার দ্বারা তৎকালীন ধর্ম্ম-উদ্দেশ্যও সাধিত হইত। কারণ ধর্ম্ম ও যাদুবিদ্যার ভিত্তি এক, এবং বিজ্ঞান প্রথম হইতেই পৃথক। যাহা প্রাকৃত বা দৃষ্টজগৎ-সম্বন্ধীয় তাহারই স্বরূপ নির্ণয়ে বিজ্ঞান চিরকাল আবদ্ধ; কিন্তু যাদু ও ধর্ম্ম অদৃষ্ট জগতের বার্ত্তাবহ। যাহা অপ্রাকৃত অতিপ্রাকৃত বা অনৈসর্গিক (supernatural), যাহা চর্ম্মচক্ষুর মাপকাঠিতে বিচার করা যায় না, তাহাই ছিল যাদু ও ধর্ম্মের বিষয়। যেখানে বিজ্ঞানের আলোক স্তিমিত, পঞ্চেন্দ্রিয়ের শক্তি ব্যহত, প্রকৃতির শৃঙ্খলা ও নিয়ম সম্পূর্ণরূপে

বার্থ, সেই অজানা, অদৃশ্য জগতেই ধর্ম্মের যথার্থ রাজ্য। এই অনৈসর্গিক রাজ্যে যাদু ও ধর্ম্ম, প্রথমতঃ নির্ব্বিশিষ্ট ভাবে বিরাজমান থাকিয়া সভ্যতার উন্নতির সহিত ক্রমশঃ স্বাতন্ত্র্যে অধিকারী হইয়াছে। সুতরাং প্রারম্ভে ধর্ম্ম ও যাদুবিদ্যার মধ্যে ব্যবধান না থাকিলেও পরিস্ফুট বা পূর্ণবিকশিত অবস্থায় ধর্ম্ম ও যাদু পরস্পর-বিশ্লিষ্ট হইয়া উভয়তঃ পৃথক ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। সহজ কথায় আদিতে ধর্ম্ম বলিতে যাহা বুঝাইত যাদু বলিতেও তাহাই বুঝাইত। ইহা ধর্ম্মের প্রাক্তন অবস্থার স্বরূপ। কিন্তু ধর্ম্মের উন্নতির সহিত উহা যাদু হইতে এতখানি সরিয়া গিয়াছে যে, আজ উভয়ের মূলগত সাদৃশ্যও কষ্টকল্পনা। সুধু ইহাই নহে। অসভ্যেরা যে-আচারকে যাদু ও ধর্ম্ম উভয় অর্থেই নিয়োগ করিত, তাহার উদ্দেশ্য ছিল সমষ্টির কল্যাণসাধন। যে-যাদু সমষ্টির অমঙ্গল ঘটাইয়া ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির সহায়তা করিত, তাহা কখনও ধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হইত না। অর্থাৎ বন্যদিগের দুই প্রকার যাদু-বিদ্যা—ব্যক্তিগত (Individualistic) ও সমষ্টিগত (Tribal, Social)। এই সমষ্টিগত যাদুই ছিল তাহাদের ধর্ম্ম বা ধর্ম্ম বলিতে এখন আমরা যাহা বুঝি। ব্যক্তিগত যাদু তাহাদের মতে একপ্রকার অনিষ্টকারী মায়াবিক বিদ্যা (Black Magic), যাহা ধর্ম্মের প্রতিকূল ও ধর্ম্ম হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্।

ফ্রেজারের মতে ধর্ম্ম যাদুর বিপরীত মার্গ—যাদু আদি মানুষের বিজ্ঞান। যাহা এখন বিজ্ঞান নামে পরিচিত এবং যাহার দ্বারা মানুষ প্রকৃতির স্বরূপ নির্ণয় করিয়া উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে অসভ্যদের নিকট তাহারই অপরিণত অবস্থা ছিল যাদু। সুতরাং যাদু বিজ্ঞানেরই রূপান্তর, এবং ইহাদের সহিত ধর্ম্মের কোনো সম্বন্ধ নাই ; কারণ যাদু বা বিজ্ঞানের দ্বারা মানুষ তাহার শক্তি প্রকাশ করিতে চাহে। যাদুকর ও বৈজ্ঞানিক প্রকৃতির রহস্যভেদ করিয়া তাহাকে মানুষের আজ্ঞাধীনে আনায় প্রয়াসী। কিন্তু ধর্ম্ম মানুষের অক্ষমতা ও হীনতার সাক্ষ্য, ধর্ম্ম অশক্ত মানুষের কাতর প্রার্থনা ব্যতীত আর কিছুই নহে। স্তব, স্তুতি, উপাসনা ইত্যাদিই ধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ, দেবতাকে স্তুতির দ্বারা সন্তুষ্ট করা,

তাঁহার নিকট সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করতঃ বিনয় অনুনয় দ্বারা তাঁহার কৃপা-ভিক্ষাই ধর্ম্মের মুখ্য উদ্দেশ্য। ধর্ম্ম বলিতে বুঝায় দেবতার অনুগ্রহে আপনার নিঃসহায়তা হইতে মুক্তি-লাভের চেষ্টা। নিজের শক্তি প্রয়োগে কিংবা কৌশল অবলম্বনে নৈসর্গিক বা অনৈসর্গিক শক্তির পরিচালনা ও তাহার ফলে স্বকার্য্য-সিদ্ধি, এ-সমস্তই ধর্ম্মের পরিপন্থী। কাজেই বিজ্ঞান ও যাদু ধর্ম্মাচরণের প্রতিবন্ধক, উভয় পদ্ধতিই আত্মম্ভরিতার বিকাশ, উহাদিগের মধ্যে পরমুখাপেক্ষা বা ভজন-পূজনের স্থান নাই।

ম্যারেট্ বলেন ফ্রেজারের এই মত অসঙ্গত। যাদুকে ধর্ম্ম হইতে একেবারে পৃথক করিবার মূলে এই ভ্রান্ত ধারণা রহিয়াছে যে যাদু আত্মশক্তির সাহায্যে স্বীয় অভিলাষ পূরণে বদ্ধপরিকর, এবং ধর্ম্ম দেবতার নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া দৈববলে বিধাতার অভিপ্রায় সম্পাদনে উৎসুক। যেখানে যাদু বলিতে চাহে, 'আমার কামনা সিদ্ধ হউক', সেখানে ধর্ম্মের উক্তি হইতেছে, "তাঁহারই ইচ্ছা পূর্ণ হউক"। আত্মনির্ভরতাই হইতেছে যাদুর মূল মন্ত্র। আর ঈশ্বরের শরণাপন্ন হওয়াই ধর্ম্মের মুখ্য উদ্দেশ্য। যাদু ও ধর্ম্মের পার্থক্য সম্বন্ধে এই যে মূল ধারণা রহিয়াছে ইহা ম্যারেটের মতে ভ্রান্ত কুসংস্কার মাত্র। কারণ যাদু যে শুধু আত্মপ্রতিষ্ঠাতেই ব্যস্ত, তাহা নহে; যাহা বাহ্যতঃ শক্তিমানের আদেশ বলিয়া মনে হয় তাহাও অনেক সময় আন্তরিক মিনতিরই ছদ্মবেশ মাত্র; এবং যেখানে যাদু মন্ত্রের আকার ধরে, সেখানে একের ইচ্ছাশক্তি অপরের ইচ্ছাশক্তির সাহায্য প্রত্যাশা করে। এই একের শক্তির দ্বারা অপরকে অভিভূত করিবার চেষ্টা প্রথমতঃ আজ্ঞাকারে প্রকাশ পাইলেও ক্রমপরিণতিতে তাহাই মিনতি, অনুনয়, বিনয় রূপে প্রকট হয়। অতএব যাহা একদিক হইতে আদেশ বা ক্ষমতার অভিব্যক্তি তাহাই আর একদিক হইতে দেখিলে মিনতি, প্রার্থনা, স্তুতি ইত্যাদিরই রূপান্তর বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। তাহা ছাড়া আরও এক কথা আছে। অসভ্যেরা শুধু যে মন্ত্র উচ্চারণ করিয়াই নিরস্ত হয় তাহা নহে। তাহারা উচ্চারণের সহিত যে উদ্দেশ্যে

যাতুশক্তি নিয়োগ করিতেছে তাহারও অভিনয় করে। ফলতঃ দর্শকের মনে এই প্রতীতি জন্মে যে তাহারা স্বশক্তি প্রয়োগ করিয়া নিজেদের কার্য্যসিদ্ধির প্রয়াস পাইতেছে। কিন্তু দর্শকগণ অসভ্যদিগের এই আচরণের কেবল বাহিরটিই দেখিতে পান। যদি তাঁহারা উহাদের মনের ভিতর প্রবেশ করিতে পারিতেন তাহা হইলে বুঝিতেন যে অসভ্যেরা ঐ যাতু-মন্ত্রে ঐশী শক্তিরই শরণাপন্ন হইতেছে। তাহাতে দম্ভ বা আত্মনিষ্ঠার কিছুই নাই। সুতরাং যাহা বাহিরে যাতুশক্তির সদর্প নিয়োগ বলিয়া বোধ হয় তাহার প্রকৃত রূপ হইতেছে—মিনতি ও অনুনয়। যাতুর বাহ্য দৃপ্তি লক্ষ্য করিয়া যাঁহারা যাতুকে ধর্ম্ম হইতে পৃথক ভাবেন, তাঁহারা ভ্রান্তির বশীভূত হইয়া আপনাদের অন্তর্দ্দৃষ্টির অক্ষমতারই পরিচয় দেন।

ম্যারেটের মতামত আলোচনা করিতে হইলে ইহা অবশ্যস্বীকার্য্য যে ফ্রেজারের সহিত তাঁহার মতদ্বৈত আংশিক ভাবে সত্য হইলেও একেবারে নির্দ্দোষ নহে। তিনি ধর্ম্মের যে লক্ষণ দিয়াছেন তাহার প্রধান ত্রুটি এই যে সেই লক্ষণ সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্ম সম্বন্ধে প্রযোজ্য নহে। লক্ষণ বা Definition সকল লক্ষ্যবৃত্তি না হইলে অলক্ষণ বা লক্ষণ-আভাস স্থানার্হ। গাভীর লক্ষণ দিতে গিয়া কেহ যদি বলেন, "গাভী একপ্রকার শুভ্রবর্ণ পশু", তাহা হইলে তাঁহার লক্ষণ অলক্ষণ বা লক্ষণ-আভাস স্থানীয় হইয়া যায়, কেননা কৃষ্ণবর্ণ গাভীও সুলভ। অর্থাৎ এমন গাভীও আছে যাহাতে উক্ত গাভীর লক্ষণ প্রয়োগ করা চলে না। সেইরূপ ধর্ম্মের লক্ষণ বলিতে গিয়া যদি এরূপ লক্ষণ দেওয়া হয় যাহা সকল ধর্ম্ম সম্পর্কে খাটে না, তবে তাহাকে আর ধর্ম্মের লক্ষণ বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। ম্যারেট্ বলেন যে ধর্ম্মের অধিকার হইতেছে এক অজানা অদৃশ্য রাজ্যে যাহা এই দৃষ্ট জগতের একবারে বাহিরে। কিন্তু এই লক্ষণ যে সকল ধর্ম্মে প্রয়োগ করা চলে না তাহা বিশেষ করিয়া দেখাইবার প্রয়োজন নাই। এমন ধর্ম্মও আছে যাহার সম্বন্ধ এই দৃষ্ট জগতেরই সহিত এবং যাহাতে অনৈসর্গিক বা অপ্রাকৃত কিছুরই কোনরূপ স্থান নাই। কঁৎ (Comte) যে ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন

তাহা দৃষ্ট মানবেরই পূজা ও তাহাতে অদৃষ্ট বা অপ্রাকৃতির কোনরূপ স্থান ছিল না। তাঁহার এই ধর্ম্ম বহুলোকে গ্রহণও করিয়া ছিল এবং এখনও অনেকে আছেন যাঁহারা নিজদিগকে 'পজেটিভ' ধর্ম্মাবলম্বী বলিতে কুণ্ঠিত নহেন। সুতরাং ধর্ম্ম যে কেবল অদৃশ্য ও অজানা জগত লইয়াই থাকে এ-কথা মনে করা কঠিন। আজকাল বৈজ্ঞানিক-দিগের মধ্যেও অনেকে দৃষ্টজগতের ভিতর দিয়াই ধর্ম্মকে পাইবার প্রয়াসী দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহাদের মতে ধর্ম্মে অলৌকিক বা অপ্রাকৃতের কোনও স্থান নাই। যাহা লৌকিক বা প্রাকৃত তাহারাই মধ্যে ধর্ম্মের সমস্ত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে। জুলিয়ান হাক্সলে (Julian Huxley) এইরূপ মত সমর্থন করিয়া বিজ্ঞানকেই ধর্ম্মের স্থানে প্রতিষ্ঠিত করতঃ শ্রুতি (Revelation) বর্জ্জিত এক নূতন ধর্ম্মের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ইহা তাঁহার ব্যক্তিগত মত হইলেও এমন অনেকে আছেন যাঁহারা ইহার সমর্থনে প্রস্তুত। অতএব ধর্ম্মকে কেবল পারলৌকিক বা অলৌকিক পর্য্যায়ে আবদ্ধ রাখিলে ধর্ম্মের স্বরূপের সঙ্কোচ ঘটে।

ম্যারেট্ আরও বিশ্বাস করেন যে অসভ্যেরা যাহাকে ধর্ম্মার্থে ব্যবহার করে তাহা এক অদৃশ্য অতিপ্রাকৃত জগৎবিষয়ক। কিন্তু এ-মতও সম্পূর্ণ সঙ্গত নহে। অপ্রাকৃত বা অতিপ্রাকৃতের ধারণা তখনই সহজসাধ্য যখন প্রাকৃতের জ্ঞান বেশ পরিষ্কার। প্রাকৃতের সম্বন্ধে যে অসভ্যদের কোন সুস্পষ্ট বোধ আছে বা কখন ছিল, একথাও জোর করিয়া বলা যায় না। অবশ্য ম্যারেট-এর বিশ্বাস যে অসভ্যদের "ইন্দ্রিয়শক্তি" (ঘ্রাণ, শ্রবণ, দৃষ্টি আদি) আমাদিগের অপেক্ষা সমধিক প্রখর, এবং ভেষজ-বিদ্যাতেও তাহারা বিশেষ ব্যুৎপন্ন। কারণ গাছ গাছড়া চিনিতে ও গুণাগুণ অনুযায়ী তাহাদিগকে ঔষধার্থে প্রয়োগ করিতে তাহারা যে জ্ঞানের পরিচয় দেয় তাহা কখনই অবোধ বা অজ্ঞের পক্ষে সম্ভব নহে। ম্যারেটের এই যুক্তি কিন্তু সম্পূর্ণ ন্যায্য বলিয়া মনে হয় না। জন্তু জানোয়ারদিগের মধ্যেও গাছ গাছড়া সম্বন্ধে একপ্রকার অস্পষ্ট বা অন্ধ বোধ (Instinct) দেখিতে পাওয়া যায়।

তাহাদের ঘ্রাণাদির শক্তিও অনেক সময় আমাদিগের অপেক্ষা তীক্ষ্ণ। উড্ডীয়মান খেচরও ভূধরস্থ আহার লক্ষ্য করিয়া তদাহরণে সচেষ্ট হয়, তাহার দৃষ্টি যে মানবদৃষ্টি হইতে অধিক শাণিত তাহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু তাই বলিয়া একথা সত্য নহে যে ঐ সকল পশুপক্ষীর মধ্যে প্রাকৃতের সুস্পষ্ট বোধ আছে। অসভ্যদের বিষয়েও এই যুক্তি কিয়ৎ পরিমাণে খাটে। তাহাদের দৃষ্টি সূক্ষ্ম হইতে পারে, শ্রুতি অতি সজাগ হইতে পারে, ওষধির সম্বন্ধে তাহারা বিশেষ পটুতার পরিচয় দিতে পারে—কিন্তু ইহা হইতে প্রমাণ হয় না যে তাহারা প্রাকৃত বিষয়ক কোনো বিশেষ জ্ঞানে অধিকারী।

ম্যারেট যাদুকে ধর্ম্মের সহিত অভিন্ন প্রমাণ করিতে গিয়া যে দুই প্রকার যাদুর উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাও ধর্ম্ম সম্বন্ধে একটি ভ্রান্তি হইতে উৎপন্ন। ম্যারেটের মতে দুইপ্রকার যাদুর মধ্যে যাহা ব্যক্তিগত (Individualistic) তাহা হইতেছে অসভ্যদের একপ্রকার অনিষ্টকারী মায়াবী বিদ্যা যাহাতে ধর্ম্মের কোন স্থান নাই। কেবল সেই যাদুই ধর্ম্ম স্থানীয় যাহা সর্ব্বসম্মতিক্রমে সমষ্টির হিতার্থে (Tribal ends) সম্পাদিত। কিন্তু ধর্ম্ম সর্ব্বত্র কেবল সমষ্টির হিতার্থেই নিয়োজিত হয় না—তাহার দ্বারা ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যও মাঝে মাঝে সিদ্ধ হয়। অর্থাৎ ধর্ম্ম মাত্রকে একটি সাম্প্রদায়িক ব্যাপার বলা যায় না—যাহাতে দশেরই হিত সাধিত হয়। যাহা ব্যষ্টিমূলক, যাহাতে একের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়, দশের কার্য্য হয় না—তাহাও কচিৎকদাচিৎ ধর্ম্ম হইতে পারে। ম্যারেটের মতে ইহাই সিদ্ধ হইতেছে যে ধর্ম্ম বা Religion একপ্রকার হিতকর লোকব্যবহার অথবা সমাজিক নীতি মাত্র (Morality)। কিন্তু এই মত স্বীকার করিতে হইলে বলিতে হয় যে ব্যক্তিগত ধর্ম্ম ধর্ম্মই নহে, সুতরাং যোগ সাধন ও অন্যান্য প্রকার ব্যক্তিগত অলৌকিক অনুভূতি (mystical experience) আর ধর্ম্ম পদবাচ্য নহে। কিন্তু আজকাল এই অলৌকিক অনুভূতিরূপ Mystical Religionই ধর্ম্ম হিসাবে শ্রেষ্ঠ বলিয়া অনেক বৈজ্ঞানিকও স্বীকার করিতেছেন (Eddington, Arthur Thompson), আর এই যোগ বা Mysticism

যে একপ্রকার ব্যক্তিগত ব্যপার তাহাও অবিসংবাদিত। দশের সহিত পূজা করিয়া দশের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করা যোগ সাধন নহে। তাহাতে একের দ্বারা একের উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হয় এবং যোগকে ধর্ম্ম বলিয়া অস্বীকার করা ধর্ম্ম সম্বন্ধে অজ্ঞতারই পরিচায়ক। ধর্ম্ম ব্যক্তিগতও হইতে পারে আবার সাম্প্রদায়িক হইতে পারে। ইহাতে দেবপূজার স্থান আছে, আবার ধ্যান, ধারণা, সমাধি আদিরও স্থান আছে। ইহার প্রকার ভিন্ন হইলেও ভিতরে সার বস্তু এক। যেমন মানুষকে শুধু সিতাসিতে বিভক্ত করিলে তাহার বর্ণ সম্বন্ধে অযথা সঙ্কোচ প্রকাশ পায় (কারণ বাদামি মানুষও বিরল নহে) সেইরূপ ধর্ম্মকে কেবল সাম্প্রদায়িক বলিলেও ধর্ম্মের প্রকৃত স্বরূপ অযথা সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়ে। যাহাতে মানুষ তাহার নিঃসহায়তা হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারে, যাহা মানুষকে মিথ্যা হইতে নিষ্কৃতি দিয়া সত্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করে, তাহাই ধর্ম্ম ও প্রকৃত ধর্ম্ম-স্থানীয়। তাহা ব্যক্তিগতও হইতে পারে, সমষ্টিগতও হইতে পারে। যাহাতে ব্যক্তি তাহার নিঃসহায়তা হইতে মুক্তি পায় তাহা হইতেছে ব্যক্তিগত ধর্ম্ম ; যাহাতে সমষ্টি তাহার অসহায়তা হইতে পরিত্রাণ লাভ করে তাহা হইতেছে সমষ্টিগত ধর্ম্ম। ধর্ম্ম মানুষের অসহায়তা ও হীনতা হইতে মুক্তির উপায় এবং যে উপায়েই মানুষ এই উদ্দেশ্য সাধন করিতে পারে তাহাই ধর্ম্ম-স্থানীয়। যাহারা মনে করে দেবতার কৃপা লাভে মানুষ মুক্ত হইবে, তাহাদের পক্ষে দেব উপসনাই ধর্ম্ম। আবার যাহারা যাদু বা বিজ্ঞান দ্বারা প্রকৃতিকে আজ্ঞাধীন করিয়া মুক্তি লাভের প্রয়াসী তাহাদের পক্ষে যাদু বা বিজ্ঞানই ধর্ম্ম-নামীয়। আবার এই উভয়কেই পরিত্যাগ করিয়া যাহারা যোগ-বলে প্রকৃতি পুরুষ বিবেক বা ব্রহ্মাত্মৈকত্ববিজ্ঞান দ্বারা মুক্তি লাভে তৎপর তাহাদের পক্ষে যোগ সাধনাই ধর্ম্ম। ধর্ম্মের বাহ্য রূপ নানা হইলেও ভিতরে সকল প্রকার ধর্ম্মই এই মুক্তিলাভের চেষ্টা মাত্র। যাঁহারা ধর্ম্মের বাহ্যিক কোন একরূপকে তাহার সার বস্তু বলিয়া গ্রহণ করতঃ আস্ফালন করেন তাঁহারা ধর্ম্মের প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ।

শ্রীসুশীল কুমার মৈত্র

সংস্কৃতি-সঙ্কট

......"Please, will you
Give us a light?
Light
Light." (T. S. Eliot, "Triumphal March.")

আধুনিক সাহিত্যের যাঁরা খোঁজ রাখেন, তাঁদের জান্‌তে আর বাকী নেই যে সেখানে গানের ধুয়োর মত এই ধরণের কথা নানা ছদ্মবেশে দেখা দি'চ্ছে। যার পায়ের ধ্বনি শোনার জন্য কবিরা উৎকর্ণ হয়ে রয়েছেন, তার স্থলে আস্‌ছে, এলিয়টের ভাষায়—

"5,800,000 rifles and carbines,
102,000 machine guns
28,000 tench mortars,
53,000 field & heavy guns,
I cannot tell how many projectiles, mines & fuses,
13,000 aeroplanes,
24,000 aeroplane engines,
50,000 ammunition wagons,
now 55,000 army wagons,
11,000 field kitchens,
1,150 field bakeries.
What a time that took. Will it be now? No."

কবিতার পথ আজ আর কুসুমাস্তীর্ণ নয়, লীলাসঙ্গিনীর কঙ্কণ-ঝঙ্কার পূর্ব্বস্মৃতি মাত্র হ'য়ে পড়্‌ছে, বসন্তের বকুলগন্ধ তার মাদকতা হারিয়ে ফেল্‌ছে। অরসিকের প্রলাপ বলে' যাঁরা একথা উড়িয়ে দেবেন্, তাঁদের বিদ্রূপ উপেক্ষা করেও আমাদের দেশে বিশেষ করে বলার প্রয়োজন যে বর্ত্তমান সংস্কৃতির বাস্তব ভিত্তি নানা ঐতিহাসিক কারণে শিথিল হ'য়ে আস্‌ছে বলে ধর্ম্ম, দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্য—সর্ব্বত্রই জরার চিহ্ন প্রকট হয়েছে। এলিয়টের মত যথার্থ চক্ষুষ্মান্ তাই

বর্ত্তমানকে যথাসাধ্য বর্জ্জন করে প্রাচীনের মহিমা পুনঃ প্রচার করছেন, নিজেকে জ্ঞাতসারেই মায়ামুগ্ধ করছেন, যুগধর্ম্ম প্রত্যাখ্যান করে আশ্রয় নিচ্ছেন এক বাতাহত শৈলের ছায়ায়, ক্যাথলিক চার্চ্চকে বরণ করে। আমাদের মনে পড়ে বাইব্‌লের সেই আখ্যানের কথা—"rock"-এর ওপর বীজ পড়্‌লে সূর্য্যরশ্মিও তাকে প্রাণ দিতে পারে না।

গত পাঁচ শ বছর যে সংস্কৃতি পশ্চিমে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে, যা'র প্রতিফলিত ভাতি দেখে আমরা মুগ্ধ, যা অনুকরণ ও আমাদের সমাজে সংযোজন করতে আমরা ব্যস্ত, সেই সংস্কৃতি এখন যেন ব্যাধিগ্রস্ত। রোজ সকালে একবার কষ্ট করে' খবরের কাগজখানা খুল্‌লেই মনে হবে যে নানা দেশের শাসনভার যাদের হাতে, তাদের মধ্যে বাতুলতা বুঝি সংক্রামক। যুদ্ধবিরতি সকলেরই কামনা, যুদ্ধোদ্যোগ সকলেরই কর্ত্তব্য! যাঁরা ভবিষ্যতের ছবি আঁকছেন, তাঁরা এখন রামরাজ্য কল্পনা ছেড়েছেন; Wellsএর 'Things to Come' দেখে মনে হবে যে ও ব্যাপারের ফিল্‌ম্‌ই ভাল, বাকি সবই ভয়াবহ। আগামী যুদ্ধ হবে সভ্যতার সমাধি। একথা কয়েক বছর ধরে শোনা যাচ্ছে। অবিশ্বাসও করা যায় না। সমসাময়িক ইতিহাসকে অবজ্ঞা করে যাঁরা তথাকথিত কৃষ্টির চর্চ্চা করে চলেছেন, তাঁরা নিজেদের মুক্তপুরুষ ভেবে' আত্মতুষ্টি পান্‌ বটে, কিন্তু তাঁরা জীবন থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ছেন, তাঁদের রূপসৃষ্টি হবে প্রাণহীন। তাঁদের কাছে অর্থহীন লাগ্‌বে Wilfrid Owenএর কথা—

> All the poet can do today is to warn.
> That is why the true Poets must be truthful.

সম্প্রতি অধ্যাপক জুলিয়ান্‌ হাক্সলি এক বক্তৃতায় ধনতন্ত্রবাদের প্রাধান্য সমাজ-সেবায় বিজ্ঞানের প্রয়োগকে কি ভাবে ব্যর্থ করছে তা'র বহু দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। মনোবিজ্ঞানকে সমাজের কাজে লাগানো হচ্ছে না, কৃষি-বিদ্যার উন্নতিকে চেপে রাখা হচ্ছে; অজুহাত অবশ্য অর্থাভাব, কিন্তু যুদ্ধ ও যুদ্ধোদ্যোগের বেলায় সে অজুহাত অন্তর্দ্ধান করে! অর্থবান্‌দের অর্থবৃদ্ধিই যেন জ্ঞান-চর্চ্চার একমাত্র বৈধ উদ্দেশ্য।

Baconএর সময় হতে জ্ঞানের যে অভিযান মানবজাতির গর্ব্ব ছিল, আজ তা প্রতিহত হচ্ছে। Spengler, Spann, Walter Eucken প্রভৃতি "idea of development"-কে অস্বীকার করছেন। বহু দার্শনিকের মধ্যে ধর্ম্মতত্বের (theology) প্রতি উৎসাহ ও অনুরাগ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে ধর্ম্ম ও বিজ্ঞানের একটা সামঞ্জস্য স্থাপনের চেষ্টা প্রায়ই চলেছে; অনেকে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করার জন্যে উঠে' পড়ে লেগেছেন। বিচারগ্রাহ্য জ্ঞানের স্থলে আস্‌ছে গূঢ়ার্থবাদ (mysticism) অপরোক্ষানুভূতি (intuition), occultism। ফলিত জ্যোতিষের প্রতিপত্তি বাড়ছে। ফ্যাশিষ্ট্ দেশে যে রকম পণ্ডিতী প্রলাপ ও বুজরুকি প্রকাশ হচ্ছে, তার তুলনায় Jeansএর "mathematical god" অত্যুচ্চ কল্পনা মনে হবে। জার্ম্মানীর আজকালকার নতুন আমলে চিন্তাশীল বলে খুব নাম করেছেন H. Blank; তিনি বল্‌ছেন, What need has the German nation of the science of Darwin, Virchow, Du Bois, Raymonde, Haeckel, Planck and Einstein, which have torn the ties between the soul and God?......We rather want a world philosophy which is reproached with being barbarous, because, be it noted, we consider one of our best fighting calls the one "back to barbarism!" proclaimed in recent years। আজ ইয়োরোপের সব চেয়ে "শিক্ষিত" দেশে সংস্কৃতি উৎপাটনের চেষ্টা চলেছে, শ্রেষ্ঠ লেখকদের বই ঘটা করে পোড়ানো হচ্ছে, শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকদের বহিষ্কৃত করা হচ্ছে, "race theories" বলে এমন সব উপদেশ প্রচার হচ্ছে যা মধ্যযুগেও অগ্রাহ্য হত।

সমাজে অভিজাত অনভিজাতের পার্থক্য সনাতন ও শ্রেয়, যারা আজ নিঃস্ব, অধিকার-বঞ্চিত, তাদের আশাও যে অপরাধ, এ কথা প্রায়ই শোনা যাচ্ছে। আরাকি একবার জাপানীদের (অর্থাৎ জাপানী ধনিকদের) শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে গিয়ে বিভিন্ন জাতিকে বিভিন্ন পর্য্যায়ের

কুকুরের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। সে যাই হোক্, শ্রেণীভেদকে Pareto, Gentile, Spann, Rocco প্রভৃতি সমর্থন করেছেন ও করছেন, সকল মানুষের অধিকারসাম্য যে সভ্যতার উদ্দেশ্য, তা অস্বীকার করছেন। সুতরাং আশ্চর্য্য হলে চল্‌বে না যে Spenglerএর মত লেখক গরিলাপ্রকৃতির আদিম মানবের ক্রোধ, বীর্য্য, নিষ্ঠুরতার প্রশংসায় শতমুখ। তাই আমরা আজ পড়্‌ছি: "The soul of this Lonely One is militant throughout, suspicious, jealous with respect to its power and its acquisitions. It knows the stormy excitement when the knife cuts into the body of the enemy, the smell of blood and the cry of mortal agony evoke the feeling of triumph. Every real man, even in the cities of late civilisations feels within himself at times the latent fire of this primitive soul"। Spenglerএর সম্প্রতি লেখার এই যখন নমুনা, তখন এ তো স্বাভাবিক যে ফ্যাশিষ্ট্ নাট্যকার Johst বল্‌বেন, "When I hear the word 'culture', I cock my revolver"।

সংস্কৃতি-দ্রোহ আজ ব্যাপক ভাবে দেখা দিয়েছে; Julien Benda-র ভাষায় "la trahison des clercs" এযুগের লক্ষণ। কিন্তু সভ্যতার পুরোহিতেরাই কেন এ বিদ্রোহে যোগ দিচ্ছেন, তার কারণ বোঝার চেষ্টা তেমন নেই। সে চেষ্টার ফলে আমরা দেখব যে ধনতন্ত্র-বাদের বিপদ যেখানে বেশী, যেখানেই বর্ত্তমান সমাজ-ব্যবস্থাকে রক্ষা করার জন্যে ফ্যাশিজ্‌ম্ উদ্যত হয়েছে, যেখানেই ভবিষ্যৎকে নতুন ক'রে গড়ে তোলা হ'চ্ছে অপরাধ, সেখানেই সংস্কৃতি বিশেষ বিপন্ন। একথা যাঁরা ভুলে যাচ্ছেন, তাঁরা উটপাখীর মত বালিতে মাথা গুঁজে ভাবছেন যে ঝড় কেটে যাবে তাঁদের স্পর্শ না করে। যখন ইতিহাস তাঁদের পরীক্ষা করবে, তখন কোন্ পক্ষে তাঁদের দেখা মিল্‌বে, সে সম্বন্ধে জোর করে বলা যায় না। ঝড় আস্‌ছে জেনেও তাঁরা তৈরী হ'চ্ছেন না, কারণ আসলে তাঁরা চান্ না যে ঝড় আসে, যে আমাদের সমাজের রূপ

বদলায়। তবে ইতিহাস তাঁদের ইচ্ছা অনিচ্ছার অপেক্ষা করবে না; যে বিপ্লব শুধু প্রলয় আনবে না, করবে নতুন সৃষ্টি, সে বিপ্লবের আগমনী আজ আমরা শুনছি।

* * * *

সাহিত্যক্ষেত্রে সংস্কৃতি-সঙ্কট বোঝাতে গেলে বলা হয় যে মোটের উপর আধুনিক সাহিত্য হচ্ছে বুর্জ্জোয়া (bourgeois) ও জরিষ্ণু (decadent)। এই দুটো কথার প্রতি অনেকেরই বিরাগ, আর স্বীকার করতে হবে এগুলো একটু বেশী 'যত্রতত্র' ব্যবহার করা হয়েছে। প্রথমেই আমাদের মনে রাখতে হবে যে কোন লেখককে বুর্জ্জোয়া বা 'decadent' বলার মানে তাদের উড়িয়ে দেওয়া নয়। Proust বা Joyce সম্বন্ধে ঐ বিশেষণ প্রয়োগ যখন করা হয়, তখন কেউই তাঁদের প্রতিভা অস্বীকার করে না। কোন লেখককে বুর্জ্জোয়া বলার একটা অর্থ এই যে তিনি ঐ শ্রেণীর সম্বন্ধে ও ঐ শ্রেণীর জন্যে লিখে থাকেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে লেখক স্বয়ং ঐ শ্রেণীরই একজন, কিম্বা D. H. Lawrence-এর মত শ্রমিক শ্রেণীতে জন্ম সত্ত্বেও সমাজের উচ্চস্তরে উঠেছেন। এর চেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে যাঁদের আমরা বুর্জ্জোয়া লেখক বলি, তাঁদের লেখায় এমন একটা বৈশিষ্ট্য আছে যার সংজ্ঞা দেওয়া কঠিন, কিন্তু সে বৈশিষ্ট্য যথার্থ সাহিত্যানুভূতির কাছে ধরা পড়তে বাধ্য। D. H. Lawrence-এর প্রতিভাকে যে মিস্‌টিসিজমের ঢেউ এসে অনেক সময় মুখোস পরিয়ে দিত, "blood consciousness" আর "thinking with one's thighs" সম্বন্ধে বক্তৃতা তাঁর মুখ দিয়ে বা'র করা'ত, তার কথা আমাদের বুর্জ্জোয়া সাহিত্য সম্বন্ধে মনে পড়ে। আবার মনে পড়বে Proust-এর লেখার কথা, যেখানে আছে ফরাসী সমাজের এক আনুবীক্ষণিক বিভাগ সম্বন্ধে অনুপম, গভীর ও ব্যাপক ব্যবচ্ছেদ, কিন্তু সেই সঙ্গে আছে ঐ বিভাগের বহির্ভূত যা কিছু তার প্রতি সম্পূর্ণ ঔদাসীন্য। এ ধরণের সাহিত্যসৃষ্টি হ'য়ে থাকে সভ্যতার একটা যুগাবর্ত্তের সময়; 'byzantinism' কথাটা এই ভাব প্রকাশের জন্যেই ব্যবহার করা হয়। আবার জোর করে

বলা দরকার যে যখন Proust বা Joyce-কে "decadent" বলা হয়, তখন একেবারেই তাঁদের অসামান্য প্রতিভা অস্বীকার করার চেষ্টা বা ইচ্ছে থাকে না। এমন কি "decadence"-এর কতকগুলি বিশেষ গুণ থাকে যা সুস্থ লেখায় নেই। চরিত্র বা ঘটনা বিশ্লেষণে "decadent" লেখকদের শক্তি ও অনুভূতি দেখে মনে হয় যে তাঁরা বুঝি এক ষষ্ঠেন্দ্রিয়ের অধিকারী; Virginia Woolf-এর লেখার সঙ্গে পরিচয় থাকলে কথাটার অর্থ সহজে পরিষ্কার হবে। তবে ভুল্‌লে চল্‌বে না যে তাঁরা যে যুগকে সাহিত্যরূপ দিচ্ছেন সে যুগ সমাপ্ত-প্রায়, শুধু সূর্য্যাস্তের বর্ণচ্ছটার মত তাঁদের সৃষ্টি এখনও আমাদের মুগ্ধ করছে।

আরও বলা দরকার যে কাউকে বুর্জ্জোয়া লেখক বলা মানে এই নয় যে তিনি জ্ঞাতসারে ধনতন্ত্রবাদকে সমর্থন করে যাচ্ছেন। পক্ষান্তরে তিনি ধনতন্ত্রবাদ বা বুর্জ্জোয়াজি সম্বন্ধে কোন বিশেষ ভাবই পোষণ করেন না, তাঁর কাছে কথাগুলো একরকম নিরর্থক, কানে পৌঁছে ফিরে যায়। এর কারণ তাঁর সঙ্গে ধনিক সভ্যতার অঙ্গাঙ্গি সম্বন্ধ; স্বতশ্চল হয়ে অজ্ঞাতসারে, নিষ্কপটভাবে তাঁর যুগের লক্ষণকে তিনি সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্যের ছাপ লাগিয়ে প্রকাশ করছেন। Walter de la Mare বা W. H. Davies-এর মধুর কবিতা পড়ার বেলায় এ কথা আমাদের মনে আসে। তাঁদের বুর্জ্জোয়া বলে নিন্দা করার উদ্দেশ্য আমাদের কিছু মাত্র নেই; কথাটা ব্যবহারের কারণ এই যে তা হচ্ছে আমাদের অর্থনির্দ্দেশের একটা অপরিহার্য্য উপায়।

অধিকাংশ সাহিত্যতাত্ত্বিক এখনো ভাবেন যে শিল্প ও সাহিত্য অভেদ্য বেড়ার পেছনে রাখা আছে, জীবনের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক নেই, দৈনন্দিন ব্যাপারের মালিন্য ও অশুদ্ধি থেকে তাকে সরিয়ে রাখা হয়েছে, তার অধিষ্ঠান কোন এক সুরম্য শূন্যদেশে যেখানে বাস্তবতা একেবারেই অস্পৃশ্য। তাঁদের মনে করিয়ে দেওয়া যায় Trotsky'র কথা—

"Artistic creation is always a complicated turning inside out of old forms, under the influence of new stimuli which originate outside of art. In this large sense of the word, art is a handmai-

den. It is not a disembodied element feeding on itself but a function of social man indissolubly tied to his life and environment."

* * * *

সাহিত্যরস সেচন করে যারা মনকে একেবারে নিদ্রিত করে রাখে নি, তারা বর্ত্তমান "decadent", "bourgeois" সাহিত্য থেকে আনন্দ পায় না, এ কথা বলার বা ভাবার কোন প্রয়োজন নেই। তবে তারা বল্‌বে যে শুধু তাদের প্রায়ই মনে হয় Shaw'র কথা, "Yes this silly house, this strangely happy house, this agonising house, this house without foundations. I shall call it Heartbreak House."

Proustএর মত বিরাট শিল্পীর লেখায় সমসাময়িক সভ্যতার জীর্ণপ্রায় মূর্ত্তি প্রতিভাত হ'য়েছে। ফরাসী সমাজ সন্দর্শনে বেরিয়ে তিনি যাদের জীবন ব্যবচ্ছেদ করে দেখ্‌লেন, তারা সকলেই সম্ভ্রান্ত শ্রেণীস্থ, তাদের মধ্যেই সংস্কৃতির ছাপ আমরা আশা করতে পারি। কিন্তু Proustএর অন্বেষণের ফল হল এক "Odyssey of Snobbery"; সমাজে যে কদর্য্যত্ব, যে শৈথিল্য ব্যাপক হয়েছিল, তা তিনি অপাবৃত করে দিলেন। পৃথিবীর যে জাতি সভ্যতায় শ্রেষ্ঠ, সেই জাতির সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর মধ্যে তিনি দেখলেন পূতি, দেখলেন জরা। Duchesse de Guermentes, Odette de Crecy, Madame de Villeparaise, Madame Verdurin—এরা সবাই মনে করিয়ে দেয় যে তাদের যুগ, তাদের সমাজ, তাদের সংস্কৃতি—সবই যেন মুমূর্ষু। প্যারিসের ওপর যখন গোলা পড়ছে, তখন যেন শহরের সঙ্গে সমাজও ধ্বংসোন্মুখ। Proustএর লেখা থেকে মনে হয় যে তার অপরূপ দীপ্তি হ'চ্ছে অস্তগামী সূর্য্যের শেষ কিরণের মতই সুন্দর ও করুণ।

D. H. Lawrence ও Proustএর মধ্যে লেখক হিসেবে প্রভেদ খুবই বেশী, কিন্তু লরেন্‌সের বেলাতেও দেখা যায় যে দেশের সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর জীবন দেখে তিনি Proustএর মতই রিপোর্ট দিলেন; দুজনেই

দেখলেন যে ওপরে আছে ক্ষয় আর অবসাদ। লরেন্‌সের বিরাট শক্তি তাই যেন প্রতিহত হয়ে গেল; নরনারীর সম্পর্ক নিয়ে একটা নতুন মিস্‌টিসিজমে গিয়ে তিনি আশ্রয় নিলেন। লরেন্‌সের লেখার যাঁরা অনুকরণে ব্যস্ত, তাঁদের সাহিত্য হল পুরোপুরি জীবন ছেড়ে পলায়নের সাহিত্য।

Aldous Huxley'-র লেখায় আমরা তাঁর মার্জ্জিত মনের সাক্ষাৎ পেয়ে থাকি; ইয়োরোপীয় সংস্কৃতির সঙ্গে তাঁর গভীর পরিচয়। কিন্তু সে লেখার সর্ব্বত্র এমন একটা আবহাওয়া ছড়িয়ে রয়েছে যা' সাক্ষ্য দিচ্ছে সমাজের জীর্ণপ্রায় অবস্থা সম্বন্ধে। চিন্তার দৈন্য, অনুভূতির মূঢ়ত্ব, সর্ব্বব্যাপী ব্যর্থতা—এই যেন তাঁর উপন্যস্ত বিষয়। "Brave New World" পর্য্যন্ত হল ভীতিপ্রদ। Huxley'-র জিজ্ঞাসু মন প্রতিহত হয়ে ফিরছে এই উত্তর নিয়ে—"Thought is an infirmity, Tournebroche my son!"

*　*　*　*　*

সম্প্রতি W. B. Yeats "The Words upon the Window Pane"-এর ভূমিকায় লিখেছেন: We can no longer permit life to be shaped by a personified ideal, we must serve with all our faculties some actual thing"। এর অর্থ এই যে Yeatsএর মন পুরাণ-পরিচয় সত্ত্বেও সজাগ আছে, তিনি যথার্থ কবি বলেই। Yeats-এর পরেই নাম করা যেতে পারে Eliotএর; তাঁর সম্বন্ধে এর পূর্ব্বেই কিছু বলা হয়েছে। 'The Waste Land' হচ্ছে আধুনিক কবিতার মধ্যে বোধ হয় সবচেয়ে বেশী অনুধাবনীয়। এর আবহাওয়ায় যেন রয়েছে শূন্যতার, অবসাদের ভাব; সবই অনিশ্চিত, সবই নিরর্থক, আশা আকাঙ্ক্ষার কোন ভিত্তি নেই, উদ্যম অহমিকারই রূপান্তর, তৃষ্ণার্ত্তের তৃপ্তি বুঝি অসম্ভব। এর ছন্দের বৈচিত্র্য অদ্ভুত; ভাঙা, ছিট্‌কে যাওয়া, লুকানো ছন্দের সঙ্গে সাজানো সুন্দর ছন্দ চলেছে। যে সমাজ এককালে ছিল খুবই শক্তিমান্, তারই ভাঙন্ ধরার ছবি এ কবিতায় পাওয়া যাবে। একটা দৃষ্টান্তও নেওয়া যাক্:

"My nerves are bad tonight. Yes bad. Stay with me.
Speak to me. Why do you never speak ? Speak.
What are you thinking of ? What thinking ? What ?
I never know what you are thinking. Think !
I think we are in rat's alley
Where the dead men lost their bones."

নিম্নশ্রেণীর জীবনের কি সর্ব্বগ্রাসী দৈন্য ফুটে উঠ্‌ছে সামান্য ক লাইনে, কবি যেন শিউরে উঠে সে জীবনের পূতিগন্ধ হ'তে সরে আস্‌ছেন :

"On Margate sands
I can connect
Nothing with nothing.
The broken fingernails of dirty hands
My people humble people who expect
Nothing !"

" 'Now Albert's coming back, make yourself a bit smart.
He'll want to know what you done with that money he gave you
To get yourself some teeth. He did, I was there.'
'It's them pills I took, to bring it off,' she said.
(She's had five already, and nearly died of young George.)
'The chemist said it would be all right, but I've never been the same.'
'You are a *proper* fool,' I said.
'Well if Albert won't leave you alone, there it is,' I said,
'What you get married for if you don't want children.'

যে সমাজ, যে সংস্কৃতির সঙ্গে কবির অন্তরঙ্গ পরিচয়, তা ধ্বংসোন্মুখ :—

He who was living is now dead
We who were living are now dying
With a little patience.
Falling towers

Jerusalem Athens Alexandria
Vienna London
Unreal.
London Bridge is falling down, falling down, falling down.

গত মহাযুদ্ধে Wilfrid Owenএর মৃত্যুতে ইংরিজী সাহিত্য বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। Owenএর মনের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্য যে বিশেষ সমৃদ্ধ হত, তার আর সন্দেহ নেই। তার একটা কবিতা নিয়ে দেখা যাক্ যে তার মনের উন্মেষ কি ভাবে হচ্ছিল।

"I thought of some who worked dark pits
Of war, and died
Digging the rock where Death reputes
Peace lies indeed.
Comforted years will sit soft-chaired
In room of amber ;
The years will stretch their hands, well cheered
By our lives' ember.
The centuries will burn rich loads
With which we groaned,
Whose warmth shall lull their dreaming lids
While songs are crooned.
But they will not dream of us poor lads
Lost in the ground."

কবিতাটী সুন্দর, কিন্তু মনে হয় যেন এর আবেগ নিষ্ক্রিয়, দুঃখ যেন সহিষ্ণু। Owen আজ থাক্‌লে হয়তো এই ধরণের লিখ্‌তেন।

Yet living here,
As one between two massing powers I live
Whom neutrality cannot save
Nor occupation cheer.

None such shall be left alive :
The innocent wing is soon shot down
And private stars fade in the blood-red dawn
Where two worlds strive.

The red advance of life
Contracts pride, calls out the common blood,
Beats song into a single blade,
Makes a depth-charge of grief.

Move then with new desires,
For where we used to build and love
Is no man's land, and only ghosts can live
Between two fires. (C. Day Lewis.)

* * * *

আধুনিক সাহিত্যে নৈরাশ্য, বিষাদ, অবসাদ, 'cynicism', 'escape', যাঁদের লক্ষ্য হয় না, তাঁরা হয়তো ইচ্ছা করেই অন্ধ সাজেন। অনেক সময় শোনা যায় যে সমাজ-বিপ্লব যে সাহিত্যে, সংস্কৃতিতে পরিবর্ত্তন আন্‌বে, তা নয়; সামাজিক, অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধান হলেও মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির সম্বন্ধ নিয়ে যে সমস্যা তার সমাধান হবে না, সে সমস্যা সনাতন, অচঞ্চল, অভেদ্য। কিন্তু আসলে মানুষ ও মানুষের সম্পর্কের চেয়ে তাড়াতাড়ি বিজ্ঞান বদল করে দিচ্ছে মানুষ ও প্রকৃতির সম্পর্ক। অবশ্য ফ্রয়েড্ যাকে বলেছেন, 'সভ্যতার বোঝা' তা সর্ব্বযুগেই মানুষকে বহন করতে হয়েছে। কিন্তু যখনই কোন যুগের অগ্রগতির ও উৎকর্ষের সব পথ আপাতদৃষ্টিতে বন্ধ মনে হয়, তখনই সে বোঝা অসহ্য হয়ে পড়ে। বর্ত্তমান যুগে তাই সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অসহনীয় বেদনার অবসাদ দেখা দিয়েছে।

অবশ্য একথা কেউই বল্‌ছে না যে সমাজতত্ত্বজ্ঞান সরেশ না হলে কবির কবিতাও নিরেশ হবে; বুদ্ধিমান্ মার্ক্‌স্‌পন্থী না হলে যে বড় কবি কেউ হতে পারে না, তা বলার মানে বুদ্ধিভ্রংশ। আমাদের শুধু বক্তব্য এই যে বর্ত্তমান যুগে, ধনতন্ত্রবাদের মরণোন্মুখ অবস্থায়, পুরোনো রাস্তায় সংস্কৃতি বিকাশের আশা নেই। সংস্কৃতির ওপর আক্রমণ সব চেয়ে বেশী আস্‌ছে ফ্যাশিষ্ট দেশ থেকে। আর তার কারণ এই যে ফ্যাশিজম্ ধনতন্ত্রবাদকে বাঁচিয়ে রাখার শেষ বিভ্রান্ত চেষ্টা। যাঁরা এ কথা স্বীকার করবেন, তাঁদের আমরা সাহিত্যক্ষেত্রে বল্‌ব সহযাত্রী।

Paul Valery কিছুদিন আগে বলেছেন যে ইতিহাস ভুলে গিয়ে নিজেদের "ivory tower" হ'তে রূপসৃষ্টিই একমাত্র উপায়। কিন্তু ইতিহাস নিয়ে খেলা চলে না, কবিশেখরের নির্জ্জন দুর্গও পৃথিবীর বাইরে কোথাও নয়। ইতিহাস ভোলার উপদেশ হচ্ছে বর্ত্তমান যুগের সংস্কৃতি-সঙ্কটের প্রধান সাক্ষ্য।

শিল্পী, সাহিত্যিকদের মধ্যে যাঁরা সমাজ-বিপ্লবকামীদের সহযাত্রী, তাঁরা বিপ্লবের যুগে তাঁদের আর্টকে ব্যবহার করতে বাধ্য হবেন অস্ত্ররূপে; "above the battle" থাকার মত প্রবৃত্তি বা দুর্বুদ্ধি তাঁদের হবে না। তাই বিপ্লব যখন আসন্ন কিংবা আগত, তখন আর্টেরও চেহারা বদ্‌লাবে, সে চেহারা মনোরম নয়। যখন বিপ্লব শেষ হয়ে গিয়ে সামাজিক সমস্যার নির্ব্বন্ধ লঘু হবে, তখনই তাঁদের সৃষ্টির সম্পূর্ণ বিচার করার সময় আস্‌বে। অবশ্য তখন আর্টের "ivory tower"এ প্রত্যাবর্ত্তনের কোন প্রয়োজন একেবারেই হবে না। যাঁরা "Proletarian literature" শুন্‌লে নাক শিঁট্‌কান বা কোমর বেঁধে তার বিচার করতে বসেন, তাঁরা একথাটী মনে রাখ্‌বেন। ১৬৪০ সালে Oliver St. John যা বলেছিলেন, আমরা তাই বলি; "All is well; it must be worse, before it is better."

হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

কবিতাগুচ্ছ

পাত্র ও পাত্রী

(১)

চন্দ্রমল্লিকা

ফুলিদের বাড়ি থেকে এসেই দেখি
পোষ্টকার্ডখানা আয়নার সামনেই,
কখন এসেছে জানিনে তো।
মনে হোলো সময় নেই একটুও।
গাড়ি হয়তো ষ্টেশনে এসে চলে গেছে।
চুলটাকে জড়িয়ে নিলুম কোনোমতে,
বাগান থেকে তুলে নিলুম
একটা চন্দ্রমল্লিকা বাসন্তী রঙের।
ওই যা, চাবি ফেলে এসেছি,
ভাঁড়ারের দরজা বন্ধ করিনি।
যাক্ গে।
ষ্টেশনে এসে দেখি
গাড়ি আসেই না,
জানিনে কতক্ষণ গেল,
পাঁচ মিনিট,
হয়তো বা বিশ মিনিট।
গাড়িতে উঠে দেখি
চেলি-পরা বিয়ের কনে দলে বলে।
আমার চোখে কিছুই পড়ে না যেন,
খানিকটা লাল রঙের কুয়াসা,
একখানা ফিকে ছবি।

গাড়ি চলেছে ঘটর ঘটর,
　　বেজে উঠ্‌চে বাঁশি,
উড়ে আসচে কয়লার গুঁড়ো,
　　কেবলি মুখ মুচছি রুমালে।
অজায়গায় থামল গাড়ি—
দুমিনিট, বা পনেরো মিনিট,
　　দরকার কী ছিল।
　　　বাজল বাঁশি।
　　　　গাড়ি চল্‌ল ঘটর ঘটর।
গাছপালা ঘরবাড়ি পানা পুকুর
　　ছুটেছে জানলার দুধারে
　　　পিছনের দিকে,
পৃথিবী যেন কোথায় কী ফেলে এসেছে ভুলে,
　　ফিরে আর পায় কি না পায়।
গাড়িটার তাড়া নেই,
　　　ঘটর ঘটর ঘটর ঘটর।
এক ঘণ্টা, কি দেড় ঘণ্টা,
　　　কী জানি কতক্ষণ।
গাড়ি থামল হাওড়ায়—
　　বিয়ের কনে, টোপর হাতে আত্মীয় স্বজন,
　　　সবাই গেল চলে।
কুলি এসে চাইলে মুখের দিকে,
　　দেখলে গাড়ির ভিতরটাতে মুখ বাড়িয়ে,
　　　কিছুই নেই।
কনেকে নিতে এসেছিল,
　　গেল চলে।
যারা এমুখে আসছিল
　　　ফিরল সবাই গেটের দিকে।

গট গট করে আসতে আসতে
গার্ড আমার জানলার দিকে একটু তাকালে,
ভাবলে মেয়েটা নামেনা কেন।
মেয়েটাকে নামতেই হোলো।
চেয়ে দেখলুম প্ল্যাটফরমের এদিকে ওদিকে,
শেষে বের করলুম থলিটা।
ভাগ্যে ভুলে ফেলে আসিনি।
রাস্তায় এসে তাকিয়ে রইলুম ব্রিজ্‌টার দিকে।
রাস্তার লোক কী ভাবলে জানিনে।
সামনে ছিল বাস্‌, উঠে পড়লুম।
ফেলে দিলুম চন্দ্রমল্লিকাটা।
মনে পড়ল ননি,
যার সঙ্গে ছেলেবেলায় ইস্কুলে পড়েছি
সে থাকে শ্যামবাজারে,
তার নম্বরটা কী?

(২)

অপরপক্ষ

সময় একটুও নেই।
লাল মখমলের জুতোটা গেল কোথায়;
বেরোলো খাটের নিচে থেকে।
গলায় বোতাম লাগাতে লাগাতে গেছি চৌকাঠ পর্য্যন্ত.
হঠাৎ এলেন বাবা।
আলাপ সুরু করলেন ধীরে সুস্থে;
খবর পেয়েছেন দুজন পাত্রের,
মিনির জন্যে।
মনটা একবার এর দিকে ঝুঁকচে একবার ওর দিকে।
ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছি আর উঠ্‌ছি ঘেমে।

রাস্তায় বেরলেম ; হাওড়ায় গাড়ি আসতে বারো মিনিট।
বুকের মধ্যে রক্ত মারচে ধাক্কা ; মন্দগতি সময়কে
হৃদয়টা মারচে ঠেলা।
ট্যাক্সি ছুটল বেআইনি বেগে।
বড়োবাজারের মোড় এলো ; ন'মিনিট বাকি ;
দুর্ভাগ্য আর গরুর গাড়ি আসে যখন
আসে ভিড় করে।
সমস্ত রাস্তাটা পিণ্ডি পাকিয়ে গেছে
পাট বোঝাই গোরুর গাড়িতে।
হাঁক ডাক আর ধাক্কা লাগালে কনিষ্টেবল—
নিরেট আপদ, যথেষ্ট ফাঁক হচ্চেনা কোথাও।
নেমে পড়লুম ট্যাক্সি থেকে,
হনহনিয়ে চললুম পায়ে হেঁটে।
পৌঁছলুম হাওড়া ষ্টেশনে।
ভাবচি এমন যদি হয় যে,
আমার কব্জি ঘড়িটা অন্তত পনেরো মিনিট ফাষ্ট।
কী জানি হয়তো বা—
ঢুকে পড়লুম ভিতরে।
গাড়ি নেই, মানুষ নেই ;
আমার ভগ্ন আশা শূন্য প্ল্যাটফরম জুড়ে ভূলুণ্ঠিত।
বেরিয়ে এলুম বাইরে—
বোকার মতো দাঁড়িয়ে আছি রাস্তার মাঝখানে,
জানিনে যাই কোনদিকে।
বাস্-এর নিচে চাপা পড়িনি নিতান্ত দৈবক্রমে।
এইটুকুর জন্যে দেবতাকে কৃতজ্ঞতা জানাতে
ইচ্ছে করচেনা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

একমাত্র

বলেছিলাম,
আমার জীবনে একমাত্র নারী তুমি।
যখন মানুষ ও কথা কয়,
তখন কি সে চোখ রাখতে পারে
কেউ মুখ লুকিয়ে হাস্‌ছে কি না।
তুমি হেসেছিলে, না গো ?

বোসেদের লীলার কথা তোমার মনে হলো,
এ সব গোপন ব্যাপার ত চাপা থাকে না ;
শোনো তাহলে !
বন্ধুর পাহাড়ের দেশে,
পাইন বনের চোখে যখন নামে সন্ধ্যার শীতল আশ্বাস,
যখন ফার্ণের দলে শেষ হাতছানি হয় সমাধা,
শেষ চাওয়া চেয়ে পাহাড়ী ফুল ঘুমে পড়ে ঢুলে—
তখন পাহাড়ী পাখী ফেরে নীড়ে,
তপ্তবুকের সান্নিধ্যে,
তেম্‌নি এক সন্ধ্যার শীতল বিফলতা
তপ্তবুকে বহন করে চলে গেছে বোসেদের লীলা।
ভালো তাকে বাসি নি,—
সে কি হয় গো।

তোমারি মামাতো বোন্‌ বিভা,—
ডায়ারী পড়েচ বুঝি ? তাহলে ত জানো !
মধুমাসে,
অশোকে কিংশুকে ফুল্ল বনতলে
দখিণা হাওয়ার দৌত্যে চলে দোললীলা ;
উৎসবের সাড়া জাগে দিক্‌ থেকে দিগন্তরে।

সন্ধ্যা মদালসা,
উত্তপ্ত আলিঙ্গনের মতো দেহ ঘিরে নামে !
বিভা এনেছিল বহন করে এই উৎসবের বারতা তার সর্ব্বদেহে,
অপূর্ব্ব সুন্দরী পূর্ণ-যৌবনা বিভা !
তার নিমীলিত নয়নের ঈষৎ স্ফুরণে,
রক্তিম অধরের মৃদু শিহরণে, স্তনতট-চুম্বী চাঁপার মালার
আলোড়নে ছিল যে আমন্ত্রণ,
তাকে অস্বীকার করব ?
সে কি হয় গো !

শোনো নি শিলেটের শর্ব্বরীর কথা।
আগের চেনা নয়, পূজোর ছুটির পর কল্‌কাতা ফিরতি
জাহাজে দেখা, পদ্মার বুকে।
মাঝ গাঙে, দিনশেষে, অকস্মাৎ এলো ঝড়।
মনে হোলো,
আকাশ জুড়ে লক্ষ লক্ষ রাক্ষসের লড়াই বাধ্‌লো—
গুরু গুরু নির্ঘোষ—ঘোর হুহুঙ্কার !
চল্‌লো বিদ্যুতের ছোরাখেলা আকাশের বুক চিরে চিরে !
ধর্ষিতা প্রকৃতি অসহায় ধারা বর্ষণে কোরলো আত্ম-নিমজ্জন !
জাহাজ ডোবে ডোবে !
যাত্রিরা করেছে ভীড় ডেকে, কে আগে উঠ্‌বে জলিবোটে,
কে আগে বাঁধ্‌বে গলায় বয়া
তারি তদ্বিরে।
খালি কেবিনে আমি একা,
ভাব্‌ছি এবারকার মতো পূর্ণ-চ্ছেদ পড়লো তাহলে !
সেই অপ্রকৃতিস্থা প্রকৃতির শঙ্কা, বেদনা, ভীতি
রূপ পরিগ্রহ করে এলো সেই কেবিনে,
শ্যামাঙ্গিনী শর্ব্বরী !

একমাথা কালো চুলের নীচে কালোমেয়ের জলভরা চোখে
জেগে উঠ্‌লো সন্ধ্যার অসহায় অমুচ্চারিত আর্ত্তনাদ—
বুকে সাড়া পড়বে না ?
সে কি হয় গো !

ঋতুতে ঋতুতে সমস্ত সত্তা
দিয়েচে সাড়া অনাহত ধ্বনির সাথে তাল মিলিয়ে,
আমার প্রাণবান, জীবন্ত সত্তা।
ভালোবাসি প্রত্যেকটি পরমক্ষণ, জীবন-পথের প্রতি সঙ্গিনীকে
ভালোবাসি—ভালোবাসি তাদের স্মৃতিকে।
জানো,—
একদিন অনন্ত সমুদ্রের বিশালতার বুকে জাগ্‌লো পৃথিবী,
সমুদ্রের মতো বিশাল নিঃসঙ্গতা বুকে বয়ে এলো সেখানে
মানুষ, সৃষ্টির প্রথম মানুষ ;
স্তব্ধ বনানী গুরুভার মূক সাহচর্য্যে ক্লিষ্ট !
সেদিন অকুণ্ঠিতা উষার মতো
যে নারী উদয় হয়েছিলো মানুষের গগনে, সৃষ্টির প্রথমা নারী,
বহন করে এনেছিল কী সে ?
মানুষের বলিষ্ঠ বুকে,
পুষ্ট মাংসপেশীতে,
স্বপ্নময় নয়নে জেগেছিল কী আলোড়ন ? শুধু প্রেম ?

আমার জগতের
তমোনাশিনী উষার মতো তোমার অভ্যুদয়,
প্রাণসঞ্চার তোমার নয়নোন্মীলনে,
জীবন্ত সত্তার তুমি পরম সত্য,
একমাত্র নারী !

আমি কি দেখতে যাচ্চি তুমি হাস্‌চো কি না ?
হাসো না গো !

শ্রীযুবনাশ্ব

দ্বিপ্রহরে

মেঘ্‌লা এ-দুপুরের বৃষ্টির নূপুরে
বাজে শোন্ বাদলের বাঁধভাঙ্গা ছন্দ,
এলো-মেলো বাতাসের আন্‌মনা বিলাসে
ভেসে আসে কাননের ভিজে ভিজে গন্ধ!
কোন কাজে মন নেই, শুয়ে শুয়ে ভাব্‌ছি,
আকাশ ধরণী ছেপে এল বুঝি ঢল্ আজ,
পুরাণো যা কিছু কথা ভেসে যাক্, ডুবে যাক্,
আজকের কথা কিছু বল্ আজ!
কেশে তোর ঘনিয়েছে ঘন মেঘ-সমারোহ,
চোখের কানায় তোর কাঁপে জল,
থম্‌থমে ভাদরের আলোহীন আকাশের
আবছায়া ছবি তুই অবিকল!
সহসা তাকাতে গিয়ে ঢুলে পড়ে মন-প্রাণ,
ঠোঁটে তোর কি বিজলী চমকায়,
অতল বাদলে আজ ঘুম-ভরা দুপুরে,
আয় তুই আরও কাছে সরে আয়!
কি কথা বল্‌তে চাই, বলা কিছু হয় না—
সব কথা থেকে যায় গোপনে,
ভুল নিয়ে ভেসে যাব', পাইনে যে থৈ তারো,
হাবুডুবু আলুথালু স্বপনে;
বেহালা থাকুক প'ড়ে গান আর হবে না,
কাঁদে জল ছল্ ছল্ জানালার গায়ে ঐ,
গহন রাতের গান ভরা দিন দুপুরে
শুন্‌বি তো কাছে আয়, আরও কাছে আয় সই।

সুধাংশুশেখর সেন গুপ্ত

জিজীবিষা

নয়নে তোমার মদিরেক্ষণ মায়া।
স্তনচূড়া দিল ক্ষীণ কটিতটে ছায়া।
স্বপ্নসারথি, তোরণ কি যায় দেখা?
অমরলোকের ইসারা তোমার চোখে।
ক্রান্তিবলয় শ্রান্ত সুমেরুলোকে।
আজ কি আমারে ভুলেছ মহাশ্বেতা?

অমৃতের ঝারি মদির ওষ্ঠাধরে
স্মৃতিবিস্মৃতি শরতের ধারা ঝরে।
আজ কি আমারে ভুলেছ মহাশ্বেতা?
তোমার শরীর অলকানন্দা-গান।
অচ্ছোদনীরে করেছিলে যবে স্নান
স্বপ্নবাণীতে শিহরিল ক্রন্দসী।

ভাস্বর তব তনুতে অমৃত জ্যোতি।
প্রাণসূর্য্যের একান্ত সংহতি।
ক্রান্তিবলয়ে শিহরিল ক্রন্দসী।
উত্তরকরে মুদ্রিত বরাভয়।
তামসীকে করো খণ্ডন, করো জয়।
স্বপ্নসারথি, তোরণ কি যায় দেখা?

পশ্চাতে ধায় মরণ-চাঁদের আলো
দিগন্তফণা, তুহিন, পাণ্ডু, কালো।
স্বপ্নসারথি, তোরণ কি যায় দেখা?
হে বীর মদন, জীবনের ধনু টানো,
দেহদুর্গের রক্ষায় মোরে আনো—
তোমার প্রাকৃত বাহুতে, মহাশ্বেতা।

শ্রীবিষ্ণু দে

মেঘদূত

(১)

শাপগ্রস্ত ঝড়্,
কালির আঁচড়
বর্ণধূলি ॥

হে যক্ষ,
তুমিও সে-মেঘে
অঙ্গুলি-
কম্পিত রেখার সূক্ষ্ম তুলি-
লগ্ন হলে চিত্রীর উদ্বেগে।
তব সখ্য
ছাপার অক্ষর,
কালিদাস ॥

সে-ছবি,
সংস্কৃত কাব্য,
ছাত্রের, প্রিয়ার নয় ; হোলো ইতিহাস,
খোঁজে ভগ্নশেষ,
উজ্জয়িনীচূড়ার উদ্দেশ ॥

(২)

বৃষ্টি পড়ে,
ছাতাঅলা গলির ভিতরে।
গঙ্গা,
বেত্রবতী নদী নয়, শিপ্রা নয়, তবু তা'র সংজ্ঞা
সেই জলে, সেই মেঘে, হাওয়ার প্রবাহে।
(আজিকে কাহারে চাহে ?)

হাওড়ার পুলে,
লক্ষ লক্ষ,
হে যক্ষ,
মনোরথে নয়, বাস্‌-এ, মোটরে ইত্যাদি
অনাদি
তোমাদেরই বহি এই ধারা।
এ জীবন আজও মিল-হারা।
দেখো, অদ্ভুত,
চলে মর্ত্ত্যে তুই মেঘদূত ॥

(৩)

এরও পারে,
যক্ষ,
কোথা নিজে তুমি ?
সে কোথায় ?

রচিবারে
কোন্ কবি পারে মেঘকায়া,
জলের হাওয়ার ছায়া
পূর্ণতর সেদিনের ? সেই ভূমি,
জম্বুবন ; অণুবীজ হতে সত্তা উঠিছে কুসুমি' ?
নব রামগিরি-
আশ্রমের সংস্করণ ঘিরি'
শাপমুক্ত কোন্ সৃষ্টিঝড়ে
তিন মেঘদূত এক হবে
আপনা-সম্পূর্ণ শিখা
রিক্ত-মরীচিকা
কবে

কালির আঁচড়ে,
　　বর্ণধূলি-
লগ্ন কোন্ চিত্রীর অঙ্গুলি-
　　ঘূর্ণাবেগে,
　　জেগে-
ওঠা বাদলের কণ্ঠস্বরে ?

শ্রীঅমিয় চক্রবর্ত্তী

সম্পাদকী

কবিদের অনুপকারিতা অনেক আগেই ধরা পড়েছে, এবং অন্তত হেগেল্-এর পর থেকে দর্শনও শূন্যকুম্ভ ব'লে পরিচিত। এটা বিজ্ঞানের যুগ; আধুনিক অতিপ্রাকৃত এঞ্জিনিয়ারদের হাতে, আজকালকার কথামৃত গণিতব্যবসায়ীদের মুখে, সত্যের যূপে স্বার্থবলিদান দেখতে সাম্প্রতিক মানুষ আর সাধকের আশ্রমে জোটে না, পদার্থবিদের প্রয়োগাগারেই ভিড় জমায়। তাহলেও বর্ত্তমান জগৎ পূর্ব্ববৎ কুসংস্কার-প্রবণ; এবং প্রাচীন মিসর যেমন পুরোহিতদের অপ্রমাদ ভেবে জাতীয় বিনষ্টির পথ প্রশস্ত করেছিলো, আমরাও তেমনি বৈজ্ঞানিকদের অতি-মানুষ বিবেচনায় মহাপ্রলয়ের অভিমুখেই এগোচ্ছি। আসলে বিজ্ঞান মানুষী জ্ঞানের একটা ক্ষুদ্র বিভাগমাত্র; এবং সেই সাবয়ব জ্ঞানের সর্ব্বাঙ্গীণ সঙ্গতিই যেহেতু সত্য-পদবাচ্য, তাই গণ্ডিবদ্ধ বিশেষজ্ঞেরা অনেক সময়েই মরীচিকার মায়াজালে জড়িয়ে যান, নিরক্ষরদের ভূয়োদর্শী প্রবচনেই যাথার্থ্যের সন্ধান মিলে। অবশ্য এ-অভিযোগ ওয়েল্স্-প্রমুখ বিজ্ঞানস্তাবকদের বিরুদ্ধেই পোষণীয়; কিন্তু হাক্স্লী ও তাঁর সম-সাময়িক প্রবক্তারাই এই একদেশদর্শিতার উদ্‌ভোক্তা; এবং নিজেদের উপজীবিকা সম্বন্ধে প্লাঙ্ক্, জীন্স্, শ্র্যাডিঙ্গার ইত্যাদির অতিমাত্রিক বিনয় যদিও অনেক অন্ধেরই চোখ ফুটিয়েছে, তবু হিট্‌লারী আর্য্যাবর্ত্তের জটিল চক্রান্তেও বৈজ্ঞানিক স্বেচ্ছাসেবকের অভাব নেই। তবে এতে আশ্চর্য্য হওয়া বৃথা। কারণ ইদানীন্তন রাজনীতি রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পদবী চাইলেও অণু-পরমাণুর সাম্য এখনো মনুষ্যসমাজে অপ্রতিষ্ঠিত; এবং রাসেল্-এর মতো বিজ্ঞান-সচেতন তত্ত্বজিজ্ঞাসু ভৌতিক অনিশ্চয়বিধির মধ্যেই নৈরাজ্যের অনুমোদন খুঁজেছেন বটে, তত্রাচ সে-প্রযত্নে যুক্তির চেয়ে পক্ষপাতই হয়তো বেশি। কিন্তু সেজন্যে বিজ্ঞান দোষাবহ নয়, বৈজ্ঞানিক-দের মতান্ধতাই দায়ী; তাঁরাও যেকালে মানুষ, তখন সন্তর্পণে থাকলেও

মানুষী অসম্পূর্ণতার দায়ভাগ তাঁদের অর্শায়। উপরন্তু সমাজে আত্মশ্লাঘা বংশমর্য্যাদার তুলনায় গৌণ; এবং শত চেষ্টা সত্ত্বেও অবৈজ্ঞানিকেরা ভুলতে পারে না যে বিজ্ঞান ভানুমতীর শেষ সন্তান। তাই অতিভাষী এডিংটন্-কে আমরা অলৌকিকের কর্ণধার বানাই, ভোরোনফ্-এর অস্ত্রচিকিৎসায় মৃতসঞ্জীবনীর আশ্বাস পাই, ফ্রয়েড্-এর নাম জ'পে ঘোচাই ইচ্ছাশক্তির শোচনীয় দৈন্য।

কিন্তু সাধারণের পক্ষে ভাবালুতা যদিও ভাবুকতার চেয়ে সহজ, তবু কারো প্রতিপত্তি কেবল ফাঁকির উপরে গ'ড়ে ওঠে না; এবং বিজ্ঞানের সকল বিভাগেই যেমন প্রবঞ্চনার অন্ত নেই, তেমনি তার স্বভাবগতিকেই সে আজ অন্যান্য বিদ্যার অগ্রগণ্য। বস্তুত বিজ্ঞান এত দিন তার ব্যাবহারিক আদর্শ ভোলেনি; হয়তো বয়সে সে সর্ব্বকনিষ্ঠ ব'লে অগ্রজদের দুর্দ্দশা তাকে অত্যধিক কল্পনাবিলাস থেকে বাঁচিয়েছে, এবং সেইজন্যেই সে প্রারম্ভেই বুঝেছে যে জগতে টিঁকতে গেলে তত্ত্ব অত্যাবশ্যক বটে, কিন্তু সে-তত্ত্ব তথ্যের অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ না-হ'লে লোকাপবাদ অনিবার্য্য। তাই সে আবহমান কাল শুধু খবর নিয়েছে আর ঘটনাপরম্পরার মধ্যে সাদৃশ্য খুঁজেছে; এবং অধ্যবসায়ের এমনি গুণ যে এই নিরুদ্দিষ্ট পরিশ্রমও অপুরস্কৃত থাকেনি, আজ অবধি কোনো নির্ব্বিকল্প কৈবল্যে পৌঁছুতে না-পারলেও সে ইতিমধ্যে বর্গনির্দ্দেশের তাগিদে যে-সমস্ত আপেক্ষিক নিয়মের সন্ধান পেয়েছে, তা থেকে অন্তত আনীহারিকা বস্তুপুঞ্জের অব্যাহতি নেই। সুতরাং বিজ্ঞান প্রসঙ্গে আধুনিকদের কৌতূহল কেবলি বিদ্রূপযোগ্য নয়, সে-সম্বন্ধে আমাদের রোমান্টিক মনোভাবও হয়তো মার্জ্জনীয়, এবং বিজ্ঞানের কাছে বিজ্ঞানাতীত সমস্যার সমাধান না-চাইলে তার অভয়ে বুক বাঁধাই সমীচীন। এ-কথা পরলোকগত রুষ জীববিদ্যাবিশারদ ইভান্ পেত্রোভিচ্ পাভ্‌লোভ্ সম্পর্কে বিশেষভাবে সত্য; এবং তাঁর দেহাচারবিষয়ক পুঙ্খানুপুঙ্খ গবেষণাদিই যদিও মনস্তত্ত্বকে ঔপন্যাসিকের কবলমুক্ত ক'রে প্রামাণিক সাধারণ্যে আসন দিয়েছে, তবু পাভ্‌লোভ্ স্বয়ং কখনো কোনো ব্যাপক সিদ্ধান্তে আপনার লক্ষ্য হারাননি, আমরণ নিজেকে

স্নায়ুপ্রতিক্রিয়ার বিবেচক হিসাবেই দেখেছেন। সম্ভবত সেইজন্যেই চিরদিন আত্মবিজ্ঞাপন বাঁচিয়ে চ'লেও তিনি আজ পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের প্রতীকস্বরূপ; সম্ভবত সেইজন্যেই এই অশীতিপর বৃদ্ধের অবশ্যম্ভাবী তিরোধানকেও অনাগতেরা অকাল মৃত্যু ব'লে মান্‌বে।

কিন্তু অনধিকারচর্চ্চায় নিরুৎসাহ হলেও পাভ্‌লোভ্‌ অমানুষিক বা অতিমানুষিক নিষ্কর্ষণের প্রচারক ছিলেন না; এবং রুষ বিপ্লবের সাংঘাতিক বিক্ষোভেও তিনি তাঁর সহযোগীদের কাছে কালনিষ্ঠাই চাইতেন বটে, তবু ব্যবচ্ছেদের পূর্ব্বে ও পরে জন্তু-জানোয়ারের কষ্ট-লাঘবের জন্যে যে-পরিমাণ সেবাব্রত তাঁকে পেয়ে বসতো, তা হয়তো জৈনদের মধ্যেও বিরল। কিন্তু এই সহৃদয়তার সঙ্গে ইংরেজদের অনাত্ম পশুপ্রীতির তুলনা চলে না; মানুষী অনুকম্পাও পাভ্‌লোভ্‌-এর বক্ষে এমনি আলোড়ন তুলতো যে সমানাধিকার রুষ বৈদ্যপীঠ থেকে পুরোহিত-সন্তানদের তাড়ালে পরে তিনিও তাঁর যাজক পিতার নামে উক্ত অনুষ্ঠানের নেতৃত্ব ছেড়েছিলেন। কারণ তিনি কখনো ভুলতে পারেন নি যে বিজ্ঞান বৃহত্তম সংখ্যার মহত্তম মঙ্গলের অভিভাবক ব'লেই সাধারণের সহানুভূতি তার প্রাপ্য। ফলত জীবব্যবচ্ছেদ সম্বন্ধে বর্ণাড্‌ শ-এর ভাববিলাস তাঁর নিকটে হাস্যকর ঠেকতো, এবং তিনি বুঝতেন যে অনাবশ্যক প্রাণিহত্যা যতই গর্হিত হোক না কেন, বিনামূল্যে জ্ঞানসঞ্চয়ও অসম্ভব। কিন্তু যে-জ্ঞান লোকহিতার্থে অব্যবহার্য্য, তার আকর্ষণ তাঁকে কোনোদিন টানেনি, এবং সম্ভবত সেইজন্যেই যন্ত্রশিল্পের অসম্পৃক্ত উন্নতিকল্পে বোল্‌শেভিক্‌দের নরবলি তাঁর মুখে ফোটাতো দুরুক্তি, তাঁর কাজে আনতো বিদ্রোহ। তাহলেও এ-প্রতিবাদকে দেশদ্রোহিতা বলা অশোভন, এর মধ্যে বৈজ্ঞানিক সমাজের তথাকথিত আন্তর্জ্জাতিকতাও অনুপস্থিত, এবং মাতৃভূমি-সম্বন্ধে তাঁর ও আইন্‌ষ্টাইন্‌-এর মনোভাব মেলালেই পাভ্‌লোভ্‌-এর প্রগাঢ় দেশভক্তি চোখে পড়বে। কেননা নিরীহনিগ্রহে নাৎসীরাষ্ট্র যদিচ সোভিয়েট্‌তন্ত্রেরই পদাঙ্কচারী, তবু এই বৈভীষিক নীতির উত্তরে বিভীষণ-ভূমিকার পুনরভিনয় দূরে থাকুক, আইন্‌ষ্টাইন্‌-এর মতো স্বেচ্ছানির্ব্বাসনে যাওয়াও পাভ্‌লোভ্‌-এর সাধ্যে

কুলায়নি; এবং প্রায় আশী বছর বয়সে যখন তাঁর পিত্তকোষে অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন হয়, তখন কর্ত্তৃপক্ষের অনুনয়-বিনয় সত্ত্বেও তিনি বিদেশী বিশেষজ্ঞদের পরিচর্য্যা নেননি, অনভিজ্ঞ স্বজাতির হাতেই আত্ম-সমর্পণ করেছিলেন। সুতরাং এ-কথা যেমন অবশ্যস্বীকার্য্য যে পাভ্‌লোভ্‌ এর মন জুগিয়ে চ'লে বোল্‌শেভিক্‌ দলপতিরা অসামান্য বিজ্ঞানভক্তির দৃষ্টান্ত দেখিয়েছেন, তেমনি এটাও হয়তো নিঃসন্দেহ যে পাভ্‌লোভ্‌ কখনো য়িহুদী বুদ্ধিজীবীদের মতো রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে অন্তর্বিরোধের বীজ বুনে শাসক-সম্প্রদায়ের ধৈর্য্যপরীক্ষায় এগোননি।

বস্তুত পাভ্‌লোভ্‌-এর মতো নির্ব্বিরোধ মানুষ সকল যুগেই দুর্ল্লভ; তিনি কেবল শ্রেণীবিভাগকেই অন্যায় বিবেচনা করেননি, শ্রমবিভাগও তাঁর কাছে সমান অনুচিত ঠেকেছে। তাই তিনি কখনো নির্জ্জলা বিজ্ঞানে তুষ্ট থাকেননি, চিৎপ্রকর্ষের সকল শাখা-প্রশাখাকেই তুল্যমূল্য ভেবেছেন। এমন-কি বিজ্ঞানের বেলাতেও তিনি যে আদর্শ থেকে আজীবন প্রেরণা কুড়িয়েছেন, তা মুষ্টিমেয় বিশেষজ্ঞের আত্মপ্রসাদ জুগিয়েই সার্থক নয়, এক সূত্রের সাহায্যে সর্ব্ববিধ তথ্যের ব্যাখ্যাই তার আশা ও অভীপ্সা। সেইজন্যেই রক্তচলাচল ও হৃৎপিণ্ড সম্পর্কে অগণ্য আবিষ্কারেও তাঁর জ্ঞানপিপাসা মেটেনি, তিনি আবার নবীন উৎসাহে পাকস্থলীর পর্য্যালোচনায় নেমেছেন; এবং সেই সাফল্যের জন্যে ১৯০৪ সালে নোবেল্‌ পুরস্কার পেয়েও তিনি অবসর নিতে পারেননি, আরো পঁচিশ বছরের অক্লান্ত পরিশ্রমে চৈতন্যকে নাড়িমণ্ডলের ভিতরে এনে দুর্ম্মুখদেরই উপহাস্য ক'রে তুলেছেন। ইতিমধ্যে বিদ্বজ্জনের শত্রুতা তাঁকে পদে পদে বাধা দিয়েছে, মহাসমর তাঁর পুত্রদ্বয়ের প্রাণ নিয়েছে, উপনিপাত তাঁর গ্রাসাচ্ছাদনেও এমন টান ধরিয়েছে যে মাঝে মাঝে তিনি চলৎশক্তি সুদ্ধ হারিয়ে ফেলেছেন। তবু বিঘ্নের সামনে তিনি মাথা নোয়াননি, বার্দ্ধক্যের কাছে হার মানেন নি, এবং মৃত্যুর অনতিপূর্ব্বে পরলোক সম্বন্ধে নূতন গবেষণায় নেমে ইতিহাসের কীর্ত্তিস্তম্ভে পুনর্ব্বার এই কথা লিখে গেছেন যে মানুষ প্রকৃতিপরায়ণ হলেও পুরুষকারে বঞ্চিত নয়, তার আত্মসমাহিত সঙ্কল্প

প্রতিকূল প্রতিবেশকে তো পেরিয়ে যায়ই, উপরন্তু মহাকালের দিগ্বিজয়কেও প্রয়োজনমতো থামিয়ে রাখে।

অবশ্য আত্মসমাহিতি আত্মরতির নামান্তর নয়; এবং পাভ্‌লোভ্‌ যদিও সাধ্যপক্ষে নিন্দুকদের কথায় কান পাততেন না, তবু সাত্ত্বিক সমালোচনার দিকে তাঁর দৃষ্টি সদাসর্ব্বদা নিবদ্ধ থাকতো। সত্যানুরক্তিতে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী মেলা ভার; এবং প্রমাণের সম্মুখে স্বকৃত সিদ্ধান্ত পরিহারে তিনি বারম্বার যে-রকম ক্ষিপ্রতা দেখাতেন, তা সত্যই বিস্ময়কর। উদাহরণত ১৯২৩ সালের একটা ঘটনা উল্লেখযোগ্য। কয়েক বৎসর ধ'রে ইঁদুর নিয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরে পাভলোভ্‌ ওই সময়ে এই সাধারণ বিশ্বাসে সায় দেন যে একজনের অর্জ্জিত বৈশিষ্ট্য বা ব্যক্তিগত দক্ষতা বিষয়-সম্পত্তির মতোই তার উত্তরাধিকারীদের বর্ত্তায়। এর ফলে দার্শনিক মহলেও সাড়া প'ড়ে যায়, এবং মনস্তাত্ত্বিকেরা যে সে-বাদ-বিতণ্ডাকে আরো পাকিয়ে তোলেনি, এমন কথা বলতে পারবোনা। কিন্তু পাভ্‌লোভ্‌-এর অপূর্ব্ব আবিষ্কার অভিব্যক্তিবাদের স্বপক্ষে কি বিপক্ষে, সে-তর্কনিষ্পত্তির আগেই স্বয়ং আবিষ্কর্ত্তা নিজের ভ্রান্তি সম্বন্ধে নিঃসংশয় হন এবং দিগ্বিদিকে নিঃসংকোচে রটান যে তথ্য-সংগ্রহে অসতর্কতাবশতই তিনি এত গোলোযোগ বাধিয়ে বসেছেন। এই জাতীয় নিরাসক্তির নমুনা তাঁর জীবনে অসংখ্য; এবং এই নিষ্কাম অনুসন্ধিৎসার চালনেই হৃৎপিণ্ড থেকে পাকস্থলী ও পাকস্থলী থেকে সমগ্র নাড়িমণ্ডলে তিনি প্রাণরহস্যের অনুধাবন করেছিলেন।

কারণ প্রমাণে আস্থা রাখলেও পাভ্‌লোভ্‌ বাল্যকালেই প্রামাণ্যে নির্ভর খুইয়েছিলেন। তাই পাকযন্ত্রের গণ্ডনিঃসারণ খুঁজতে গিয়ে তিনি যখন বুঝলেন যে খাদ্যসম্পর্কিত সামগ্রী দর্শনে, এমন-কি খ্যাদ্যের নামেই, জীবের জিহ্বায় লালা ঝরে, তখন ব্যাপারটাকে মনোরাজ্যের অজ্ঞাতবাসে পাঠাতে তাঁর বিবেক আপত্তি জানালে; এবং প্রমাণাভাবে তিনি অগত্যা মনরূপ লোকপ্রসিদ্ধিরই মোহ কাটালেন। কিন্তু অতখানি সংস্কারমুক্তি সকলের সয়না। কাজেই সেজন্যে সহকর্ম্মী স্নার্স্কি-র সঙ্গে তাঁর মতান্তর ঘটলো; বন্ধুরা তাঁর চিত্তস্বাস্থ্যের সম্বন্ধে ভাবতে

লাগলেন; এবং প্রায় নিঃসহায় অবস্থায় বিশবৎসরব্যাপী সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পরীক্ষাবলীর কল্যাণে মন-সংক্রান্ত পরোক্ষ মতামত ঝেড়ে ফেলে পাভ্‌লোভ্ দেখলেন যে মাইণ্ড্ আর ম্যাটার-এর চিরাচরিত দ্বৈত অন্তত মনুষ্যেতর জীবজগতে অবর্ত্তমান, সেখানকার সকল আচরণই শুধু স্নায়ু-প্রতিক্রিয়ার সাহায্যে বোধগম্য, তথাকথিত মনোব্যাপারেও বিজ্ঞান-সম্মত বহিরাশ্রয়িতা সম্ভব ও সার্থক। কিন্তু জীবের জন্মগত অধিকারে সকল প্রকার আচরণের প্রাক্তন প্রতিমান নেই; উন্মুখীন ও বিমুখীন প্রবৃত্তির মতো গোটাকয়েক সহজ দেহাচার ব্যতীত অন্য সমস্ত কর্ম্মপদ্ধতিই সে ঠেকে শেখে; এবং এই শিক্ষা-দীক্ষা যেহেতু প্রত্যেকের ক্ষেত্রে বিশেষ ঘটনাচক্রের ফল, তাই তার দেহবাচক নিত্য প্রতিক্রিয়াগুলো যত শীঘ্র বিজ্ঞানের আয়ত্তে আসে, তার বুদ্ধি-বিচার, আসক্তি-বিরক্তি প্রভৃতি নৈমিত্তিক প্রতিক্রিয়াগুলোর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা তত অনায়াসসাধ্য নয়। তাহলেও মন হেতুপ্রভব, এবং সাবধান দ্রষ্টা আর উপযুক্ত উপায় একত্রে জুটলেই মনস্তত্ত্বেও বিজ্ঞানের অনির্ব্বাণ আলোক জ্ব'লে উঠবে।

এই অমূল্য আবিষ্কারের সম্মান পাভ্‌লোভ্ নিজে নেননি, রুষ শরীর-বিদ্যার আদিগুরু সেচেনভ্-কেই দিয়েছেন। কেননা বাল্যবয়সে সেই মেধাবী সাহসিকের 'সেরিব্রল্ রিফ্লেক্‌স্'-নামক দেহাত্মবাদী পুস্তক তাঁর হাতে আসার ফলেই তিনি নাকি প্রৌঢ়বয়সে কায়িক ও মানসিককে দ্বন্দ্ব-সমাসে বাঁধতে পেরেছিলেন। কিন্তু পৌর্ব্বাপর্য্যবিচারে এমেরিকান মনোবিজ্ঞানী থর্ন্‌ডাইক্-ও তাঁর অগ্রগামী; এবং ওয়াট্‌সন্, পার্কার, য়ের্কিস্ প্রভৃতি মার্কিনী বিহেভিয়ারিষ্ট্-রা তাঁর অনন্যাধীন সমসাময়িক। তবে এতে ক'রে পাভ্‌লোভ্-এর স্বকীয়তা কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয়নি, এবং এঁদের কাছে তাঁর ঋণ মানলে হিউম্, হার্ট্‌লি, কঁদিয়াক্ ইত্যাদিকেও এই বংশকারিকা থেকে বাদ দেওয়া দুষ্কর। আসলে মানবমনের অনুষঙ্গ-প্রবণতা এরিষ্টটল্-এর যুগেও অবিদিত ছিলোনা। কিন্তু জড় আর জীবের বিরোধ সম্পর্কে সেই মহাপুরুষের দুর্ম্মর অভিমত গত আড়াই হাজার বছরে আমাদের মজ্জায় মজ্জায় ছড়িয়ে পড়েছে ব'লেই আমরা

এখনো উচ্চকণ্ঠে নিঃসম্পর্ক চিত্তবৃত্তির গুণ গাই। তত্রাচ এই অন্ধ বিশ্বাসের জন্যে জনসাধারণ দায়ী নয়, অপরাধ শুধু মনোবিদদের। তাঁরাই অপবিজ্ঞানের বন্যা বইয়ে মনস্তত্ত্ববিষয়ে আমাদের সরল আস্থাকে ডুবিয়ে মেরেছেন। কারণ তাঁদের মধ্যে প্রকৃত বৈজ্ঞানিক নিতান্ত বিরল; তাঁদের অধিকাংশই ছদ্মবেশী নীতিকার; এবং ধর্ম্মনীতি যেহেতু ন্যায়ের ধার ধারে না, নিষ্ঠাকেই আঁকড়ে ধরে, তাই মনোবিদেরা সঙ্গতি-রক্ষায় ততটা সিদ্ধহস্ত নন, যতটা উপদেশে উন্মুখর।

অবশ্য সেজন্যে তাঁদের চেয়েও তাঁদের অধীত বিদ্যাই বেশি দোষী; সেখানে পরীক্ষার ক্ষেত্র যেমন বিরাট, পরীক্ষার পাত্র তেমনি দুর্লভ, এবং সে-সম্বন্ধে ব্যবচ্ছেদাদি প্রকরণ কেবল বিধিনিষিদ্ধ নয়, জিজ্ঞাসুর স্বভাব-বিরুদ্ধও বটে। কিন্তু এ-কথা যদিও মানুষের বেলাতেই বিশেষভাবে সত্য, তবু জীববিজ্ঞান মৃত্যুর নিদান নয়, জীবনেরই মর্ম্মানুসন্ধান; এবং ব্যবচ্ছেদের অবাধ সুযোগ থাকতেই আমরা সে-বিশ্লেষণে এত দূর এগোইনি, পরাবর্ত্তনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষার সাহায্যেই তথ্যের পর তথ্য কুড়িয়েছি। প্রকৃতপক্ষে পর্য্যবেক্ষণের প্রকৃষ্টতর পদ্ধতিই মনোবিদ্যার মুখ্য প্রয়োজন; এবং ব্যবচ্ছিন্ন জীবকে বাঁচিয়ে রেখে, তার কষ্টের মাত্রা যথাসম্ভব গুটিয়ে, নৈর্ব্যক্তিক উপায়ে তার প্রতিক্রিয়া লিপিবদ্ধ ক'রে পাভ্লোভ্-ই সর্ব্বপ্রথম এই অভাব ঘুচিয়েছিলেন। সেইজন্যেই তাঁর স্বতন্ত্র আবিষ্কার-সমূহ আপাতত ওয়াট্‌সনী সিদ্ধান্তের দিকেই ঝুঁকলেও চিন্তাশীলের কৃতজ্ঞতা পাভ্লোভ্-এরই প্রাপ্য, ওই শেষোক্ত পণ্ডিতের নয়; এবং তাঁর আর ওয়াট্‌সন্-এর মধ্যে যে-ব্যবধান বর্ত্তমান, তা হয়তো আর্য্যভট্ট ও গালিলিও-র পার্থক্যের চেয়েও সুদুস্তর। বলাই বাহুল্য যে এ-প্রসঙ্গে মার্ক্‌স্‌বাদীদের অনুকরণে যুগধর্ম্মের অবতারণাও বৃথা; এবং রাষ্ট্রের ইতিবৃত্তে ডায়ালেক্‌টিক্ খাটুক বা না-খাটুক, বিজ্ঞানের ইতিহাসে তার সূচ্যগ্র স্থান নেই। কারণ কোনো বিশেষ ধারণা একটা নির্দ্দিষ্ট দেশ-কালে উড়ে বেড়ায়না, ব্যক্তিগত প্রতিভা ও প্রয়োগনৈপুণ্যই পরিকল্পনা-বিশেষকে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার ভোগে আনে; এবং রূপহীন ভাবনা যেকালে ভাবনাই নয়, ভাবনার ভানমাত্র, তখন অলস মনে

আষাঢ়ে গল্প বানিয়ে বেকার মানুষ ভাবুক আখ্যা পায়না, লোকোত্তর চিন্তাকে লোকায়তে নামিয়েই মনীষা তার ভাণ্ডার ভরে।

উপরন্তু সংঘটিত প্রতিক্রিয়াকে আচারবাদে পরিণত করা নিরাপদ নয়, তার সঙ্গে অনুষঙ্গমূলক মনস্তত্ত্বের যোগও আংশিক ; এবং জীবনকে অবিভাজ্য ভেবে পাভ্‌লোভ্‌ যদিও দেহ-মনের যুক্ত রাজ্যে একই শাসনতন্ত্রের নিরন্তর প্রসার দেখেছেন, তবু তার ফলে চৈতন্যের মর্য্যাদা বেড়েছে বই কমেনি। কেননা তাঁর মতে একাধিক উত্তেজনার তাৎকাল্যই যথেষ্ট নয়, সেগুলোর তাৎপর্য্যও অবশ্যগণ্য ; এবং যেকালে প্রত্যাশায় বারম্বার প্রবঞ্চিত হলে সকল নৈমিত্তিক প্রতিক্রিয়াই থেমে যায়, তখন জন্তুরাও কেবল ইন্দ্রিয়ের তাড়নে চলেনা, তারাও নিশ্চয় অতীন্দ্রিয় তুলামূল্যের সাহায্যেই বোঝে যে অবস্থা-বিশেষে তাদের চক্ষু-কর্ণ-জিহ্বার সমন্বয় অবস্থান্তরে অব্যবহার্য্য। সুতরাং ওয়াট্‌সন্‌-এর বিপক্ষে রাসেল্‌-এর অখণ্ডনীয় আপত্তি পাভ্‌লোভ্‌-এর সম্বন্ধে খাটে না ; এবং কোনো নিত্য প্রবৃত্তির প্রশ্রয় ব্যতীত পরাবর্ত্তকের অদল-বদল তো অসাধ্যই, এমন-কি শিক্ষা যেহেতু শিক্ষকের আজ্ঞাধীন নয়, শিক্ষার্থীরই বিচারসাপেক্ষ, তাই গোলমরিচের গুঁড়ো শুঁকেই আমাদের হাঁচি আসে, তার নাম শুনে কেউ হাঁচতে শেখেনা। আসলে জড়বাদের প্রতি পাভ্‌লোভ্‌-এর কিছুমাত্র শ্রদ্ধা নেই ; বোধহয় হোল্‌ট্‌-এর মতো তিনিও জীব আর জড়ের উপাদানে এক উভয়-সামান্য মূল ধাতুর সন্ধান পেয়েছেন ; এবং তাঁর পারিভাষিক শুদ্ধি অন্তত জীববিজ্ঞান থেকে কথামালার মনুষ্যভাবাপন্ন পশু-পক্ষীদের তাড়িয়েছে বটে, কিন্তু তাঁর গবেষণাদি সম্ভবত লাইব্‌নিৎস্‌-এরই সহযাত্রী, তিনিও নিশ্চয় বিশ্বচরাচরে শুধু মনের সোপানমার্গই প্রত্যক্ষ করেছেন। সেইজন্যেই রুষের চার্ব্বাকপন্থীরা সাম্যবাদের সমর্থনে তাঁর প্রক্ষিপ্ত উক্তি-প্রত্যুক্তিই আউড়ে বেড়িয়েছেন, কখনো ভুলেও তাঁকে প্রকাশ্য সাক্ষী ডাকেননি। সেইজন্যেই প্রজননবিদ্যার বংশানুক্রমিক অধিকার-ভেদ বিহেভিয়রিজ্‌ম্‌-কেই বিপদে ফেলেছে, পাভ্‌লোভ্‌-এর অদ্বৈত-বাদকে ছুঁতে পারেনি। সেইজন্যেই মানুষ তো দূরের কথা, তিনি

কুকুরের মধ্যেই হিপোক্রেটিস্-আদিষ্ট চতুর্বর্ণ চারিত্র্যের প্রস্তাবনা খুঁজেছেন।

কিন্তু পরীক্ষালব্ধ তথ্যের উপরে প্রমিতির ভিত্তিস্থাপনা মূর্খের কাজ; এবং পাভ্‌লোভ্‌ পাঠ্যদশায় দর্শনশাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তি দেখালেও, ওই নামে যে-প্রাপ্তবয়স্ক বৈজ্ঞানিক আজ জগদ্বরেণ্য, তিনি কখনো ব্যাপকতার খাতিরেও কোনো নিষ্প্রমাণ মতবাদের কুহকে মজেননি। বরং হঠকারী সামান্যীকরণ তাঁর এতটা অপ্রীতিকর লাগতো যে সমপর্য্যায়ের সকল জীবকে একই জাতিব্যবসায়ে জোড়া যায় কিনা, তিনি সে-সম্বন্ধেও প্রতর্কের যথেষ্ট অবকাশ রেখেছেন। তাহলেও মনোবিকলনের দাবি-দাওয়া একেবারে অমূলক নয়; এবং মৃত লোকনায়কের মমির বদলে ক্রুসারূঢ় দেবতার মৃত্যুঞ্জয় মূর্ত্তিকে ভ'জেই তিনি তাঁর যাজকোচিত কুলপ্রথার পরিচয় দেননি, হয়তো উল্লিখিত অধিকারভেদেও লাইব্‌নিৎস্ অপেক্ষা সেন্ট্‌ অগাষ্টিন্-এর প্রভাবই অধিক। কারণ প্রাণিমাত্রেই অল্প-বিস্তর ব্যক্তিস্বরূপে অধিকারী হোক বা না-হোক, জীবনের প্রত্যেক স্তরেই নিত্য ও নৈমিত্তিকের অবস্থাবিনিময় নিশ্চয়ই প্রগতির পরিপন্থী এবং চিরনির্ব্বিকার প্রাণধর্ম্মের পক্ষপাতী। অবশ্য যথারীতি অভ্যাসের পরে সকল কুকুরই বর্ণ-বিশেষকে খাদ্যের বার্ত্তাবহ মনে করে। কিন্তু এই শিক্ষণীয়তা কখনোই সম্প্রসারিত চৈতন্যের নিদর্শন নয়, অপরিবর্ত্তনীয় চিত্তবৃত্তিরই চিহ্ন; এবং জীবনে বৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকলে সহজাত প্রতিক্রিয়ার অসহযোগেও সংঘটিত প্রতিক্রিয়া জন্মাতো। উপরন্তু সে-রকম নির্ব্বাচনক্ষমতায় ফাঁকি প'ড়েও প্রাণপ্রবাহ যেকালে অদ্যাবধি থামেনি, কেবলি ঘুরে মরেছে, তখন জীব তো স্বয়ংসম্পূর্ণ বটেই, এমন-কি জড়প্রকৃতিও একই ধারায় অনাদ্যন্ত কাল বাঁধা। সম্ভবত সেইজন্যেই খাবার পেলেও কুকুরের লালা ঝরে, আবার লাল আলো জ্বললেও তার জিভে জল আসে; এবং এই বিপরীত উত্তেজনার উত্তরে একই প্রতিক্রিয়ার আশ্রয় নিয়ে কুকুর নিশ্চয়ই তার আলোকপ্রাপ্তির সংবাদ রটায়না, সে এই কথাই বলে যে বস্তুজগতে বৈচিত্র্যের সুযোগ এমনি পরিমিত যে আলোকে

আহার্য্যের কোঠায় ফেলাই স্বাভাবিক। নচেৎ জন্ ষ্টুয়ার্ট্ মিল্-এর মতো সংশয়বাদীও অন্বীক্ষার আরোহণপদ্ধতির দোষস্খালনে প্রকৃতির সমভাব খুঁজতেন না; নচেৎ সহস্র কোটি বৎসর আগেকার নক্ষত্ররশ্মিকে অত্যাধুনিক দৃক্‌শাস্ত্রের বিধান মানাতে গিয়ে ডি সিটার বিশ্ববিস্তারের অনর্থ বাধাতেন না; নচেৎ পাভ্‌লোভ্-এর মতো ব্যক্তিবাদীর জীবন কাটতো না সার্ব্বজনীন নাড়িমণ্ডলের চাপ ছ'কে।

সৌভাগ্যক্রমে সে-কথা পাভ্‌লোভ্ জানতেন; তাই বিজ্ঞানের মতো ব্রহ্মবিদ্যার চূড়ান্ত মীমাংসাও তাঁর সন্দেহ জাগাতো, এবং তিনি বুঝতেন যে অতীত ও বর্ত্তমান লোকাচারে স্বাধীনতার সুদূর সম্ভাবনাও যদিচ দুর্ঘট, তবু অন্তত অনধিগম্য আদর্শ হিসাবে সেই অভীপ্সাই মানবত্বের একমাত্র লক্ষণ। কিন্তু সাম্রাজ্য, গণতন্ত্র ও তথাকথিত সমানাধিকার, এই তিন শাসনপদ্ধতির সঙ্গেই ক্রমান্বয়ে সংঘর্ষে এসে তিনি স্বভাবত ভেবেছিলেন যে স্বার্থচালিত মানুষও যন্ত্রপুত্তলীর মতোই অভ্যাসের দাস। তাহলেও তাঁর বিশ্বাস ছিলো যে আত্ম-বেদের সম্মুখে অনিষ্টের শক্তিও দাঁড়াতে পারবে না; এবং বহিঃপ্রকৃতিকে না-বেঁধেও তার আংশিক পরিচয় পেয়েই মানুষের স্বাচ্ছন্দ্য যখন এতখানি বেড়েছে, তখন তার অন্তঃপ্রকৃতি না-বদলালেও শুধু আত্ম-জ্ঞানের সাহায্যেই সে সকল হিংসা-দ্বেষকে ছাড়িয়ে যাবে। এই আত্ম-জ্ঞান একা বিজ্ঞানেরই দাতব্য কিনা, সে সম্বন্ধে পাভ্‌লোভ-এর কোনো স্পষ্টোক্তি নেই; তবে তাঁর নিত্যকর্ম্মতালিকায় শিল্প প্রভৃতির অনুশীলন এতখানি জায়গা জুড়েছিলো যে সে-সমস্তকে অনাবশ্যক ব্যসন বলা অসঙ্গত। হয়তো তাঁর বক্তৃতাবলীর আভাস-ইঙ্গিত এই ধারণারই অনুকূল যে বিজ্ঞানকে তিনি জ্ঞানার্জ্জনের উপায় মাত্র বিবেচনা করতেন; বিভিন্ন জীবনযাত্রার বিরোধী উপকরণের সুশৃঙ্খল বিন্যাসে বিজ্ঞান একটা নির্দ্বন্দ্ব বিশ্ববীক্ষার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য মানচিত্র আঁকবে, বোধহয় এই ছিলো তাঁর আন্তরিক আশা ও ঐকান্তিক আকাঙ্ক্ষা। সেইজন্যেই আসন্ন বর্ব্বরতার অবশ্যম্ভাবী অবসানে পুনরুজ্জীবিত মানব-সভ্যতা ইভান্ পেত্রোভিচ্ পাভ্‌লোভ্-কে মনুষ্যধর্ম্মের অন্যতম পুরোধা ব'লেই চিনবে।

পুস্তকপরিচয়

Rajmohan's Wife—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত

(প্রকাশক, কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়, প্রবাসী অফিস)

মাইকেল মধুসূদনের মতনই বঙ্কিম প্রথম বই লেখেন ইংরেজীতে। সাধারণে খবরটুকু জানত না। বঙ্কিম বাবু শেষ জীবনে একটা নূতন নভেল লিখতে আরম্ভ করেন—তার মাত্র সাতটি অধ্যায় লেখা হয়েছিল। বঙ্কিম বাবুর ভাইপো সচীশ বাবু তাকে সম্পূর্ণ করেন এবং তার নাম দেন 'বারি-বাহিনী'। শচীশ বাবুও জানতেন না যে বইটা Rajmohan's Wife নামে প্রকাশিত ইংরেজী নভেলেরই অনুবাদ। দুর্গেশনন্দিনী প্রকাশিত হয় ১৮৬৫ সালে। ইংরেজী বইটা তারও দু'বৎসর পূর্ব্বের লেখা, যখন বঙ্কিমের বয়স মাত্র পঁচিশ বৎসর। কিশোরী মিত্র মহাশয়ের সম্পাদিত Indian Field নামক সাপ্তাহিকে ১৮৬৪ সালে বইখানি ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হয়। ঐ সাপ্তাহিকের কোনো কপি সাধারণ লাইব্রেরীতে না থাকার দরুনই বঙ্কিমের প্রথম পুস্তক সম্বন্ধে এমন অজ্ঞানতা। বঙ্কিমও নিজে বইখানি সম্বন্ধে বিশেষ কোনো উচ্চাবাচ্য করেননি। কারণ ঠিক জানা নেই, তবে সে সম্বন্ধে স্বকীয় গৌরব-বোধের এবং পাঠক-বর্গের মধ্যে উৎসাহের অভাবই অনুমান করা চলে।

বইখানির আবিষ্কার সত্যই অপ্রত্যাশিত ও বিস্ময়কর। 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা'র লেখক ঐতিহাসিক ব্রজেন বাবুর অনুসন্ধান-প্রবৃত্তি সর্ব্বজনবিদিত। কিছুকাল পূর্ব্বে অন্য বিষয়ে নিজের গবেষণাসম্পর্কে ১৮৬৪ সালের হিন্দু পেট্রিয়ট তিনি খোঁজ করেন। খোঁজ পেলেন ৺কৃষ্ণদাস পালের পৌত্র শ্রীসীতানাথ পালের লাইব্রেরীতে। যে ভলুমে ঐ বৎসরের হিন্দু পেট্রিয়ট বাঁধান ছিল তারই পাতা ওলটাতে ওলটাইতে ব্রজেন বাবু দেখলেন সেই সঙ্গে ঐ বৎসরের Indian Fieldও রয়েছে। যতগুলি সংখ্যা পেলেন তাতে তিনটি অধ্যায় ব্যতীত ইংরেজী নভেলটির বাকী সব অধ্যায়গুলিই ছিল। দপ্তরীর এই ভুলে বঙ্কিম-সাহিত্যের মহৎ উপকার হল।

নব-প্রকাশিত বইখানিতে ৪ থেকে ২১ অধ্যায় ও উপসংহার বঙ্কিমের লেখা—দু'একটি অক্ষর ছাড়া, যেগুলি পোকায় খেয়েছিল। প্রথম তিনটি অধ্যায় শচীশ বাবুর প্রকাশিত ও বঙ্কিম বাবুর লিখিত বারি-বাহিনী নামে বাংলা বইএর প্রথম তিনটি অধ্যায়ের অনুবাদ। এই অংশের ইংরেজী অনুবাদ বঙ্কিমের ইংরেজী রচনাভঙ্গীরই অনুযায়ী। অতএব বইখানিকে পূর্ণাবয়বই বলা চলে।

স্বাধীন দেশে এই প্রকার কোনো সাহিত্যিক আবিষ্কার ঘটলে দেশময় একটা সাড়া পড়ে। কেবল তাই নয়, প্রথম সংস্করণের জন্য নীলামে হাজার হাজার টাকার ডাক ওঠে। এ পোড়া দেশে খবরের কাগজে সাড়া পড়ে যে কোনো

লোকের চরিত্রস্খলনে, এবং টাকা ছড়িয়ে পড়ে গোপন চিঠির প্রকাশ দমনে। সে যাই হোক—এই মহামূল্য আবিষ্কারের জন্য ব্রজেন বাবুকে প্রথমেই ধন্যবাদ জানিয়ে পরে বইখানির অন্য মূল্য যাচাই করিতে হবে, নচেৎ পরিচয়ের মতন পত্রিকার কোনো সার্থকতাই থাকে না।

এই ইংরেজী বইখানিকে বঙ্কিম-প্রতিভার অভিব্যক্তির সূচনা, সমসাময়িক সমাজের চিত্র, এবং মাত্র একখানি নভেল হিসেবে ধরা চলে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই ছোট্ট বইখানি বঙ্কিম-প্রতিভার বীজ-ভূমি। অঙ্কুরগুলির মধ্যে মাত্র কয়েকটির নির্দ্দেশ করছি। বঙ্কিমচন্দ্রের নানা বিষয়ের আদর্শের আভাসও এখানে পাওয়া যায়।

বইখানির চতুর্থ পরিচ্ছেদে মথুর-মাধব ঘোষের বংশপরিচয়ে নতুন সম্প্রদায়ের জমীদার-বর্গের সম্বন্ধে বঙ্কিমের গভীর অভিজ্ঞতার পরিচয় মেলে। ঘোষেদের সদর ও অন্দর মহলের বর্ণনা যেন নগেন্দ্র ও কৃষ্ণকান্তের বাড়িরই বর্ণনা। উইল সংক্রান্ত ঘরোয়া বিবাদ, সরিকী মনোভাব, সম্পত্তি ভাগ, দাস-দাসীর আচার ব্যবহার, কথাবার্ত্তা, এমন কি বৈঠকখানার সাজ সজ্জা পর্য্যন্ত আমাদের অত্যন্ত পরিচিত।

চরিত্র সৃষ্টিতেও বঙ্কিম বাবু যেন হাত পাকাচ্ছেন; অর্থাৎ পরবর্ত্তী উপন্যাসের অনেক টাইপ এখানে বর্ত্তমান, গোটাকয়েক স্পষ্ট ও গোটাকয়েক অস্পষ্টভাবে। মোটামুটি বলা চলে—রাজমোহনের স্ত্রী মাতঙ্গিনী ও মথুরের স্ত্রী তারা এক টাইপের; মাতঙ্গিনীর বোন এবং মাধবের স্ত্রী হেমাঙ্গিনী অন্য টাইপের—দুইই লক্ষ্মী মেয়ে। মথুরের দ্বিতীয়া স্ত্রী চম্পক যেমন হয় অর্থাৎ সুন্দরী ও হিংসুটে। একমাত্র খারাপ স্ত্রীলোক সুখীর মা। পুরুষদের মধ্যে রাজমোহন ডাকাতের গুপ্তচর, নিষ্ঠুর ও হিংসুক, মথুর অসচ্চরিত্র ও লোভী জমীদার—(অনেকটা দেবেন্দ্রের মতন), এই দুজন খারাপ। সর্দ্দার ও ভিখু লোক মন্দ নয়। লেখক হিসেবে ডাকাতের প্রতি বঙ্কিমের মোহ ছিল। এই বইতে ডাকাত, পরের বইএ ডাকু সন্ন্যাসী, তারও পরে বিশুদ্ধ সন্ন্যাসী। মাধবই বইখানির নায়ক, ইংরেজী শিক্ষিত সহুরে প্রকৃতির অর্থাৎ ভদ্রলোক। যে যে গুণ বঙ্কিমের সমগ্র নভেলের নায়কেই পাওয়া যায় মাধবও সেই সব গুণের আধার। মাধবকে প্রতাপও বলা যায়। বইখানিতে কোনো সন্ন্যাসী নেই। ভূতপেত্নী আনতে পারেননি বলে বঙ্কিম পাঠক-বর্গকে ঠাট্টা করেছেন—এটাও তাঁর পজিটিভিজমের পূর্ব্বাভাস। কিন্তু এলে গল্প আরও জমত।

গল্পের প্লট ও চরিত্র-সমাবেশ এই বইখানিতে দুটি বিভিন্নরূপ নেয়নি—পরেও তারা হরিহরাত্মা। বইখানির গল্প যেন ছুটছে—মাত্র ১৫৫ পৃষ্ঠার মধ্যে কি না হোলো—এক চরিত্রের অভিব্যক্তি ছাড়া! বঙ্কিমের শ্রেষ্ঠ বইগুলির প্লট যেন এই বই থেকেই ভাঙ্গিয়ে নেওয়া। মাতঙ্গিনী ও মাধবের বাল্যপ্রেম, উইলচুরি, সুখীর মায়ের দৌত্য, মথুর-চম্পকের কথোপকথন, মথুর-রাজমোহনের সয়তানী, মাতঙ্গিনী-তারার মাহাত্ম্য সবই পরবর্ত্তী উপন্যাসের উপাদান ও অঙ্গ।

বর্ণনাভঙ্গীও যুবক বঙ্কিমেরই উপযুক্ত। দ্রুত ঘটনার পর সেই রসিকতার অবসর, সেই গুরুগম্ভীর ভাষায় বিদ্রূপ, সেই গ্রাম্যভাষায় গ্রাম-বাসীদের কথোপকথন, স্বামী-স্ত্রীর সেই রসালাপ বর্ণনায় সেই সূক্ষ্মদৃষ্টির পরিচয়, প্রকৃতির সেই রোমাঞ্চকর বর্ণনা সবই এই বইএ বিদ্যমান।

সমসাময়িক সমাজের চিত্র হিসেবে বইখানির মূল্য অত্যন্ত বেশী। মাত্র বছর পাঁচেক পূর্ব্বে সিপাহী বিদ্রোহের অবসান হয়েছে। ইংরেজ শাসন তখনও গ্রামে সুপ্রতিষ্ঠিত হয় নি—ডাকাতের দল তখনও ডাকাতী করে বেড়ায়, জমীদাররাও তাদের সাহায্য ভিক্ষা করে, গ্রামের সুন্দরী স্ত্রীলোক তখনও অত্যাচারী জমীদারের ভয়ে পথেঘাটে বেরোন না। অন্তধারে একদল ইংরেজী শিক্ষিত ভদ্র সম্প্রদায় উঠছেন (বঙ্কিম মাধবকে গ্রামবাসী করেছেন !)—যাঁরা অত্যাচারী নন, গ্রামের বাড়িতে সোফায় শুয়ে ইংরেজী বই পড়েন (কি বই লেখা না থাকলেও অভ্যাসটা বাঙ্গালীর পক্ষে বহু পুরাতন দেখা যাচ্ছে)। এঁরা একটু নিরীহ প্রকৃতির, অত্যাচারের বিপক্ষে টুঁ-শব্দটি করেন না, এক বাড়িতে ডাকাত পড়ার খবর কোনো স্ত্রীলোকের মুখ থেকে শুনে উইল রক্ষার জন্য ডাকাতদের চেয়ে মাত্র বেশী চেঁচিয়ে তাদের তাড়িয়ে দেওয়া ছাড়া। তখন থেকে ডাকাতপড়ার কিছু দিন পরে এসে দুষ্টের দমন করতে সুরু করেছেন জেলার ইংরেজ ম্যাজিষ্ট্রেট। এই বইএর সাহেব জাতিতে আইরীশ এবং পুলিশ রিপোর্ট অগ্রাহ্য করবার সাহস ধরেন বলে interfering। এটাও পূর্ব্বলক্ষণ। এই সাহেবের আগমনবার্ত্তা শুনেই মথুর ঘোষ নামে জমীদার মহাশয় আত্মহত্যা করেন।

প্রেম ও বিবাহের আদর্শ সম্বন্ধে আমাদের পরিচিত বঙ্কিমী মতামত বইখানিতে ওতপ্রোত। বাল্যপ্রেমে অভিসম্পাৎ, প্রেমনিবেদনের পর সংযম, স্ত্রীর আদর্শ সতীত্ব ও প্রেম—এমনকি রাজমোহন ও মথুর বাবুর মতন স্বামীর প্রতিও, কোনটাই এতে বাদ যায় নি। যেটুকু বাদ পড়েছে সেটুকু পরেও আসেনি। শৈবলিনী ও সূর্য্যমুখীর স্বামীগৃহত্যাগ যদি সন্ন্যাসীর দ্বারা শোধিত না হত তবে সে-কর্ম্ম মাতঙ্গিনীর মাধব ও মথুর গৃহে ইচ্ছা এবং অনিচ্ছাকৃত রাত্রি-বাসের মতনই সমাজবিগর্হিত হত না কি ? বঙ্কিমের মতে দুই স্ত্রী থাকার পরিণাম খুব অশুভ নয়, কেবল মান অভিমানের দাবীদাওয়া মেটান ছাড়া। বঙ্কিমের কাছে বিবাহের চেয়ে বড় কিছুই ছিল না, এখানেও নেই।

স্ত্রীজাতির মধ্যে এক নিম্নশ্রেণীর দাসী বাঁদীদের ওপরই বঙ্কিম বিরক্ত ছিলেন। বাকী স্ত্রীলোক দুই জাতের—পরে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন—এ-বইএ ইঙ্গিত মাত্র আছে—এক তেজী, অন্য মিনমিনে, ঘ্যানঘেনে, প্যানপেনে। শেষের দলই হিংসুটে, সকলেই। তেজী মেয়েদের সম্বন্ধে বঙ্কিম এই বই-এর বিংশ-অধ্যায়ের শিরোনামায় লিখছেন, 'Some women are the equals of some men'। কিন্তু তেজী হয়েও পুরুষালী নয়। মাতঙ্গিনী ও তারা বঙ্কিমের আদর্শ রমণী, বিমলারই আত্মীয়া। কর্ত্তব্যের খাতিরে (?) মাতঙ্গিনী নিশুথ রাতে পাড়াগাঁয়ের জঙ্গলে রাস্তা দিয়ে ভগ্নীপতির বাড়ি যায়, স্বামীর হাতে যন্ত্রণা উপেক্ষা ক'রে স্বামীর টানে (?) তারা দেবী লণ্ঠন হাতে করে বাগান অতিক্রম করে, রাস্তায় ডাকাত, আকাশে প্যাঁচার ডাক কিছুই ভ্রুক্ষেপ করে না, কম সাহসের কথা নয়; কিন্তু সেই সঙ্গে ভগ্নীপতির সামনে মাতঙ্গিনীর এক হাত ঘোমটাও লক্ষ্য করবার জিনিষ। কিন্তু একবার খুললে মুখ আর থামে না, পরে বুক বাঁধতে হবে জেনেও। এই শ্রেণীর তেজী মেয়েদের শ্রদ্ধা না করে থাকা যায় না। কেবল ইচ্ছা হয় অষ্টম অধ্যায়ের

(যেখানে মাধব চেঁচিয়েই ডাকাত তাড়ালেন) নাম করণ এই প্রকার হল না কেন, Some men are the equals of some women ? অবশ্য পুরুষের আদর্শ সম্বন্ধে বঙ্কিম কোথাও খোলাখুলি কিছু লিখেছেন বলে মনে পড়ছে না। মাধবই যখন এই বই-এর নায়ক তখন তাকেই আদর্শ পুরুষ ভাবলে অন্যায় হবে না। যে ডাকাতরা আওয়াজের চোটেই ছুটে পালাল তারাও মাধবের গুণের অধিকারী। বইখানির শেষে রাজা-প্রজার সম্বন্ধে ইঙ্গিতটুকু নিতান্ত অল্প বয়সের লেখা বলে বাংলায় স্বদেশ-প্রেমের জন্মদাতাকে ক্ষমা করা যায়।

মাত্র নভেল হিসেবে দেখলে বলা চলে, বাংলা সিনেমা ও টকীর উপযুক্ত এমন ভাল বই বঙ্কিম এর পরে আর কখনও লেখেন নি। জমীদার-বাড়ির সদর ও অন্দর-মহলের বর্ণনা সত্যই চমৎকার। কিন্তু কেবল ঐ জন্যই বইখানি যে ভাল লেগেছে তা নয়—বইখানির প্রধান গুণ এই যে তাতে কোনো সন্ন্যাসী নেই—"পতিতা"—রমণীকে শোধন করিয়ে নেবার জন্য।

বঙ্কিমের যথার্থ সমালোচনা এ-দেশে এখনও হয় নি—হলে দেশের উপকারই হবে। ব্রজেন বাবুর আবিষ্কার তাতে সাহায্যই করবে। ব্রজেন বাবুর কাছে আমরা কেবল সামাজিক ইতিহাস নয়, সাহিত্যিক ইতিহাসের জন্যও ঋণী। প্রকাশকও ধন্যবাদার্হ। আমার মতে বঙ্কিমের মতন লোকের ফেলা খুদ-কুঁড়োও উপভোগ্য—এটাত' কাঁচা ধান, কিংবা আঁকাড়া চাল।

ধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

Experiments in Autobiography—by H. G. Wells (Victor Gollancz & The Cresset Press)—Vols I & II.

একথা বোধ হয় নিঃসংশয়ে বলা যেতে পারে যে ওয়েল্‌সের আত্মজীবনী তাঁর সাহিত্যিক গ্রন্থনিচয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম বলে পরিগৃহীত হবার দাবী রাখে। এ হিসাব থেকে আমি তাঁর অক্ষয়কীর্ত্তি Outline of History ও Science of Lifeকে বাদ দিয়েছি, কেননা শেষোক্তটি হোল নিছক বিজ্ঞান আর প্রথমটি ইতিহাস বা ইতিহাসের সাজপরা বিজ্ঞান। Science of Life যে একটি মহা মূল্য বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ এ-বিষয়ে বৈজ্ঞানিকদের দ্বিমত নেই কিন্তু Outline-এর কৌলিন্য সম্বন্ধে ঐতিহাসিকের মতামত না নেওয়াই হবে প্রীতিকর। বাস্তবিক ওয়েল্‌সের বিরাট খ্যাতির পংক্তিবিভাগ কেমনভাবে নির্দ্ধারিত হবে জানিনে, কিন্তু একথা নিশ্চয় যে ওয়েল্‌সের লেখা যা কিছু সবই প্রায় বিজ্ঞান, কখন তা ইতিহাসের কখন তা নিবন্ধের কখন তা গল্পউপন্যাসের সাজপোষাকে সজ্জিত। এ সবের অন্তর্নিহিত বৈজ্ঞানিক বার্ত্তাকেও বিজ্ঞান বলা চলে কিনা সন্দেহ, বলা যেতে পারে সে সব অর্দ্ধ বা উপ-বিজ্ঞান। যাঁরা রামায়ণে বর্ণিত আগ্নেয়াস্ত্রের ও বিমানের কল্পনাতে বিজ্ঞানের অস্তিত্ব দেখতে পান তাঁদের কাছে ওয়েল্‌সের গল্পউপন্যাস বৈজ্ঞানিক সার্থকতা লাভ করতে পারে; কিন্তু বিজ্ঞান ও বিদ্বৎ সমাজে এর সার্থকতা কখনই স্বীকৃত হবে না। অথচ স্বয়ং ওয়েল্‌সের এই সব বৈজ্ঞানিক আজগুবির প্রতি মমতার অন্ত নেই; আত্মজীবনীতে তিনি বলতে ছাড়েন নি যে বিগত

মহাযুদ্ধের বিমান সংগ্রাম তাঁরই কল্পনায় প্রথম উদ্ভূত হয়েছিল। Time-এর fourth dimension তিনিই প্রথম প্রচারিত করেন, রাষ্ট্রে বিপ্লব এনে ব্যক্তিগত অধিকার নির্ম্মূল করে সাম্যতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা কর্‌বার গৌরবও তিনিই অর্জ্জন করতেন যদি না লেনিন তাড়াতাড়ি ঐ কাণ্ডটা বাধিয়ে বসতেন! বলা বাহুল্য এ সমস্তরই কল্পনা ওয়েল্‌সের মস্তিষ্কে ও রচনায় বাস্তবিক প্রসবিত হয়েছিল কিন্তু অপরিণত কল্পনা ও তার প্রকৃষ্ট পরিণতি—প্রভেদ ত ঐখানেই। তথাপি ওয়েল্‌স একজন বিশ্ববিশ্রুত সাহিত্যিক আর আমিও এখানে তাঁর গল্প উপন্যাসের scientific fantasiesএর দর যাচাই করতে বসিনি। এই সব গল্প উপন্যাসের বৈজ্ঞানিক মূল্য যাই হোক তারা এতদূর জনপ্রিয় হয়েছে যে তাদের সার্থকতা সম্বন্ধে সন্দেহ থাকতে পারে না এবং তাঁর Outline of History ঐতিহাসিকদের ইষ্টদেবতা না হলেও জগতে একটা বিরাট কীর্ত্তি বলে আদরণীয় হবে। উভয় ক্ষেত্রেই সিদ্ধির একটা না একটা কারণ আছে যা তার স্বাধিকারের অতিরিক্ত। অপর পক্ষে তাঁর আত্মজীবনীর বৈশিষ্ট্য এই যে তা এ শ্রেণীর লেখার অন্তর্গত নয়। তাতে কোন বৈজ্ঞানিক অভিসন্ধি নেই এবং তার সৌষ্ঠব সম্পূর্ণ স্বকীয়। এরূপ আত্মজীবনী বিরল এমনকি অদ্বিতীয় একথা বলতে বোধ হয় কুণ্ঠার প্রয়োজন করে না।

ওয়েল্‌স এ আত্মজীবনীর নাম দিয়েছেন Experiment in Autobiography। এ এক্সপেরিমেণ্টে বেশ একটু নূতনত্ব আছে। প্রসঙ্গত আমার তিনটি আত্মজীবনীর কথা মনে জাগছে যাদের নাম করলে বোধ হয় পাঠকের কাছে দোষী হব না। প্রথম রুসোর Cofessions, দ্বিতীয় রবীন্দ্রনাথের আত্মজীবনী, তৃতীয় মহাত্মা গান্ধীর Experiments with Truth। রুসোর Confessions নিশ্চয়ই আত্মজীবনী লেখার অগ্রদূত,—তাতে সত্যের প্রাচুর্য্য থাকলেও প্রবঞ্চনারও কমতি ছিল না, কেননা সে জীবনীর প্রতিষ্ঠা ছিল আত্মগরিমায়। রবীন্দ্রনাথের আত্মজীবনী কবি-হৃদয়ের উন্মেষের কাব্যময় কাহিনী। মহাত্মাজীর আত্মজীবনীর প্রতিষ্ঠা অন্য স্তরে—বোধ হয় বলা যেতে পারে তা মূলত আধ্যাত্মিকতায়। ওয়েল্‌সের আত্ম-জীবনী এ কোনটির সমতুল নয়, তাঁর এক্সপেরিমেণ্ট হোল আত্মবিশ্লেষণের একটা এক্সপেরিমেণ্ট। অপরের জীবনী আলোচনা করতে যে নিস্পৃহা ও নিরপেক্ষতা কাম্য ওয়েল্‌স্ নিজের জীবনী আলোচনায় সেই নিস্পৃহা ও নিরপেক্ষতা প্রয়োগ করতে পেরেছেন। এই detachment সত্যই বিরল। মানুষ একটা জৈব বস্তুবিশেষ ও সে জগতের একটা বিশেষ কাল ও ঘটনাচক্রের গণ্ডীর মধ্যে অবস্থিত; এরই যোগ-সমন্বয়ের ফলাফলে তার শিক্ষা সাধনা কার্য্য ও কীর্ত্তিকলাপ, দোষ ত্রুটি গুণ। এতে গোপন করার কিছু নেই আবার দোষ ত্রুটিকে ক্ষুদ্র করে গুণকেও বড় করবার কিছু নেই। এই খাঁটি বৈজ্ঞানিক মনোভাব এ আত্মজীবনীতে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে অথচ এ আত্মজীবনীতে বিজ্ঞানের বালাই নেই। ওয়েল্‌স্ বলেছেন যে নিজের আত্মজীবনীতে তিনি সারা মানবের জীবন্ত ছবি প্রতিফলিত দেখেছেন, তাই তাঁর কাছে ক্ষুদ্র মহৎ, দোষগুণের কোন প্রভেদ নেই।

A variety of biological and historical suggestions and generalizations …the once amorphous mixture has fallen into a lucid arrangement and through

this new crystalline clearness, a plainer vision of human possibilities and the conditions of their attainments appears. I have made the broad lines and conditions of the human outlook distinct and unmistakable for myself and for others.

উপরোক্ত মনোভাবের একটা প্রধান লক্ষণ হোল বিনয়,—এই বিনয় সমগ্র আত্ম-জীবনীতে ব্যাপ্ত হয়ে আছে। গোড়াতেই ওয়েল্‌স লিখেছেন—

"If there were brain shows as there are cat and dog shows I doubt if my brain would get even a third class prize···In a little private school in a small town on the outskirts of London it seemed good enough, and that gave me a helpful conceit about it, but compared with the run of the brains I meet now-a-days it seems a poorish instrument, I wont even compare it with such cerebra as the full and subtly simple brain of Einstein, the wary, quick and flexible one of Lloyd George, the abundant and rich grey matter of G. B. Shaw or Julian Huxley's store of knowledge"

একথা বলতেও তিনি ইতস্ততঃ করেননি যে মস্তিষ্কের দুর্ব্বলতা যেমন বুদ্ধির নিষ্প্রভতার কারণ তেমনি তা নৈতিক নিশ্চেষ্টতারও উৎপাদক। মস্তিষ্ককে তিনি যেমন উচ্চস্থান দিয়েছেন তেমনি উচ্চস্থান দিয়েছেন শিক্ষাকে, বিশেষতঃ বাল্য-কালের শিক্ষাকে। এই বাল্যশিক্ষার ত্রুটি অনুভব করে তিনি লর্ড কার্জ্জন থেকে ষ্ট্যালিন কাউকে বাদ দেন নি,—বলেছেন Governessএর আঁচলধরা শিক্ষা ও বাল্যকালের অব্যবস্থিত শিক্ষাই এঁদের একগুঁয়েমি ও আত্মম্ভরিতার কারণ। স্কুল কলেজের শিক্ষার আলোচনা, তার ব্যবস্থা ও পদ্ধতি ওয়েল্‌সের আত্ম-জীবনীর অনেকখানি স্থান অধিকার করে আছে। আধুনিক জগতের সব রকম শিক্ষা ও সব রকম বিলি-ব্যবস্থাতেই তাঁর মহা বৈরাগ্য; বাস্তবিক ওয়েল্‌সের সমস্ত কল্পনা সমস্ত রচনা একটি কেন্দ্রের চারিদিকে গ্রহমণ্ডলীর মত পরিভ্রমণ করেছে—সে হোল planned শিক্ষা, planned রচনা, planned সমাজ, planned জগৎ। মনে হয় তিনি সারা প্রকৃতির মধ্যে plan-এর অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন। সেই plan-কে চালনা করবার বিরাট পুরুষেরই যা কিছু অভাব।

এ সব যাই হোক নভেল ও গল্পলেখক, সমালোচক, journalist, ঐতিহাসিক, বৈজ্ঞানিক, বিজ্ঞানশিক্ষক, সমাজসংস্কারক এদের একত্র সমাবেশময় ওয়েল্‌সের বিচিত্র রচনাবলীর উৎস ও পুষ্টি কোথায় তা তাঁর দু ভলুমের ৮০০ পৃষ্ঠাব্যাপী আত্মজীবনীতে সুবিন্যস্তভাবে ফুটে উঠেছে। ওয়েল্‌সের বাল্যকাল কাটে দারুণ দারিদ্র্যে,—বাবা ছিলেন বাগানের পরিচারক ও ক্রিকেটার; মা ছিলেন বড় ঘরের পরিচারিকা। বাবা বাগানের কাজ করে ও ক্রিকেট খেলায় আকৃষ্ট থেকেও বাড়ীতে লাইব্রেরী থেকে নানা গল্প উপন্যাস ভ্রমণ-কাহিনীর বর্ণনা নিয়ে এসে পড়তেন; মায়ের শিক্ষা ছিল নগণ্য। ওয়েল্‌সের জন্য নির্দ্দিষ্ট হয়েছিল পোষাকের দোকানের কর্ম্মনবীশি। কিন্তু দৈবাৎ আট-নয় বছর বয়সে পায়ে আঘাত পেয়ে ওয়েল্‌স কিছুকালের জন্য শয্যাশায়ী থাকেন। সেই সময় তিনি পাঠের দুর্দ্দমনীয় স্পৃহার সন্ধান পান ও এই থেকেই তাঁর জীবনের বর্ত্ত অন্যদিকে ধাবিত হয়। Natural Historyর

প্রতি পক্ষপাতিত্ব তাঁর এই সময় থেকেই। আর এক কথা, ঐ সময়ই তাঁর নানারূপ রঙীন ছবিদেখে স্ত্রীসৌন্দর্য্য সম্বন্ধে চেতনা জাগে।

Across the political scenes also marched tall and lovely feminine figures, Britannia, Erin, Columbia, La France, bare armed, bare necked, showing beautifnl bare bosoms, revealing shining thighs, wearing garments that were a revelation in an age of flounces and crinolines. I became woman-conscious from these days onwards.

পরে স্বীয় যৌনজীবন সম্বন্ধে নিজেকে অনাবৃত করে দেখাতে তিনি তিল মাত্র সংকোচ করেন নি; স্ত্রীবিলাসের আস্বাদ পান তিনি ১৪।১৫ বছর বয়সেই ও তার আহ্বান আসে তাঁর এক তরুণী আত্মীয়ার কাছ থেকে। পরে তিনি আর এক তরুণীর প্রেমময় বাহুবন্ধনের স্ফূর্তি লাভ করেন—ওয়েল্স বলেছেন "কামানন্দ নাহি তায়" এবং প্রকৃতি প্রেমের স্বরূপ তিনি এঁরই কাছে উপলব্ধি করেন। আর এক কথা তিনি স্পষ্ট করে ব্যক্ত করবার যথেষ্ট প্রয়াস করেছেন যে, তাঁর স্কুলজীবনে ১০।১২ বছরের মধ্যেই স্ত্রীপুরুষের যৌনতত্ত্ব সম্বন্ধে যা কিছু জ্ঞাতব্য ও গোপনীয় সংবাদ তার কোনটি থেকেই তিনি বঞ্চিত হননি। স্কুলেতে সহপাঠীর সঙ্গ যৌনতত্ত্বের শ্রীক্ষেত্র এ বিষয়ে এখনও অনেক পিতামাতা ও অভিভাবকবৃন্দের ভ্রান্তধারণার অন্ত নেই। যা হোক ওয়েল্সকে শিক্ষার পথ অবলম্বন করতে দুর্দ্দমনীয় চেষ্টার আশ্রয় নিতে হয়েছিল ও দারিদ্র্যপীড়িত সংসারের সঙ্গে বিবাদ বিদ্রোহও করতে হয়েছিল। প্রাথমিক শিক্ষার শেষে নানা ভাগ্যবিপর্য্যয়ের মধ্য দিয়ে তাঁর বাল্যবয়স একরূপ শিক্ষকতা ও শিক্ষালাভের একত্র সমাবেশে অতিবাহিত হয়। এ রকম অব্যবস্থিত ভাবে শিক্ষালাভের অদৃষ্ট তাঁর সময়ে অনেককেই বহন করতে হয়েছে; ওয়েল্সের সময় শিক্ষার পদ্ধতিও এখনকার মত সহজ ও সুলভ্য ছিল না। এই জন্যই বোধ হয় Natural History ভিন্ন সমস্ত রকমের শিক্ষাপদ্ধতির বিরুদ্ধে ওয়েল্সের তীব্র নিন্দা সবাক হয়ে উঠেছে; Physics Chemistry শিক্ষা পদ্ধতির বিরুদ্ধেও তিনি খড়্গহস্ত। Natural Historyর কথা আলাদা কেননা ও বিষয় তিনি ছেলেবেলা থেকেই বোঝেন ও ওবিষয়ে পরিণত বয়সে তিনি Huxleyর কাছে শিক্ষালাভ করেছিলেন। প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে তিনি Midhurst Grammar School থেকে শিক্ষকভাবেই সসম্মানে পরীক্ষা উত্তীর্ণ হন ও সে সময়কার নূতন ব্যবস্থানুযায়ী বৃত্তি পেয়ে Londonএর South Kensingtonএ নর্ম্মাল স্কুলে ভর্ত্তি হবার সুযোগ পান। এইখানে সেই বিশ্ববিশ্রুত Huxleyর পদতলে তাঁর দ্বিতীয় স্তরের শিক্ষা আরম্ভ হয়। ওয়েল্স একমাত্র Huxleyকেই তাঁর বিজ্ঞান-শিক্ষার ইষ্টদেবতা ভেবে ভক্তি-অর্ঘ্য উপহার দিয়েছেন;—"Huxley the acutest observer, the ablest generalizer, the great . teacher, the most lucid and valiant of controversialist."। বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখা ও পদার্থবিজ্ঞানের প্রতি তাঁর বীতরাগের কথা ইতিপূর্ব্বেই বলেছি। Natural Historyর প্রতি তাঁর তীব্র অনুরাগের ফল তাঁর সমস্ত রচনার মধ্য দিয়ে বেশ বিকাশ পেয়েছে। World Historyকেও তিনি Natural Historyর মত সাজিয়ে ছড়িয়ে দেখতে চেয়েছেন আর পদার্থবিজ্ঞান নিয়ে তিনি যা কিছু গল্প উপন্যাস লিখতে গিয়েছেন তা হয়েছে আজগুবি। Huxleyর

শিক্ষকতা সম্বন্ধে ওয়েল্‌সের একটা বিবরণ পাঠককে মুগ্ধ করবে নিশ্চয়—"I was told that while Huxley lectured Charles Darwin had been wont at times to come through those very curtains from the gallery behind and sit and listen"। কে না জানে Darwinএর evolution তত্ত্বের প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি Huxleyর কাছে কত না ঋণী।

নর্ম্মাল স্কুল থেকে পাশ করবার পর ওয়েল্‌স London Universityর B. Sc. পাশ করেন ও এই সময় থেকে তাঁর লেখকজীবন সুরু হয়। প্রথম প্রথম তিনি সুরু করেন সমালোচনা ও দু'একটা আজগুবি প্রবন্ধ লিখতে—এর মধ্যে Time Machine বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সঙ্গে তিনি ঐ সময় Educational Times, Science School Journal ও Pall Mall Gazette প্রভৃতি সাময়িক পত্রিকাদির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হন। সাময়িক পত্রিকাদিতে লেখার পূর্ব্ব থেকে তিনি B. Sc ছাত্রছাত্রীদের coaching কাজে আত্মনিয়োগ করেন। কিন্তু ক্ষয়রোগে ভীষণভাবে আক্রান্ত হয়ে তাঁকে ছেলে পড়ানো কাজ বন্ধ করতে হয়, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর লেখার কাজ বেড়ে চলে। বহু পত্রিকাদি থেকে তাঁর রচনার জন্য আহ্বান আসতে আরম্ভ হয় ও সেই থেকেই তাঁর সৌভাগ্যরবি উদিত হয়। ঠিক কোন সময়ে কি ভাবে তাঁর গল্প উপন্যাস প্রকাশিত হতে আরম্ভ হয় তার সঠিক নির্দ্দেশ আত্মজীবনীতে পাওয়া যায় না যদিও এ কথা তিনি স্থানে স্থানে বলে গিয়েছেন কোন ঘটনা থেকে তাঁর কোন গল্প উপন্যাসের আদর্শ সংগৃহীত হয়। তাঁর গল্প উপন্যাসের মধ্যে—বৈজ্ঞানিক আজগুবি বাদ দিয়ে—কোনটিই আমার কাছে যথেষ্ট উঁচুদরের মনে হয় নি। আমার কাছে তাঁর Outline ও Science of Life ই মূল্যবান গ্রন্থ বলে মনে হয়। Outline-এর উদ্ভব-কাহিনী ওয়েল্‌স সুন্দররূপে ব্যক্ত করেছেন। বিগত মহাসমরের শেষাবস্থায় যখন সারা জগৎ League of Nations-এর কল্পনায় মসগুল সে সময়ে নানাভাবে ওয়েল্‌স এরই কল্পনা প্রচারে ব্যাপৃত হন ও সে অবস্থায় তিনি অনেক মহারথীর সংস্পর্শে এসে এই তথ্য আবিষ্কার করেন যে কূট রাজনীতিতে পাকা হলেও এঁরা অনেকেই জগতের ইতিহাসের ধারাবাহিকতাসম্বন্ধে অজ্ঞ। এ থেকেই তাঁর Outline of Historyর পরিকল্পনার উদ্ভব হয় ও এতে তিনি অসামান্য সাফল্য ও অর্থলাভ করেন। Science of Life ও Wealth, Hapiness—রচনার পরিকল্পনাও এ থেকেই। সমগ্র প্রাচীন ও আধুনিক জাগতিক বিবরণকে একসূত্রে গাঁথার এই বিরাট পরিকল্পনা শিক্ষিত জাতের কাছে চিরদিন গৌরবের বিষয় হয়ে থাকবে। আজ ঐভাবের পুস্তক রচনার কত যে অনুকরণ প্রকাশিত তা হতেই এর যথেষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায়।

আর দুটি বিষয়ের উল্লেখ করে আমি এই আলোচনা শেষ করতে চাই। অন্যান্য যে সব লেখক ও ভাবুকবৃন্দের সঙ্গে ওয়েলসের প্রীতিবন্ধন হয়েছিল তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য—Bernard Shaw, George Gissing, Wallace, Joseph Conrad, ও Arnold Bennett। এক Shaw ছাড়া এঁদের বিবরণ আত্মজীবনীর এক রমণীয় অংশ জুড়ে আছে। শুধু আশ্চর্য্য লাগে যে একবার Shaw-এর তীক্ষ্ণ মেধার উল্লেখ ভিন্ন তাঁর প্রতি কোন প্রশংসা বা শ্রদ্ধার নিদর্শন ওয়েলস্‌ আত্মজীবনীতে

উপস্থিত করেন নি। রাশিয়ায় গিয়ে ওয়েলস্ সেদিন ষ্টালিনের সঙ্গে দেখা করেন ও তিনঘণ্টাব্যাপী রাষ্ট্র আলোচনায় অতিবাহিত করেন কিন্তু তাঁর প্রতি ওয়েলস্ প্রসন্ন নন। সোভিয়েটের আশ্রয়ে গর্কীর মনোগত পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করেও তিনি বিদ্রূপ ও সংশয় ব্যক্ত করতে ছাড়েন নি। যে গর্কী একদিন সমাজের নগণ্যতমের ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার জয়গানে মুখর ছিলেন সে গর্কীর মুখে আজ ব্যক্তিগত স্বাধীনতার দাবী সোভিয়েট রাষ্ট্রের শত্রুর অনিষ্টাচার মাত্র। কে জানে ওয়েল্‌সের নির্দ্দেশই ঠিক কি গর্কীর ব্যাখ্যাই ঠিক। বাস্তবিক কি নিরপেক্ষ ব্যক্তিগত স্বাধীনতা কোথাও থাকা সম্ভব? সে যাক একজন রাশিয়ানকে ওয়েলস্ তাঁর শ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেছেন, সে হোল Pavlov; Pavlov-এর laboratoryকেও তিনি উচ্চকণ্ঠে প্রশংসা এবং এই ৯০ বছর বয়স্ক বৃদ্ধ বৈজ্ঞানিককে সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট ও সমস্ত রাশিয়া যে কি শ্রদ্ধা ও মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখে তার বর্ণনা করেছেন। এমন কোন জিনিষ বা এমন কিছু টাকাকড়ি নেই যা Pavlov চাওয়া মাত্র পাননি।

আর একটি বিষয় বাকি আছে সে হোল ওয়েল্‌সের দাম্পত্যজীবন। দাম্পত্য জীবনে ওয়েল্‌স সুখী নন। প্রথমে তিনি যাঁকে বিবাহ করেন তিনি ওয়েল্‌সের দূর সম্পর্কের এক আত্মীয়া; এ বিবাহ প্রেমঘটিত নয় এবং ওয়েল্‌স তাঁর নিষ্ঠাবান স্ত্রীর কাছে না প্রেম না তাঁর শিক্ষাদীক্ষার সম্পদ বা সাড়া খুঁজে পেয়েছিলেন। যখন ওয়েল্‌স তাঁর এক ছাত্রীর কাছে প্রেমের আস্বাদ খুঁজে পান তখন স্ত্রীকে ত্যাগ করে তাঁর প্রেমাস্পদের বাহুবন্ধনে ঝাঁপ দিতে ওয়েলস ইতস্তত: করেন নি। পরে পূর্ব্ব স্ত্রীর সঙ্গে divorce ও নূতনের সঙ্গে বিবাহ হয় কিন্তু আত্মজীবনী পড়ে মনে হয় না যে দ্বিতীয়া স্ত্রীও তাঁর দাম্পত্যজীবনে এমন কিছু অবদান আনয়ন করেছিল। কামের দিক থেকে ওয়েল্‌স সম্পূর্ণ স্বাধীনতার পক্ষপাতী, তাই বিনাপরাধে প্রথম স্ত্রী ত্যাগের জন্য তিনি কোন ক্ষোভই স্বীকার করতে রাজী নন। ওয়েল্‌সের এমন বিচিত্র আত্মজীবনীর ষ্টাইল অতি সহজ ও সাধারণ, কোন অলঙ্কার বা রম্যতার প্রয়াস তাতে নেই।

"I am a journalist" I declared, "and I refuse to play the artist". I have stuck to that declaration ever since, I write as I walk because I want to get somewhere and I write as straight as I can, just as I walk as straight as I can, because that is the best way to get there"

গিরিজাপতি ভট্টাচার্য্য

The Ancient World—By T. R. Glover, (Cambridge).

(ক)

প্রতীচ্যে বিজ্ঞানসম্মত গবেষণার দ্বারা পণ্ডিতেরা তাঁদের জ্ঞানের সীমা যে পরিমাণে বাড়িয়ে চলেছেন, সে পরিমাণেই যাতে সাধারণ লোকের জ্ঞানবৃদ্ধি সম্ভব হয়, এবিষয়েও তাঁরা সচেষ্ট। ফলে, লৌকিক বিজ্ঞান (popular science) জাতীয় বেশ একটা বড় গোছের সাহিত্য গড়ে উঠেছে; এ সাহিত্যের উদ্দেশ্য হচ্ছে সাধারণ পাঠককে সহজভাবে শিক্ষা দেওয়া। আমাদের দেশেও যখন বিদ্যার আদর ছিল, তখন পুরাণ জাতীয় সাহিত্য এই আদর্শেই লেখা হয়েছে। অষ্টাদশ মহাপুরাণে

বর্ণিত বিষয় কতকটা একই বটে; কিন্তু এক একটী পুরাণের এক একটী বিশেষ সুর আছে,—কোনটীতে তীর্থমাহাত্ম্যের প্রাধান্য (যথা, স্কন্দপুরাণ), কোনটীতে ঔষধ পথ্যের ব্যবস্থা অনেকটা স্থান অধিকার করেছে (যথা, গরুড়-পুরাণ) কোনটীতে ভৌগোলিক তত্ত্বেরই বিশেষ আলোচনা দেখা যায় (যথা, মার্কণ্ডেয়-পুরাণ), ইত্যাদি। অবশ্য, আধুনিক শিক্ষার প্রভাবে আমরা ইদানীং এ-সব পুরাণগুলোকে প্রায়ই নিতান্ত পুরোনো বলে' মনে করি, এবং একটু অবজ্ঞাও হয়তো করে থাকি। আমরা চাই, নতুন পুরাণ; আর ইংলণ্ডে সেইরকম চাহিদার ফলে শিক্ষার অন্যতম কেন্দ্র কেম্ব্রিজ সহরের ছাপাখানায় এই শ্রেণীর বই অনেকগুলি ছাপা হয়ে আস্‌ছে।

"লৌকিক বিজ্ঞান"—কথাটা ঠিক্ সোনার-পাথর বাটির মতন বলা যায় না; বরং বল্‌তে পারি, জিনিষটা যেন বামুনের গরু,—খাবে কম, দুধ দেবে বেশী। গ্লোভর সাহেবের কেতাবটীর দাম, মাত্র সাড়ে সাত শিলিং; অথচ তাতে আমরা দেখ্‌তে পাই একটী প্রকাণ্ড ব্যাপারের ছোট্ট একখানি ছবি,—সমগ্র প্রাচীন জগতের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। লেখকের ভাষা অতি প্রাঞ্জল, বর্ণনায় সৌষ্ঠব আছে, ভঙ্গীতে সরলতা প্রচুর। আলোচ্য গ্রন্থখানি কোনো "পরীক্ষার পাঠ্য পুস্তক" রূপে কল্পিত নয়; তাই "battles, dates and constitutions have been omitted, where they seemed of minor significance in the march of events." (লেখকের ভূমিকা)। এসব বিষয়ে ভাল করে' জান্‌তে হলে কৌতূহলী পাঠক Cambridge Ancient History পড়ে নেবেন,—গ্রন্থকারের এই নিবেদন।

গ্রন্থকার দেখিয়েছেন যে ইতিহাস তৈরী হয় প্রাধানত তিনটী ভৌগোলিক উপাদানে—পাহাড়, নদী, আর পথ। জগতে পর্ব্বতের মতন অচল আর কি আছে? পাহাড় থেকেই নদীর উদ্ভব। স্রোতস্বতীর বক্ষে বক্ষে কূলে কূলে, যাওয়া-আসা মানুষের পক্ষে চিরদিনই সহজ; তাই আজও পর্য্যন্ত পৃথিবীর প্রধান পথগুলো নদীর প্রবাহের সহগামী। নদী আমাদের ক্ষুধা-তৃষ্ণা দুই-ই নিবারণ করে। জল কৃষকের শ্রেষ্ঠ সম্বল, তৃষিতের তৃপ্তিস্থান। সেই কারণেই বোধ হয় আমাদের পূর্ব্বপুরুষরা নদী ও পর্ব্বত উভয়েরই পূজা করতেন। আমরাও যে করি না, তা নয়। শুধু পূজার পদ্ধতির পরিবর্ত্তন ঘটেছে। মনে মনে আমরা খুবই ভালবাসি, গঙ্গার ধারে বেড়াতে, ষ্ট্র্যাণ্ডের হাওয়া খেতে, দার্জ্জিলিং—শিম্‌লায় যেতে। পূজার উপচারই এখন বিভিন্ন; ফুল-চন্দনের পরিবর্ত্তে আমরা এখন ধারণ করি, রিষ্ট্-ওয়াচ্, ওয়াকিং-ষ্টিক্ আর ওভার কোট্।

(খ)

আলোচ্য পুস্তকে যে জগৎ অঙ্কিত হয়েছে, তার মধ্যে ভারতবর্ষের স্থান অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ। লেখক গতানুগতিক ভাবে ধরে নিয়েছেন যে, ইতিহাসে প্রাচীন ভারত প্রায় নগণ্য। দোষ অনেকটা আমাদেরই। ইতিহাসে ইউরোপীয়দের যেরকম আস্থা আছে, আমাদের সেরকম নেই। আমার মনে হয়, এই আস্থা আর অনাস্থা যে মনোভাবের পরিচায়ক, সে মনোভাব জাতিগত। কেবল আধুনিক যুগেই যে আমরা ইতিহাসকে অবহেলা করেছি, তা নয়। প্রাচীনকালেও

ভারতীয়েরা এই শ্রেণীর সাহিত্য-রচনায় বিশেষ তৎপর ছিলেন না। কথাটা একটু বিশদভাবে বলি।

'ইতিহাস'—শব্দটীর প্রয়োগ পাওয়া যায় বৈদিক সাহিত্যে, কিন্তু সেযুগে ঐ শব্দের অর্থ কি ছিল, সে সম্বন্ধে পণ্ডিতেরা একমত নন্। যাস্ক বলেছেন, ইতিহাসের উদ্দেশ্য হচ্ছে ঋগ্বেদের কতকগুলি mythsকে legends-ভাবে বোঝানো। বৈদিক সাহিত্যে 'ইতিহাস' আর 'পুরাণ' এই দুই শব্দেরই পাশাপাশি ব্যবহার দেখা যায়। পরবর্ত্তী যুগের কাছে—

ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণামুপদেশসমন্বিতং।
পূর্ব্ববৃত্তং কথাযুক্তমিতিহাসং প্রচক্ষতে॥

আমরা প্রত্যেক রাজ্যের ইতিহাস বলতে বুঝি, স্থানীয় প্রধান প্রধান ঘটনার পূর্ব্বাপর-সংযোগ। এবং যেহেতু রাজা ও রাজ্য—ruler and ruled এই দুই মিলে তবে হয় প্রকৃতি বা State, রাজ-পরম্পরাকে ছেড়ে দিলে ইতিহাস রচনা করা কঠিন। কয়েকটী মহাপুরাণে 'রাজবংশ-কথন' পাওয়া যায়—আধুনিক historical research কার্য্যে এই বংশানুক্রম অত্যন্ত উপযোগী। স্বর্গীয় পার্জ্জিটার সাহেব এই সম্বন্ধে বহু গবেষণা করেছিলেন। এই বিবরণে ভারত যুদ্ধ থেকে মহাপদ্ম নন্দ পর্য্যন্ত যে বংশানুক্রম দেওয়া আছে, তার মধ্যে একটী বিশেষ লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে তিনটী সমসাময়িক রাজবংশের মধ্যে কেবল মগধের রাজাদের-ই প্রত্যেকের রাজ্যকাল দেওয়া আছে,—অন্য রাজাদের কেবল পূর্ব্বাপর নামোল্লেখ মাত্র বর্ত্তমান। আমার মনে হয়, সেকালে মগধেই কালজ্ঞান ছিল; সেইখানেই ইতিহাসের মেরুদণ্ড।

সিংহলের 'মহাবংশ' প্রভৃতি গ্রন্থকে ইতিহাস বলা যায়; সেখানেও রাজ-পরম্পরা ও রাজ্যকাল দেওয়া আছে। কিন্তু গোড়ার দিকের রাজাদের সঙ্গে সমসাময়িক মগধের রাজাদের পারম্পর্য্য ও রাজ্যকাল বিশেষভাবে উল্লিখিত। কারণ বোঝা সহজ; মগধ থেকেই সিংহলে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচার; সুতরাং মগধে প্রচলিত ঐতিহাসিক রীতি যে সিংহলে অনুসৃত হবে, সেটা কিছু বিচিত্র নয়।

কাশ্মীরের 'রাজতরঙ্গিনী'ও ইতিহাস-পদবাচ্য। 'নীল-মত-পুরাণ' প্রভৃতি প্রাচীনতর গ্রন্থ অবলম্বন করে' এই ইতিহাসটী লেখা হয়। রাজতরঙ্গিনী রচিত হয়েছিল খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে, যখন মগধের সিংহাসনে পাল-বংশীয় রাজা অধিষ্ঠিত। এই পাল-বংশের আদি রাজা ছিলেন বঙ্গদেশীয় 'গোপাল' যিনি খৃষ্টীয় অষ্টমশতাব্দীতে মগধ জয় করেন। গোপালের পর রাজা হন, ধর্ম্মপাল। ধর্ম্মপাল বহুদেশ জয় করেছিলেন; এমন কি সুদূর গন্ধার পর্য্যন্ত তাঁর প্রভাব বিস্তৃত ছিল। হয়তো, মগধের ঐতিহাসিক রীতি এই সূত্রেই কাশ্মীরে প্রতিষ্ঠা লাভ করে; অন্ততঃ, এটা দেখি যে এই সময় থেকেই রাজতরঙ্গিনীতে কাশ্মীরের রাজাদের রাজ্যকাল ঠিক্ ঠিক্ দেওয়া আছে। অবশ্য চীনদেশের সুপ্রাচীন ইতিহাসেও এই পদ্ধতি দেখা যায়। সুতরাং শেষ পর্য্যন্ত পদ্ধতিটীকে চীনে বল্‌লেও বলা চলে —বিশেষত যখন স্মরণ করি যে ঐ সময়ে চীনদেশের সঙ্গে ভারতের খুবই ঘনিষ্ট সম্পর্ক।

* আমার সন্দেহ হয়, পাল-বংশীয় দেবপালের সেনাপতি 'লাউসেন'—যিনি আসাম জয় করেন—চীনা ছিলেন। মাগধী প্রাকৃতে যে 'র'-এর বদলে 'ল' পাওয়া যায়, তাও হয়তো চীনের প্রভাবে।

(গ)

আমরা আশা করতে পারি না, যে গ্লোভর সাহেব মাত্র চার-শ পৃষ্ঠার কেতাবে সমগ্র ইতিহাস পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দিয়ে যাবেন। তাঁর নিজের কথায় বলি—

"The writer has so far followed the example of ancient historians that he has ignored politicians, permitted himself to digress, and repeated that the cause is as important to learn as the event". (Preface).

কেন যে তিনি politicianদের ignore করেছেন, সে কথাও বলেছেন—

"When all is said, the politicians of any age are rarely remembered ten years after they die or lose their seats in Parliament. Only historians, pondering sadly over maps, marvel at the short outlook and the scanty insight of those who managed our colonies before they governed themselves. Ancient politicians were little wiser ; and it is one of the touches of genius in the historian Thucydides that he ignores their very names, unless it may be that the murder of one of them shows the temper of the day. So little significant, so little formative, as a rule, are party leaders. Few indeed of the political figures did so much to make Grecce as did the poets and philosophers." (Page 66-67).

গ্লোভর সাহেবের digressionগুলি অনেক ক্ষেত্রে উপাদেয়। দু' একটী দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করা যেতে পারে। আথেন্সে দাসত্ব কিরকম ছিল, এই প্রসঙ্গে লেখক বলেছেন—

"The flight of 20,000 slaves is evidence enough that men were not content to be slaves in Athens. Escape was harder for women. But, at the worst, it must be admitted that slavery at Athens, bad as it was for master and slave, and bad economically, does not show the horrors of Roman slavery, or of American. No negro slave in New York or New Orleans is known to have inherited his master's widow along with a bank." (P. 134).

মিশরের সহর আলেক্জান্দ্রিয়ার বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—

"The city was divided into five quarters called after the first five letters of the alphabet (the jews lived in Delta). It was full of impressive buildings, notably the Gymnasium, with porticoes more than a furlong in length. The streets were on the rectangular plan, and two of them very broad, 90ft. in width (Main Street, Winnipeg, is 132ft, wide) ; one the canopic street, they say, was four miles long, and lit at night—so well lit, that an ancient writer in his enthusiasm calls it "the sun in small change" ; oil-lamps only, we remember with something of a start. Broadway in New York, is many miles long ; but the ancient world was impresed with a street four miles long, the cities they knew were much smaller and far more cramped." (P 250).

সব দিক্ থেকে দেখ্‌তে গেলে, গ্লোভর সাহেবের Ancient World একটী সুখপাঠ্য পুস্তক। তবে, যাঁরা ঐতিহাসিক গবেষণা চান্, তাঁদের জন্যে এ বই লেখা হয় নি।

শ্রীহারীতকৃষ্ণ দেব

সাগর ও অন্যান্য কবিতা—সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য (পূর্ব্বাশা প্রেস্)

পুরবাসিনী—শ্রীমতী অপরাজিতা দেবী (গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়)

এই সুদৃশ্য ছোট কবিতার বইখানি আগাগোড়া অব্যাহত আনন্দে প'ড়ে যাওয়া যায় এবং প'ড়্‌তে প'ড়্‌তে কোথাও বই বন্ধ ক'রে মাথা ঘামাবার প্রয়োজন হয় না—ঝর্‌ ঝরে হাল্‌কা ভাষা, সুন্দর মোলায়েম্‌ শব্দ-যোজনা, স্থানে স্থানে চমৎকার চিত্রাঙ্কন—আবার সব শুদ্ধ জড়িয়ে কেমন একটা আব্‌ছা সুদূরতার অন্তরাল! মস্তিষ্ক-বৃত্তির মারপ্যাঁচে বিপর্য্যস্ত আধুনিক কাব্যের আব্‌হাওয়ায় এ কাব্যের বিশেষত্ব আছে—যে সমস্ত স্বপ্ন, যে সমস্ত অনুভূতি অত্যন্ত সন্তর্পণে আল্‌তো পায়ে আমাদের কল্পনার মাটি মাড়িয়ে চলে, লেখক তাদের ধ'রে রেখেছেন তাঁর সোনালী ভাষার ইন্দ্রজালে। তবে একথা আমি বিশ্বাস করি যে এই বই আরো বড় হ'লে এবং এই জাতের কবিতা এতে আরো থাকলে বইটি শোচনীয় রকম একঘেয়ে হ'ত—আর শেষকালকার গদ্য-কবিতাগুলো সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের স্বীকৃতি উদ্ধৃত করা সত্ত্বেও আমি কোন উচ্চ প্রশংসা ক'রতে পারিনে। গদ্য টেক্‌নিক্‌ বাংলা কবিতার ধাতের সঙ্গে ভালো রকম খাপ খায় কিনা তাতে আমার সন্দেহ আছে—বিশেষ ক'রে এই রকমের মেরুদণ্ডহীন গদ্য—যা গদ্য ও পদ্য দুইয়ের মধ্যবর্ত্তী এবং কোনটারই স্পষ্ট আভিজাত্য যাতে নেই। যদি কারুর সঙ্গে তুলনায় সমালোচনা ক'রতে হয় ত আমি এই নবীন কবিকে অন্যতম নবীন কবি বিষ্ণু দের সঙ্গে তুলনা কর্‌বো—উভয়ে যেন উভয়ের অবলম্বিত ধারার প্রতিক্রিয়ার দ্যোতক—সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য মূলতঃ স্বপ্নের কবি—তাঁর দৃষ্টি রঙীন, তাঁর ভাষা রঙীন, তাঁর ভঙ্গী পেলব—যেন পুষ্প ভরানতা ভূসঞ্চারিণী লতা—অবলম্বন ব্যতিরেকে যার উর্দ্ধমুখী হবার স্বকীয় শক্তি নেই। আর বিষ্ণু দে—আপন বেগে আপনি উর্দ্ধায়িত—কিন্তু তাঁর গতির বহুসহস্র গ্রান্থিল আবর্ত্তন ও সৌষ্ঠবহীন কাঠিন্য উপভোগ্য ত নয়ই, সময় সময় ক্লান্তিকর। এ দুইই দুই প্রান্ত—সুতরাং গ্রন্থারম্ভে লেখকের পক্ষ থেকে যে লিরিক-বৈশিষ্ট্যের দাবী করা হ'য়েছে, তা আমরা অস্বীকার করি না।

দ্বিতীয় বইয়ের লেখিকা শ্রীমতী অপরাজিতা দেবী ইতিমধ্যেই বেশ খ্যাতি লাভ ক'রেছেন। বলা বাহুল্য সহজেই সাধারণের প্রীতি অর্জ্জন করা যায় যাতে, সেই প্রসাদগুণ তাঁর রচনায় প্রচুর—তাঁর হাতে ভাষা চলে ঠিক শাণিত তলোয়ারের মতো। কোথাও তাঁর বাধা-বিপত্তি নেই, অতি অনায়াস কৌশলে তিনি জবরদস্ত গদ্যকে সরস সুরেলা ক'রে তুল্‌তে পারেন। তাঁর রচনা যে সাধারণের এত প্রিয়, তার আরও একটা কারণ তার ভেতর বৃহত্তর কোন ব্যঞ্জনার বালাই নেই; তার বদলে তাতে আছে খানিকটা নাটকীয়তা, খানিকটা গল্পের ভাব আর প্রচুর পরিমাণে আছে বাক্‌বিন্যাসের সরসতা। রুচি বা নীতির প্রশ্নকে সাহিত্য-বিচারে একান্ত ভাবে মারাত্মক ক'রে না তুল্‌লে এই জাতীয় রচনাকে বেশ উপভোগ্যই মনে করা যেতে পারে। অবশ্য এরা কবিতা কিনা সে প্রশ্ন ওঠা আশ্চর্য্য নয়—কিন্তু কবিতার এলাকার যদি একটা নির্দ্দিষ্ট পরিমাপ না থাকে ত একেও এক জাতের কবিতা বলতে বাধা কি? না হয় তার স্থান একটু নীচু স্তরেই নির্দ্দিষ্ট হ'ক্‌।

আলোচ্য বইয়ে বাংলার গার্হস্থ্য-জীবনে মা, ভগিনী, বৌদি ইত্যাদি নানা আকারে নারীর যে রূপ দেখা যায়, লেখিকা তাঁর নিজস্ব ভঙ্গীতে তাঁদেরই কয়েক-জনকে এঁকেছেন এবং অনেকগুলি কবিতাই বেশ সুখপাঠ্য ও সুষমান্বিত হ'য়েছে। রচনা কোথাও আড়ষ্ট হয় নি, স্থানে স্থানে বরং বিশেষত্বপূর্ণই হ'য়েছে—অবশ্য গভীরতা, নিবিড়তা কোথাও পাবেন না; তবে বিচিত্রতা ও মধুরতারও অভাব নেই। বাংলা ভাষায় কবি কিরণধন প্রথম এই ধরণের কবিতা লেখার সূত্রপাত ক'রে-ছিলেন—তাঁর 'গৃহিণী', 'দেনদার', 'আব্দারের আধঘণ্টা' প্রভৃতি এই জাতেরই কবিতা—অবশ্য তাঁর হাত ছিল অপরাজিতা দেবীর চেয়ে কম সচল, কিন্তু বেশী মিষ্টি। উভয়ের রচনা থেকে উদ্ধৃত ক'রে দেখাতে পারলে সুখী হ'তাম, কিন্তু স্থানাভাব। পিসিমা, ঠিকে ঝি, গৃহিণী চিত্র হিসাবে বাংলার ঘরে ঘরে আদর পাবে আশা করা যায়—বিশেষ ক'রে তাঁদের এরা খুবই প্রিয় হবে, যাঁদের নিয়েই এই কাব্যের উদ্ভব।

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত

Everyman in Health and in Sickness—Edited by Dr. Harry Roberts (J. M. Dent & Sons)

মানুষের স্বাস্থ্য এবং অসুস্থতা সম্বন্ধে লিখিত এই বইখানি ৭৫০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। চিকিৎসাব্যবসায়ী না হ'য়েও সাধারণ বুদ্ধিমান ব্যক্তি শরীর ধর্ম্ম-সম্বন্ধে যে সকল অবিসংবাদিত বৈজ্ঞানিক তথ্য জানতে উৎসুক এবং নিজে অথবা কোনো আত্মীয়স্বজন ব্যাধি-বিশেষ পীড়িত হ'লে ডাক্তারের হাতে চিকিৎসার ভার দেওয়া সত্ত্বেও ব্যাপারটা কি জানবার জন্যে যখন আগ্রহান্বিত তখন ঐ রোগ সম্বন্ধে মোটামুটি যতটুকু জানা থাকলে সে বুদ্ধি পূর্ব্বক ডাক্তারের কার্য্যের সহযোগিতা করতে পারে,—সেই সমস্ত তথ্যই এই বইখানিতে যথাসম্ভব সহজ ও সংক্ষিপ্ত ভাবে সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে। শরীর ও মন সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য কোনো কথাই এতে বাদ যায় নি। বইখানি চারিভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে আছে—Natural History of Everyman,—অর্থাৎ মানুষের শরীরের অ্যানাটমি ও ফিজিওলজি, তার ইন্দ্রিয়সমূহ ও সেগুলির ক্রিয়া, তার স্নায়ুসকলের ক্রিয়া, তার খাদ্যাখাদ্যের বিচার, তার মনের চেতন ও অবচেতন অংশ, তার সন্তানোৎপাদনের কলকৌশল ইত্যাদির সম্বন্ধে আলোচনা। দ্বিতীয় ভাগে—Everyman in Health,—অর্থাৎ স্বাস্থ্য কাকে বলে, স্বাস্থ্যরক্ষার কি কি উপায়, খাদ্যাদি সম্বন্ধে নানারকম বিচার, এবং ব্যায়াম সম্বন্ধে, বাসগৃহ সম্বন্ধে, পোষাক পরিচ্ছদ সম্বন্ধে এবং পরিশ্রমাদি সম্বন্ধে নানা তথ্য। তৃতীয় ভাগে—Stages of Human Life,—অর্থাৎ শৈশবাবস্থা ও শিশু-প্রতিপালন সম্বন্ধে বহু আবশ্যকীয় কথা, যৌনতত্ত্ব ও বিবাহতত্ত্ব, সন্তানোৎপাদন ও বার্থ-কন্ট্রোল্, মধ্যবয়সের কথা ও মধ্যবয়সের উপযুক্ত আহার বিহারাদি, এবং বার্দ্ধক্যের কথা ও তখনকার জন্য নানারূপ সাবধানতার কথা। চতুর্থ ভাগে—Everyman in Sickness,—অর্থাৎ সকল প্রকার রোগ সম্বন্ধে

সংক্ষিপ্ত বিবরণ, তার প্রতিকারের উপায়, প্রাথমিক চিকিৎসা, পথ্যাদি ও শুশ্রূষাদি।

স্বাস্থ্য সম্বন্ধে এবং রোগ সম্বন্ধে সাধারণ পাঠ্য-পুস্তক ইতিপূর্ব্বে ইংরেজীতে অনেক লেখা হয়েছে, কিন্তু সেগুলি এই বইখানির মত সম্পূর্ণ পুস্তকও নয়, এবং এমন সাবধানে যথাযথ বৈজ্ঞানিক অনুপ্রেরণার সঙ্গেও লিখিত নয়। যথাসম্ভব সাধারণ ভাষায় লেখা হ'লেও এটিকে রীতিমত বৈজ্ঞানিক পুস্তক বলা যায়। অতি আধুনিক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলিও এর মধ্যে সযত্নে সন্নিবেশ করা হয়েছে। এমন কি ভেগাস্ নার্ভের উত্তেজনায় কিরূপে acetyl-choline উৎপন্ন হ'য়ে হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া মন্থর করে, আর Aschiem-Zondek test নামক ল্যাবরেটরি-পরীক্ষার দ্বারা কিরূপে গর্ভসঞ্চারের অতি প্রথম অবস্থাও চিনতে পারা যায়, তাও এতে বাদ যায় নি। কয়েকজন বিশেষজ্ঞ বৈজ্ঞানিক এই বইখানি লিখতে সাহায্য করেছেন। তাঁদের মত এই যে বিজ্ঞানের কথা পুরোপুরিভাবে এবং প্রকাশ্যভাবে বলাই ভালো,—সাধারণের জন্য লেখা হচ্ছে বলে কতকগুলি সত্য বাদ দিয়ে কতকগুলি সত্য বেছে বেছে বলা বিপজ্জনক। "There is danger in presenting facts in too simple a way"—এতে সাধারণের ভুল বোঝার যথেষ্ট সম্ভাবনা। তাঁরা বলেন শরীর সম্বন্ধে যা কিছু জ্ঞান তা কেবল চিকিৎসকমণ্ডলীর মধ্যেই নিবদ্ধ থাকবে, আর বুদ্ধিমান উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিরাও এ সম্বন্ধে অজ্ঞ হ'য়ে এক একটা অদ্ভুত ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করবে, বর্ত্তমান যুগে এটা নিতান্তই অন্যায়।

"It is a curious reflection that about himself, about his own bodily and mental mechanism, the ordinary man knows far less than he knows about his motor car. The queerest notions obtain about human anatomy, human physiology, and human psychology, even among the highly cultivated. The practice of medicine is inevitably a matter for experts ; but it is obviously absurd that everyman, entrusted with the driving on the high roads of the universe of the most elaborate and the most dangerous vehicle conceivable, should be in complete ignorance of the structure of the machine."

এখনকার যুগের বৈজ্ঞানিকদের এই মত যে কোনোরূপ কার্পণ্য না ক'রে সমস্তটুকু সত্যই সাধারণকে জানতে দেওয়া উচিত, তবেই তাদের কাছ থেকে সমুচিত সহযোগিতা এবং সমর্থন পাওয়া যাবে। মানুষের স্বাস্থ্যরক্ষা করা যারা ব্রতস্বরূপ গ্রহণ করবে, তাকে স্বাস্থ্য সম্বন্ধে জ্ঞান দেওয়াও তারা ব্রতরূপেই গ্রহণ করবে। কোনো রোগ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হ'লে তারা বলবে না—"সে কথা জেনে তোমার কি লাভ ?"

বইখানিতে অনেক নতুন কথা দেখতে পাবেন। এর স্বাস্থ্যের সংজ্ঞাটি বড় চমৎকার। লেখক বলেন স্বাস্থ্য বলতে কেবল অসুস্থতার অভাবই বুঝায় না,—তা ছাড়া আরো একটা স্বতন্ত্র জিনিষ স্বাস্থ্যের মধ্যে আছে, সেটা একটা প্রাণবন্ত আনন্দ এবং স্ফূর্ত্তি।

""Health has come to mean an absence of disorders. This negative attitude to health is numbing to vitality. The conception is a passive one ; the reality is an active one."

নানারূপ রোগের মাইক্রোব বা বীজাণুর যখন প্রথম আবিষ্কার হয় তখন থেকেই মানুষের মনে বীজাণু-ভীতির সূত্রপাত হয়েছিল এবং লিষ্টারের সময় থেকে অনেক কাল পর্য্যন্ত সে ধারণা বদ্ধমূল হ'য়ে থাকে। তখন লোকে ভাবতো যে বীজাণুর আক্রমণ থেকে কোনরকমে রক্ষা পেয়ে গেলেই স্বাস্থ্য বজায় রইল; এ ছাড়া স্বাস্থ্য বলতে আর কিছু বোঝায় না। কাজেই তখন—

"Disease was studied, not health ; not prevention, but cure."

কিন্তু এখন সে ধারণা বদলে গেছে। এখন—

"We are coming to realize that, after all, man is stronger than the microbe, and that, if we cultivate the defences with which Nature has endowed us, the victory is nearly always with us."

এখন আমরা জানি যে বীজাণুরা কত লোকের দেহের মধ্যেই নিরুপদ্রবে বাস করে, এমনকি যক্ষ্মা-বীজাণুও কত লোকের দেহে লুকিয়ে আছে, অথচ স্বাস্থ্য ভাল ব'লে তাদের কোনো রোগই নেই। সুতরাং বীজাণু রোগের কারণ হ'লেও স্বাস্থ্যহানি না ঘটলে তারা একেবারে নিষ্ক্রিয়।

বইখানিতে মানুষের মন নিয়েও নানারকম আলোচনা আছে এবং মনের রোগ সম্বন্ধেও অনেক কথা আছে। আজকালকার দিনের এও একটা সমস্যা। মানুষের মনও শরীরের মত একরকম যন্ত্র-বিশেষ। "It is only just beginning to be suspected that the mind is just as much a machine as is the body"। এই কলও বিগ্‌ড়ে যায় এবং তার থেকেও নানারকম রোগের সৃষ্টি হয়।

যাঁরা স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় পুস্তকাদি পড়তে উৎসুক তাঁরা এই বইখানি পড়ে অনেক কথা জানতে পারবেন। এমন কি কোনো চিকিৎসকও যদি এ বই পড়েন তবে চিকিৎসারাজ্যের বাইরে আরো যে সব কথা তাঁর জানা দরকার তার অনেক কথাই এর থেকে জানতে পারবেন। তবে এই বইয়ের কতকগুলি ছবি সম্বন্ধে কিছু প্রতিবাদ করা আবশ্যক। অঙ্গসৌষ্ঠব এবং ব্যায়ামকৌশল দেখাবার অছিলায় যে কতকগুলি নগ্ন স্ত্রী-পুরুষের ছবি এতে দেওয়া হয়েছে, এবং বইয়ের মলাটের ওপর সেই সব ছবির নমুনা ডিস্‌প্লে করা হয়েছে, এই বইয়ের মধ্যে তার কোনো আবশ্যকই ছিল না। বোঝা যাচ্ছে এটা জনসাধারণের কৌতুহল আকর্ষণ করবার একটা কৌশল,—অর্থাৎ পুস্তক-ক্রেতা প্রথম দর্শনে ছবি দেখেই উৎসুক হ'য়ে উঠবে, তার পর বইখানা উল্‌টে পাল্‌টে চাই কি কিনে ফেলতেও পারে। কিন্তু এমন একখানা বৈজ্ঞানিক পুস্তকের কাটতির জন্যে এরকম হীন কৌশল অবলম্বন না করলেই ছিল ভাল। এতে বইখানিকে খেলো করে দেওয়া হয়েছে।

শ্রীপশুপতি ভট্টাচার্য্য

The Asiatics—By Frederic Prokosch. (Chatto & Windus).

'দি এসিয়াটিক্‌স্‌' বইখানি উপন্যাস, কিন্তু ইহা লিখিত ভ্রমণবৃত্তান্তের আকারে এবং অনেকখানি পড়িয়াও এই বইখানি যে ভ্রমণবৃত্তান্ত নহে এই ধারণা মন হইতে দূর করা শক্ত হয়। তাহার কারণ লেখকের অসাধারণ বর্ণনাশক্তি। প্রত্যেক স্থান, প্রত্যেকটি ঘটনা, প্রত্যেকটি ব্যক্তি, এত স্পষ্ট, এত সহজ, এত জীবন্ত যে ইহারা কাল্পনিক তাহা কল্পনা করাই কঠিন। হয়তো সম্পূর্ণ কাল্পনিক নহে, লেখকের অভিজ্ঞতাপ্রসূত, কিন্তু একেবারে নিছক কাল্পনিক হইলে অবশ্য বইখানিকে নভেল বলা চলিত না।

এই ধারণা বইয়ের প্রথম অংশ পড়িয়া হয়। ইহা যে আসলে সত্যই উপন্যাস বইখানির উত্তর অংশ পড়িলে সে বিষয়ে আর সন্দেহ থাকে না। বিশেষভাবে, ভারতবর্ষ-সংক্রান্ত অংশটুকু পড়িলে। এই অংশে ভারতবর্ষকে অতি অল্পই পাওয়া যায়—পাওয়া যায় শুধু লেখককে। কোনো ভ্রমণবৃত্তান্তের লেখক এইভাবে ভারতবর্ষের বর্ণনা করিতেন না এবং যদি করিতেন, তাহা হইলে তাঁহাকে ভ্রমণবৃত্তান্তের লেখক না বলিয়া বলা হইত রূপকথার রচয়িতা। ফ্রেডারিক্‌ প্রোকোশের ভারত-বর্ণনা প্রায় রূপকথারই সামিল, কিন্তু এই রূপকথার মধ্যে বাস্তবের একটু লঘু স্পর্শ থাকিয়া গিয়াছে, তাই ভারতবাসীর মনকে তাহা সামান্য নাড়া দেয়—সামান্য, কেন না, লেখক ভারতবর্ষের মর্ম্মে পৌঁছিতে পারেন নাই, নিজের মর্ম্ম দিয়া ভারতবর্ষকে বুঝিবার চেষ্টা করেন নাই, শুধু তাঁহার উপন্যাসের উপকরণ হিসাবে ভারতবর্ষকে ব্যবহার করিয়াছেন মাত্র।

আমি ভারতবাসী, ভারতবর্ষ সম্বন্ধে আমার দরদ আছে, তাই স্বভাবতই প্রোকোশের ভারত-বর্ণনা আমার মনে প্রবল প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করিয়াছে। বইটির অন্যান্য অংশ সম্বন্ধে ঠিক এতটা দৃঢ়ভাবে মন্তব্য প্রকাশ করিবার দুঃসাহস আমার নাই; আমি এশিয়া সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। কিন্তু একটি কথা 'দি এশিয়াটিক্‌স্‌'-এর যে-কোনো পাঠকেরই বোধহয় মনে হইবে—ইউরোপ হইতে তিনি যত দূরে সরিয়া আসিয়াছেন তাঁহার রচনার বাস্তবতা সেই পরিমাণে কমিয়াছে। তাই প্রথম অংশে এশিয়া মাইনরের অভিজ্ঞতা মনে হয় এত সত্য এবং উত্তর অংশে ভারতবর্ষ, বর্ম্মা, কাম্বোডিয়া প্রভৃতি দেশে যখন তিনি পৌঁছান তখন মনে হয় যেন নিতান্তই সম্বন্ধ রক্ষা করা ছাড়া এই অভিযানের আর কোনো উদ্দেশ্য নাই।

দি এসিয়াটিক্‌-এর চরিত্রচিত্র এই ধারণা আরো বদ্ধমূল করে। এসিয়া মাইনরে যাহাদের সাক্ষাৎ পাই তাহারা কেহ স্থানীয় অধিবাসী, কেহ বিদেশী, কিন্তু যে পরিবেশের মধ্যে তাহারা স্থায়ী বা অস্থায়ীভাবে বাস করে তাহার সহিত তাহাদের অন্তরঙ্গ যোগ আছে—তাহাদের মনের দিক হইতে নহে, চরিত্র অঙ্কনের দিক হইতে। উত্তরোত্তর এই যোগ লঘু হইতে লঘুতর হইয়া আসে, মনে হয় লেখকের চোখের সামনে যেন একটি রঙীন পরদা তাঁহার অজ্ঞাতসারে বিলম্বিত হইয়াছে, ইহার রং কখনো প্রীতিকর, কখনো পীড়াদায়ক, ইহার একদিকে রহিয়াছে এশিয়া ও এশিয়াবাসী, অপর দিকে লেখক ও তাঁহার য়ুরোপীয় বন্ধুবান্ধবী এই উপন্যাসের রঙ্গমঞ্চে যাঁহারা একাধিকবার অতর্কিতে অবতরণ করেন এবং আবার অকস্মাৎ অদৃশ্য হইয়া যান। মাঝে মাঝে এই রঙীন পরদাটির স্বচ্ছতা কমিয়া আসে, তখন এশিয়া ও

এশিয়াবাসী পায় লোপ, সমস্ত রঙ্গমঞ্চ জুড়িয়া থাকেন কয়েকটি য়ুরোপীয় নরনারী, ঠিক য়ুরোপীয় কিনা জানি না, কিন্তু আমাদের চোখে নিতান্তই বিদেশী তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু এশিয়া একেবারে অন্তর্হিত হয় না পরদার ওপারে যাহার বিপুল প্রসার অন্তত কল্পনায় অত্যন্ত বাস্তব ছিল, তাহা দেখি ক্রমে পরদার উপর সঙ্কুচিত নক্সায় পরিণত হইয়াছে। নক্সার পরিকল্পনা অবশ্য য়ুরোপীয় চিত্রকরের। স্থূল তাঁহার তুলী, কিন্তু অত্যন্ত নিপুণ তাহার অবলেপ।

ফ্রেডারিক্ প্রোকোশ সার্থক ঔপন্যাসিক না হইতে পারেন, কিন্তু তিনি মনোগ্রাহী লেখক এবং অত্যন্ত কৃতী শিল্পী।

শ্রীহিরণকুমার সান্যাল

"Storm in Shanghai"—(La Condition Humaine)—By Andre Malraux (Methuen & Co).

জীবনের শিরায় তাণ্ডব নর্ত্তনের ছন্দ যেখানে উদ্দাম হয়ে ওঠে, সেখানে শিল্পীর কর্ত্তব্য হয়ে পড়ে জটিল ও দুঃসাধ্য। কারণ তাকে রূপ দিতে গিয়ে শিল্পী প্রায়ই নিজের সৃষ্টি-পরিধি খুঁজে পান না। একটা সংক্রামক আবর্ত্তের ভেতর পড়ে হয় একেবারে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েন, না হয় তাঁকে পলায়ন করতে হয় সৃষ্টি-ক্ষেত্র থেকে। অর্থাৎ যেখানে ঘটনার বেগ দ্রুত ও উগ্র সেখানে প্রায়ই পরিণতিটা হয়ে পড়ে নিছক উপ-নাটকীয়, melodramatic, অথবা উপ-রসাত্মক, Sentimental। এ দুয়ের মাঝখান দিয়ে বলিষ্ঠ ও নিরাসক্ত রস-সৃষ্টি বিরল। কিন্তু মাল্‌রোর এ বইটা পড়ে মনে হল যে, তিনি অসামান্য শিল্প-প্রতিভার দ্বারা এ দুইয়ের প্রায় অসম্ভব সমন্বয় করতে সক্ষম হয়েছেন। জীবনের—করুণ, উগ্র, বীভৎস, বাৎসল্য, মধুর এতগুলি রস-বৈচিত্র্যের ভেতর দিয়ে লেখকের বৈদান্তিক নিরাসক্তি ও নির্ভীক লেখনী চালনা দেখে অবাক হতে হয়। তবে এ বইটা উগ্র-রস-প্রধান। লেখকের পূর্ব্ব প্রকাশিত অন্যান্য বইগুলিও উগ্র-রসাত্মক এবং অসম্ভব বেগবান। (অবশ্য Alastair Macdonald-এর অনুবাদের ওপর নির্ভর করেই মন্তব্যগুলি বলে যাচ্ছি)

আসলে, বইয়ের নাম—La Condition Humaine—। বাহ্যতঃ লেখককে নিয়তিবাদ বা অদৃষ্টবাদের অধিবক্তা বলে ধরে নেওয়া অসম্ভব নয়। কিন্তু আগাগোড়া ভাল ভাবে পড়লে পুরুষকারের স্থান এতে নেই বলা চলে না। অন্ততঃ, তা হলে কিও, কাটভ্ বা অন্যান্য অধিনায়কদের বৈপ্লবিক সংহতি, সঙ্কল্প ও প্রচেষ্টার আংশিক সাফল্যের কোনো মানে খুঁজে পাওয়া যায় না। তাদের শেষ পরিণতি পরাজয় হলেও বা তাদের মৃত্যু ঘটলেও তাদের আদর্শের মৃত্যু শেষ পর্য্যন্ত ঘটতে দেওয়া হয় নি। অদৃষ্ট বা পুরুষকার একটা বিশেষ অবস্থা বা পরিণতির ওপর নির্ভর করে। মৃত্যুর একটা অনিবার্য্য জৈব সত্যকে মেনে নেওয়া অদৃষ্টকে মানা নয়। অপঘাতই প্রশ্ন তোলে নিয়তির। কিন্তু কিও বা শেন্-এর মৃত্যুর পেছনে তাদের দৃঢ় ও জাগ্রত সংকল্প—will, পুরুষকারের অধিকারী করে তোলে—তাদের ঊর্দ্ধে দৈব থাকা সত্ত্বেও। তাই চূর্ণীকৃত ফলের বীজক্ষত থেকে নবতররূপে অঙ্কুরোদ্গমের

স্বপ্ন নিয়েই বইটাকে শেষ করতে হয়। ভবিতব্যতা ও পুরুষকারকে জড়িয়েই তাই La Condition Humaine। এই দুয়ের সমন্বয়ও হয়েছে অপূর্ব্ব!

রাজনৈতিক আন্দোলনের উত্তাপ সাহিত্যকে বহুদিকে ও বহুভাবে প্রভাবান্বিত করেছে। ফরাসী রাশিয়া আয়র্ল্যাণ্ড—এমন কি ভারতবর্ষেও, অনেক দেশেরই, রাষ্ট্রনৈতিক বিগ্রহের চিত্র বহু সাহিত্যরথীদের হাত থেকে পেয়েছি। তাদের প্রত্যেকের সঙ্গে এ বইটার বিস্তৃত তুলনামূলক সমালোচনা সম্ভব নয় রিভিউতে। তবে মাল্‌রোর স্বাতন্ত্র্য মোটামুটি ভাবে দেখান সম্ভব। তার খানিকটা প্রথমেই বিবৃত হয়েছে। আলোচ্য বইটা লেখা হয়েছে—বিংশ শতাব্দীর চীনা রাজনৈতিক আন্দোলনকে কেন্দ্র করে। প্রসঙ্গত প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের নামোল্লেখও পাওয়া যায় —যেমন—সুনইয়াৎসেন বা চাংকাইশেক। বইটার ঘটনাকেন্দ্র শাংহাই সহরে। প্রারম্ভেই দেখতে পাই বিপ্লবের বজ্রগর্ভ মেঘের ছায়াপাত সমস্ত সহরে। শেন্‌এর গুপ্ত-হত্যা এবং চাংকাই-শেক্‌ তথা কুওমিন্‌তাং-এর দৌরাত্ম্যে সে মেঘ হল আসন্নবর্ষী। সে বিপ্লব-মেদুর, সাইরেন-নাদী, থম্‌থমে দৃশ্যপটে দেখতে পাই কিওর বিপ্লবী বন্ধুদের ছুটোছুটি, অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহের গুপ্ত ও দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা এবং সাফল্য। তারপর বিপ্লবের বজ্রনির্ঘোষ ও অগ্ন্যুৎপাৎ। ফলে সমস্ত সহর অস্থায়ীভাবে বিপ্লবীদের করতলগত হয়। ইতিমধ্যে চাং-কাই-শেক্‌এর হত্যার প্রশ্ন নিয়ে মতদ্বৈধ ঘটে কম্যুনিষ্ট কেন্দ্রীয় সমিতির সঙ্গে। ফলে শেন্‌ প্রমুখ বৈভীষিক দল বিচ্ছিন্ন হয়ে চাং-কাই-শেকএর হত্যার ভার নেয়। শেন্‌-এর ষড়যন্ত্র শোচনীয় ভাবে ব্যর্থ হয় এবং শেন্‌ নিহত হয় বা আত্মঘাতী হয় বলাই ঠিক। এ দিকে কিও-র দল অস্ত্রবলের অভাবে পুলিশের হাতে আত্ম-সমর্পণ করতে বাধ্য হয়। তারপর বন্দীদের শোচনীয় মৃত্যু। সংক্ষেপে গল্পের কাঠামোটি এই।

এরই অন্তরালে নায়কনায়িকাদের অন্তর্লোকে যে গভীর নাট্য-লীলা চল্‌ছিল তার আভাস আমরা পাই লেখকের প্রখর সন্ধানী আলোক-সম্পাতে। বইটার অসাধারণত্ব সেইখানেই। কর্ম্মকাণ্ডের তীব্র গতি সত্বেও চরিত্রের সূক্ষ্ম অন্তর্লীন রূপ ব্যাহত হয় নি কোথাও। তাং-ইয়েন-তা-কে হত্যা করার পর শেন্‌-এর মনের অসহ্য দ্বন্দ্ব ও সংপ্লব প্রকট হয়ে উঠলো। সে হঠাৎ উপলব্ধি করলো নিয়তির অমোঘ স্পর্শ নিজের জীবনে। ফলে, দেখতে পাই হিংস্র ও রক্তাক্ত পারিপার্শ্বিক থেকে তার অহিংস ও অসহায় দূরত্ব। সে হয়ে উঠলো গভীর ভাবে নিঃসঙ্গ। নির্ব্বাসিত শেন্‌ তার পুরাতন গুরু বৃদ্ধ জিসোর-এর—কিওর পিতৃদেব—কাছেও কোনো আশ্রয় বা সান্ত্বনা পেলো না। নিয়তির অমোঘ ইঙ্গিত একটা উদগ্র নেশার মত তাকে মৃত্যু-পন্থী করলো। কিও-র জীবনেও দেখতে পাই এই নির্লিপ্ততা। কিন্তু সে অন্য কারণে। তার শান্ত ও শুভবুদ্ধির অভাব ছিল না। যার মূলে ছিলেন তার পিতৃদেব জিসোর। ফলে সে বুঝেছিল যে জীবনের ভাবপুঞ্জ শুধু বৌদ্ধিক প্রত্যয় হিসেবে রইলে চলবে না—সমস্ত জীবনের কর্ম্মের মধ্য দিয়ে নিবিড় ভাবে মূর্ত্ত হওয়া চাই। তাই কিও-র কর্ম্মযোগ আবশ্যিক নয় ঐচ্ছিক। কিন্তু শেন্‌ তার ভগবান হারিয়ে ফেলেছিল—তার জীবনে যেটা খুব বেশী দরকারী ছিল। তাই তার এই নির্ব্বেদ এবং অসহায় নিঃসঙ্গতা। এবং কিও-র জীবনে তাই

ধ্যানাশ্রিত ভগবানের বা পরম-পুরুষের অব্যবহিত প্রয়োজন ছিল না। কিও-র জীবনের সমস্যা তাই তত জটিল নয় যতটা শেন্-এর। মে-র আবির্ভাবে কিও-র জীবনের আর একটা স্তর দেখতে পাই। যেখানে সে অত্যন্ত মানবিক, আসঙ্গ-প্রার্থী অথচ সংযমী। মে কিওর সহধর্ম্মিণী পুরোপুরি ভাবেই। তাদের মিলন জৈব ভাবকে ছাড়িয়েও কর্ম্মের মধ্যে গভীর সহানুভূতির মধ্যে। অতীন আর এলা অথবা সব্যসাচী আর সুমিত্রা বা ভারতীকেও মনে পড়ে এই সূত্রে। তাদের জীবনের যোগসূত্র—প্রধানতঃ আবেগজ, একনিষ্ঠ কর্ম্মযোগের নয়। তাই বলে মে আর কিও-র মধ্যে আবেগ ছিল না একেবারেই তা বল্‌ছিনে। কিন্তু লেখকের কৃপায় তাদের আবেগের পাত্র পূর্ণ হয়ে উঠেছিল একনিষ্ঠ কর্ম্মের দ্বারা। তারা বিলাসী হবার অবসর পায় নি। কিও-র লীলার পরিসমাপ্তির দিনে তার পাশে মে-কে দেখতে পাই মৃত্যু-সঙ্গিনী হিসাবে, যে মে অধুনাবৈজ্ঞানিকমন্থভাবে দেহদান করে কিওকে করেছিল কঠিন। তারপর কিও, মে, সেন্-এর পাশাপাশি দেখতে পাই জিসোর-কে তাদের জীবনের সূত্রধার রূপে। বৃদ্ধ জিসোর-এর চরিত্রাঙ্কন অদ্ভুত হয়েছে। চরিত্র হিসাবে তিনি পুরাদস্তুর চীনা। মহা-অহিফেন-সেবী, মহাজ্ঞানী ও গভীর অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি। প্রাচীন চীনা ঐতিহ্যের আধুনিক প্রকাশ তাঁর মধ্যে। দেখে মনে হয় তাও-পন্থী। অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন যে তাঁর অন্তর্দৃষ্টি ও জ্ঞানের সঙ্গে Opium trayর সম্বন্ধ নিগূঢ়। তা হো'ক। তা'তে তাঁর চরিত্র-মাহাত্ম্য কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় না। তাতে বরঞ্চ তাঁর চীনা লক্ষণ সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।

তারপর কম্যুনিষ্ট বিপ্লবের জ্বালাময়ী লীলার ঊর্দ্ধে তাঁর প্রজ্ঞা সমাহিতি মুগ্ধ করে। তিনি নিজে একেবারে নিষ্ক্রিয় ও শান্ত এবং অহিফেন-মগ্ন। এ রকম উষ্মা-বিহীন শান্ত ব্যক্তির নাড়ীর স্পন্দন মালরো-র সর্ব্বগ্রাহী তাপমানে জানা সম্ভব হয়েছে। তিনি মনে মনে বেশ জানতেন কিও-র কম্যুনিষ্ট সঙ্ঘের এই সব আন্দোলন একটা খণ্ড-নাট্য-লীলা, যার পেছনে পরম-সত্যের সমর্থন ঠিক নেই। তবু তিনি এই কম্যুনিষ্ট বিদ্রোহের পরিপন্থী হন নি, সর্ব্বতোভাবে তার সমর্থন করেছেন, উৎসাহ দিয়েছেন। একবার শুধু জিসোর-এর এই পাষাণ সমাহিতি দ্রব হতে দেখলাম, কিও-র মৃত্যুর পর। তিনি শাংহাই ছেড়ে কোবে এসে অধ্যাপনা কার্য্যে মগ্ন হয়েছেন। এমন সময় মে এসেছে তাঁকে ফিরিয়ে আনবার জন্যে। মে-কে বল্লেন—"I have not forgotten that May. It's something else...Kyo's death isn't only pain, it isn't only that things are changed···It's—a metamorphosis. I have never loved the world over-much : Kyo kept me in touch with mankind, it was through him that men existed for me···।" পিতা পুত্রের সম্বন্ধ এত গভীর ছিল! তারপর বল্‌ছেন—"Marxism no longer lives in me. Kyo looked upon it as a form of will—that's true—don't you think ? "—হাঁ ঠিক। কিন্তু, আসলে মনে হয় মার্ক্‌স্‌বাদের এ ভাষ্যটি জিসোর-এরই নিজের। কিও উত্তরাধিকারীসূত্রে পেয়েছে মাত্র। কিন্তু এবার তাঁর পুনর্ভাষ্যটি বল্লেন—"But I see in it a fate, and I adhered to it so that my fear

might have a link with fate. There is almost no fear left in me now, May : since Kyo died, I haven't minded dying. I have been freed !—at one and the same time from death and from life. "—একে ঠিক শোকোচ্ছ্বাস বলব কি ?

এর পর চরিত্র হিসাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে কাতভ্, ক্লাপিক, ফেরাল এবং হেমেল্‌রিশ্। বিশেষতঃ ক্লাপিক-এর রণ-ক্ষেত্র থেকে পলায়ন-পর্ব্বটি খুব উপভোগ্য ও সজীব। ইন্দ্রিয়বিলাসী ফেরাল্-এর (French Consortiumএর পরিচালক) কর্ম্মকাণ্ড এবং কাম-কাণ্ড বেশ রসাল হয়েছে। তারপর হেমেলরিশ্ এবং কাতভ্-এর করুণ পারিবারিক চিত্র মনে পড়ে। এই সূত্রে বলে রাখা ভাল যে বইটার আর এক দিক আছে। সেটা ক্যাথার্সিস-এর। মনের পুঞ্জীভূত রস-প্রাবল্য যেটা আবর্জ্জনার মত ঠেলতে থাকে ভেতর থেকে—বহির্গমনের পথ পায় বইয়ের পাতায় পাতায়। লেখক সেজন্য ধন্যবাদার্হ।

শেষ করার আগে বলা দরকার লেখক স্বয়ং একজন গোঁড়া কম্যুনিষ্ট। কম্যুনিজ্‌মের রস-বিমুখী বস্তু নিয়ে এত বড় রস-সৃষ্টি যিনি করতে পারেন তাঁকে সশ্রদ্ধ অভিবাদন জানাই। কিন্তু সম্প্রতি আঁদ্রে জিদ্ ও অটুনাদী রোঁলার কম্যুনিষ্ট হওয়াটা সাহিত্যের তরফ থেকে অবান্তর। মানে, কম্যুনিজ্‌ম তাঁদের সাহিত্য-চর্চ্চাকে কিছু সাহায্য করতে পারবে বলে ভরসা হয় না। অথচ কম্যুনিজ্‌মও যে রসানুগ তার প্রমাণ মাল্‌রো-র সাহিত্য-সাধনা।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ মৈত্র।

Poems—By William Empson (Chatto & Windus)

Poems—By George Barker (Faber & Faber)

Selected Poems—By Marianne Moore (Faber & Faber)

A Time to Dance—By Cecil Day Lewis (Hogarth Press)

জাক্ মারিতঁ্যা একদা এক গাছের কথা লেখেন। সে গাছ নাকি বলেছিল, "আমি শুধু গাছ, আর কিছু নয় ; আমি যে ফল ফলাব, সে হবে শুধু ফল। সুতরাং মাটীর যোগ আমি রাখব না, মাটী তো গাছ নয় আর এ আবহাওয়া আমি চাই না, এ তো শুধু গাছ-আবহাওয়া নয়, এ তো সারা প্রভাঁস্ বা ভাঁদের জলবায়ু। বাতাস থেকে আমাকে বাঁচাও।"

দীর্ঘকাল ধরে' কাব্যলক্ষ্মীও এই বুলি আওড়াতেন। টি, এস্ এলিয়ট্ তাঁর কাবলক্ষ্মীকে অন্য সুর বলান্, এই তাঁর কৃতিত্ব। কবিত্ব করে' বলা যায় যে এবার কাব্যলক্ষ্মী জীবনের সমুদ্র থেকে উঠলেন। উঠলেন বটে, কিন্তু দেখা যাচ্ছে স্বধর্ম্মে নিধন ভালো, ফলে দেখি দুর্ব্বল ডে লুইস যে জীবন দেখেন, সে সংক্ষিপ্ত সরলীকৃত কম্যুনিষ্ট্ জীবন। তাই এম্‌পসন্ ব্রিটিশ্ মিউসিয়মের বারাণ্ডায় আর মারিয়ান্ মূর জন্তুর বাগানে ; অর্থাৎ গাছ একটা না একটা আশ্রয় চায়—হয় মার্ক্সিষ্ট্ গ্রন্থশালায়, নয় যাদুঘরে।

মারিতঁ্যা এক জায়গায় বলেছেন যে শিল্পীকে নিজের শিল্পে মানতে হয় একটা তপস্যার কাঠিন্য, ঋজু ব্রহ্মচর্য্য এবং তা মান্‌তে গিয়ে অনেক কিছুই ছাড়তে হয়, ত্যাগ করতে হয়। এই শুচিতা প্রায়ই বার্কার পালন ও রক্ষা করতে পারেন নি। তাঁর মধ্যে নিজের সুখদুঃখ দেহমন নিয়ে, নিজের বিশ্বালোচন নিয়ে নাটুকে অতিশয্য তাঁর কাব্যকে পীড়িত করে। কিন্তু এ ন্যাকামি স্পষ্ট বোঝা যায় প্রথমযৌবনের প্রায় স্বাভাবিক বিকার মাত্র। বিদ্যাপতি এই বিকারই রাধিকা-প্রসঙ্গে বর্ণনা করে' গেছেন। এ কথা মনে হয় যে অন্য তিন কবির মতো বার্কার মানবজীবন ও সভ্যতার অলিগলিতে যান নি। যে পথে তিনি তারস্বরে আত্মকীর্ত্তন করছেন, সে পথ বড়ো ঐতিহ্যের চওড়া পথ, সে পথে চলা যায় ও চলার পূর্ণ পরিণতি আছে। বায়রণের নাটুকেপনা—ডন্ জুয়ানের নয়, চাইল্ড্ হ্যারল্ডের, বার্কারের ঘাড়ে চেপে থাক্‌লেও, তাই তাঁর মধ্যে মেজর কবির দূর সম্ভাবনা দেখি। অবশ্য বার্কারের প্রিয় মৃত্যু ও প্রেম এখনো কৈশোরের কল্পনাউন্মাদিত নাটুকে প্রেম ও মৃত্যু। কিন্তু তিনি নিজেই নিজের সীমা বিষয়ে সজ্ঞান (Narcissus I)। আর বার্করের নাটুকেপনা ছাপিয়ে' ওঠে তাঁর উচ্ছল প্রাণশক্তি। এই উচ্ছল প্রাণশক্তি কিছুকাল আগে রয় ক্যাম্পবেলেও পাওয়া গিয়েছিল। ক্যাম্পবলের মননমার্গ রোমান্টিক রোমাঞ্চকর অ্যাড্‌ভেঞ্চার হওয়ায় তাঁর কবিপ্রকৃতি ম্যাজেপার ঘোড়দৌড়, ট্রিষ্টান্ ডা কুন্‌হা, গোখরো সাপ পোষা ইত্যাদিতেও চমৎকার আলঙ্কারিক ঐশ্বর্য্যেই রুদ্ধ হল। বার্কারের মধ্যে যে প্রাণশক্তি, যে ব্যাপক জীবনায়ন ও নিজের সীমাজ্ঞান পাওয়া যায়, তারই জন্যে ভরসা হয় তাঁর ভবিষ্যতে এবং ক্ষমা করা যায় এই রকম দুর্ব্বল অনুকরণ—

> Wondering one, wandering on,
> One among stars, gone
> For ever from beneath the feet, bereft
> From your always wandering all is left.

কিন্তু চার পাঁচটি কবিতায় অন্তত বার্কারের সংযম এর চেয়ে ভালো কবিতাও সম্ভব করেছে। এবং বার্কারের এই কবিতাগুলিতে স্বকীয়তার দীপ্তি আছে। বিশ্বজগৎ বার্কারের মনে বাঁধা সড়কে যায় না। এই মননের স্বকীয়তায় তাঁর হাতে ভাষার নির্ব্বিশেষ কথা হয়ে' উঠেছে বিশেষ। তাই হয়তো তাঁর শিল্পের ত্রুটি। তাঁর শিল্প তৈরি কিছু নিয়ে কারবার করতে পারে না, তাঁর শিল্প তাই—নিতান্ত ছেলেমানুষি ছেড়ে দিয়ে—একটু উচ্ছ্বসিত, primitive। প্রিমিটিভ্ সম্বন্ধে মারিতঁ্যার বক্তব্য মনে রেখেই বার্কারকে এ নিন্দা করছি।

দুঃখের বিষয়, ডে লুইস্‌কে এ নিন্দায় নন্দিত করা সম্ভব নয়। বার্কারের তপশ্চর্য্যায় ত্যজ্য হচ্ছে প্রাকৃতিক কারণে বয়সোচিত চাঞ্চল্য আর ডে লুইসের তপশ্চর্য্যাই নেই। তাঁর প্রবন্ধের বই পড়ে' ও তাঁর গুরু ও বন্ধু অডেনের বিশ্বরূপদর্শনে (The Arts Today নামক গ্রন্থে) জেনেছি যে কাব্য সম্বন্ধে ডে লুইসের বোধশক্তি কিঞ্চিৎ স্থূল ও তাঁর বিশ্বালোচন মার্ক্সীয় পথে হাঁট্‌তে গিয়ে গোলকধাঁধায় ঘুরছে। এই নব রোমান্টিকরা যে শুধু সমাজরাষ্ট্রীয় পরিবর্ত্তন

চান, তা নয়, তাঁদের জীবনায়নই সেখানে শেষ। এলিয়টপূর্ব্ব কাব্য সম্বন্ধে আপত্তি হত সে কাব্যের বহুমুখ জীবনকে এই সংক্ষিপ্ত সহজ করাতেই; সে আপত্তি আবার এই কম্যুনিষ্ট্ কবিকিশোরদের সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। এই ফাঁকি ডে লুইসেই সব চেয়ে সহজে ধরা পড়ে, কারণ তাঁর শিল্প নেহাৎ স্থূল। তাই তাঁর এ গুরুতর প্রশ্নের জবাব দেবারও প্রয়োজন হয় না—Is it your hope, hope's hearth, heart's home, here at the lane's end? বরঞ্চ হপ্কিন্সের জন্যে দুঃখই হয়। লুইসের যে মনন ক্ষীণ ও জীবনদৃষ্টি ধার করা তার একটা প্রমাণ তাঁর এই হপ্কিনস্ ও অডেনের কবিতাশিল্পের কাছে ঋণ। তার চেয়ে বড়ো প্রমাণ তাঁর নাম-কবিতার শিল্পরীতির অন্তঃসারশূন্যতা। Yes, why do we all, seeing a Red, feel small?—ইত্যাদি প্রক্ষিপ্ত বাক্য ছাড়া সে কবিতাটি কিপ্লিং-নিউবোল্টের ভাষাতেই লেখা। এবারে লুইস্ pylon, cantilever, kestrel-দের হাত এড়িয়েছেন বটে, কিন্তু অর্কেষ্ট্রাকবিতা লেখার মানসিক সম্পদ্ ও শিল্পক্ষমতা তাঁর এখনো হয় নি। শুধু তাই নয়। এটি পড়ে লুইসের কম্যুনিজ্মের ফাঁকি আরো ধরা যায়। তার কারণ এর বহুচর্ব্বিত প্রেম (love) charity নয়, মৈত্রী নয়। তার কারণ এতে সেই বিশেষ নেই, যে বিশেষ কবির কোনো predominating passion থাকলে তাঁর কাব্যকে রঙিয়ে দেবেই দেবে। তা ছাড়া, এই কম্যুনিজ্মের জয়গান যখন মানবজীবনের বেড়ার বাইরে একঘেয়ে স্বরে চলে, তখন সে কাব্যে কবির বিকাশের সম্ভাবনাই বা কোথায় আর বলিষ্ঠ জীবনানুগতাই বা কৈ? আর মাত্র জীবনানুগতাই যে কাব্যের উৎস নয়, সে কথা টমিষ্টরাও বলেছেন।

জানি এখানে সমাজিক প্রশ্ন উঠছে। কিন্তু সে প্রশ্নের উত্তর এলিয়ট্ তাঁর কবিতায় দিয়েছেন, স্বধর্ম্মানুসারে ইয়েট্স্ও দিয়েছেন। এ সমস্যায় ডে লুইস্ ও তাঁর সমপন্থীরা গোলকধাঁধায় ঘুরছেন ও ঘুরবেন বলেই আমার বিশ্বাস। কারণ তাঁরা ভুলে' যান মানবধর্ম্ম এবং তাতে শিল্পের বিশেষ স্থান ও মর্য্যাদা কি ও কোথায়। মারিতঁ্যার ভাষায় তাঁদের দুর্দ্দশার বর্ণনা এই—

And for this reason human production is in its normal state an artisan's production and therefore necessitates a strict individual appropriation. For the artist as such can share nothing in common; in the line of moral aspirations, there must be a communal use of goods, whereas in the line of production the same goods must be objects of particular ownership. Between the two horns of this antinomy St. Thomas places the social problem.

When work become inhuman or subhuman, because its artistic character is effaced and matter gets the better of man, the material factors of civilisation, left to themselves, naturally tend to communism and the death of production, through the very excess of proprietarism and productivism which is brought about by the predominance of the *factibile.*

কিন্তু ঐ পূর্ব্বোক্ত প্যাশন বা টমিষ্ট্দের কথায় habit—তার অভাবে লুইসের কাব্য যেমন দুর্ব্বল, সেই অভ্যাসের জোরেই তেমনি মিস্ মুর বা এম্প্সন্ স্বপ্রতিষ্ঠ। অভ্যাসের জোরেই—কারণ এঁরা কেউই মেজর কবি নন। তাঁদের কবিস্বভাব দুর্ব্বল

নয়, কিন্তু সুকুমার, যত্নপুষ্ট। কিন্তু শুভবুদ্ধি তাঁদের দিয়েছে সীমাজ্ঞান এবং তাঁদের স্বাভাবিক অভাব ও সার্থক অভ্যাস তাঁদের শিল্প ক্ষমতায় সংহত মূর্তি লাভ করেছে।

অবশ্য যে পাঠক হেনরি জেমস্ পড়েন নি, ডান্সিআড ও হুডিব্রাস্ যাঁর ভালো লাগে নি এবং এমিলি ডিকিনসন্ আর আলিস মেনলের কবিতা যাঁদেরকে অভিভূত ক'রে না, তাঁদের মারিআন্ মুরকে ভালো লাগবে না। আর মার্ভলের বৈদগ্ধ্য ও রচেষ্টারের চিন্তাশক্তি ও শিল্পনৈপুণ্য যাঁরা বোঝেন নি তাঁরা এম্প্সনের সুকুমার বৈজ্ঞানিকমগ্ন কবিত্বও বুঝবেন না। অবশ্য এঁরা দুজনে সবসময়ে সুর ঠিক রেখেছেন ভাবলে ভুল হবে। তাল কেটেছে মধ্যে মধ্যে, মধ্যে মধ্যে তানেও হয়েছে গোলযোগ। কিন্তু কয়েকটি ভাল কবিতা তো পাওয়া গেল আর তা ছাড়া The artist who has the habit of art and the quivering hand produces an imperfect work but retains a faltless virtue. (Art and Scholasticism)

মিস্ মুরের দৃষ্টি যেন সারসের মতো—মিস্ সিট্‌ওএলের কবিতা যেন কাকাতুয়ার আর্তনাদ। স্থির শান্ত তাঁর ভঙ্গী—হঠাৎ দেখি শিকার হয়ে গেছে—কবিতার বিশেষ মূর্তিটি আণুবীক্ষণিক দৃষ্টি ও ধারালো ঠোঁটে ধরা পড়ে গেছে। দৃষ্টি তাঁর হেনরি জেমসের মতো, হড্‌সনের মতো প্রখর, প্রয়োগ ও গতি তাঁর পোপের মতো, বটলরের মতো তীক্ষ্ণ ও ক্ষিপ্র। অথচ আসন তাঁর সংযত শালীনতায় শ্রীমতী ডিকিন্‌সনের বা মেনলের মতো সুষ্ঠু ও সংহত-আবেগ। মিস্ মুরের ভাষাও অন্তরঙ্গ স্বকীয়তায় নিজের কাছে সার্থক ও পাঠকের কাছে মূল্যবান। মারিতঁ্যার পরীক্ষা তিনি পেরিয়ে গেছেন—it is bound fast to an object—any object to be made, certainly, not an object of contemplation.

তাঁর, তথা এম্প্সনের, তপশ্চর্য্যা সার্থক সন্দেহ নেই। Selected Poems-এর ভূমিকায় এলিয়ট বলেছেন যে জীবজন্তুর প্রতি বিষয়গত টান দেখে যদি কেউ ভাবে মিস্ মুর trivial, তাহলে বুঝতে হবে তারই মন trivial। নিশ্চয়ই বুঝতে হবে, আর বাইব্‌লের কাল থেকে জীবজন্তুর বিষয়গত সার্থকতা তো আমরা দেখেই আসছি। কিন্তু একথা তো আধুনিক মনস্তত্ত্বে বলে ও সেণ্ট্ টমাস্ সেকালেই বলেছিলেন যে মানসিক ক্রিয়ার কারণে কোনো কোনো বস্তু, কোনো কোনো প্রতীক অন্যাপেক্ষা মূল্যবান—যথা ঘ্রাণ গন্ধের সম্বন্ধে যা মানসিক ক্রিয়া হয়, তার চেয়ে দৃশ্যবর্ণের ক্রিয়া আরো গভীর। আধুনিক কবি হতে হলে হতে হবে মহাকবি—এ কথা মিস্ মুরকে বা এম্প্সনকে বলা যায়। তাঁরা কবি এবং ভালো কবি; কিন্তু তাঁদের বাস যে জগতে সে জগৎ সীমাবদ্ধ। এখানে আরেকটা উদ্ধৃতি তাই দিয়ে ফেলছি—

For this reason art, as ordered to beauty, never stops—at all events when its object permits it—at shapes and colours, or at sounds or words, considered in themselves and *as things* (they must be so considered to begin with, that is the first condition), but considers them *also* as making known something other than themselves, that is to say *as symbols*. And the thing symbolised can be in turn a symbol, and the more charged with symbolism the work of art, the more immense, the richer and higher will be the possibility of joy and beauty. The

beauty of a picture or a statue is thus incomparably richer than the beauty of a carpet, a Venetian glass, or an amphora.

কিন্তু এ দুঃখ নিয়ে কাব্য পড়া পণ্ডশ্রম। ইংরেজির মতো সাহিত্যেও তিন জনের বেশি মহাকবি আশা করাই অন্যায়। তাই এম্প্‌সন্ পদার্থবিদ্যার জ্ঞানকে কাব্যমণ্ডিত করতে পারলেন না বলে' দুঃখ না করে' রাসায়নিক বিদ্যাকে ব্যবহার করতে পেরেছেন বলে'ই কৃতজ্ঞ রইলুম। Poems-এর আট নটি কবিতা ও Select Poems-এর ততোধিক যে কোনো পাঠককে তৃপ্ত করবে বলে' আমার বিশ্বাস। আর খুসি করবে মিস্ মূরের গদ্যের শব্দকে কাব্যমণ্ডনের ও এম্প্‌সনের বৈজ্ঞানিক শব্দকে কাব্যভাষা করার ক্ষমতা দেখে।

কিন্তু এলিয়ট্ যে মিস্ মূরের লাজুক ও শালীন স্বভাব আত্মপ্রকাশে কুণ্ঠা বোধ করে বলেছেন, তার দ্বারা কোনো প্রশংসাই হয় না। এ কুণ্ঠা যদি কোন বাধজ (inhibition) হয়, তো কবি চিকিৎসা করালেই পারতেন। তাছাড়া মিস ডিকিন্‌সনেরও তো এই বাধ ছিল, কিন্তু তিনি চিড়িয়াখানার আনাচে কানাচে ঘোরেন নি। মিস্ মূর্ লিখেছেন,—

> The deepest feeling always shows itself in silence ;
> not in silence, but restraint.

তাঁর গভীর হৃদয়াবেগ কঠিন শাসনের মধ্যেও বহমান দেখেছি। শুধু এই শাসনের গণ্ডী টেনে তিনি তাঁর ভবিষ্যৎ বিকাশেও রেখা টেনেছেন, এই আমার ভয়। এ ভয় এম্প্‌সনের বিষয়ে আরো বেশি, কারণ তাঁর গভীরতা আরো আপাতদৃষ্ট, তাঁর স্বভাব আরো সৌখীন ও খেয়ালী। কিন্তু এঁরা দুজনেই স্বধর্ম্মশীল তাই অপেক্ষাকৃত শুদ্ধ কবি—যা ডে লুইস নন্। মিস মূর্ তাই বলেছেন—

> I, too, dislike it ; there are things that are important
> beyond all this fiddle.
> Reading it, however, with a perfect contempt for it,
> one discovers in
> it after all, a place for the genuine.......................
> ....all these phenomena are important. One must
> make a distinction
> however : when dragged into prominence by half poets,
> the result is not poetry.
> nor till the poets among us can be
> literalists of
> the imagination—above
> insolence and triviality and can present
> for inspection, imaginary gardens with real toads in
> them, shall we have
> it. In the meantime, if you demand on the one hand
> the raw material of poetry in
> all its rawness and
> that which is on the other hand
> genuine, then you are interested in poetry.

বিষ্ণু দে

Hunger and Love—By Lionel Britton, (Putnam).

গত চার বৎসরের মধ্যে ব্রিটনের নাম প্রচারিত হয়েছে উদ্ভট সাহিত্যিক হিসাবে। 'বুভুক্ষা ও প্রেম' নামধারী এই উপন্যাসখানি লেখবার আগে Brain বলে একটি নাটক তিনি প্রকাশিত করেছিলেন। সমগ্র পৃথিবীটা ছিল তার পটভূমিকা। মানুষের সৃষ্টি-রহস্য থেকে আরম্ভ করে তার অভিব্যক্তি ও পরিণতি, যন্ত্রচালিত সমাজ থেকে আদর্শ বৈজ্ঞানিক সভ্যতা,—এই ধরণের নানা দৃশ্য তাঁর সর্ব্বগ্রাসী নাটকগর্ভে স্থান পেয়েছিল। কিন্তু বিশ্ব-শৃঙ্খলার বিপুল বিস্তার তাঁর পাঠক ও সমালোচকদের মন উদ্বুদ্ধ না করে উদ্ব্যস্ত করেছিল। চরিত্র-সূচীর মধ্যে কেউ কেউ নায়িকার দর্শনাভাস না পেয়ে যে মনঃক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন, তার প্রতিশোধ নেওয়া হয়েছিল হিংস্র ও উগ্র রকমের সমালোচনা করে।

অবশ্য অসহায় পাঠকবর্গের তরফেও কিছু বলবার আছে। ব্রিটনের 'ব্রেনে' যে ব্রেনের চিহ্ন সুস্পষ্ট সে কথা অস্বীকার করতে সাহস হয় না। কিন্তু যখন তাঁর রচনাকে ন্যায্যাতিরিক্ত মূল্য দেওয়া হয়, তখন গায়ে পড়ে তর্ক করবার প্রবৃত্তি হয়। তাঁর লেখায় কল্পনার প্রসার আছে, বলিষ্ঠ মননশক্তির পরিচয় আছে এবং পড়তে বসে তার নাটকীয় উপাদানের প্রাচুর্য্যে বিস্মিত হতে হয়। কিন্তু রঙ্গমঞ্চে এ নাটকের বিফলতা স্বয়ংসিদ্ধ সত্য। একটা বিরাট পরিকল্পনা নিয়ে তিনি সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন তার আর সন্দেহ নেই। কিন্তু সব উপকরণ থাকা সত্ত্বেও যা রচিত হল, তার অস্তিত্ব ও পরিচয় বাস্তব ধারণার বাইরে। গোটা কয়েক দাম্ভিক ভবিষ্যদ্বাণীকে বৈজ্ঞানিক সত্য বলে প্রমাণ করতে চেষ্টা করলেও, তা না হয়েছে বিজ্ঞান না শিল্প-সৃষ্টি। এর চেয়ে ওয়েলসের বিশ্বরাষ্ট্র অনেক সহজবোধ্য। তাঁর বুর্জ্জোয়া মনোভাব নিয়ে ষ্টালিন যতই দুরন্ত রসিকতা করুন, এবং ব্রিটনের সমাজতত্ত্ব ওয়েল্‌স্‌-এর ধারণার চেয়ে যতই উন্নত ও যুক্তিসঙ্গত হোক্, ওয়েল্‌স্‌-এর লেখায় সাহিত্যগুণ আছে, পূর্ব্বাপর ধারাবাহিকতা আছে,—যে কারণে তাঁর রচনা অত্যন্ত সুপাঠ্য হয়ে ওঠে। অবশ্য প্রসাদগুণ আর পঠন-যোগ্যতাই সাহিত্যিক বিচারের একমাত্র মানদণ্ড নয়। মূল্য নির্দ্ধারণের একাধিক উপায় ও পরীক্ষা আছে। কিন্তু ধারণা আর কল্পনা ব্যাপক অথবা বিস্তৃত হলেও, কেবলমাত্র অভিনব পদ্ধতির জোরে সাহিত্য তৈরী হয় না। হার্ডির 'ডাইনাস্‌টস্‌' যে কারণে মহাকাব্যের যুগসৃষ্টি, ব্রিটনের 'ব্রেন' ঠিক সেই কারণেই আধুনিক কালের অমুদ্দেশ বিসৃষ্টি।

এই উচ্চাশী এক্‌স্‌প্রেসনিষ্ট নাট্য কবিতা থেকে যখন তাঁর উপন্যাসক্ষেত্রে পৌঁছানো গেল দেখলুম ভদ্রলোকের মতি-গতির কিছু পরিমাণে পরিবর্ত্তন হয় নি। একনিষ্ঠ ধর্ম্মাচরণের মনোবৃত্তি নিয়ে এবং সূক্ষ্ম ও সজাগ মনোনিবেশ দিয়ে বইখানা শেষ করে ফেললাম—নাম করা বিলাতী সমালোচকবর্গের ওপর অভ্রান্ত ও সভয় আস্থা স্থাপন করে। আর কর্ত্তব্যচ্যুতির ভয় রইল না, তবে বুঝলুম যে ব্রিটন সাহেবের সামাজিক মতবাদগুলো আরো পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে বটে, কিন্তু তাঁর রচনাভঙ্গীর উৎকট অভিনবত্ব ঠিক সম্পূর্ণই বজায় আছে। বার্ণাড্‌ শ ব্রিটনের লেখার প্রশংসা করেছেন এবং এ-কথা সে-কথার পর মত প্রকাশ করেছেন, তিনি লিখতে জানেন। আমারও তাই মনে হয়, তবে গুছিয়ে নয়—এটা ঠিক।

অনেকেই ব্রিটনের বই সম্পূর্ণ আয়ত্ত করেন নি, এবং অহেতুক সন্দেহ হয় যে অনেকস্থলে শ নিজেও একবর্ণ পড়েন নি। কিন্তু ব্রিটনের উপন্যাস যে প্রণিধান-যোগ্য এ কথা তাঁর অতি বড় কঠিন সমালোচকও অস্বীকার করতে পারবেন না। হয়ত আমাদের অনেকগুলো পুরাতন ধারণা ও আরামপ্রদ সংস্কারকে তাঁর বক্তব্য অতি রূঢ়ভাবেই আঘাত করে। কিন্তু ঠিক সেই কারণেই তাঁর বই যত্ন করে পড়া উচিত, অন্ততঃ যতটুকু সম্ভব।

উপন্যাসে অনেক চরিত্র আছে, কিন্তু তারা সব গৌণ, মনকে ভালো করে স্পর্শ করবার আগেই তারা মিলিয়ে যায়। গল্পের নায়ক হল আর্থার ফেল্‌প্‌স। ব্রিটন অত্যন্ত গম্ভীরভাবেই তার সঙ্গে পাঠকদের পরিচয় করে দিয়েছেন প্রাণিতত্ত্বের ভূমিকা দিয়ে। ফেল্‌প্‌স হল সমাজের নিম্নস্তরের একজন উৎপীড়িত মানুষ, যদিও তার ন্যায্য স্থান অভিব্যক্তির উচ্চস্তরে। কৈশোর থেকে আরম্ভ করে যৌবনাবস্থা পর্য্যন্ত নিজস্ব বুদ্ধি আর পর্য্যবেক্ষণ-বৃত্তির সাহায্যে তার মননশক্তির কতটা উন্নতি সাধিত হয়েছে, বইখানি তারি ইতিহাস। অবান্তর ঘটনার ভিড় কাটিয়ে যদি কেন্দ্রস্থলে পৌছানো যায়, দেখা যাবে উপন্যাসটি ব্যক্তিগত চিন্তাধারা ও সত্তার মধ্যস্থতায় সমগ্র সমাজ তথা বিশ্বনিয়মের সমালোচনা, নিগূঢ় উদ্দেশ্যের গভীরতর উপলব্ধি। জনসাধারণের একটি নগণ্য অঙ্গ হয়েও ফেল্‌প্‌স একজন উচ্চ শ্রেণীর প্রবুদ্ধ ও প্রগতিশীল ব্যক্তি। জীবনে তার অগণিত বাধা বিপত্তি এসেছে, জ্ঞানার্জ্জনের পথে একাধিক অন্তরায় তার মনকে বিচ্ছিন্ন করেছে, পরিপূর্ণ দৃষ্টিকে খণ্ডিত করেছে। কিন্তু বিশুদ্ধ জ্ঞানানুরাগের প্রখরতা তার কোনও দিন কমে নি। তারি আতিশয্য হেতু সে যে বইএর দোকানে কাজ করত, সেখানে লুকিয়ে লুকিয়ে বই পড়ে সময় নষ্ট করার জন্য তার চাকরী গেল। সুরু হল জীবন সংগ্রাম, যেটা মাত্র রূপক নয়,—অতি মাত্রায় বাস্তব, কঠোর, অপ্রিয়। কিন্তু দৈহিক ও মানসিক অসুবিধা সত্ত্বেও ফেল্‌পস কখনো তার মনুষ্যত্বকে প্রবঞ্চিত করেনি, এই জড়ভরত সমাজ ও তার প্রচলিত নিষ্ঠুর বিধি-বিধানকে স্বীকার করে নিয়ে আপনার বিবেককে জলাঞ্জলি দেয়নি। মন ও বুদ্ধি হৃদয় ও দেহের বশ্যতা গ্রহণ করলে হয়ত তার জীবন অপেক্ষাকৃত সচ্ছল ও সুগম হত। কিন্তু প্রতিপদেই তার সুকঠোর আহ্বান-রূঢ় জিজ্ঞাসা, যা অনুভূতির তীব্রতায় ও স্বাতন্ত্র্যহীন জগতের নির্ব্বোধ প্রথার প্রতি ঘৃণায় উন্মুখর।

ব্রিটন কশাঘাত করেছেন প্রচুর, অনেক স্থলে নির্ম্মম উল্লাসেই। পড়তে পড়তে সুইফ্‌টের কথা মনে আসে। তবে সুইফ্‌টের মত ব্রিটনের আক্রমণ ধ্বংসমূলক নয়। ব্রিটন সমবায়-শক্তিতে আস্থা রাখেন, বিশ্বাস করেন সংঘবদ্ধ হলে মানব-সমাজের অকল্পনীয় উন্নতি সাধিত হবে। যেমন অনেকগুলো একক্রিয়, সমধর্ম্মী জীব-কোষের অঙ্গাঙ্গি সমষ্টিতে প্রাণিদেহ গঠিত হয়ে ওঠে এবং সকলেই যেমন মস্তিষ্কের প্রামাণ্য স্বীকার ক'রে আপনার কাজ করে যায়, তেমনি বিভিন্ন মানুষ যদি স্বার্থ-বিদ্রোহিতা ত্যাগ ক'রে সংহত শক্তির প্রাধান্য গ্রহণ করে, তা' হলে সমাজের প্রভূত উপকার অবশ্যম্ভাবী। ব্রিটন একস্থলে লিখেছেন—

"The human—as we are coming to know it now—cannot exist except in civilisation. It is not a quality of individual men

at all, but arises only out of association and co-operation as a mass-effect and individuals are human individually by metaphor in so far as they contribute to the human in civilisation. It is a totality effect like the soul in body, and depends upon the organisation of the whole."

তাঁর এই প্রতিপাদ্য বিষয়ের উৎকৃষ্ট ব্যাখ্যা হল ফেল্‌প্‌সের জীবনচরিত। অনেকেরই ধারণা যে বর্ত্তমান সমাজে ব্যক্তিগত লাভের প্রত্যাশাতেই মানুষ সমগ্র জাতির সর্ব্ব-সাধারণ উদ্দেশ্যকে কাজে পরিণত করতে প্ররোচিত হয়। কিন্তু এ বিশ্বাস অমূলক। জাতীয় কল্যাণ ও উন্নতি সাধন করবার ঐকান্তিক ইচ্ছা ফেল্‌প্‌সের আছে। কিন্তু মনিবদের আর ধনী-সম্প্রদায়ের স্বার্থ-প্রণোদিত মহাযুদ্ধ তার মহান্ প্রচেষ্টার বিঘ্নস্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ব্রিটন দেখিয়েছেন, কিরূপে শিক্ষা, সাহিত্য, নৈতিক জীবন, ধর্ম্ম প্রভৃতি যাবতীয় অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান তাদের মানব গুণ হারিয়েছে। সকলেরই এক লক্ষ্য কেমন করে এই বিচ্যুত ও উৎপীড়িতদের আজীবন নির্ভরতার নাগপাশে বেঁধে ফেলা যায়। একটা দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করা যেতে পারে। আত্মোন্নতি ও শিক্ষা উপলক্ষ্যে ফেল্‌প্‌স আবিষ্কার করলে, বাস্তব আর কল্পনার মধ্যে একটা স্বভাবগত বিরোধ আছে। পরে তার বদ্ধমূল ধারণা হ'ল, রোম্যান্টিসিজ্‌ম আর কিছুই নয়—যে সব লোক অথবা শ্রেণীর হাতে ক্ষমতা আছে তাদেরই রচিত একটি সুমিষ্ট-প্রলেপ মতবাদ। অবশ্য যাঁরা অজ্ঞাতসারে শান্তিরক্ষক, বিচারক, প্রভুবর্গ প্রভৃতি রাষ্ট্র-প্রণালীর বিভিন্ন বিভিন্ন বিভাগগুলিকে পরিপোষণ করে আসছেন, তাঁদের কাছে এরকম ধারণা বাতুলতা মাত্র। কিন্তু যাদের আপনার অন্ন-সংস্থান আপনার পরিশ্রমের দ্বারাই সম্ভব, তাদের কাছে এটা সত্য অভিজ্ঞতা। বুর্জ্জোয়া শ্রেণী বুঝেও বোঝেন না,—যেহেতু তাদের সাহিত্য, তাদের মুখপত্র, তাদের ধর্ম্ম-সংঘ সব কিছুই এই শাসন প্রণালীর কঠোরতাকে মোলায়েম করে দেয়। কিন্তু শ্রমজীবী অথবা বেতনজীবীকে প্রতিনিয়তই ঐ শাসনতন্ত্রের প্রতিনিধির সংস্পর্শে আসতে হচ্ছে; অত্যন্ত স্পষ্ট করে বুঝতে হচ্ছে—গলদ কোনখানে।

ব্রিটন বিশ্বাস করেন যে উপযুক্ত শিক্ষার সাহায্যে সমস্ত লোকই সর্ব্বোৎকৃষ্ট এবং যোগ্যতম মানুষের সমকক্ষ হতে পারবে। অবশ্য এ সব ধারণা সমালোচনার বাইরে, কারণ তর্কে ক্ষ্যাপামি বেড়ে যায়। The Mass-Production of Genius নামক অধ্যায়ে এবং বইএর অন্যান্য অনেক স্থলেও ব্রিটন এই কথাটাই বার বার বলেছেন যে প্রতিভা-বিকাশের সহায়ক একটা সমিতি গঠন করা অত্যন্ত দরকারী হয়ে পড়েছে। Genius-Production Society-র মারফত অনুরূপ শিক্ষার সাহায্যে আমাদের মস্তিষ্কের সহজাত দ্রব পদার্থের কিরূপ পরিবর্ত্তন হবে সেটা আন্দাজ করা একটু কঠিন। অবশ্য সু-প্রজনন বিদ্যা আয়ত্ত করে ফেললে আমরা যে কি না করতে পারি তা' বলা যায় না। তবে একথা ঠিক যে ব্রিটন সাহেবের একান্ত নিজস্ব প্রতিভা এবং স্নায়বিক অসুস্থতার মধ্যবর্ত্তী রেখাটি নিতান্তই সূক্ষ্ম। তাঁর এই সম্পূর্ণ নতুন উপায় উদ্ভাবনের কথা পড়লে মনে হয়, যদি Chelsea র বিকৃত-যকৃৎ দুর্ব্বাসা মুনি বেঁচে থাকতেন।

ব্রিটনের আর একটি অতি প্রিয় ধারণা আছে, তার উল্লেখ পূর্ব্বেই করেছি। সেটি হল, সংঘ-শক্তি। সমগ্র মানব জাতিটাকে সুব্যবস্থিত শৃঙ্খলায় বেঁধে ফেললে, ব্রিটনের মতে, জগতের যাবতীয় অন্যায়, অশান্তির পূর্ণচ্ছেদ হবে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, বাঁধবে কে? ব্রিটন উত্তর দিয়েছেন মানুষের সমবেত প্রচেষ্টা। জীবকোষেরা এই ঐক্য-শক্তির মূল রহস্যের সন্ধান পেয়েছে বলেই জৈব পদার্থের এতটা সুনিয়মিত ব্যবস্থাপন। তিনি লিখেছেন,—

"The cells have found it out. Each mitosis leaves them a little quicker at selective osmosis and assimilation than before, greater hormone responsiveness, nimbler livers...."

কিন্তু জৈবগঠনেও এটা আংশিকভাবে সত্য বা সফল। এই উপন্যাসের গোড়াতে বার্টরেণ্ড্ রাসেল-কৃত ভূমিকায় এই মতবাদের অতি উপাদেয় সমালোচনা ও বিশ্লেষণ আছে, যেটা পড়লে বোঝা যায় দীর্ঘ ও জটিল প্রলাপের চেয়ে সংক্ষিপ্ত ও সরল প্রকাশ কত বেশী মনকে উদ্বুদ্ধ করে। রাসেল বলেছেন,—

"There may be cancer cells which may develop Napoleonic ambitions and bring the whole body to destruction. And when in health, the body is governed not democratically but autocratically from the brain. ......I think such an organism of the human race as Mr. Britton has in mind would necessarily be oligarchic and would therefore contain within itself the same distinction of master and slaves which makes him indignant with our existing society. Moreover, it is difficult to conceive of values as residing elsewhere than in individuals."

তা ছাড়া ব্যক্তিরও স্বাতন্ত্র্য আছে—সে সমষ্টির প্রতীক-মাত্র নয়। রাসেল সঙ্গীত-রচনার উদাহরণ দিয়ে মন্তব্য করেছেন—

"Can we imagine the collective brain of the human race, however highly organised, producing a symphony? Collective mankind can give individual training and opportunity, but he alone must do the creative work."

মুস্কিল হচ্ছে এই যে সংঘ-গঠন, জগতের যাবতীয় দুঃখ-কষ্টের একমাত্র প্রতিকার হ'তে পারে না। সম্পূর্ণ সাম্যবাদী সমাজেও শক্তিধারী মানুষ থাকবে যে তার ক্ষমতাকে সর্ব্বসাধারণের মঙ্গলার্থে প্রয়োগ না করে আপনার শ্রেণীর উন্নতি-বিধানে উৎসুক হতে পারে। অবশ্য এ কথা স্বীকার করতে হবে যে যতদিন ব্যক্তির হাতে আত্ম-নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা থাকবে, ততদিন বিরোধ ও নৈরাজ্যের সম্ভাবনাও থাকবে। কিন্তু, আদর্শ, সুনিয়ন্ত্রিত সমাজে মানুষ যে তার শ্রেষ্ঠ গুণ-গুলিকে সযত্নে রক্ষা করবে এই ধারণারই বা কি সুনিশ্চিত ভিত্তি আছে?

রাষ্ট্রনীতি-ক্ষেত্রে সাম্যবাদ কয়েক স্থলে সফল হয়েছে বলে প্রতিভায় সাম্যবাদ স্বীকার করতে অনেকেই কুণ্ঠিত হবেন। তবে ব্রিটনের স্বপক্ষে এটুকু

বলা উচিত যে একজন তীক্ষ্ণধী Proletarianএর তরফ থেকে তিনি আধুনিক জগৎ ও সমাজকে অতি সূক্ষ্মভাবে পর্য্যবেক্ষণ করেছেন। কে জানে হয়ত তাঁর কল্পিত আদর্শটাই খাঁটি এবং একমাত্র মানব-সমাজের সুগঠিত ঐক্যরাজ্যে আমাদের বৈজ্ঞানিক সভ্যতার উন্নতি ও প্রসার হবে। সত্যের স্বরূপ হল নৈর্ব্যক্তিক, বিভিন্ন দৃষ্টি-কোণ থেকে বিচারের সমন্বয়েই হয়ত তার যথার্থ মূর্ত্তি উদঘাটিত হবে।

সমস্ত বইখানা ভালো করে পড়লে মনে হয় যে ব্রিটন অপ্রকৃতিস্থতার পরিচয় দিয়েছেন, কিন্তু সেই প্রলাপের অবসর-মুহূর্ত্তে অনেক সারগর্ভ তথ্য বলে ফেলেছেন। উপন্যাসের মধ্যে Mind-mining, The Space-time Franchise, The Time-scape, Undimensional or Super-dimensional? Romance and Reality, The Origin of Will, The Mass-production of Genius, The Relativity of Ego, ও Toward Infinity নামক অনেক ভয়াবহ ও বুদ্ধিবিভ্রমকারী অধ্যায় আছে। কিন্তু সব চেয়ে আমার ভালো লেগেছে The Recipe for Greatness শীর্ষক পরিচ্ছেদটি। এটি গম্ভীর সত্য আর উন্মাদ-কৌতুকের অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ। একটা কথা বলে রাখা ভালো। ব্রিটন Lewes-কৃত Biographical History of Philosophy-কে জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ একশত পুস্তকের অন্যতম বলে নির্দ্ধারণ করেছেন কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই রসিকতা করেছেন—বাইবেলকে অনেকে এই রকম উচ্চাসন দিয়ে থাকে। দর্শন-শাস্ত্রটা অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক, কিন্তু ঐ আধুনিক সমাজের মূর্খতার জ্বালায় কিছু করবার উপায় নেই।

ব্রিটন হচ্ছেন চৈতন্যস্রোতে চালিত চিন্তার পরিপন্থী। এ জন্যে তাঁর লিখন-ভঙ্গী ও ভাষাও অনুরূপ—সংক্ষিপ্ত, ছেদবিহীন ও ইঙ্গিতে অভিব্যক্ত। যথা,—

"Judges dishonest. Not a criminal in Christendom makes steady £ 5,000 ; send prison for stealing less than stealing self.

অথবা আরো ভালো উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে "The Recipe for Greatness" থেকে—

" Pyrrho, doubt whether doubted ; Spinoza, explain whole world from axioms not find out first whether anybody accept axioms or not ; Leibnitz, monads, best of all possible worlds, so usefull to bishops mayors ; Descartes, 'I am here thinking therefore here to think ; Berkeley, with weighty doctrine can't be conscious without being conscious ; Plato, prove by making imaginary characters agree :—all solemnly laying down the Law to which the universe must conform. Darkness, tomfoolery, obesities of One Who Knows."

এই সম্পর্কে আর একটা কথা মনে পড়ল। জ্ঞানার্জ্জনের প্রকৃষ্ট উপায় কি, বলতে গিয়ে ব্রিটন বলেছেন যে যদি আমরা শ্রেণীবদ্ধ ও শ্রেণীভুক্ত করতে শিখি, তা' হলে জগতের প্রতিটি তথ্য আমাদের করতলগত হবে, আর তখন জ্ঞান আমাদের সম্পূর্ণ বশ্যতা স্বীকার করবে। এর ব্যবস্থাও তিনি দিয়েছেন—

"Never become too big to understand.
But how can we understand ?
The infinitude of fact.
The Tiny mind."

ইন্দ্রিয়-বোধের সাহায্যে আমরা জ্ঞানার্জ্জন করে থাকি। আর এই শক্তির কতকটা আমরা নিজে সঞ্চয় করেছি, কতকটা উত্তরাধিকার-সূত্রে পেয়েছি। তার পরেই ব্রিটন এই বোধশক্তির ইতিহাস দিতে গিয়ে আমাদের প্রাগৈতিহাসিক যুগে টেনে নিয়ে গেছেন, যখন বোধশক্তির পূর্ব্বে ধারণাশক্তি ছিল,—যখন নিরিন্দ্রিয়দেরও গ্রহণ করবার ক্ষমতা ছিল। অতি সুপরিচিত বৈজ্ঞানিক সত্য।

আবার "The Space-time Franchise" নামক অধ্যায়ে অনেক পাগলামীর শেষে বলেছেন—

"Meantime, the good old space-time continuum went on doing whatever it was it did. The time and space of Arthur's world —the world in which he lived, were already in the process of decay. Minkowski and Einstein were neatly filing it away in the museum of the world's memories." ইচ্ছা হয় বলে উঠি,—নো-ম্যাটার, নেভার মাইণ্ড।

সে যাই হোক্ ব্রিটনের উপন্যাসে তাঁর স্বকীয় প্রতিভার অজস্র নিদর্শন আছে। স্থানে স্থানে অদ্ভুত রস হাস্যোদ্রেক করে, কিন্তু তা' সত্ত্বেও বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা, আবেগের প্রবলতা, বর্ণনা ও বিচারের সূক্ষ্মতা, আর সর্ব্বোপরি চিন্তাধারার বিশ্বজনীনতা মনকে বিস্মিত করে। উপন্যাসে অনেক ভালো ভালো অংশ আছে যেগুলো প্রকৃত কাব্যরস ও সৌন্দর্য্যবোধে ভরপুর। মাত্র দুটি দৃষ্টান্ত উদ্ধার করলুম, একটি Second Order Differences থেকে, অপরটি Nose drip and knowledge থেকে—

"Beauty is certainly one of the deepest-seated and insuppressible needs of our nature, through the centuries, back past the dawn and into the night of time, since perhaps even before we were men. Beauty, the intangible ..

আর—

"The race drifts, the earth shoots on in a dark night, with no light but the stars, the race drifts on the sea of time, you drift on tho racial sea, bubble, spume blown by the the wind of chance, spray scattered into night's darkness by the storm of time. The dawn of all the tomorrows will rise on a quiet sea from the star movement, out of the flow of things."

শেষোক্ত লাইন ক'টি পড়লে ওয়েল্‌সের Tono Bungayর পরিসমাপ্তির কথা মনে পড়ে—যেখানে বলা হয়েছে, "We are all things that make and pass out to the open sea!" অনেক স্থলেই মনে হয়েছে যেন ওয়েল্‌সের প্রতিধ্বনি। আধুনিক সমাজের নির্ব্বোধ নিপীড়নের কথা ব্রিটন হাজারবার বলেছেন—আমার

স্মরণ হয়েছে Ann Veronica অথবা Kipps-এর কথা :—"In a blessed drain-pipe, and got to crawl along till we die।" ব্রিটন বলেছেন সব চেয়ে যে বড়ো কাজ, তাইতে নামতে হবে—তবেই আমরা আত্মপ্রসারে সমর্থ হ'ব। The New Machiavelli-তে আছে—"If I don't attempt the biggest things in life, I am a damned shirk. The very biggest।" লেখকের ওপর ওয়েল্‌সের অজ্ঞাত প্রভাব পড়েছে।

ব্রিটনের স্বপ্ন বিরাট্‌। সমাজ ও জগতের যে পরিকল্পনা তিনি করেছেন, তা' অসম্ভব হলেও প্রণিধান-যোগ্য। সকল মনীষীরাই অল্প-বিস্তর আদর্শ-ব্যাধিগ্রস্ত। বার্ণাড শ-ও একদা লিখেছেন—"তোমরা সবাই দেখো আর প্রশ্ন কর—কেন? আমি স্বপ্ন দেখি সেই সব, যা অসম্ভব ছিল, আর জিজ্ঞাসা করি—কেন নয়?"

সমালোচনা দীর্ঘ হয়ে পড়ল, কিন্তু বইখানির আয়তন ও বিষয়বস্তু ত কম নয়! পদ্ধতির কথা বলে শেষ করা যাক্‌।

বলা বাহুল্য এ ধরণের বইএর সুনিশ্চিত আকৃতি না থাকলেও আবয়বিক সংস্থানের জন্য একটা আঙ্গিক রূপ মেনে নেওয়া হয়েছে, তা' সে যতই কুয়াসায় আবৃত হোক্‌। এত বিশাল এই উপন্যাসের পটভূমি যে তার কোনো সাহায্যই কাজে লাগে না। ফলে একটা বিশিষ্ট ও নির্দ্দিষ্ট ছবি ফুটিয়ে তোলা অসম্ভব হয়েছে। ঘটনা ও চরিত্রের বেশী বাহুল্য না থাকলেও চিন্তাধারার জটিল আবর্ত্তে অনেকটা রসহানি হয়েছে। অবশ্য ব্রিটনের বক্তব্যের একটা পারম্পর্য্য আছে—কিন্তু প্রসঙ্গ ও পদ্ধতির মধ্যে অনেক জায়গায় সামঞ্জস্য রক্ষা হয়নি। চৈতন্যস্রোতের ধারাকে নিরাবিল রাখতে হলে যে শিক্ষা-সংযমের অবশ্য-প্রয়োজন, তার অভাব এই উপন্যাসে লক্ষ্য করেছি। অনেক সময়ে তার স্বচ্ছতা নষ্ট হয়ে গিয়েছে প্রলাপের উদ্বেল বন্যায়। এই কারণে মনে হয়, প্রুস্‌তের যেখানে সাফল্য, ব্রিটনের ও জয়েসের সেখানে পরীক্ষার অভিনবত্ব। নানা গুণ সত্ত্বেও স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছি যে ব্রিটনের উপন্যাসখানি উৎকট রকমের দুরূহ—এতই কষ্টসাপেক্ষ যে এর তুলনায় "দি ওয়েভস্‌" রীতিমত স্নিগ্ধ পুকুর-জল, আর "অন্তঃশীলা" ত প্রশ্রয়যোগ্যা নাবালিকা।

শ্রীবিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

Progress of Archaeology—By Stanlay Casson. (G. Bell & Sons.)

(ক)

এ ক্ষুদ্রকায় গ্রন্থটীতে আধুনিক আর্কিয়লজির একটী সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। গ্রন্থকার অক্সফোর্ডে আর্কিয়লজির অধ্যাপক (রীডার)। আলোচ্য পুস্তকে তাঁর পাণ্ডিত্যের ও রচনা-কৌশলের যুগপৎ পরিচয় পাওয়া যায়। যাঁরা গত বিশ বৎসরের আর্কিয়লজি সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা পেতে চান্‌, তাঁদের কাছে এই ছোট্ট বইটী বিশেষ মূল্যবান্‌। কেবল একটী দুঃখ আছে; লেখক কোনো Bibliography দেন নি, যদিও মাঝে মাঝে ফুটনোটে অন্য গ্রন্থের উল্লেখ করেছেন।

আর্কিয়লজি জিনিষটাকে ঠিক্‌ পুরা-তত্ত্ব বলা যায় না। "Archaeology

is the study of the human past, concerned principally with the activity of man as a maker of things (p. 2)। আর্কিয়লজির উদ্ভবও অদ্ভুত ; রেলের রাস্তা তৈরী করা, বন্দর বানানো, সুড়ঙ্গ কাটা, —এই সব কাজে মাটি খোঁড়া দরকার হয়, আর মাটির নীচে পাওয়া যায়, সেকালের মানুষের হাতে গড়া জিনিষ,—হয়তো-বা চক্-মকি পাথর, নয়তো-বা দেবতার মূর্তি, আরও কত কী পুরাকালের কীর্তি। কিন্তু একটা কুফল হ'ল। ভূগর্ভোত্থিত রত্নের সংগ্রহ করা একটা বাতিক হওয়ায় অনেক বড়লোকরা লুণ্ঠনের লোভে আনাড়ীর মতন মাটি খোঁড়াতে লাগলেন। এ প্রণালীতে যে সব দ্রব্য আবিষ্কৃত হয়েছিল, সেগুলোর বৈজ্ঞানিক আলোচনা করা অবশ্যই কঠিন ; কেননা কোন্ স্তরে কোন্ জিনিষ পাওয়া গিয়েছে, সেটা না জানলে পারম্পর্য্য বা কার্য্য-কারণ সংযোগ বোঝা যায় না।

(খ)

ইংলণ্ডে ১৯২৫ সালে এয়ার-ফোটোগ্রাফির সাহায্যে 'উড্-হেঞ্জ্' নামে একটী কাষ্ঠময় 'ষ্টোন্-হেঞ্জ'-জাতীয় কীর্তি আবিষ্কৃত হয়েছিল। অনুমান হয়, এটীর নির্ম্মাণ-কাল খৃষ্টের ১৫০০ বৎসর পূর্ব্বে। বিমান-সন্দর্শনের পরেই পরশুরামের মতন কুঠার হস্তে ভূমি-খনন-পটু আর্কিয়লজিষ্ট্ সেই স্থলে উপস্থিত হয়েছেন।

ব্রন্জ-যুগের আয়ার্ল্যাণ্ডের সঙ্গে ফ্রান্স ও স্পেনের সংস্কৃতি-গত সংযোগ এখন প্রতিপন্ন হয়েছে। এঙ্গল্‌সীতে আবিষ্কৃত একটী গোরস্থানের পরীক্ষা করে পণ্ডিতরা অনুমান করেন যে সেকালে ঐ অঞ্চলে নর-বলি দেওয়া হ'ত। আয়র্ল্যাণ্ডে সোনা ছিল প্রচুর ; সেই সোনার তৈরী জিনিষ হল্যাণ্ড-ডেন্‌মার্কেও পাওয়া যায়।

খৃঃ পূঃ ৩০০০—৪০০০ বৎসরের সময়ে বৃটেনে, এমন-কি পশ্চিম ইউরোপের সব স্থানেই, মানুষগুলো ঠিক সভ্য হয় নি ; তখন কোন গতিকে জীবন ধারণ করাটাই ছিল তাদের উদ্দেশ্য, শিকার করে আহারের ব্যবস্থা করা ছাড়া তারা চাষ-বাস দুই-ই সবে মাত্র আয়ত্তের ভিতরে আন্‌তে সুরু করেছে। কিন্তু মধ্য ইউরোপ আর দক্ষিণ-পূর্ব্ব ইউরোপে সভ্যতার একটা সাড়া পাওয়া গেল। প্রাচ্য দেশ থেকে ড্যানিয়ুব নদীর ধারে ধারে এই সভ্যতার প্রবাহ তখন বহমান। সুমেরিয়া বা মেসোপোটেমিয়াতে ছিল এই প্রবাহের উৎস।

মেসোপোটেমিয়ায় 'উর'-নামক স্থানে খনন-কার্য্য আরম্ভ হবার পূর্ব্বে পণ্ডিতরা অনুমান করতেন যে ঈজিপ্টেই সভ্যতার আদিম উন্মেষ হয়েছিল। অবশ্য, আমরা অস্বীকার করতে পারি না যে মিশর থেকে সভ্যতা ভূমধ্যসাগরের আশে-পাশে সব জায়গাতেই ছড়িয়ে পড়েছিল। কিন্তু উরের আবিষ্কার না-কি প্রতিপন্ন করেছে এই যে, খৃঃ পূঃ ৩৫০০ এম্‌নি সময়েও সেখানকার শিল্প বেশ উঁচুদরের হয়েছিল। ক্যাসন সাহেবের বইয়ে ছবি দেওয়া আছে,—উরে প্রাপ্ত সোনার বাটী, সোনার গেলাস, 'হার্প'-বাজনা, Mosaic 'Standard' যা দেখ্‌লে আমরা সুমেরীয় শিল্পীর প্রশংসা করতে বাধ্য হই।

উরে আবিষ্কৃত একটী রাজার সমাধি জিজ্ঞাসুদের জানিয়ে দেয় যে সেখানে সহ-মরণ-প্রথা প্রচলিত ছিল। রাজার সহচররাই মরণের ওপারে যেতেন, রাজ-সাহচর্য্য অক্ষুণ্ণ রেখে। আর, রাণী—এ রাণীটীর নাম 'সুবাদ'—যখন ইহলীলা

সংবরণ করতেন, তখন তাঁর নব-জীবনের সম্পদ পূর্ব্ব-জীবনের অনুরূপ করে রাখবার উদ্দেশ্যে অনেক লোক আত্মহত্যা করতেন। রাজা ও রাণীর পাশাপাশি গোর দেওয়া হতো। উপযুক্ত অলঙ্কার সাজ-সজ্জা তাঁদের দেহের সঙ্গে সমাধি লাভ করত।

মহেন্-জো-দড়ো ও হারাপ্পার আবিষ্কার সম্বন্ধে ক্যাসন সাহেব বলেন যে, এখনও অনেক খোঁড়া দরকার। এখন এই-মাত্র বলা যায় যে, খৃঃ পূঃ ২০০০ বৎসরেরও পূর্ব্বে সুমেরীয় ও ভারতীয় সভ্যতার মধ্যে একটা ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র ছিল। হারাপ্পায় প্রাপ্ত একটী প্রস্তর-নির্ম্মিত বালকের মূর্ত্তি দেখে হঠাৎ মনে হয় যে সেটী খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দীর কোনো গ্রীক্ ভাস্করের হাতে-গড়া। লেখক ভরসা করেন: "The Indians may prove to have been the earliest naturalistic sculptors in the world."

ইউরোপ এবং এসিয়ার মধ্যে যেটুকু জলের ব্যবধান আছে, সে ব্যবধানটুকুকে জয় করার প্রচেষ্টা প্রাচীনযুগে বারম্বার হয়েছিল। কন্‌ষ্টাণ্টিনোপ্‌ল্ আর (হোমরীয়) ট্রয়—এই দুটী ছিল ইউরোপের সঙ্গে এসিয়ার গতায়াতের সেতু। ঐ দুটী সহরে সেই জন্যে প্রাচী-প্রতীচ্যের সমন্বয় বিশেষ ভাবে দেখা যায়। বেল্‌গ্রেডের কাছে 'বিঞ্চা' নামক স্থানে কয়েক বৎসর খনন-কার্য্য চলেছে; ফলে, আমরা জান্‌তে পেরেছি যে, প্রাচ্য সভ্যতা—যার আভাস আমরা উরে পাই—প্রতীচ্যে প্রবেশ লাভ করছিল খৃঃ পূঃ প্রায় ২৫০০।৩০০০ বৎসরের সময়ে।

আধুনিক ঐতিহাসিকরা যাদের 'হিটাইট্'নামে অভিহিত করেন, তাদের অভ্যুদয় হয়েছিল প্রায় খৃঃ পূঃ ১৫০০। ট্রয় নগর তখন রাহু-গ্রস্ত। তুর্কী-রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত 'বোঘাজ্-কুই'-গ্রামে সহস্র সহস্র হিটাইট্ ফলক আবিষ্কৃত হয়েছিল; অধিকাংশেরই পাঠোদ্ধার এখন হয়েছে। বহু ফলকে 'অহ্হিয়ব' নামক জাতির উল্লেখ পাওয়া যায়; এই জাতি হোমরে 'অখাইয়' (Achaeans) -নামে পরিচিত। ট্রোজান সমরের সমসাময়িক মিশরের শিলালিপিতে এই জাতির নাম মেলে; এরা অন্যান্য নানা জাতির সঙ্গে যোগ দিয়ে মিশর আক্রমণ করেছিল। সেই সময়েই বোধ হয় ঐ সব জাতির কিয়দংশ ভারতে আসে। ঋগ্বেদে বিশ্বামিত্র-বসিষ্ঠের সমকালীন রাজা সুদাসের বিরুদ্ধে যাঁরা যুদ্ধ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে চারটী জাতের সঙ্গে এই মিশরীয় অভিযানের চারটী জাতের নাম-গত সাদৃশ্য আছ (অথৈব = যক্ষু, শিকুরু = শিগ্রু; তুর্-বশ = তুর্ব্বশ)। আর রামায়ণে বিশ্বামিত্র-বসিষ্ঠের সমকালীন রাজা রামচন্দ্রের বিরুদ্ধে যে রাক্ষসরা যুদ্ধ করেছিলেন তাঁদের জাতিগত নাম 'পুলস্তি' (পুলস্ত্য) মিশরের শিলালিপিতে পাওয়া যায়। * পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা স্থির করেছেন যে, এই 'পুলস্তি'-জাতি প্যালেষ্টাইন অঞ্চলে বসবাস করতে লাগলেন—সেই জন্যেই দেশটার নাম প্যালেষ্টাইন; আর, কিছুদিন পরে এই 'তুর্-জাতি' ইতালীতে 'এত্রুরিয়া' অঞ্চলে উপনিবেশ স্থাপন করে,—সেই জন্যেই দেশটার নাম এত্রুরিয়া।

আধুনিক ইতালী দেশ-হিতৈষীরা বিশ্বাস করতে চান্ যে, এত্রুরিয়ার

---

* এ বিষয়ে বর্ত্তমান সমালোচকের একটী প্রবন্ধ ১৯৩০ সালে জার্ম্মাণীতে প্রকাশিত হয়েছিল—Geiger Commemoration Volume (Studia Indo-Iranica, Leipsig) art. "Vedic India and Minoan Men" দ্রষ্টব্য।

লোকরা বহির্জাতি ছিল না, তারা ছিল প্রাক্‌-আর্য্য-জাতির বংশধর। কিন্তু, ক্যাসন সাহেব বলেন যে, আর্কিয়লজি এ মতকে দিনের পর দিন খণ্ডন করে যাচ্ছে। আর একটা ভুল ধারণা এই যে, ইতালীতে প্রাচীনযুগে বাস করছিল যত অসভ্য জাত; তাদের না-কি সভ্য করলেন রোম। সত্য কথা বল্‌তে গেলে রোমের সমৃদ্ধির বহুপূর্ব্বে সেই সব প্রাচীন জাতি সভ্যতার উন্নত সোপানে আরোহণ করেছিলেন।

রাশ্যা, তুর্কীস্থান, মঙ্গোলিয়া, সাইবীরিয়া ও চীন এই সব দেশের শিল্প কি প্রকারের ছিল, তার কিছু কিছু আভাস আমরা পাই। রাশ্যার যাদুঘরগুলির মধ্যে যে সমস্ত প্রাচীন কীর্ত্তির নিদর্শন সংরক্ষিত আছে, সে-গুলো দেখলেই বোঝা যায় সে-কালে সে-দেশের শিল্প কত ভাল ছিল। সাইবীরিয়ায় প্রস্তর-যুগের এমন কয়েকটী কীর্ত্তি আছে যে-গুলোকে masterpieces বলা যায়। যাযাবর জাতিদের সাধারণত একটু অবজ্ঞার চোখেই দেখা হয়। কিন্তু তাদের হাতের তৈরী জিনিষ দেখলে আমরা স্বীকার করতে বাধ্য যে উত্তর এসিয়াখণ্ডের যাযাবর-জাতি শিল্প-কৌশলে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতির সমতুল্য। ক্যাসন সাহেবের ভাষায়—

"The style of art of those Siberian and Russian ornaments found throughout the length and breadth of upper Asia is particularly pure and fine. The art is instinctive and not elaborated. And the tendency throughout is to capture the beauty of the forms and shapes of animals and to adapt those shapes quite arbitrarily to the utility aspect of the objects made. And the artist is always making patterns, never copying nature. In a word, the northern Asiatic in ancient times was an instinctive artist, a wandering hunter with a hunter's eye for beauty." (pp. 69-70).

আমেরিকায় 'মায়া'-জাতির সভ্যতার নিদর্শন অনেকদিন আগেই পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু তাদের সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক গবেষণা হচ্ছিল অতি সামান্য। গত বিশ বৎসরের খনন-কার্য্যের দ্বারা এই অভাব কতকটা পূর্ণ হয়েছে। এখন বোঝা যায়, প্রায় খ্রীষ্টজন্মের সময়েই আমেরিকায় এ সভ্যতার বিকাশ, এবং তারপরে প্রায় ৪৫০ বৎসর সভ্যতাটীর জীবন। তবে এই নাগরিক সভ্যতার আদি কবে ও কোথায় তার সন্ধান আজও মেলে নি। এদের শিল্প অনেকটা সাইবীরিয়ার মতন; কিন্তু জন্তু-জানোয়ারের চাইতে মানুষের চেহারাই এরা আঁকতে ভালবাসত বেশী। লোহার ব্যবহার তারা জানত না—তাদের যন্ত্রগুলো, হয় পাথরের, নয় কাঠের। গণনায় এরা ছিল বিশেষ নিপুণ।

আফ্রিকায় যে সব নতুন জিনিষ খুঁড়ে পাওয়া গিয়েছে, তাদের মধ্যে তুতানখামেনের সমাধি সবচেয়ে বিখ্যাত হয়ে পড়েছে। ক্যাসন সাহেবের মতে,—
"Among the objects recovered some, undoubtedly, were of exquisite workmanship and great beauty. But there was a pronounced element of sheer vulgarity and ostentation in many of them." (p. 90). রাজার মুকুটটী সেকালের স্বর্ণকারের সুকৌশলের প্রকৃষ্ট নিদর্শন।

শ্যাম, ইন্দোচীন, যবদ্বীপ, ইত্যাদি সম্বন্ধে পুস্তকটীতে অল্প-বিস্তর আলোচনা

আছে। ঈষ্টর আইল্যাণ্ডের বিস্ময়কর ভাস্কর্য্যের একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনাও আমরা পাই। তবে আধুনিক আর্কিয়লজি এসব দেশের কোনো নূতন তথ্য উদ্‌ঘাটন করতে পারে নি।

ভরসা করি, বইটী বিদ্বানের কাছে আদর পাবে।

শ্রীহারীতকৃষ্ণ দেব

Principles of Gestalt Psychology—By K. Koffka. (Routledge).

মনোবিজ্ঞানের অনতিপূর্ব্ব ইতিহাস বৈচিত্র্যপূর্ণ। ফ্রয়েডীয় নির্জ্ঞানের দুন্দুভি-নিনাদের সঙ্গে সঙ্গে ওয়াটসনীয় দেহাচারবাদের সমসাময়িকতা স্বতঃই বিংশতাব্দীর বিজ্ঞানপন্থী মনোবৈজ্ঞানিকের মনে সন্দিগ্ধ কৌতূহলের সৃষ্টি করেছিল। ভুণ্ট্ ও টিচনারের বীক্ষণাগারের ধ্রুপদী মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণের ধারার সঙ্গে এই নবীন মতবাদের বিরোধের সমাধান হবার পূর্ব্বেই হ্বেরটাইমার, কেইলার ও কফ্‌কার গেষ্টাণ্ট-বিধির প্রচার হওয়াতে জনসাধারণ মনোবিজ্ঞানের এক নূতন দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পেল। অবশ্য গেষ্টাণ্ট নামক পদার্থের সঙ্গে পূর্ব্বের বৈজ্ঞানিকদেরও ন্যূনাধিক পরিমাণে পরিচয় ছিল। মূলার,হুসার্ল, এরেনফেল্‌স, সুমান. কর্ণেলিয়াস ক্রিগার, ফোলকেল্ট ও মার্ত্তিয়ুসের নাম প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে। কাজেই গেষ্টাণ্ট-মতবাদও নিরালম্ব ও নিরাশ্রয় অর্থাৎ কেইলার-কফকা-মাত্রাশ্রয় নয়। অবশ্য পরীক্ষার বহুবিধ আঙ্গিক নবীনেরা আবিষ্কার করেছেন ও গেষ্টাণ্টকে তথাকথিত বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করতে বহু আয়াস করেছেন একথা নিশ্চয়ই স্বীকার্য্য।

মানসিক ক্রিয়ার যে ধ্রুপদী আণবিক ও সংশ্লেষাত্মক ব্যাখ্যার অপ্রতিহত প্রভুত্ব বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারে বিরাজমান ছিল প্রধানতঃ তার বিরুদ্ধেই গেষ্টাণ্টীয়গণ বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। আণবিক বেদনা-পুঞ্জের আনুসঙ্গিক সংশ্লেষণের সাহায্যে মনের ব্যাখ্যা দুর্ব্যাখ্যা বলে এঁরা ধ্রুপদী মনোবিজ্ঞানকে নির্ব্বাসনে পাঠালেন। অংশ থেকে সমগ্রে উপনীত হবার অসম্ভাব্যতা এঁদের মনে বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল, তাই সিদ্ধান্ত করলেন যে অংশকে সমগ্রের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে বিচার না করলে অংশকে বোঝা যায় না। ন্যায়তঃ সমগ্রতা অংশতার পূর্ব্ববর্ত্তী; অতএব এঁরা দেহাচারবাদীর পরাবর্ত্তকের বিশেষীকরণ বিধিকেও আণবিক সংশ্লেষণ-স্থানীয় বলেই মনে করেন। গেষ্টাণ্টের এই তাত্ত্বিক প্রতিবেশে পরীক্ষাগারের অবিরত পরিশ্রমের ফল এই বিখ্যাত পুস্তক, Principles of Gestalt Psychology।

প্রথম পরিচ্ছেদে গ্রন্থকার বহু দার্শনিক আলোচনার সন্নিবেশ করেছেন ও শেষ পরিচ্ছেদে পুস্তকের প্রতিপন্ন বিষয়ের সঙ্গে যোগ রেখে তার পুনরুল্লেখ করেছেন। প্রত্যক্ষ, স্মৃতি, জ্ঞানোন্মেষ, চিন্তা, ইচ্ছা, ভাবাবেগ, অস্মিতা প্রভৃতি মনোবিজ্ঞানের প্রায় সমগ্র ক্ষেত্রে গেষ্টাণ্টের প্রয়োগ দ্বারা পূর্ব্বাচার্য্যদের সঙ্গে নিজের মতের সামঞ্জস্য করে এই শাস্ত্রকে এক নূতন রূপ প্রদান করেছেন। ফলে বহু তথ্য ও তত্ত্বের ঘন-সন্নিবিষ্ট অরণ্যানীর মধ্যে অনভিজ্ঞ পাঠককে প্রায় দিশেহারা হয়ে যেতে হয়। যুগান্তব্যাপী বাদ-বিসংবাদের সমাধানের চেষ্টার ফলে পুস্তকখানি

বিশেষজ্ঞদের অত্যন্ত প্রয়োজনীয়; কিন্তু লিখনভঙ্গীর সাবলীলতা এত দুরূহ ব্যাপারকেও মনোজ্ঞ করে তুলেছে। তবে একটু অন্যমনস্ক হলেই চিন্তার ও বিচারের ধারাবাহিকতা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার সম্ভাবনা অত্যন্ত বেশী। কাজেই পাঠককে অত্যন্ত অবহিত হয়ে ধৈর্য্যাবলম্বন করে পুস্তকখানির পরিচ্ছেদের পর পরিচ্ছেদ অতিক্রম করে লেখকের সিদ্ধান্ত পর্য্যন্ত পৌছাতে হয়। তবে প্রথম পরিচ্ছেদে কিছু সাধারণ আলোচনা থাকাতে সে পক্ষে কিছু সৌকর্য্য হয়।

চর্য্যা বা জ্ঞানোন্মেষ সম্পর্কে গ্রন্থকারের মূল বিরোধ দেহাচারবাদীদের সঙ্গে। থর্ণডাইকের পরীক্ষা ও ভ্রান্তি নামক বিখ্যাত বিধির বিরুদ্ধে বহু যুক্তি দেখান হয়েছে। চর্য্যার মূলে কেবলমাত্র প্রয়োগ বর্ত্তমান এই সিদ্ধান্তের প্রতিকূল পরীক্ষা দ্বারা গ্রন্থকার দেখাতে চেষ্টা করেছেন যে অন্তর্দৃষ্টিই চর্য্যার প্রাণ। সম্পর্ক স্থাপন ও অর্থগ্রহ অন্তর্দৃষ্টি ভিন্ন সম্ভব নয় এই যুক্তিতে দেহাচারবাদীদের বিখ্যাত প্রয়োগ-বিধি খণ্ডনের চেষ্টায় ইনি বহু পরীক্ষার উল্লেখ করেছেন। প্রত্যক্ষ সম্পর্কেও প্রতিদ্বন্দ্বী মতবাদ নিরসন দ্বারা গেষ্টাণ্টবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য প্রযত্নের ত্রুটী করেন নি। কিন্তু যে থর্ণডাইকের বিরুদ্ধে গেষ্টাণ্টের এই অভিযান সে কাল্পনিক প্রতিপক্ষ মাত্র, অন্তর্দৃষ্টি না হোক, অন্ততঃ অর্থগ্রহকে আসল থর্ণডাইক অস্বীকার করেন নি। আর প্রত্যক্ষ সম্পর্কে গ্রন্থকার যে ভৌতিক, শারীর ও মানসিক গেষ্টাণ্টের পরিকল্পনা করেছেন, তা কতটা ভারসহ বলা কঠিন। স্বতঃই মনে হয় পদার্থবিদ্যা ও শরীর-বিজ্ঞানের এই কাল্পনিক মূর্ত্তি রচনা গেষ্টাণ্টের ভঙ্গুরতার পূর্ব্ব সূচনামাত্র।

বৈজ্ঞানিক গ্রন্থে অতিমাত্রায় দার্শনিকতার গন্ধ থাকলে স্বভাবতঃই অত্যন্ত সংশয় উপস্থিত হয়। কফ্‌কা কেবলমাত্র পরীক্ষা ও পর্য্যবেক্ষণের উপর নির্ভর করে তাঁর বৈজ্ঞানিক মতবাদ স্থির করতে রাজী নন। তিনি একটা পূর্ব্ব-কল্পিত পরিকল্পনার সাহায্যে মনোবিজ্ঞানের পরিধি ও বিষয়বস্তু সম্বন্ধে একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে পরীক্ষা ও পর্য্যবেক্ষণলব্ধ জ্ঞানকে কোন প্রকারে সেই কাঠামোর মধ্যে সন্নিবিষ্ট করতে অত্যন্ত ব্যগ্র। বিভিন্ন বিজ্ঞানের সীমানির্দ্দেশ ও বিষয়-বস্তুর বৈশিষ্ট্য নির্দ্ধারণ অত্যন্ত দুরূহ দার্শনিক বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত। দৃষ্টান্তস্বরূপ কাণ্টের Critique of Pure Reason-এর শেষাংশে Transcendental Doctrine of Methodএর Architetonic of Pure Reason নামক অধ্যায়ের উল্লেখ করা যেতে পারে। আর এ আলোচনাতে বৈজ্ঞানিকের অপেক্ষা দার্শনিকের অধিকার বেশী। অধিকন্তু, কোন বিজ্ঞানের বহু তথ্য ও তত্ত্ব আবিষ্কৃত না হওয়া পর্য্যন্ত এ জাতীয় দার্শনিক আলোচনা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ও অনুসন্ধিৎসার পরিপন্থী। গ্রন্থকার প্রাকৃতিক ও মানসিক পরিবেশ প্রভৃতি বিষয়ে যে আলোচনা করেছেন তা প্রয়োজনীয় হলেও, তার দ্বারা বর্ত্তমান পুস্তকে দার্শনিকতাপ্রসূত, অতএব আপত্তিকর।

বিস্তৃত দার্শনিক বিচার করলে মনোবিজ্ঞানের স্থান ঠিক কোথায় তা স্থির করা অত্যন্ত কঠিন। প্রথমতঃ বিষয়-বস্তু ও পদ্ধতির মূলগত পার্থক্যের বিষয় মনে রাখলে পদার্থবিজ্ঞানের সঙ্গে একে সমপর্য্যায়ে ফেলা চলে না। আর যদিও বা কিছু সম্ভব হয়, সে একমাত্র দেহাচারবাদী মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধেই কিছু খাটে।

গেষ্টাণ্টবাদ শেষ পর্য্যন্ত McDougallএর Hormic Psychology বা বর্ত্তমান জার্ম্মেনীর Spranger, Binswanger, Ewald প্রভৃতি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত Understanding Psychology'র সমপর্য্যায়ভুক্ত। Dilthey ও Munsterburgএর সঙ্গেও Gestalt-পন্থীগণের মূলগত সাদৃশ্য আছে; দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে দেখলে Gestalt Psychology Empirical Psychologyর সমগোত্রে উন্নীত হয়েছে বললেও বোধ হয় বিশেষ অত্যুক্তি হয় না।

অবশ্য একথা Gestalt Psychologyর সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গি ও বিচার পদ্ধতির দিক থেকেই কেবলমাত্র খাটে। আধুনিক কালোপযোগী বহু পরীক্ষা ও পর্য্যবেক্ষণের ফলে এই মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্র অত্যন্ত সমৃদ্ধ একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই। বর্ত্তমান কালের মনোবিজ্ঞানের বহুবিদিত লেখকের এই পুস্তকখানি দার্শনিক, মনস্তত্ত্ব ও দর্শন-বিজ্ঞানে অনুরাগী প্রত্যেক পাঠককেই পাঠ করতে আমরা অনুরোধ করি।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী

A Handbook of Marxism—Edited by Emile Burns (Gollancz,)

প্রায় এগার শো পাতা, ছাপা ভাল, কাপড়ের বাঁধাই, দাম মাত্র পাঁচ শিলিং—একে বইয়ের বাজারে একটা মস্ত দাঁও বলতেই হবে। পুণ্যার্জ্জনের ইচ্ছা থাকলে কেউ যেন এর অন্তত শখানেক কপি কিনে একটা ছোটখাট দানছত্র খোলেন!

মার্ক্‌স্‌বাদের প্রামাণ্য আলোচনা একখানা সহজলভ্য বইয়ের মধ্যে যতদূর ঢোকানো যায়, বার্ণস্‌ সে চেষ্টা করেছেন। যাঁদের মুখ আর কলম দিয়ে মার্ক্‌স্‌বাদ বিশ্লেষণ এ বইয়ে হয়েছে, তাঁরা কেউই পণ্ডিতী টীকাকার নন্‌। তাঁরা হচ্ছেন স্বয়ং মার্ক্‌স্‌, এঙ্গেল্‌স্‌। আর তাঁদের দুই শ্রেষ্ঠ শিষ্য লেনিন আর ষ্টালিন। বইয়ের আর্দ্ধেকের কিছু বেশী দুই গুরুর লেখা থেকে বাছা, বাকিটা হচ্ছে দুই শিষ্যের লেখা, বক্তৃতা আর ১৯২৮ সালে থার্ড ইণ্টারন্যাশ্‌নলের অধিবেশনে যে কার্য্য-পদ্ধতি গৃহীত হয়েছিল তার বিবরণ। অন্য কারুর লেখা এতে নেই; প্লেখানভ, ট্রট্‌স্কি, কাউট্‌স্কি বা হিল্‌ফারডিঙের উল্লেখ নেই শুধু বইয়ের শেষে এক নামের তালিকায় ছাড়া; যাঁরা মার্ক্‌স্‌বাদকে ঘষে' মেজে "ভদ্রস্থ" করার চেষ্টায় ছিলেন সেই "Revisionists"-দের কথা তো ছাড়াই যাক্‌। ১৮৪৮ সালের কম্যুনিষ্ট্‌ ইস্তাহার দিয়ে বই আরম্ভ, আর শেষ হচ্ছে ১৯২৮ সালে ইণ্টারন্যাশ্‌নলের কার্য্যপদ্ধতিতে। আর ক মাস বাদে বইটা বেরুলে সম্প্রতি ইণ্টারন্যাশ্‌নলের যে অধিবেশন হয়ে গেছে, তার খবর থাকৃত আর সে খবর কম্যুনিজ্‌মের ইতিহাসে বিশেষ দামী।

ভারতে ইংরেজ রাজত্ব সম্বন্ধে ১৮৫৪ সালে মার্ক্‌স্‌ যা' লিখেছিলেন তা আমাদের প্রায় সকলের পক্ষেই দুষ্প্রাপ্য তো বটেই, একরকম অপ্রাপ্য; এ বইয়ে সেটা মিলবে। মার্ক্‌সের 'Poverty of Philosophy' (যা' প্রধঁর Philosophy

of Poverty'-কে বিদ্রূপ করে লেখা হয়েছিল), এঙ্গেল্‌সের 'Origin of the Family, Private Property, and the State' লেনিনের 'Materialsm and Empirio Criticism', 'Imperialism' ইত্যাদি অনেক বই যা' আমরা বড় একটা যোগাড় করতে পারি না, তা থেকে বিস্তৃত উদ্ধৃতি এ বইয়ে পাওয়া যাবে। আসল মার্ক্‌স্‌বাদ বল্‌তে যা বোঝায়, তার ঐতিহাসিক, দার্শনিক, অর্থনৈতিক, রাষ্ট্রনৈতিক, দৈনন্দিন কার্য্যপদ্ধতি বিষয়ক—এ সব রকম আলোচনা চুম্বকে জান্‌তে হলে এ বইয়ের জুড়ি আর কোথাও মিল্‌বে মনে হয় না।

কেউ কেউ হয় তো চাইবেন যে ট্রট্‌স্কির 'Russian Revolution' থেকে বা হিল্‌ফারডিঙের 'Finance Capital' থেকে বা কাউট্‌স্কির ১৯১৪ সালের আগের লেখা থেকে কিছু উদ্ধৃত করে দেওয়া উচিত ছিল। আমরা অনেকেই ট্রট্‌স্কির অসামান্য তীক্ষ্ণ প্রতিভা দেখে অল্পাধিক মুগ্ধ; কাউট্‌স্কি আর হিল্‌ফারডিঙ্‌ জার্ম্মাণভাষী দেশে যে মার্ক্‌স্‌বাদীদের এককালে পুরোধা ছিলেন, তাও অনেকে জানেন। কিন্তু মার্ক্‌স্‌বাদের ভিত্তির ওপর যারা নতুন সমাজ-সৌধ নির্ম্মাণে ব্যস্ত, তারা বিমার্গগামীদের ("deviationists") ক্ষমা করতে পারে না, তাদের মতে যারা কৃতঘ্ন তাদের পূর্ব্ব খ্যাতির জন্যে কৃতজ্ঞতাপ্রকাশ ভণ্ডামির একটা প্রকার-ভেদ। ট্রট্‌স্কির অতিদুর্ল্লভ চিন্তাশক্তি, কর্ম্মক্ষমতা ও লেখনীদক্ষতা তাদের অজ্ঞাত নয়, গত মহাযুদ্ধের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কাউট্‌স্কি যে নির্ব্বিসম্বাদে মার্ক্‌স্‌বেত্তাদের শিরোমণি ছিলেন, তাও অস্বীকার্য্য নয়; কিন্তু যুদ্ধ কাউট্‌স্কিকে সুবিধাবাদী ("opportunist") করে দিল আর মতান্তর ট্রট্‌স্কিকে প্রকাশ্যভাবে কম্যুনিষ্ট্‌ দলের অনুশাসনদ্রোহী করল—এ দুই অপরাধের মার্জ্জনা নেই।

এই সুযোগে ষ্টালিন্‌-ট্রট্‌স্কির মতভেদ সম্বন্ধে একটু আলোচনা হয়তো একেবারে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। মতদ্বৈধের প্রধান কারণ হচ্ছে ট্রট্‌স্কির "Permanent Revolution"-বাদ। তাঁর মতে প্রলেটেরিয়টের যে কেবল ধনিকদলের সঙ্গে সংঘর্ষ হবে তা নয়, চাষীদের মধ্যে অধিকাংশই তাদের বিরুদ্ধে যাবে। সুতরাং যে সমস্ত পশ্চাৎপদ দেশে চাষীদের সংখ্যাধিক্য প্রবল, সেখানকার সমস্যা সমাধান তখনই হতে পারবে যখন সমস্ত পৃথিবীতে প্রলেটেরিয়ট্‌ বিদ্রোহ সাফল্য লাভ করেছে। এর এক অর্থ এই যে বিপ্লবী রুষদেশ কখনই রক্ষণশীল ইয়োরোপ বর্ত্তমান থাকা পর্য্যন্ত নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারবে না। ইয়োরোপের মজুর শ্রেণী রুষদেশকে সাক্ষাৎ সাহায্য না করলে সেখানে সমাজতন্ত্রবাদ সুপ্রতিষ্ঠ হতে পারবে না। অন্তত ইয়োরোপের প্রধান সব দেশে শ্রমিকদের জয় না হলে রুষদেশে নতুন সমাজসৃষ্টির চেষ্টা ব্যর্থ হবে।

লেনিনের লেখা থেকে বোঝা যাবে যে প্রলেটেরিয়ন্‌ ডিক্টেটরশিপের ভিত্তি হচ্ছে নগর ও গ্রামের সকল শ্রমিকদের ঘনিষ্ঠ মিলন; মিলের কুলী আর মাঠের চাষীকে এক নিশানের তলায় দাঁড় করাতে হবে, ট্রট্‌স্কি এদের আলাদা তাঁবুতে ঠেলেছেন। বিপ্লবে চাষীদের যে অনেকখানি যায়গা নেবার আছে তা তিনি উড়িয়ে দিচ্ছেন বলে প্রকারান্তরে তাদেরই সাহায্য করছেন যারা চাষীদের বিপ্লবান্দোলনে ডাক দিতে নারাজ। আর দ্বিতীয়ত, লেনিনের মতে ধনিকবাদের একটা নিয়মই

হচ্ছে এই যে, বিভিন্ন দেশে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অগ্রগতি হবে অসমান, তার রেখা অবক্র, মসৃণ, ঋজু নয়, কোথাও কম, কোথাও বেশী এই তার স্বভাব। সুতরাং এ অবস্থায় কয়েকটি বা এমন কি একটি মাত্র দেশেও সমাজতন্ত্রবাদের জয় অবশ্য-সম্ভাবী। গত মহাযুদ্ধের সময় লেনিন মনে করেছিলেন যে ঐ বিকট তাণ্ডবের অবিশ্রান্ত ক্রূরতা ও নির্ব্বুদ্ধিতা দেখে সকলের চক্ষুরুন্মীলন হবে, বিপ্লব কেবল সর্ব্বব্যাপী হবে না সর্ব্বত্র সফলও হবে, "একদেশে সমাজতন্ত্রবাদ" সম্ভব কি না সে বিচার নিষ্প্রয়োজন হবে। কিন্তু ইতিহাসের সিদ্ধান্ত হল ভিন্ন, আর সোভিয়েট ইউনিয়ন স্থাপন ও পরিচালন ব্যপদেশে তাঁর অভিজ্ঞতা পুরোনো মতে পরিবর্ত্তন এনে দিল।

মার্ক্স্ও একবার তাঁর এক চিঠিতে বলেছিলেন যে "একদেশে সমাজতন্ত্রবাদ" সম্ভব কি না সন্দেহ। কিন্তু লেনিন আর ষ্টালিন দেখ্লেন যে অন্তত রুষদেশ সম্বন্ধে তাঁর ও মত ঠিক খাটছে না। মার্ক্স্ যে অর্থে "এক দেশ" কথা দুটো ব্যবহার করেছিলেন, সে অর্থে রাশ্যা একদেশ মাত্র নয়, এক বিরাট মহাদেশ যা প্রায় সম্পূর্ণ স্বনির্ভর হতে পারে। ভৌগোলিক বহিরাকৃতি (configuration) যার সহায়, যেখানে ধনোৎপাদনের সুযোগ প্রায় অফুরন্ত, যেখানকার অধিবাসীদের জীবনযাত্রা অনেক অগ্রগামী দেশের তুলনায় সহজে পরিবর্ত্তন সাপেক্ষ,—সেখানে সমাজতন্ত্রবাদ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা এক কথা, আর ধনিকজগতের বৈরিতা অগ্রাহ্য করে ইংলণ্ডের মত সুসংহত, বাণিজ্যনির্ভর দেশে সমাজতন্ত্রবাদ স্থাপনের চেষ্টা আর এক কথা। এই কারণে লেনিন একবার বলেছিলেন যে রুষদেশের তুলনায় ইংলণ্ডে সমাজতন্ত্রের গোড়াপত্তন সময়সাপেক্ষ, কিন্তু ইংলণ্ড বা ফ্রান্সে ভিত্ একবার ভাল করে খুঁড়তে পারলে রাশ্যার চেয়ে ঢের তাড়াতাড়ি ইমারৎ উঠে যাবে।

অবশ্য 'Socialism in one country'—একথা শুনে প্রেরণা বেশী আসে না। তবে যাদের প্রেরণা কতগুলো গরম কথা তাদের দাম সমাজতন্ত্রবাদীদের কাছে খুবই কম। আর সকলেই জানেন যে পৃথিবীর এক ষষ্ঠাংশ জুড়ে যে প্রচেষ্টা অদম্য উদ্যমে চলেছে, তার সাফল্যের চেয়ে বড় প্রেরণা শ্রমিক আন্দোলনের আর কিছু নেই। মার্ক্স্‌বাদ জড় বিশ্বাস নয়, জীবন্ত আন্দোলন, তার রীতি, তার বিধি স্থাণু, নিশ্চল নয়; তাই Brest-Litovsk সন্ধির সময় ট্রট্স্কি যখন ব্যাকুল হয়ে লেনিনকে তার করেছিলেন যে 'ঈভ্নিং' পোষাক পরে সন্ধি-সভায় তিনি প্রলেটেরিয়ন্ হ'য়ে কেমন করে উপস্থিত হন, তখন উত্তর আসে যে যুদ্ধশান্তির জন্যে প্রয়োজন হয় তো 'পেটিকোট' পরে হাজির হও। তাই তাঁর New Economic Policy মার্ক্স্‌বাদের আদর্শ থেকে সাময়িক বিচ্যুত হলেও তিনি গ্রহণ করতে দ্বিধা করেন নি; ষ্টালিনও সেই পথ অনুসরণ করে ট্রট্স্কির বিরুদ্ধবাদী হয়েছিলেন। ঐ দুই নেতার মধ্যে ব্যক্তিগত দ্বন্দ্বও যে বিরোধের মধ্যে ছিল না, তা' নয়; কিন্তু ব্যক্তিগত মতামতের চেয়ে সমূহের স্বার্থই শ্রেয়, তাই পার্টির নিয়ম যিনি লঙ্ঘন করেছিলেন, তাঁর শাস্তি হল। লেনিনের সময় যেমন Martov, Dan প্রভৃতি দেশত্যাগে বাধ্য হয়েছিলেন, তেমনি ষ্টালিনের সময় ট্রট্স্কিকেও দেশ ছাড়তে হল। এ নিতান্ত দুঃখের বিষয়, সন্দেহ নেই; কিন্তু সমাজতন্ত্রবাদীদের কাছে বিপথগামিতা বিষম অপরাধ, ভ্রমস্বীকার ভিন্ন তার মার্জ্জনা নেই।

আলোচ্য বই ছেড়ে খানিকটা বেরিয়ে আসা গেছে। আবার ফিরে বলা যাক যে এ থেকে যাঁরা সমাজতন্ত্রবাদ সম্বন্ধে একটা সঙ্কলন আশা করছেন, তাঁদের ভুল হচ্ছে। তবে মার্ক্স্ ও এঙ্গেল্স্ যে মতবাদ ও বিপ্লবান্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা, সে সম্বন্ধে একটা বই থেকে যত না আশা করা যায়, তার বেশী এ বইয়ে পাওয়া যাবে।

বাছাই খুব ভালই হয়েছে—তবে দু' একটা জিনিষ, যেমন আয়ারল্যাণ্ড বা "housing question" সম্বন্ধে মার্ক্স্ বা এঙ্গেল্স্ যা বলেছিলেন তার দাম এখন তাঁদের অন্য অনেক লেখার তুলনায় কম। তার বদলে "Wage-Labour and Capital" থেকে অন্তত কিছু, মার্ক্স্-এঙ্গেল্সের পত্রাদি থেকে কিছু, আর "Critique of Political Ecomony"র ভূমিকাটা নিশ্চয়ই এখানে থাকা উচিত ছিল। ষ্টালিনের লেখা খুব দরকারী হলেও তার সামান্য কমিয়ে একটু যায়গা মার্ক্সের জন্যে বাড়ানো হলে ভালই হত। মার্ক্স্বাদের অর্থনীতির দিক্‌টা আরও পরিষ্কার করবার চেষ্টা বাছাইয়ের মধ্যে দিয়ে হতে পারত।

অবশ্য এগুলি হচ্ছে গৌণ সমালোচনা; বইখানার দাম সম্বন্ধে সন্দেহ নেই। ইংরাজীতে যে কথা আছে—"beg, borrow or steal" সেটা একটু বদ্‌লে বল্‌ব এ বইটা—buy, borrow or steal।

হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

শ্রীসরস্বতী প্রেস লিঃ, ১নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে শ্রীকুলভূষণ ভাদুড়ী কর্তৃক মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ২৪।৫৯, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত।